আল ইলমু ওয়াল ওলামা

আশরাফ আলী থানবী রহঃ

ইফাদাত

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা

শাহ মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানভী রহ.

العلم والعلماء

আল ইলমু ওয়াল উলামা

সংকলন

মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নদভী

মুফতী : জামিয়া আরাবিয়া, হতুরা, বান্দাহ, ভারত

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবদুল গাফ্ফার শাহপুরী

জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

আশরাফিয়া বুক হাউস

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৯১১০০৬৮০৬

www.banglakitab.weebly.com

عَلَيْكُمْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ
فَإِنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ

তোমরা আলেমদের মজলিসে বসো এবং জ্ঞানীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কেননা, আল্লাহ তাআলা হেকমতপূর্ণ বাণীর জ্যোতিতে মৃত অন্তরকে জীবিত করে দেন।

হাকীমুল উম্মত থানভী [রহ.]-এর মালফুজাত, বয়ান ও রচনাসমগ্রের বিষয়ভিত্তিক সংকলন সিরিজের অন্যতম আয়োজন 'আল্ ইলমু ওয়াল উলামা'।

এ বইয়ে অনেক শ্রম-সাধনা ব্যয় করে হযরত থানভী [রহ.]-এর সমগ্র ওয়াজ ও রচনা মন্থন করে ইলমের গুরুত্ব, উলামায়ে কেরামের প্রয়োজনীয়তা, মাদরাসা-মকতবের উপকারিতা, পরিচালক ও শিক্ষকবৃন্দের জন্য দিকনির্দেশনা, আবশ্যকীয় সতর্কীকরণ, আলেমদের জীবিকা নির্বাহের পন্থা, ফারেগ তালেবুল ইলমদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থাসহ তালেবুল ইলম ও উলামায়ে কেরামের ইসলাহ ও সংশোধন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সংকলন করা হয়েছে।

মাদরাসার শিক্ষা ও পরিচালনা সংক্রান্ত সকল বিষয়, মুহ্তামিম ও শিক্ষকবৃন্দের গুণ ও শর্তাবলি, স্ট্রাইক, চাঁদা, দস্তারবন্দী, জলসা, মাদরাসা ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষের প্রতি অভিযোগ ও তার জবাব, আলেম ও সাধারণ জনগণের প্রতি উপকারী নসিহত ও পরামর্শ ইত্যাদি এবং অনুরূপ প্রায় তিন শতাধিক শিরোনামকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ করার পরই বইটির গুরুত্ব ও উপকারিতার সঠিক অনুধাবন সম্ভব হবে।

- মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নদভী

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

باسمه سبحانه وتعالى

আল্ ইলমু ওয়াল উলামা'র দ্বিতীয় সংস্করণ এখন পাঠকের হাতে। বস্তুত, এটি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানভী [রহ.]-এর মালফুজাত, মাওয়ায়েয, ফাতাওয়া ও রচনাসমগ্রের চয়নিকা। এতে দীনি মাদরাসা, ইলম ও আমল এবং ছাত্র-উলামা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয়াবলি সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে। এক বছর না যেতেই আল্ ইলমু ওয়াল উলামা'র প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধবের দাবির প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের চিন্তা এলো। আল্লাহ তাআলার রহমতে উলামা-মাশায়েখ ও গবেষকগণ এ সংকলনটি খুবই পছন্দ করেছেন এবং এটি বিভিন্ন মাদরাসা ও বুযুর্গদের মজলিসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে পড়ে শোনানো হয়। বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শ মোতাবেক প্রত্যেক আলেম, তালেবুল ইলম এবং মাদরাসার সাথে জড়িত প্রত্যেক দায়িত্বশীলের জন্য এ কিতাবের অধ্যয়ন খুবই জরুরি ও উপকারী বলে বিবেচিত।

এ নতুন সংস্করণে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলেম ও ছাত্রদের উদাসীনতা অসতর্কতা এবং তার ইসলাহ সংক্রান্ত অনেক বিষয় সংযোজিত হয়েছে। এ নতুন সংস্করণে প্রথম সংস্করণের চেয়ে প্রায় একশত পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য তার উপকারিতাও পূর্বের চেয়ে বেড়ে গেছে। আল্লাহর শোকর, এ পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ইজতিহাদ ও তাকলীদ, ফিকহে হানাফীর মূলনীতি, আদাবুল ইফতা ওয়াল ইস্তিফতা, উস্তাদ শাগরেদের হক এবং তালীম-তরবিয়তের পদ্ধতি মুদ্রিত হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছে গেছে।

এছাড়াও ইসলামী বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, মুনাজারার মূলনীতি ও আদব, বক্তৃতা ও রচনার আদব, উলূম-ফনুন, নেসাবে তালীম, তাসহীলুত তালীম ইত্যাদি কিতাব যন্ত্রস্থ হয়ে আছে। অতি শিঘ্রই ইনশাআল্লাহ পাঠকের হাতে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে।

এ ছাড়া আরো অনেক বিষয়ে কাজ চলছে। বিশেষভাবে ইসলামী তাহযীব, ইসলামী অধিকার, দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি ও বিধান ইত্যাদি বইয়ের সংকলন চলছে।

আমার কল্পনায়ও ছিল না যে, এ ধরনের মহৎ কাজ করার তৌফিক আমি প্রাপ্ত হব। বস্তুত, এটা আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ এবং বুযুর্গদের জুতা বহন ও তাঁদের দোয়ার ফসল। প্রিয় পাঠকদের কাছে দোয়া চাই যেন আল্লাহ এ চেষ্টা মেহনতকে কবুল করে অবশিষ্ট কাজগুলো পূর্ণাঙ্গ করার তৌফিক দান করেন এবং সেগুলো উম্মতের সকলের সংশোধনের উপায় করে দেন।

-মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নদভী

www.banglakitab.weebly.com

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী [রহ.]-এর
মূল্যবান অভিমত

জামিয়া আরাবিয়া হাতুরার সম্মানিত শিক্ষক স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নদভী بارك الله فى حياته وافادته হাকীমুল উম্মত থানভী [রহ.]-এর বাণী, বয়ান, রচনা ও চিন্তাধারাকে বিভিন্ন শিরোনাম ও বিষয়ের অধীনে এমনভাবে সংকলন করেছেন যার দ্বারা হযরতের ইলম ও ইফাদাতের বিশ্বকোষ তৈরি হতে চলেছে। এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহৎ কর্মের কারণে স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নদভী কেবল থানভী এবং দেওবন্দী ঘরানা নয়; বরং সকল সুস্থ চিন্তাশীল গুণিজনের পক্ষ থেকেও কৃতজ্ঞতা ও দোয়া পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। সেই সাথে জামিয়া আরাবিয়া হাতুরার পৃষ্ঠপোষক মাওলানা ক্বারী সিদ্দীক আহমদ সাহেব বান্দাভী [রহ.] আরও বেশি দোয়া ও শুকরিয়া পাওয়ার যোগ্য, যার তত্ত্বাবধান, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার ছায়ায় এ ধরনের উপকারী ও মূল্যবান কর্ম তারই তালীম-তরবিয়্যতের প্রতিষ্ঠানে আঞ্জাম পাচ্ছে। اطال الله بقائه وعم نفعه جزاه الله خيرا

আবুল হাসান আলী নদভী
দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ হাসানী, রায়বেরেলী, ভারত
১৭ জিলহজ্ব ১৪০০হি.

আরিফ বিল্লাহ রুমিয়ে যমান হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের
বাণী

باسمه سبحانه وتعالى نحمده ونصلى على رسوله الكريم

জামিয়া আরাবিয়া হাতুরার শিক্ষক মাওলানা মুফতী যায়েদ মাজাহেরী নদভী সংকলিত গ্রন্থ আল্ ইলমু ওয়াল উলামা দেখে সীমাহীন খুশি লেগেছে। তিনি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানভী [রহ.]-এর রচনা ও বয়ানের সুন্দর সাবলীল সংকলন তৈরি করে মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সেগুলো দ্বারা সর্বস্তরের মানুষকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং তাকে থানভী [রহ.]-এর ইলম ও মাআরিফের আরও বেশি বেশি প্রচার-প্রসারের সেবায় নিয়োজিত থাকার তৌফিক দান করুন।

-হাকীম মুহাম্মদ আখতার
করাচী, পাকিস্তান

www.banglakitab.weebly.com

আরিফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা ক্বারী সায়্যেদ সিদ্দীক আহমদ সাহেবের

মূল্যবান অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ছাত্র যামানা থেকেই হাকীমুল উম্মত শাহ্ আশরাফ আলী থানভী [রহ.]-এর ব্যাপারে আকাবিরে উম্মত এ আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আত্মশুদ্ধির মসনদে আসীন হয়ে মানুষের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবেন এবং বিশেষ ও সাধারণ সর্বস্তরের মানুষ তার ফয়েয-বরকত দ্বারা উপকৃত হবেন। হযরতের জীবনব্যাপী অবদান ও কীর্তিগুলো আকাবিরে উম্মতের ভবিষ্যদ্বাণীর অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়ন করেছে। তাই তো কেউ সুন্দর বলেছে :

قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

আল্লাহর ওলীগণ অন্তর্দৃষ্টির আলোকে
ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত [রহ.]-কে ইসলামের সংস্কার ও সুন্নতের পুনর্জীবন দানের যে উঁচু মাকামে আসীন করেছিলেন এ যুগে তার নজীর নেই। এখনও মানুষ হযরতের রচনাবলি ও মাওয়ায়েযে হাসানা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানে হযরতের উলূম ও মাআরিফ নিয়ে বিভিন্নভাবে কাজ চলছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিছক তার দয়া ও অনুগ্রহে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ যায়েদ সাহেবকে যে অপূর্ব পদ্ধতিতে কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন তা কাউকে দেয়া হয়নি। তিনি এ জাতীয় এক ডর্জনের চেয়েও বেশি কাজ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার সকল রচনাকে ব্যাপক কবুলিয়্যত দান করুন এবং এ জাতীয় আরো বেশি বেশি খেদমতের পথ সুগম করে দিন।

অধম সিদ্দীক আহমদ

হাতুরা, বান্দাহ, ভারত

www.banglakitab.weebly.com

হাকীমুল উম্মত থানভী [রহ.]-এর মালফূজাত, মাওয়ায়েয ও রচনাসমগ্রের বিষয়ভিত্তিক সংকলনকর্মসূচি সম্পর্কে

আকাবিরে উম্মতের মূল্যায়ন

মাসীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী সাহেব

খলীফা, হাকীমুল উম্মত থানভী [রহ.]

মাশাআল্লাহ! খুব ভালো কাজ হয়েছে। সীমাহীন খুশির বিষয়। বর্তমানকালে হযরত থানভী [রহ.]-এর তালীম ও শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার হওয়া আবশ্যক। হযরতের শিক্ষা-দীক্ষা হল শরীয়তের মগজ ও মাণিক্য। আল্লাহ তাআলা এ কিতাবের মুদ্রণ ও প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করে দিন এবং মানুষকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

মহিউস্‌সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব

খলীফা, হাকীমুল উম্মত থানভী [রহ.]

খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কাজের তৌফিক আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করেছেন শুনে খুশি হলাম। بارك الله تقبل الله
তালেবুল ইলম ও উলামায়ে কেরামের মজলিসে এ কিতাব পড়ে শোনানো হয়েছে। অন্তর থেকে কবুলিয়্যতের দোয়া করি। কোন বিষয় হৃদয়ে জাগলে অবগত করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা শায়খ ইউনুস সাহেব

শাইখুল হাদীস, মাজাহিরুল উলূম, সাহারানপুর, ভারত

তোমার সংকলিত গ্রন্থ 'আল্ ইলমু ওয়াল উলামা' আমার খুবই ভালো লেগেছে। আসর পরবর্তী ছাত্র মজলিসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে শুনেছি। খুবই উপকারী কিতাব। তোমার সবগুলো কিতাব দেখে সীমাহীন আনন্দিত হয়েছি। এটা সহজ কাজ নয়। হাজার হাজার পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে সেগুলোর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা এবং সুবিন্যাস্তভাবে সাজানো খুবই জটিল কাজ। এগুলোকে নিছক তোমার সংকলন না বলে সরাসরি রচনা বললেও অত্যুক্তি হবে না। আল্লাহ তাআলার বেশি বেশি শোকর আদায় করা উচিত। এ বয়সে তুমি এত বিশাল কাজ আঞ্জাম দিয়েছো। আল্লাহ তাআলা তোমার সময়ে বরকত দিয়েছেন। তুমি যতই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে কম হবে। পুনঃমুদ্রণের সময় যদি ইলমী বিষয়গুলোর আরবী কিতাবের উদ্ধৃতিসমূহ টীকার মধ্যে দিয়ে দেয়া যায় তাহলে উপকারিতা আরো বেড়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী

লেখক : ফতুয়ায়ে রহীমিয়া

باسمه سبحانه وتعالى

সুহৃদ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ যায়েদ সাহেব

وعليكم السلام ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

মাশাআল্লাহ আপনি খুবই উপকারী সিরিজ শুরু করেছেন। অত্যন্ত নিপুণভাবেই সংকলন করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনার খেদমত কবুল করুন এবং সর্বস্তরের মানুষের জন্য উপকারী করুন। হযরত থানভী [রহ.]-এর মালফূজাত এবং বয়ান খুবই উপকারী। আপনার শ্রম-সাধনা প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাআলা এগুলো আপনার পরকালের সঞ্চয় করুন।

امين بحرمة النبى الامى صلى الله عليه وسلم

আপনিও দোয়া করতে থাকুন। ওয়াস্‌সালাম।

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী

শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

সাধারণতঃ রচনা ও লেখনী বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। তাই সেখান থেকে বিষয়বস্তু খুঁজে বের করা সহজ। কিন্তু মাওয়ায়েয ও মালফূজাতের ধরণ তার ব্যতিক্রম। এতে বিষয়বস্তু মণি-মুক্তার মতো ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত থাকে। এজন্য সেগুলোকে কুড়িয়ে এনে কোন সুতায় গাঁথার প্রয়োজন হয়। তবেই হার বানিয়ে গলায় পরা সম্ভব হয়।

আমি আনন্দিত যে, জনাব মাওলানা যায়েদ সাহেব খুবই কষ্ট সহ্য করে সেসব বিষয়বস্তুকে বিষয় ও শিরোনামের অধীনে সংকলন করেছেন। আমি এ সংকলন গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছি এবং খুব উপকৃতও হয়েছি। আল্লাহ তাআলা উলামা-তালাবা, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এবং সর্বশ্রেণীর মুসলমানকে থানভী ইলমের এ ঝর্ণাধারা থেকে সিক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দীন সম্ভলী সাহেব

উসতাযুল হাদীস, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, ভারত

বাস্তবেই আপনার মনোযোগ এমন একটি উপকারী কর্মের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাহনুমায়ী ও তৎপ্রদত্ত মেধা ছাড়া আঞ্জাম দেয়া অসম্ভব। এটা শুধুই আল্লাহর অনুগ্রহ। কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে অনবগতদের কাছে এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি অন্য কোন গবেষণা ও ইলমী কাজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারপর শিরোনাম দিয়ে তা সজ্জিত করার দ্বারা উপকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনার জন্য অন্তর থেকে দোয়া আসে। আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন।

www.banglakitab.weebly.com

ইসলামী ঐতিহাসিক হযরত মাওলানা কাজী আতহার মুবারকপুরী

বস্তুত, হযরত থানভী [রহ.] মুসলিম উম্মাহর সর্বস্তরের জনগণের অবিসংবাদিত অনুসরণীয় বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বয়ান-বক্তৃতার হাজারো পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মণি-মুক্তাগুলোকে সুবিন্যাস্তভাবে সাজানোর প্রয়োজন ছিল। যাতে ব্যাপকভাবে উপকৃত হওয়া যায়। হযরতের ভক্তবৃন্দ এ ব্যাপারে কাজ শুরু করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। সুখের কথা, শ্রদ্ধেয় মাওলানা সিদ্দীক আহমদ বান্দাভী সাহেবের তত্ত্বাবধানে মুফতী যায়েদ সাহেব মাজাহেরী নদভী বেশ কৃতিত্বের সাথে বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তিাগুলোকে কুড়িয়ে এনে ভিন্ন ভিন্ন সুতায় মালা গাঁথার কসরত চালাচ্ছেন।

এ উদ্যোগের প্রথম মাল্য আল ইলমু ওয়াল উলামা সকলের হাতে শোভা পাচ্ছে, যা হযরত থানভী [রহ.]-এর মাওয়ায়েয, মালফুজাত ও রচনাবলি মন্থন করে যায়েদ মাজাহেরী সংকলন করেছেন। এ কিতাব থেকে অনুমান করা যায় যে, আগামীতে এ সিরিজের যেসব কিতাব প্রকাশিত হবে তা হযরত থানভী [রহ.]-এর ইলমী ফুয়ূজ ও বারাকাতের অমূল্য ভাণ্ডারে পরিণত হবে। আর এসব বই প্রচার-প্রসারের দ্বারা ব্যাপক উপকার সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত মাওলানা মুফতী যফীরুদ্দীন সাহেব

মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

হযরত মাওলানা আবদুল বারী নদভী [রহ.]-এর পর এ যুগে আল্লাহ তাআলা মাওলানা মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরীকে হযরত থানভী [রহ.]-এর রচনা, মাওয়ায়েয ও মালফুজাত অধ্যয়নের বিশেষ রুচি ও আগ্রহ দান করেছেন। সেই সাথে তাকে সংকলন করার সঠিক জযবা ও চেতনাও দিয়েছেন। তিনি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অসংখ্য মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। তিনি হযরত থানভী [রহ.]-এর জ্ঞানভাণ্ডারকে মুসলিম উম্মাহর সামনে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করছেন। যাতে গোটা মুসলিম জাতি সেগুলো পাঠ করে ইলম ও আমলে পরিপক্কতা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের ইলমী ও আমলী দুর্বলতাকে সহজে দূর করতে পারে।

আমি দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা মাওলানার মূল্যবান খেদমতকে কবুল করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মাওলানা নাজমুল হাসান

নাজেম, মাদরাসা ইমদাদুল উলূম খানাকায়ে আশরাফিয়া, থানাভবন, মুজাফ্ফরনগর, ভারত

বক্ষমান কিতাবের সংকলক মুফতী যায়েদ মাজাহেরী হযরত হাকীমুল উম্মতের কিতাবাদির প্রতি ভালোবাসা ও হযরতের উলূম ও মাআরিফ থেকে চয়নের বিশেষ নিপুণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর শ্রম-সাধনা বিশেষ মুবারকবাদের যোগ্য। তিনি হযরতের রচনা ও বয়ান থেকে নানা বিষয়ে সংকলনগ্রন্থ তৈরি করেছেন। যার সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় অনায়াসে একত্রে পাওয়া সম্ভব হয়ে গেছে। আর সংকলনটিও বেশ চমৎকার ও নিপুণ হয়েছে।

হযরত মাওলানা রাবে হাসানী নদভী

নদওয়াতুল উলাম, লাক্ষ্ণৌ, ভারত

আপনার প্রেরিত রচনাসমগ্র পৌঁছেছে। আপনি একটি উপকারী সিরিজ তৈরি করেছেন। ইলমী ঘরানার সর্বস্তরের লোকদের জন্যই তা জরুরি মনে হচ্ছে। ফিকহ, ইফতা এবং আদাবে মুতাআল্লিম ও মুয়াল্লিম ইত্যাদি বিষয়ের তিনটি কিতাব আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। মাদরাসার সাথে যুক্ত সকলকেই তা পড়া উচিত। এগুলো দ্বারা একজন তালেবে ইলম ও আলেমের যে আখলাক ও চরিত্র হওয়া উচিত, যেসব মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং দীনি কাজ করার জন্য যে সাহস ও তাকওয়ার প্রয়োজন, তা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তাআলা এগুলোর উপকারিতা ব্যাপক করে দিন। আমীন।

হযরত মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ আল্ আসাদী

জামিয়া আরাবিয়া হাতুরা, বান্দাহ, ইউ পি, ভারত

হযরত থানভী [রহ.]-এর মালফুজাত ও মাওয়ায়েযের উপর বিভিন্নভাবে কাজ হয়েছে এবং প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় বন্ধু মুফতী মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নদভী এক অভিনব পদ্ধতিতে তা সংকলন করে তার উপকারিতা ও গুরুত্ব অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষভাবে একেকটি অধ্যায়ে সাজিয়ে যেন প্রতিটি বিষয়ে হযরতের স্বতন্ত্র একটি রচনা তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী

প্রধান মুফতী, দারুল উলূম সাবীলুস্ সালাম, হায়দারাবাদ, ভারত

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী [রহ.] ঐসব আলেমদের শ্রেণীভুক্ত, যাঁদের দ্বারা বিভিন্ন যুগে আল্লাহ তাআলা ইসলামের সংস্কার ও পুনঃজীবন দান করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা হযরতকে যে বহুমুখী প্রতিভা দান করেছিলেন তার উপমা খুবই বিরল। ইসলামী উলূম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভবত এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে হযরত কলম ধরেননি এবং মুসলমানদের জীবনের সম্ভবত এমন কোন সংস্কারযোগ্য দিক নেই, যার প্রতি হযরতের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়েনি। তাঁর বয়ান ও মালফুজাত ইলম ও দীনের একেকটি ভাণ্ডার হয়ে আছে। তাতে অসংখ্য ইলমী সূক্ষ্মকথা ও মণি-মুক্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলো বিষয়ভিত্তিক যথাপোযুক্ত শিরোনামের অধীনে সুসংকলিত হওয়ার তীব্র প্রয়োজন ছিল। যাতে আলেমদের জন্য সে সুবিন্যস্ত গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা সহজ হয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু জনাব মুফতী মুহাম্মদ যায়েদ মাজাহেরী নদভী এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে সংকলন গ্রন্থ তৈরি করেছেন। আমি সেগুলো অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। মাওলানা যায়েদ সাহেব হযরত থানভী [রহ.]-এর এমন কিছু বক্তব্য ও অভিমত একত্রিত করেছেন, যার প্রতি হযরতের ভক্ত ও মুরীদদের অনেকেরই সম্ভবত দৃষ্টি পড়েনি।

বাস্তবেই মুফতী যায়েদ সাহেব গোটা আলেমসমাজের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। তিনি উম্মতের পক্ষ থেকে অনেক বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

সূচি-নির্দেশিকা

প্রথম অধ্যায় : ইলম প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইলম শিক্ষার গুরুত্ব

ইলমেদীনের খেদমত করার ফযীলত ২২
দরস এবং ওয়াজের প্রয়োজনীয়তা ২২
আলেমদের ফযীলত ২২
ইলমের পরিচয় ২৩
গর্ব করার মতো ইলম কোনটি ২৪
প্রকৃত ইলমের মর্ম এবং তার ফযীলত ২৫
ইলম ও মালূমাতের মাঝে পার্থক্য ২৭
ইলমেদীনের সাথে আমল ও খোদাভীতি অপরিহার্য ২৮
প্রকৃত আলেমের পরিচয় ২৮
আলেম কাকে বলে? ২৯
আলেম এবং মৌলভীর মাঝে পার্থক্য ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
দীনি শিক্ষার ব্যাপকভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা
এবং তার পদ্ধতি

প্রত্যেক মুসলমান তালিবে ইলম ৩০
শিশুদেরকে সর্বপ্রথম কুরআন পড়ানো উচিত ৩১
সাধারণ শিক্ষার পূর্বে দীনি শিক্ষা প্রয়োজন ৩১
কেন এ বৈষম্য ৩১
ইলমেদীন শিক্ষার ক্ষেত্রে ইখলাস না থাকলেও
উপকার রয়েছে ৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন শরীফ প্রসঙ্গ

কুরআন শরীফ শিক্ষার ফযীলত ৩৪
কুরআনের ধারক-বাহকের গুরুত্ব ৩৪
আহলে কুরআনের আদব ৩৫
কুরআন শরীফ হিফয করার প্রয়োজনীয়তা ৩৫
কুরআন হিফয করার বিস্ময়কর প্রমাণ ৩৬
হাফেয এবং ক্বারীদের ফযীলত ৩৬
কুরআন মাজীদ হিফয করলে কি
মেধা দুর্বল হয়ে যায়? ৩৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তালিবুল ইলমদের সম্মান, মহব্বত ও ফযীলত ৩৮
ইলমেদীন অন্বেষণের ফযীলত ৩৮
আরবী ও ফার্সী ভাষার ফযীলত ৩৮
ইলম ও আলেমদের ফযীলত ৩৯
আলেমদের প্রয়োজনীয়তা ৪০
পার্থিব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যও
আলেমদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ৪১
আলেমদের উসীলায় পৃথিবী টিকে আছে ৪৪
জাতীয় উন্নতির পথে ইলমেদীনের প্রয়োজনীয়তা ৪৪
আলেম সমাজ পার্থিব সফলতারও বাহন ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : দীনি শিক্ষাকেন্দ্র তথা মাদরাসা প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ : মাদরাসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দীনি মাদরাসা : ইসলাম রক্ষার অজেয় দুর্গ ৪৬
দীনি মাদরাসারগুরুত্ব ৪৬
দীনের প্রচার-প্রসারে মাদরাসার গুরুত্ব ৪৬
সমাজে মাদরাসার প্রয়োজন কেন? ৪৭
মাদরাসার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৪৭
ভালভাবে কিতাব না বুঝলেও
মাদরাসায় অবস্থান করা উপকার শূন্য নয় ৪৮
মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও মাদরাসার
অস্তিত্ব গণিমত এবং আবশ্যক ৪৮
নামসর্বস্ব মাদরাসাও উপকারী এবং প্রয়োজনীয় ৪৯
এমন সময়ও আসতে পারে যখন মাদরাসা থাকবে না ৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মাদরাসায় সাহায্য-সহযোগিতা

সাধারণ মানুষ মাদরাসার মুখাপেক্ষী ৫০
মাদরাসার ভবন নির্মানের ফযীলত ৫০
মাদরাসায় সহযোগিতা করা সাদকায়ে জারিয়া ৫১
মাদরাসার সাহায্য করা জনগণের দায়িত্ব ৫১
মাদরাসার সহযোগিতা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান
এবং সহযোগিতার কতিপয় পদ্ধতি ৫৩
তালিবে ইলমদের সাহায্য করার ফযীলত ৫৪
মাদরাসায় কিতাব দান করা চাই ৫৪
মাদরাসায় সর্বধরনের সাহায্য করুন ৫৪
দান-খয়রাত করে মাদরাসার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে
দখল দিবে না ৫৫

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মাদরাসা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ৫৬
মাদরাসা সূচনা করার সহজ পদ্ধতি ৫৬
যদি আল্লাহর কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকেন ৫৭
আবেগে কাজ করবে না ৫৭
ব্যর্থতার কতিপয় কারণ ৫৮
মাদরাসারসমূহের উন্নতি কোন পথে ৫৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুহতামিম ও শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রসঙ্গ

মাদরাসার মুহতামিম আলেম হওয়া আবশ্যক ৫৯
মুহতামিমের কিছু গুণাগুণ ৫৯
যোগ্যতার ভিত্তিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতার বংশীয় কোন আলেম মুহতামিম হওয়ার অধিক উপযুক্ত ৬০
অযোগ্যদের কোন পদ না দেওয়া ৬০
যাদেরকে পদ এবং দায়িত্ব না দেওয়া উচিত ৬১
পদ প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় লক্ষ্যণীয় ৬২
কোন শিক্ষক কিংবা কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদান ৬২
মুহতামিম ও পরিচালকদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা ৬৩
মাদরাসায় বাইরের শিক্ষক রাখা উচিত ৬৩
মাদরাসায় যাদেরকে রাখা উচিত নয় ৬৪
প্রাথমিক স্তরের কিতাবাদি পাঠদানকারীকে যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে ৬৪
শিক্ষকতার ফযীলত ৬৪
মুহতামিম এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতার শরয়ী হুকুম ৬৫
কী পরিমাণ ছাত্র ভর্তি করা যাবে ৬৫
হযরত থানবী [রহ]-এর মাদরাসার নিয়ম ৬৬
ইলমে দীনের জন্য ছাত্র নির্বাচন করা ৬৬
ছাত্র নির্বাচনের মাপকাঠি ৬৬
নির্বাচনের দ্বিতীয় মাপকাঠি ৬৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাদরাসার গঠনতন্ত্র ৬৭
মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতার প্রকৃত মর্ম ৬৭
শূরা গঠনের পূর্বের জরুরি কাজ ৬৮
মাদরাসার গঠনতন্ত্র নির্ধারিত না হলে করণীয় ৬৮
হাকীমুল উম্মত থানবী [রহ] কর্তৃক সংকলিত কওমী মাদরাসার মৌলিক নিয়মাবলী ৬৯
মুহতামিম এবং শূরা সদস্যদের শরয়ী দৃষ্টিকোণ এবং ক্ষমতা ৭২
পরামর্শের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা ৭৩
সত্যায়ন ও সমর্থন দেয়াও পরামর্শ ৭৩
পরামর্শদাতাদের মতামত অনুসরণ করা আবশ্যক নয় ৭৩
মজলিসে শূরার নীতিমালা ও গঠনতন্ত্র ৭৪
সিদ্ধান্তকৃত বিষয়ে রদবদল ৭৬
পৃষ্ঠপোষক এবং সদস্যদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে ৭৭
সিদ্ধান্ত হওয়ার পর মতবিরোধ না করা ৭৭
অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য নিযুক্ত না করা ৭৭
শূরা ও কমিটি হওয়ার যোগ্য কে ৭৭
প্রসঙ্গ : শূরা সদস্যদের যাতায়াত ভাড়া ও খরচ ৭৮
ভাড়া ও জরুরি খরচের বাইরে অতিরিক্ত পয়সা দেয়া জায়েয নেই ৭৮

তৃতীয় অধ্যায় : মাদরাসায় আন্দোলন ও ধর্মঘট

প্রথম পরিচ্ছেদ : মতবিরোধ

সকল মতবিরোধ মন্দ নয় ৭৯
মতবিরোধ নন্দিত ও নিন্দিত হওয়ার মাপকাঠি ৭৯
মতবিরোধের কারণে দুইপক্ষ কিংবা গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ অনুচিত ৮০
ফায়সালা করা এবং সমঝতা করানোর পদ্ধতি ৮১
মাদরাসায় মতবিরোধ দেখা দিলে কী করণীয়? ৮২
বিরুদ্ধবাদিরা মাদরাসা ছেড়ে চলে যেতে বললে কী করণীয়? ৮২
মাদরাসায় আন্দোলন ও ধর্মঘট হলে ৮৩
আন্দোলন থামানোর একটি বিস্ময়কর তদবির ৮৩
মাদরাসার ফেতনা-ফাসাদের কতিপয় কারণ ৮৪
সাধারণ ব্যাধি ৮৫
মতবিরোধিতার মূলভিত্তি ৮৫
ঐক্য ধরে রাখার পদ্ধতি ৮৫
মাদরাসায় সাংগঠনিক তৎপরতার কুফল ৮৫
পারস্পরিক মতানৈক্য ও কোন্দলের অশুভ প্রভাব ৮৬
আলেমদেরকে মন্দ বলা কিংবা তাদের সমালোচনা শ্রবণ করা উভয়টিই ক্ষতিকর ৮৭
আলেমদেরকে দুর্নাম ও মন্দ ধারণা থেকে

www.banglakitab.weebly.com

বাঁচানোর গুরুত্ব ৮৭
আলেমদের সম্মান রক্ষা করা ৮৭
মাদরাসা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা ৮৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ছাত্র ধর্মঘট [স্ট্রাইক]
ধর্মঘট অবৈধ হওয়ার প্রমাণ ৯২
ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ও ক্ষতি ৯২
জুলুমের উপর জুলুম, অনিষ্টের উপর অনিষ্ট ৯৩
একটি বড় বিপর্যয় ৯৩
ধর্মঘটের ক্ষতি এবং তা অবৈধ হওয়ার প্রমাণ ৯৪
ধর্মঘট করার ক্ষতি ৯৪
ধর্মঘট সমর্থকদের বৈধতার প্রমাণ ৯৫
ধর্মঘট সমর্থকদের দলিলের জবাব, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ৯৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছাত্র-বহিষ্কার প্রসঙ্গ
যেসব ছাত্রকে মাদরাসায় না রাখা উচিত ৯৯
চতুর্থ অধ্যায় : মাদরাসার শাখা ও বিভাগ
মাদরাসায় খানকার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ১০১
মাদরাসার পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি ১০২
প্রতিটি মাদরাসায় একজন বক্তা থাকা আবশ্যক ১০২
মাদরাসার অধীনে মুবাল্লিগ থাকার উপকারিতা ১০২
বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বড় মাপের দাঈ ও বক্তা হবে ১০৩
সকল মাদরাসার উদ্দেশ্যে জরুরি পরামর্শ ১০৪
ওয়ায়েযের যোগ্যতা ১০৪
মুবাল্লিগ ও বক্তার উদ্দেশ্য জরুরি দিকনির্দেশনা ১০৪
লেখনী ও বক্তৃতায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ১০৫
অশিক্ষিত দীনদার এবং শুধু হাফেজদের জন্য বিভিন্ন শিল্প শেখার পৃথক বিভাগ প্রসঙ্গে ১০৫
মাদরাসায় বৈষয়িক শিক্ষা না শেখানোই গৌরবের বিষয় ১০৬
মাদরাসায় উঁচু পর্যায়ের ইংরেজী ভাষা এবং জীবিকা উপার্জন বিদ্যা কেন শিক্ষা না দেয়া উচিত ১০৬
জীবিকা নির্বাহের জন্য আলেমদের কোন শিল্প শিক্ষা করা উচিত ১০৭
আলেমদের জন্য আয়-রোজগারের সহজ পন্থা ১০৮
আলেমদের জন্য চিকিৎসাকে প্রধান পেশা বানানো অনুচিত ১০৮
দীনি যিম্মাদারী পালনকারী আলেমদের স্বতন্ত্র পেশা গ্রহণের ক্ষতি ১০৮
দীনি দায়িত্বশীল আলেমদের জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত হওয়ার অনুমতি নেই ১০৯
দুনিয়াদার আলেমের উপর থেকে আস্থা উঠে যায় ১১০
উলামায়ে কেরামের জীবিকা নির্বাহ হবে কিভাবে? ১১০
কুরআনী দলীল ১১১
সামাজিক দলীল ১১২
দীনি শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার মাঝে পার্থক্য ১১২
সামান্য দীনি শিক্ষার অধিকারীও না খেয়ে থাকে না
মেট্রিক এবং ইন্টার পাশের অবস্থা ১১৩
ক্ষুদ্রতম চাকুরীও মূল্যায়নযোগ্য ১১৩
আলেম এবং ফকীহদের কাজ খুবই পরিশ্রমসাধ্য আমার অবস্থা ১১৪
প্রকৃত আলেম না খেয়ে থাকে না ১১৪
বেতন অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত ১১৫
নফসের প্রবঞ্চনা ১১৬
স্বচ্ছল আলেমকেও বেতন গ্রহণ করা উচিত ১১৬
মাদরাসা থেকে বেতন গ্রহণ করা কি অপমানের বিষয়? ১১৭
আলেমগণ যে কারণে বেতন-ভাতার যোগ্য ১১৭
আলেমদের বেতন কারো অনুগ্রহ নয় ১১৮
বেতনের পরিমাণ কি হবে? ১১৮
বেতন কম ধার্য করলে ইলমেদীনের অবমূল্যায়ন হবে ১১৮
প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন কেবল জায়েযই নয়; বরং উত্তম এবং পছন্দনীয় ১১৯
বেশি বেতনের কারণে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ১১৯
বেশি বেতনের আশায় অন্যত্র চলে গেলে শান্তি জোটে না ১২০
মুখলিস এবং অমুখলিসের পরিচয় ১২০
পঞ্চম অধ্যায় : মাদরাসার সংশোধন প্রসঙ্গ
মাদরাসার সংশোধন খুবই জরুরি ১২২
বেতন নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা উচিত ১২২
স্থানীয় ছাত্রদের ভাতা না দেয়ার তাৎপর্য ১২২
তরবিয়াত ও চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ১২৩
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ১২৩

www.banglakitab.weebly.com

পরিধেয় বস্ত্র বেং শরীরের পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে ১২৩
আঙ্গীনা এবং কামরাসমূহের পরিচ্ছন্নতা ১২৪
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা ১২৪
নেগেরান ও তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদ নির্ধারণ এবং তাদের দায়িত্ব ১২৫
ছাত্রদের আমল ও আখলাকের তদারকি ১২৫
ছাত্রদেরকে কানুনের প্রতি যত্নবান করে গড়ে তুলুন ১২৬
ছাত্রদের বেশভূষা ও চালচলনের প্রতি লক্ষ রাখা ১২৬
আসাতিযায়ে কেরাম ও তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি উপদেশ ১২৭
দুষ্টু ও অবাধ্য ছাত্রের সংশোধন পদ্ধতি ১২৭
ইসলামী এবং আরবী পরিভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে ১২৮
আরবী মাস এবং তারিখ ব্যবহার প্রসঙ্গ ১২৯
আরবী মাস এবং তারিখ ব্যবহারের শরয়ী বিধান ১২৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : ছাত্র ও আলেমসমাজের সংশোধন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আলেমদের করণীয়

আলেমদের উচিত দীনের সকল শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ১৩০
তালেবুল ইলম ও আলেমদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সম্ভাষণ ১৩০
ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব আমলের মাঝে ১৩০
সুহবতের প্রয়োজনীয়তা ১৩১
প্রকৃত ইলম ও প্রকৃত আলেম ১৩২
উপকারী ইলম ও ক্ষতিকর ইলম ১৩৩
দু'চারটি আরবী কিতাব পড়ে নিলেই কেউ আলেম বনে যায় না ১৩৪
আমলই হল আসল ১৩৪
আমলশূন্য গবেষণা-পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনর্থক ১৩৫
ইলমের পর আমল ও ইখলাসের প্রয়োজনীয়তা ১৩৫
ইখলাসের গুরুত্ব ১৩৬
ইখলাসের হাকীকত ও স্বরূপ ১৩৬
ইখলাসের নিদর্শন ১৩৬
দীনি ইলম অর্জনের জন্য নিয়তের পরিশুদ্ধি প্রয়োজন ১৩৭
আমলহীন ইলমের দৃষ্টান্ত ১৩৭
দরস-তাদরীসে বিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা ১৩৮
ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে ইখলাস সৃষ্টি করার পদ্ধতি ১৩৮
ইলম অর্জনের নিয়তে ভেজাল থাকলেও তা বাদ দেওয়া উচিত নয় ১৩৯
ছাত্রদের নিয়ত হতে হবে ইমাম গাযালী [রহ]-এর মতো ১৪০
ইখলাসহীন ইলম চর্চাও উপকারী ১৪১
আলেমদের মর্যাদা আমলের কারণে ১৪১
অধিকতর আক্ষেপ আলেম সমাজের প্রতি ১৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইলম মোতাবিক আমল করার গুরুত্ব ১৪৩
ইলম মোতাবিক আমল না করার শাস্তি ১৪৩
বেআমল আলেম গোটা আলেম সমাজের কলঙ্ক ১৪৪
আমলহীন আলেমও সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য ১৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নফল আমলের গুরুত্ব

নফল এবং মুস্তাহাব আমলের প্রতি আলেমদের উদাসীনতা ১৪৬
নফলের গুরুত্ব ১৪৬
তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব ও তালিবুল ইলম ১৪৭
নফল ইবাদতে কতটুকুই বা সময় ব্যয় হয়ে যায়! ১৪৮
নফল এবং মুস্তাহাব আমলের বিধান ১৪৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা

তাকওয়া দ্বারা কী হাসিল হয় ১৫০
তালিবুল ইলম এবং আলেম সমাজের জন্য ১৫০
তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা ১৫০
তাকওয়া ও আমলের ক্ষেত্রে তালিবুল ইলমদের উদাসীনতা ১৫১
ছাত্রদের একটি ভুল ও শয়তানের একটি ধোঁকা ১৫২
ছাত্রদের সাথে কয়েকটি খোলামেলা কথা ১৫২
হেদায়া গ্রন্থকারের তাকওয়া ১৫৩
তাকওয়ার মর্ম ১৫৩
সর্বাধিক বড় তাকওয়া ১৫৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আলেমদের পোশাক-পরিচ্ছদ

আলিম সমাজের জন্য অনাড়ম্বর জীবন অপরিহার্য ১৫৬
সালফে সালেহীন ও আকাবিরদের অবস্থা এমন ছিল
অনাড়ম্বর জীবনই আলেমদের শোভা পায় ১৫৭
লৌকিকতা ও সাজসজ্জার কুফল ১৫৭

www.banglakitab.weebly.com

কর্মীরা সাদাসিধে ও অনাড়ম্বরই হয়ে থাকেন ১৫৮
আলেম তো হল জাতীয় গাড়ির ড্রাইভার ১৫৮
দামী ও সুন্দর কাপড় এবং লৌকিকতায় সম্মান নেই ১৫৯
মান-অপমানের মাপকাঠি ১৬০
ফ্যাশন পূজারীদের যুক্তি ১৬০
লৌকিকতা এবং সরলতার ব্যাখ্যা ১৬১
ব্যতিক্রমধর্মী বসন-ভূষণ থেকে বিরত থাকা ১৬১
তালিবুল ইলম এবং আলেমদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ১৬২
শরয়ী বেশ-ভূষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ১৬২
বৈধ-অবৈধের মাপকাঠি ১৬৩
ঈমানের নিদর্শন ১৬৪
ইলম অন্বেষণের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য ১৬৬
তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা ১৬৭
গরিমা কোন ক্ষেত্রেই ভাল না ১৬৮
তালিবে ইলম ও আলেমদের বেশ-ভূষা কেমন হবে ১৬৮
তালিবুল ইলমের ইউনিফরম ১৬৯
তালিবুল ইলম ও আলেমদের উদ্দেশ্য কতিপয় নসিহত ১৬৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা

বিনয়ের প্রয়োজনীয়তা ১৭০
বিনয়ের হাকিকত ১৭১
বিনয়ের নিদর্শন ১৭১
বিনয় সৃষ্টি করার উপায় ১৭২
বিনয় কি? ১৭২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয় ১৭৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইলম ও আমলের উপর গর্ব করার অবকাশ নেই ১৭৪
দীনের কাজ করাই মুখলিস ও মাকবুল হওয়ার প্রমাণ নয় ১৭৫
বর্তমান যুগের তালিবুল ইলমদের দূরাবস্থা ও অরুচি ১৭৬
ফারেগ হওয়ার পর তালিবুল ইলমদের অবস্থা ১৭৭
আত্মশুদ্ধি লাভের উপায় এবং ফারেগ হওয়ার পরের জরুরি কর্মসূচি ১৭৭
সৎ সংশ্রব এবং পীর-মাশায়েখের খেদমতে থাকার প্রয়োজনীয়তা ১৭৮
কেবল পড়ালেখা করলেই কিছু হয় না, আসল জিনিস হল আত্মশুদ্ধি ও সৎসংশ্রব ১৭৯
সুহবতে সালেহ এবং বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ১৭৯
শুধু বই পড়লেই হয় না, সৎসংশ্রবেই দীন পাওয়া যায় ১৮০
'সুহবতে সালেহ' ছাড়া ইসলামী শিক্ষায় রঙ ধরে না ১৮১
সৎসংশ্রব গ্রহণ করার বিধান ১৮১
বর্তমানকালের বিপর্যয়ের কারণ হল সুহবতে সালেহ না থাকা ১৮১
সুহবতে সালেহ গ্রহণ না করার পরিণতি ১৮২
কামেল পীরের আলামত ১৮২
সুহবত কখন উপকারী হবে ১৮৩
আহলুল্লাহদের সুহবতের বড় লাভ ১৮৩
আলেমদের জন্য সুহবতে সালেহ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা ১৮৪
'সুহবত' এর বিকল্প ১৮৪
আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার উপায় ১৮৫
ছাত্র যমানায় মুরীদ হওয়া উচিত নয় ১৮৫

সপ্তম অধ্যায় : ছাত্র ও আলেমসমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : জরুরি সংশোধনী

উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে একটি অভিযোগ ১৮৭
বিশেষ জনদের ব্যাপারে অভিযোগ ১৮৮
চারিত্রিক অধঃপতন ১৮৯
ইবাদতে ইহসান অনুপস্থিত ১৮৯
সম্পদ ও পদের মোহ মারাত্মক ব্যাধি ১৯০
নিজের সন্তানকে ইলমেদীন শিক্ষা না দেওয়া ১৯১
দীনের পথে সম্পদ ব্যয় না করা ১৯১
কারো কিতাব এনে ফেরত না দেয়া আলেমদের একটি মন্দ অভ্যাস ১৯২
নিজের ভুল স্বীকার না করার বদ অভ্যাস ১৯২
বহস-মুবাহাসা ও তর্ক-বিতর্ক ১৯২
কুদৃষ্টির ব্যাধি ১৯৩
কুদৃষ্টি থেকে স্বল্প সংখ্যক মানুষই বেঁচে আছে ১৯৩
কুদৃষ্টির ব্যাধি খুব গোপনীয় থাকে ১৯৪
কুদৃষ্টিও ব্যাভিচার এবং জঘন্য অপরাধ ১৯৫
অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি ১৯৬
কুদৃষ্টি হারাম কেন ১৯৬
কুদৃষ্টির কুফল ও শাস্তি ১৯৭
জনৈক বুযুর্গের উক্তি ১৯৭

www.banglakitab.weebly.com

কুদৃষ্টির ফলে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা ১৯৮
শিক্ষণীয় ঘটনা ১৯৮
একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ১৯৯
বৈধ ও অবৈধ দৃষ্টির মাপকাঠি ২০০
সচ্চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং তা অর্জনের পন্থা ২০১
বলাৎকার ও পায়ুকামিতার সূচনা যেভাবে হয় ২০২
বালকদের প্রতি কামাসক্ত হওয়ার জঘন্যতা ও কুফল ২০৩
বালকদের প্রতি কামাসক্তি ব্যাপক হওয়ার
কতিপয় কারণ ২০৪
এটা ইশ্ক নয়, ফিস্ক; মহব্বত নয়, শাহওয়াত ২০৫
'লাওয়াতাত' শব্দের ব্যবহার সঠিক নয় ২০৫
'শাহওয়াত' ও রিপুর নানা রূপ ২০৬
মজাদার খাবার এবং গল্পগুজবের নেশা ২০৬
এশা পরবর্তী মজলিস ২০৭
কুদৃষ্টির ব্যাধি যেভাবে সৃষ্টি হয় ২০৭
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় ২০৭
কুদৃষ্টি বর্জনের সহজ চিকিৎসা ২০৮
আরেকটি চিকিৎসা ২০৮
ইমাম আবু হানিফা [রহ]-এর তাকওয়া এবং
বালকদের থেকে সতর্কতা ২০৯
হযরত থানভী [রহ]-এর সতর্কতা ২০৯
দাড়িহীন বালকদের কাছ থেকে কুরআন
তিলাওয়াত কিংবা হামদ-না'ত ও গজল শ্রবণ করা ২১০
ইলম ও অহংকার এবং আলেম ও অহংকারী ২১০
অহংকারই ধ্বংস ও পতনের মূল ২১২
আলেমদের জন্য ভয়ানক বিপদ ২১৩
সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতা ২১৪
সুপ্ত অহংকার ২১৫
আসল রোগ ও তার চিকিৎসা ২১৬
যুক্তিতে মুক্তি নেই ২১৬
নিজেকে বড় এবং অপরকে ছোট মনে করা ২১৭
নিজের গুণ দেখা এবং অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ
করার প্রবণতা ২১৮
অন্যের কাঁধে দোষ চাপানো ২১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মর্যাদাপ্রীতি

আলেমের জন্য বড় ফেতনা ২১৯
নিজের ইসলাহ না করে অন্যের চিন্তায় বিভোর থাকা ২২১
সংশোধন করার পদ্ধতি ও কল্যাণকামিতার দাবি ২২২
অবসর ও স্বচ্ছল মানুষের ব্যাধি ২২২
অন্যের নয়, নিজের দোষ দেখুন ২২৩
অন্যের দোষ অন্বেষণের বিধান এবং বৈধতার ক্ষেত্র ২২৪
হাল-অবস্থা তদন্ত করা ও দোষ অন্বেষণ করার
অধিকার যার রয়েছে ২২৪
গীবত : একটি ব্যাপক ব্যাধি ২২৫
গীবতের বিধান ২২৬
চোগলখোরী : গীবতের একটি শাখা ২২৬
অহেতুক রচনা ও কলমের গীবত ২২৭
অনর্থক কথা ও পরনিন্দার ক্ষতি ২২৮
বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা ২২৯
নির্বোধ আলেমের অহেতুক গবেষণা ২৩০
বেশি কথা বলার ক্ষতি ২৩১
অধিক ভোজনের ক্ষতি ২৩১
অধিক ভোজনের পার্থিব ক্ষতি ২৩২
অধিক নিদ্রার ক্ষতি ২৩৩
মানুষের সাথে অতিমাত্রার সংসর্গ এবং বন্ধুত্বের ক্ষতি ২৩৪
ছাত্রদের সাধারণ ভুল ২৩৫

পরিচ্ছেদ : ছাত্রদের বিপর্যয় ও অনাগ্রহ প্রসঙ্গ

অকৃতকার্য ছাত্র ২৩৬
তালিবুল ইলমদের মনোযোগ ও অধ্যবসায় ২৩৬
অহেতুক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার প্রয়োজনীয়তা ২৩৭
আড়াল থেকে উস্তাদের কথা শ্রবণ করা মন্দ স্বভাব ২৩৭
ছাত্রদের প্রতি কিছু হেদায়াত ২৩৭
ছাত্রদের ভুল ধারণা ২৩৮
শয়তানের ধোঁকা এবং আলেমদের দুর্নাম হওয়ার কারণ ২৩৮
ছোট মাদরাসা থেকে বের হয়ে বড় মাদরাসায়
গমনকারী স্বাধীন ও দুষ্ট ছাত্রদের প্রসঙ্গে কিছু কথা ২৩৯
আলেম ও তালিবে ইলমদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ২৪০
আলেমদের চার কাজ ২৪১
মারাসায় না পড়ালেও কিছু দীনি কাজ অবশ্যই করা উচিত ২৪২

www.banglakitab.weebly.com

অষ্টম অধ্যায় : প্রসঙ্গ : আত্মমর্যাদা ও অমুখাপেক্ষিতা
প্রথম পরিচ্ছেদ
আলেমদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ২৪৩
তালিবুল ইলম ও আলেম সমাজের মর্যাদা যে পথে ২৪৪
সম্মানের ভিত্তি ২৪৪
কারো করুণার পাত্র হবে না ২৪৫
আলেম সমাজের জন্য অমুখাপেক্ষিতার প্রয়োজনীয়তা ২৪৫
ইলমের জন্য অমুখাপেক্ষিতা কেন অপরিহার্য ২৪৬
অমুখাপেক্ষিতা যদি লোক দেখানোর জন্যও হয় তবু উপকারী ২৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আলেমদের শান
জনগণের অনুগামী হয়ে থাকবে না ২৪৮
সাধারণ দাওয়াতে আলেমদের অংশগ্রহণ না করা উচিত ২৪৮
আলেমদের প্রতি জরুরি সতর্কবাণী ২৪৮
আমীর-উমারাদেরকে তোষামোদ করা এবং তাদের সাথে ওঠা-বসা করার পরিণতি ২৪৯
ধনীদের সাথে ওঠাবসা লাঞ্ছনা বয়ে আনে ২৫০
ধনীদেরকে তোষামোদ করার ব্যাপারে এক মৌলভী সাহেবকে উপদেশ ২৫১
আমীর-উমারাদের সাথে ওঠাবসা করার দ্বারা দীনের ক্ষেত্রে অবহেলার মানসিকতা সৃষ্টি হয় ২৫২
ধনীদের সাথে সম্পর্ক রাখার পদ্ধতি ও শর্তাবলী ২৫২
ধনীদের সাথে সম্পর্ক রাখা নিষেধ নয়; বরং তোষামোদ করা নিষেধ ২৫৩
আমীর ও প্রশানসিক লোকদের সাথে সাক্ষাতের সময় তাদের আদব রক্ষা করা আবশ্যক ২৫৩
অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বৈধ নয় ২৫৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছাত্রদেরকে অমুখাপেক্ষিতার শিক্ষা প্রদান ২৫৫
তালিবে ইলমদেরকে আপমান ও দুর্নাম থেকে রক্ষা করা চাই ২৫৫
তালিবে ইলমদেরকে দাওয়াত খেতে কারো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া অনুচিত ২৫৫
ছাত্রদেরকে দাওয়াতে প্রেরণের ক্ষেত্রে হযরত থানভী [রহ]-এর আমল ২৫৬
যথাযথ সম্মানপূর্বক দাওয়াত দেয়া হলে যেতে অসুবিধা নেই ২৫৭
আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেও ছাত্রদের দাওয়াতে পাঠানো অনুচিত ২৫৭
হযরত ইমাম মালেক [রহ]-এর অমুখাপেক্ষিতা ২৫৮
হযরত সুলাইম চিশতী [রহ] -এর অমুখাপেক্ষিতা ২৫৯
মাওলানা ইসমাঈল শহীদ [রহ]-এর ঘটনা ২৫৯
এক বুযুর্গের অমুখাপেক্ষিতা ২৬০
হযরত কাসেম নানুতবী [রহ]-এর অমুখাপেক্ষিতা ২৬০
হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ]-এর অমুখাপেক্ষিতা ২৬১
হাকীমুল উম্মত থানভী [রহ]-এর অমুখাপেক্ষিতা ২২১
নবম অধ্যায় : প্রসঙ্গ : আলেম সমাজের সংরক্ষণ
প্রথম পরিচ্ছেদ : রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতা
আমি রাজনীতির বিরোধী নই ২৬৪
আলেমদের কাজ ২৬৫
সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মর্ম কর্মবণ্টন ২৬৫
রাজনীতি এবং আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ২৬৬
আলেমগণ কেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন না ২৬৭
আলেমগণ রাজনীতিতে না যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের প্রমাণ ২৬৮
আলেমদের পৃথক রাজনীতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা ২৬৯
আলেমদের রাজনৈতিক দলের রূপরেখা ২৬৯
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আলেম সমাজ ২৭০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নানা অভিযোগের জবাব
অভিযোগ : আলেমগণ সাধারণত লোভী এবং সংকীর্ণমনা হয়ে থাকেন ২৭১
কতিপয় আলেমের সংকীর্ণ মানসিকতা এবং মন্দ স্বভাবসম্পন্ন হওয়ার কারণ ২৭২
ইলমেদীন শেখার জন্য প্রখর মেধার প্রয়োজন ২৭৩
সন্তান নির্বাচনে বর্তমান কালের চিন্তাধারা ২৭৪
ইলমেদীন অর্জন করার মূল দায়িত্ব ধনীদের সন্তানের যাকাত ২৭৫
আলেমগণ কিভাবে ধনী হবেন ২৭৬
আলেমগণ সম্মানিত এবং মর্যাদাবান

www.banglakitab.weebly.com

হওয়ার পদ্ধতি ২৭৬
এ যুগেও রাযী ও গাজ্জালী রয়েছে ২৭৭
আলেমের সামনে ইংরেজী পড়ুয়াদের অবস্থান ২৭৮
আমাদেরকে উপহাস করলে আমরাও ২৭৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আলেমদের প্রতি আপত্তি ওতার জবাব ২৭৯
আলেমদের জীর্ণশীর্ণ বেশভূষা ও অনাড়ম্বর চালচলন কি অপমানকর ২৭৯
মর্যাদা এবং অমর্যাদার মাপকাঠি ২৮০
আলেমদের প্রতি অভদ্রতার আপত্তি ও তার জবাব ২৮০
আলেমদের প্রতি কৃপণতার অভিযোগ ও তার জবাব ২৮১
লেনদেনে আলেমদের অসতর্কতা প্রসঙ্গে ২৮২
বুদ্ধি স্বল্পতার অভিযোগ ও জবাব ২৮২
আলেমগণ নির্লজ্জ হন না ২৮২
আলেমদের পরস্পর মতানৈক্য প্রসঙ্গে ২৮৩
আলেমদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ২৮৩
আলেম হয়েও বেআমল হওয়া ২৮৪
দশম অধ্যায় : মাদরাসার সভা ও অনুষ্ঠান
দস্তারবন্দী ও বার্ষিক সভার প্রমাণ এবং ফযীলত ২৮৫
শরীয়তের দৃষ্টিতে মাদরাসার প্রচলিত জলসার কিছু মন্দ দিক ২৮৬
মাদরাসা নির্বাচনে ছাত্রদেরকে ভুল পরামর্শ দেয়া দীনের ক্ষতি করা ২৮৮
একাদশ অধ্যায় : চাঁদা সংগ্রহ প্রসঙ্গ
প্রথম পরিচ্ছেদ
আমি চাঁদা সংগ্রহ অভিযানের বিরোধী নই ২৯০
চাঁদার বৈধতা এবং প্রমাণ ২৯০
মাদরাসায় দান করা আবশ্যক ২৯১
মাদরাসায় কেন সাহায্য করতে হবে ২৯২
মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার শরয়ী প্রমাণ ২৯২
মুসলিম জনসাধারণ মাদরাসার সাহায্য না করার পরিণতি ২৯৩
মানুষের কাছে চাঁদার আলোচনা অপছন্দ হওয়া এবং চাঁদা আদায়কারীদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করার যৌক্তিক কারণ এবং তার শরয়ী সমাধান ২৯৪
শিশু-কিশোরদের থেকে চাঁদা গ্রহণ ২৯৫
চাঁদা আদায়ের কতিপয় শর্ত ২৯৫
অবৈধতার দু'টি কারণ ২৯৬
চাঁদা হালাল হওয়ার প্রধান শর্ত ২৯৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
চাঁদার বৈধ-অবৈধ নানা পদ্ধতি
দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা জায়েয এবং পীড়াপীড়ি ও চাপ প্রয়োগ করা নাজায়েয ২৯৭
হারাম চাঁদা ২৯৮
জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ২৯৯
চাপের মুখে দেয়া চাঁদার হুকুম এবং চাপ দিয়ে চাঁদা আদায় করার বিধান ২৯৯
লজ্জায় পড়ে দান করা ৩০০
আবেগে প্রদত্ত চাঁদার বিধান ৩০১
তদবিরের মাধ্যমে প্রভাবিত করে চাঁদা আদায় ৩০১
চাঁদার একটি বিশেষ ধরণ এবং তার শরয়ী বিধান ৩০২
স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীদের দানের বিধান ৩০২
মহিলাদের সমাবেশে বয়ান করে চাঁদা আদায় করা ৩০২
ব্যক্তিগত পর্যায়ে চাঁদা আদায় করার বিধান ৩০৩
কূটকৌশল এবং ধূর্তামির আশ্রয়ে চাঁদা আদায় চাঁদার কতিপয় মন্দ দিক ৩০৬
চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে সাধারণ এবং বিশেষ সম্বোধনের বিস্তারিত আলোচনা ৩০৬
চাঁদা সংগ্রহের বৈধ পন্থাসমূহ ৩০৭
দাতাগণকে দোয়ার আবেদন না করা উচিত ৩০৭
আলেমদের চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে কতিপয় মনীষীর উক্তি ৩০৯
যেসব গরীবদের থেকে চাঁদা গ্রহণ করা হবে ৩১০
আলেমদের চাঁদা কালেকশনের ব্যাপারে হযরত থানভী [রহ]-এর অভিমত ৩১১
দীনের খাদেম এবং চাঁদা সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা ৩১২
আলেমগণকে কেন চাঁদা কালেকশন করতে হয় : মুসলিম জনগণের লজ্জা হওয়া উচিত ৩১২
মাদরাসা কর্তৃপক্ষের চাঁদা সংগ্রহ জাতির প্রতি অনুগ্রহ ৩১৩
আমাদের উপর দাতাদের কোন অনুগ্রহ নেই ৩১৩
মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য ৩১৪
জনগণই আলেমদের মুখাপেক্ষী ৩১৪
জনগণই মাদরাসার মুখাপেক্ষী ৩১৪

www.banglakitab.weebly.com

আলেম এবং জনগণের কর্মবন্টন ৩১৫
চাঁদা করা আলেমদের কাজ নয়, সমাজপতিদের কাজ ৩১৫
চাঁদা আদায় করা আলেমদের জন্য অপরিহার্য নয় ৩১৬
আলেমদের চাঁদা কালেকশন করার মাঝে সমস্যাবলী ৩১৭
আলেমগণ অপমানিত হওয়ার পেছনে কে বেশি দায়ী ৩১৭
চাঁদা কালেকশন না করা হলে মাদরাসা কিভাবে চলবে ৩১৯
সাধ্যের সীমানায় যতটুকু কাজ হয় ততটুকুই করো ৩১৯
একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেই কাজ করা উচিত ৩২০
অমুখাপেক্ষিতার সাথে মাদরাসা পরিচালনা সম্পর্কে
হযরত থানভী [রহ]-এর ঘটনা ৩২১
হযরত গাঙ্গুহী [রহ]-এর ঘটনা ৩২২
আল্লাহর সাহায্য ৩২৩
মসজিদ নির্মাণের ঘটনা ৩২৩
মাদরাসার টাকা সংরক্ষণ করা সত্ত্বেও হারিয়ে গেলে
কিংবা চুরি হয়ে গেলে কী বিধান ৩২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চাঁদার শরয়ী বিধান

নগদ দান ওয়াক্ফ নয়; দাতার মালিকানাভুক্ত সম্পদ ৩২৬
মুহতামিম এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ দাতাদের
পক্ষ থেকে উকিল ৩২৬
যাকাতের টাকা সাথে সাথে 'তামলীক' করা আবশ্যক ৩২৭
'তামলীক' করার প্রচলিত হীলা ও তার শরয়ী দৃষ্টিকোণ ৩২৭
তামলীক সংক্রান্ত হীলা বন্ধ করুন ৩২৮
অবৈধ হীলা ৩২৯
বৈধ এবং অবৈধ হীলার মাপকাঠি ৩৩০
তামলীক করার জায়েয ও সহজ সুরত ৩৩০
বৈধ হীলা সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা ৩৩০
তামলীক সহীহ হওয়ার একটি শর্ত ৩৩১
তামলীকের পদ্ধতিতে দাতা-গ্রহীতা উভয়ে
সওয়াব পাবে কি-না ৩৩২
বৈধ হীলা ৩৩৩
অন্যান্য মাদরাসার পক্ষ থেকে তামলীক করানোর
ব্যবস্থা এবং হযরত থানভী [রহ]-এর আমল ৩৩৩
মাদরাসার অর্থে অসতর্কতা ৩৩৪
মুহতামিম ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যেসব খাতে
চাঁদার টাকা ব্যয় করতে পারবেন ৩৩৪
মাদরাসার টাকা দিয়ে ছাত্র এবং শিক্ষকদেরকে
অতিরিক্ত পুরস্কার দেয়া যাবে কি-না ৩৩৪
চাঁদার টাকা দিয়ে মাদরাসার সাইনবোর্ড বানানো
জায়েয কি-না ৩৩৫
দানের টাকা ঋণ হিসেবে নিজের কাজে ব্যবহার ৩৩৫
মাদরাসার টাকা ঋণ নেয়ার বৈধ ও সহজ পদ্ধতি ৩৩৫
মাদরাসার দানের অর্থ দিয়ে মাদরাসার জন্য
ব্যবসা করা জায়েয কি-না ৩৩৫
মাদরাসা এবং মসজিদের ফান্ড ভিন্ন থাকা উচিত
মসজিদের টাকা এবং সম্পদ মাদরাসায়
ব্যবহার করা যাবে না ৩৩৬
একটি ফেকহী সন্দেহের অপনোদন ৩৩৬
মাদরাসা এবং মসজিদে অমুসলিমদের দান ৩৩৭
মাদরাসায় সরকারি অনুদান গ্রহণ প্রসঙ্গে ৩৩৮
মাদরাসা থেকে মেহমানদের আপ্যায়ন করা ৩৩৮
মাহফিলের অনুদান আপ্যায়নে ব্যয় করা ৩৩৯
কমিশনের ভিত্তিতে চাঁদা আদায় করার বিধান ৩৩৯
চাঁদা আদায়কারীরা কাজ না করলে বেতন-ভাতা
পাবে কি-না ৩৪০
শিক্ষকের শরয়ী দৃষ্টিকোণ এবং তার বেতন প্রসঙ্গ ৩৪০
মাদরাসার সময়ে ব্যক্তিগত কাজ করলে এবং অন্য
সময়ে মাদরাসার কাজ করলে বেতন পাবেন কি-না ৩৪০
মাদরাসা চলাকালীন খালি ঘণ্টায়
ব্যক্তিগত কাজ করার বিধান ৩৪০
অসুস্থতা এবং ছুটির দিনগুলোর বেতন
দেয়া জায়েয কি-না ৩৪১
ছুটির দিনের বেতনের বিধান ৩৪১
মাদরাসার সামগ্রী ধার দেয়ার বিধান ৩৪২
তালেবুল ইলম ও আলেমদের উদ্দেশ্যে
কিছু উপকারী কথা, নসিহত ও পরামর্শ ৩৪২

পরিশিষ্ট

থানভী [রহ]-এর মাদরাসার নেজাম ও কর্মপদ্ধতি ৩৪৭
মাদরাসার ফান্ড সম্পর্কিত কিছু জরুরি জ্ঞাতব্য ৩৫১

www.banglakitab.weebly.com

প্রথম অধ্যায় : ইলম প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইলম অর্জনের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ط فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

মুমিনদের সকলে এক সাথে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়। [সূরা তাওবাহ-১২২]

এ আয়াতের আলোকে জানা গেল যে, দীনি আহকাম ও বিধি-বিধান শিক্ষা করা এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যা শত্রুর বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ চলাকালেও বর্জন করা যায় না। তখনও একটি দল জেহাদে লিপ্ত না হয়ে এ শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হয়। যুদ্ধের সময়ই যেখানে ইলম অর্জনের এত গুরুত্ব রয়েছে, সেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় তার গুরুত্ব কী পরিমাণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, কোন ইবাদত যতই বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তা তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যখন তা শরয়ী নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী হওয়ার পূর্বশর্ত হল শরয়ী ইলম ও জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

এ ইলম অর্জনের দু'টি পন্থা রয়েছে। ১. মাদরাসায় নিয়মতান্ত্রিক দরস-তাদরীসের বিশেষ ব্যবস্থা। ২. দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপক ও সাধারণ ব্যবস্থা। [তাজদীদে তা'লীম-১৬১]

www.banglakitab.weebly.com

স্মরণ রাখতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সকল কাজের শেকড়। যদি শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে কাজ করার লোক কিভাবে তৈরি হবে? [আত তাবলীগ : পৃ. ৮৪, খ. ১৬]

মোটকথা, আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, ইলমেদীনের উপর পৃথিবীর নেজাম ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬৯]

ইলমেদীনের খেদমত করার ফযীলত

বর্তমান যুগে ইলমেদীনের খেদমত সর্বাধিক উত্তম কাজ। আজ দীনি শিক্ষার চেয়ে উত্তম কোন খেদমত নেই। আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইলমের অমূল্য সম্পদ দান করেছেন তার জন্য ইলমের খেদমতের চেয়ে উত্তম কোন খেদমত আর হতে পারে না। বর্তমানে ইলমেদীনের খেদমতের খুব প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং এর ফযীলতও এত অধিক যে, সম্ভবত অন্য কোন আমলের ফযীলত ততটুকু নয়। কেননা, যতদিন পর্যন্ত দীনি ইলমের চর্চার ধারা চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমলনামায় সওয়াব বৃদ্ধি হতে থাকবে। [হুসনুল আযীয : পৃ. ২৬, খ. ৪]

দরস এবং ওয়াজের প্রয়োজনীয়তা

দীনি খেদমতের দু'টি ব্যবস্থা হতে পারে। হয়তো দরস-তাদরীস শুরু করবে, অন্যথায় জনগণের মাঝে ওয়াজ-নসিহত করবে। উভয়টিরই প্রয়োজন রয়েছে। উত্তম পদ্ধতি হল, রীতিমত দরস-তাদরীসের খেদমত গ্রহণ করবে এবং মাঝেমধ্যে ওয়াজ-নসিহতও করবে। ওয়াজের উপকারিতা ব্যাপক বিধায় তা অধিকতর উত্তম মনে হয়। [হুসনুল আযীয : পৃ. ৭২, খ. ৪]

আলেমদের ফযীলত

গর্ব করার অধিকার একমাত্র আলেমদেরই রয়েছে। কেননা, তারা নিজেরাও সঠিকপথে আছেন এবং অন্যদের জন্যও সঠিক পথের দিশারী। আর চিন্তা করলে অনুভূত হয় যে, অর্থবিত্ত না থাকাই হল গর্বের বিষয়। কেননা, সম্পদের দৃষ্টান্ত সাপের মত। তার বাহ্যরূপ খুবই মনোহর ও চিত্তাকর্ষক হলেও ভেতরটা ধ্বংসাত্মক বিষে পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে অর্থবিত্ত যদিও আরাম-আয়েশ ও সুখ-ভোগের উপকরণ কিন্তু তার ভেতরে সমূহ অকল্যাণ ও বিপদ নিহিত রয়েছে। সম্পদ নিয়ে গর্ব করা ঐ ব্যক্তির মতো যে গর্ব করে বলে, আমার সারা শরীরে বিষধর সর্প জড়িয়ে আছে।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আলী (রাদি.) বলেন,

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْاَعْدَاءِ مَالُ

فَاِنَّ الْمَالَ يَفْنِىْ عَنْ قَرِيْبٍ وَاِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ

অর্থাৎ, সম্পদ তো বিনাশ হয়ে যাবে আর ইলম অবশিষ্ট থাকবে। যার কাছে ইলম থাকবে সে আজীবন আত্মনির্ভরশীল। তার কোন বন্ধুর প্রয়োজন নেই। কোন রাজা-বাদশাও আলেমের মতো প্রফুল্লতা ও শান্তি অর্জন করতে সক্ষম নয়। বাদশারা তো সর্বদা দরবারি লোকদেরকে ভয় করে চলে। সব সময় আতঙ্কিত থাকতে হয়, না জানি কখন কে খাবারে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলে। পক্ষান্তরে একজন আলেমের জীবন সবদিক থেকে নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ। তিনি একাকী জঙ্গলে বাস করেও বাদশার চেয়ে নিরাপদে থাকেন। আর এটা কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। কেননা, ইলমের সুফল এর চেয়েও অনেক বেশি ওবিস্তৃত। [দাওয়াতে আবদিয়্যত, পৃ. ৭৪, খ. ১২]

ইলমের পরিচয়

ইলম তো ঐ বস্তু যা গুনাহ করার দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং গুনাহগার তা অর্জন করতে পারে না। যদি কেবল শব্দ ও ভাষা শিক্ষার নাম ইলম হতো তাহলে তা গুনাহের সঙ্গেও একত্রিত হতে পারত, এমনকি কুফরের সাথেও। বৈরুত এবং জার্মানে খ্রিস্টানরা আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়ে থাকে। তাদের মেধাশক্তি খুবই প্রখর হয়। সুতরাং বোঝা গেল, শব্দ শেখার নাম ইলম নয়। বস্তুত, ইলম হল বিশেষ 'নূর'। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

আল্লাহর পক্ষ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। [সূরা মায়েদাহ : ১৫]

অন্যত্র ইলমকে রূহ বলে আখ্যায়িত করে ইরশাদ হয়েছে,

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ

এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর [আল্লাহর] পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা [সূরা মুজাদালাহ : ২২]

www.banglakitab.weebly.com

বস্তুত, নূরকেই ইলম বলে। হযরত ইমাম আবু হানীফা [রহ.] বেশি পরিমাণ কিতাবপত্র পড়াশোনা করেননি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর কলবে একটি নূর বা জ্যোতি প্রদান করেছিলেন। সে নূরের আলোকে তিনি যা বলতেন তা সঠিক ও বাস্তব প্রমাণিত হত। বর্তমানে কারো অভিজ্ঞতা যতই বেশি হোক না কেন, ইমাম আবু হানীফা [রহ.]-এর মতো ইলম তার ভাগ্যে জুটে না। তার কারণ হল সে পরিমাণ নূর অর্জন করতে কেউ সক্ষম হয় না। [রেসালা আয়নায়ে মাযাহের-১৭]

গর্ব করার মতো ইলম কোনটি

কেবল নাহু ও সরফ শাস্ত্রের নিয়ম-কানুন জানা ইলমের উদ্দেশ্য নয়। قَالَ মূলত: قول ছিল এটা জানাকে ইলম বলা হয় না; বরং ইলম একটি নূর বা জ্যোতি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ

আমি ইলমকে বানিয়েছি একটি নূর, যার মাধ্যমে আপনি মানুষের মাঝে চলাফেরা করেন। [সূরা আন'আম : ১২২]

আর এ নূর বিরাজমান অবস্থায় কলবের শক্তি সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। যদি চতুর্দিক থেকে তাকে তরবারি দ্বারা বেষ্টন করে ফেলা হয় তবু তার অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হয় না।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফরে ছিলেন। দীপ্রহরের সময় একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করার জন্য থামলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন। জনৈক দুশমন এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল। ধীরপদে এসে নবীজীর তরবারিটি নিয়ে নিল। খুব আস্তে আস্তে সেটি কোষমুক্ত করলো। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বলল,

مَنْ يَّعْصِمُكَ مِنِّيْ

এ মুহূর্তে আমার আক্রমণ থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা দেখে একটু পাশ ফিরেও দেখলেন না। অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ! অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন।

www.banglakitab.weebly.com

আচ্ছা বলুন তো, আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ছাড়া এমন সাহসী উচ্চারণ কারো মুখ থেকে শোনা যাবে? এই তো হল নূর সমৃদ্ধ ইলম। শুধুমাত্র শব্দগত জ্ঞান তো শয়তানেরও ছিল।

এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা মনে রাখবেন, ইলম পরিপূর্ণ হলে আল্লাহর মারেফাতও পরিপূর্ণ হয়, তখন বান্দার সামনে থাকে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত-

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

সম্ভবত তোমরা কোন বস্তুকে মন্দ জ্ঞান কর কিন্তু তোমাদের জন্য সেটিই কল্যাণকর [সূরা বাকারাহ : ২১৬]।

তাই বান্দা কোন বিপদে মুষড়ে পড়ে না। সে মনে করে, এটা আমার জন্য চিকিৎসা। এর দ্বারা আমার পাপ মোচন হচ্ছে। সেই সাথে তার হৃদয়ে এ বিষয়টিও জাগরুক থাকে যে, আমরা সকলেই আল্লাহর। তিনি আমাদের জন্য যে অবস্থা ভালো মনে করবেন সে অবস্থায় রাখবেন। [দাওয়াতে আবদিয়্যত : পৃ. ৭৬, খ. ১২]

প্রকৃত ইলমের মর্ম এবং তার ফযীলত

প্রকৃত ইলম তো হল ঐ ইলম যা তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর এ তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত ফেকাহ সম্পর্কেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

একজন ফকীহ শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদ অপেক্ষা ভারী।

এর দ্বারা বই পুস্তকে লেখা মাসআলা-মাসাইল জানা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শুধু বইপুস্তক পড়ে শয়তানের চালবাজি ধরা যায় না; বরং তা দ্বারা ঐ মারেফাত উদ্দেশ্য যা তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

আর এরূপ ইলমের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বুঝ দান করেন।

www.banglakitab.weebly.com

বস্তুত, এ হাকীকী ইলম বই-পুস্তক পড়ে লাভ করা যায় না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবগণ তো নিজেদের পড়ালেখা না জানার ব্যাপারে গর্ব করে বলতেন,

نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيُّوْنَ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

আমরা উম্মী বা নিরক্ষর জাতি, আমরা লেখালেখি এবং হিসাব-কিতাব জানি না।

বলুন তো, সাহাবায়ে কেরাম (রাদি.) লেখাপড়া জানতেন কিনা? এতটুকু লেখাপড়াও জানতেন না। এমনকি তাঁদের মধ্যে অনেকেই তো দস্তখত পর্যন্ত করতে পারতেন না। এতদসত্ত্বেও ইলমের ক্ষেত্রে তাঁরা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই তো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদি.) সাহাবায়ে কেরামের শানে বলেছেন, اعمقهم علما। উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম সকলের চেয়ে গভীর ইলমের অধিকারী ছিলেন। বলুন, সেটি কোন ইলম ছিল? ক্লাস কিংবা বই-পুস্তকের ইলম ছিল? কিছুতেই নয়; বরং এ ইলম ছিল কুরআনের ঐ ফাহম বা উপলব্ধি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সাহচর্যের বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে প্রদান করেছিলেন এবং তাঁদের তাকওয়ার পরিমাণে তাতে ক্রমোন্নতি হতো।

এই তো সে ইলম যার সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেঈ [রহ.]-এর ঐতিহাসিক উক্তি-

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ

فَاَوْصَانِيْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

আমি একদিন আমার উস্তাদ অকী [রহ.]-এর কাছে আমার মুখস্থ শক্তি দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ বর্জনের উপদেশ দিলেন।

বলুনতো, সেটি কোন ইলম যাতে গুনাহ প্রতিবন্ধক হয়? সেটি কি কিতাবী ইলম? কিছুতেই নয়। কিতাবী ইলমের বিষয়টি তো এমন যে, যার মুখস্থ শক্তি যত প্রখর হবে সে তত বেশি পড়া মুখস্থ করতে পারবে। মুখস্থ শক্তি প্রখর থাকলে একজন পাপী ব্যক্তিও কুরআন এবং হাদীস মুখস্থ করতে পারবে। এমনকি কাফের মুশরিকরাও পারবে। যেমনটি রয়েছে বৈরুত এবং জার্মানে। সেখানে খ্রিস্টানরা আমাদের হাদীস ও ফেকাহ সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা করে। জার্মানের

www.banglakitab.weebly.com

একটি মাদরাসার অবস্থা জনৈক পর্যটক থেকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, সেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের কোন কক্ষের নাম দারুল ফিকহ, কোনটার নাম দারুল হাদীস। সেখানে বুখারী শরীফ, হিদায়া ইত্যাদি কিতাব পড়ানো হয়। অথচ সেখানকার শিক্ষক-ছাত্র সকলেই খ্রিস্টান এবং কাফের।

তাহলে ইমাম শাফেঈ [রহ.]-এর উদ্দেশ্য কিতাবী ইলম ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ ছিল না। ইমাম অকী [রহ.]-এর জবাব থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি ভিন্ন কোন ইলমের ক্ষেত্রে মুখস্থ শক্তির অভিযোগ করেছেন। যেখানে পাপের অন্তরায় হওয়ার অবকাশ রয়েছে। এই তো হলো হাকীকী ইলম, যার মাধ্যমে মুজতাহিদগণ মুজতাহিদ হয়ে থাকেন। অন্যথায় মেধার প্রখরতা ও ব্যাপক পড়াশোনার দ্বারা তো কোন কোন মুকাল্লিদ মুজতাহিদকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন।

ইলম ও মালূমাতের মাঝে পার্থক্য

ইলম এবং মালূমাত এক জিনিস নয়। উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, 'দেখা' এক জিনিস আর 'দৃশ্য' আরেক জিনিস। উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধমে বুঝুন। এক ব্যক্তি দীর্ঘ ভ্রমণ করে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করল কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি ছিল দুর্বল। আরেক ব্যক্তি ভ্রমণ কম করল কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি ছিল প্রখর। এখন যার দৃষ্টিশক্তি ছিল দুর্বল সে দীর্ঘ ভ্রমণ করে তার দেখা বস্তুর তালিকা অনেক লম্বা। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে সে কোন বস্তুর পরিপূর্ণ হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে পারেনি। কারণ, সে কোন বস্তুকে গভীরভাবে দেখতে সক্ষম হয়নি। সব কিছু সে ছায়ার মতো দেখেছে। পক্ষান্তরে যার দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ কিন্তু ভ্রমণ করেছে কম; তার দেখা বস্তুর তালিকা ছোট হলেও প্রতিটি বস্তু দেখে সে তার হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবগতি লাভ করেছে।

হুবহু একই পার্থক্য হল আমাদের মাঝে এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী [রহ.]-এর মাঝে। আমাদের মালূমাত বেশি কিন্তু কলবের বসীরত বা তীক্ষ্ণদৃষ্টি কম। আর হাজী সাহেবের মালূমাত কম হলেও বসীরতে কলব বা অন্তরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অনেক বেশি। এজন্য তাঁর সকল ইলম ছিল বিশুদ্ধ। তিনি প্রত্যেক জানা বিষয়ের হাকীকত ও স্বরূপ পর্যন্ত পৌছে যেতেন আর আমরা হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে পারি না।

www.banglakitab.weebly.com

মোটকথা, দৃশ্য বস্তু অধিক হওয়ার নাম যেমন দেখা নয়, তেমনিভাবে মালূমাত অধিক হওয়ার নামও ইলম নয়; বরং ইলম হচ্ছে অনুধাবন ও উপলব্ধিশক্তি সুস্থ ও শক্তিশালী হওয়া। যার মাধ্যমে অতি দ্রুত সঠিক ফলাফলে পৌঁছা সম্ভব হয়। এটাই হল ইলমের হাকীকত। যা কেবল পাঠদান ও পাঠগ্রহণের দ্বারা হাসিল হয় না; বরং তা অর্জনের উপায়-উপকরণ ভিন্ন। তার নানা উপকরণের মধ্যে একটি হল দু'আ। আরেকটি হল তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাকওয়া হাসিল করার জন্য যাবতীয় পাপাচার হতে বিরত থাকা আবশ্যক। তাকওয়া অবলম্বন করে দেখুন। নিছক শব্দের ভূষণে প্রকৃত যোগ্যতা ফুটে উঠে না। [আত্ তাবলীগ : পৃ. ১২০, খ. ১২]

ইলমেদীনের সাথে আমল ও খোদাভীতি অপরিহার্য

আমাদের অবস্থা হল আমরা ইলম অর্জন করি। তারপর পাঠদানে মগ্ন হয়ে যাই এবং এটাকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করি। অন্তরে আল্লাহর ভয় অর্জনের প্রতি মনোযোগী হই না। মনে রাখবেন, যে ইলম অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে না, তা ইলম নয়।

ইলমকে হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মিরাস বলা হয়। এখন লক্ষ্য করুন, কোন ইলম নবীদের মিরাস হওয়ার যোগ্য। নাঊযুবিল্লাহ! নবীদের মিরাসও কি এমন ছিল যাতে নিছক মাসাইল ও পরিভাষার উচ্চারণ ছিল এবং খোদাভীতির লেশমাত্র ছিল না। এগুলো কিছুতেই ইলম নয়।

নবীদের অবস্থা তো এই ছিল যে, তাঁদের ইলমের পরিমাণ যত বৃদ্ধি হত, খোদাভীতির পরিমাণও তত বৃদ্ধি হত। হাদীস শরীফে এসেছে,

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ

আমি আল্লাহকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি চিনি এবং বেশি ভয় করি।

সুতরাং বোঝা গেল, শিক্ষার্জন ও শিক্ষাদানকেই ইলমের আসল উদ্দেশ্য ভাবা সীমালঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে। [তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ-১৬০]

প্রকৃত আলেমের পরিচয়

আলেম তো বলা হয় তাকে, যিনি শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান জানেন। পক্ষান্তরে যিনি আরবী জানেন তাকে আলেম বলা হয় না। আবু জেহেলও তো আরবী ভাষা জানত। অথচ তার উপাধীই ছিল আবু জেহেল [মূর্খের জনক], তাকে আলেম বলা হত না। [কালামুল হাসান-৫৫]

www.banglakitab.weebly.com

আলেম দ্বারা উদ্দেশ্য হল আলেমে বাআমল তথা আমলকারী আলেম। যার নাম ইচ্ছা করলে আপনি দরবেশও রাখতে পারেন। কিন্তু যার মাঝে ইলম অনুযায়ী আমল নেই আমাদের দৃষ্টিতে সে আলেমের অন্তর্ভুক্তই নয়। বর্তমানে আমরা শুধু আরবী ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদেরকে আলেম বলে থাকি। মিশর এবং বৈরুতে এমন অনেক ইহুদী-খ্রিস্টান রয়েছে যারা ভালো আরবী জানে। তবে কি তাদেরকে আলেম বলব? তাদেরকে দীনের অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে বরণ করব? [তাজদীদে তা'লীম-৩৪]

বস্তুত, মৌলভী তো তাকেই বলা হবে যে, 'মাওলাওয়ালা' হবে। অর্থাৎ ইলমেদীন অর্জন করার পাশাপাশি যিনি তাকওয়া ও খোদাভীতি ইত্যাদি উন্নত গুণাবলীরও অধিকারী হবেন তিনিই মৌলভী বা আলেম হবেন। শুধু আরবী ভাষা জানার দ্বারা মানুষ মৌলভী বা মাওলানা হয়ে যায় না। চাই সে কত বড় সাহিত্যিক, বক্তা কিংবা লেখক হোক না কেন। কেননা, আরবী ভাষা আবু জেহেলও ভালো জানত। এমনকি আজকের অনেক বড় বড় সাহিত্যিকদের চেয়েও বেশি আরবী জানত। আলেম হওয়ার মাপকাঠি যদি আরবী ভাষা জানাই হত তাহলে আবু জেহেল মুহাক্কিক আলেম হওয়ার কথা ছিল। অথচ তার নামই ছিল আবু জেহেল তথা মূর্খের পিতা। জানা গেল, কেবল আরবী ভাষা জানার নাম আলেম নয়।

[আত্ তাবলীগ-১/১৩৩]

আলেম কাকে বলে?

আলেম বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি ইলমেদীন অর্জনের সাথে সাথে মুত্তাকী এবং সুন্নতের অনুসারী হন। কেননা, মৌলভী শব্দটির সম্পর্ক মাওলার সাথে। অর্থাৎ মাওলাওয়ালা। সুতরাং যতক্ষণ সে আল্লাহওয়ালা হবে ততক্ষণ সে মৌলভী এবং অনুসরণের যোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে। আর যখন সে রঙ পরিবর্তন করবে তখন থেকে সে মৌলভী বা অনুসরণের যোগ্য থাকবে না; বরং তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। [আত্ তাবলীগ-১/১৩৪]

কোন কোন মৌলভী মূর্খ হয়ে থাকে। বলা উচিত, কোন কোন মূর্খ মৌলভী হয়ে থাকে। কেননা, প্রকৃত মৌলভী তো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহওয়ালা হবে। আর মানুষ আল্লাহওয়ালা হয়ে থাকে শরীয়ত পালনের দ্বারা। কিন্তু আজকাল যে কেউ দু'চার হরফ আরবী পড়ে ফেললে তাকেই মৌলভী বলা শুরু হয়ে যায়। চাই সে নিছক 'মা'কুলাত' এবং সাহিত্যই পড়ুক না কেন। যদি মা'কুলাত পড়ার দ্বারা কেউ মৌলভী হয়ে যায় তাহলে এরস্টেটল ও জালিনুসরাও বড় বড় মৌলভী হওয়া

www.banglakitab.weebly.com

উচিত ছিল। কেননা, তারা মা'কুলাতের ক্ষেত্রে বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। অথচ তারা একত্ববাদী মুমিন ছিল কিনা এ ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে।

যদি আরবী সাহিত্য জানা, আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারা এবং লেখালেখি করতে পারার দ্বারা কেউ মৌলভী হত তাহলে আবু লাহাব এবং আবু জেহেলেরা সকলেই একেকজন বড় বড় মৌলভী হওয়ার কথা ছিল। কেননা, এরা সকলেই আরবী ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিল। বোঝা গেল, শুধু মা'কুলী ও মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান এবং আরবী সাহিত্য জানার দ্বারা মানুষ মৌলভী বা মাওলানা হয়ে যায় না। [আত্ তাবলীগ-২১/৫২]

আলেম এবং মৌলভীর মাঝে পার্থক্য

প্রত্যক মৌলভীকে আলেমেদীন বলা হয় না; বরং উভয়ের মাঝে عموم خصوص مطلق -এর সম্পর্ক। সকল মৌলভী আলেম কিন্তু সকল আলেম মৌলভী নয়। ইলমেদীন কখনো সোহবত ও সাহচর্যের মাধ্যমে হাসিল হয় আবার কখনো পড়া লেখার মাধ্যমে হাসিল হয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত, হক্কুল ইতাআত-২/৪২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীনি শিক্ষার ব্যাপকভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা এবং তার পদ্ধতি

প্রত্যেক মুসলমান তালিবে ইলম

প্রত্যেক মুসলমান প্রতিমুহূর্তে তালিবে ইলম। কেননা, একটি স্তর পর্যন্ত ইলম শিক্ষা করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। তা হল অত্যাবশ্যকীয় ইলম। অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণ আকাইদ, নামাযের নিয়ম-কায়দা এবং মুআমালাত ও মুআশারাতের ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। সেই সাথে দীন ও ইলমেদীনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং দীনের বুঝ অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এরই নাম হল তালিবে ইলমী।

اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا

অর্থাৎ ইলম এবং হিকমত হচ্ছে মু'মিনের হৃত সম্পদ। যখন যেখানে তা পাবে সেই তার অধিক যোগ্য। [আত্ তাবলীগ-২/৭৮]

www.banglakitab.weebly.com

শিশুদেরকে সর্বপ্রথম কুরআন পড়ানো উচিত

মুসলিম শিশু-কিশোরদেরকে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন পড়ানো উচিত। কেননা, অভিজ্ঞতার কথা হল, ছোট বয়সে তাদের মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করার যোগ্যতা না থাকলেও তখন তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া যায়। অন্যথায় সে সময়টি বেকার চলে যায়। বড় হলে নিজে নিজে কুরআন পড়ে নিবে –এ চিন্তা করে কেউ কেউ ছোটকালে সন্তানকে কুরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখেন। বাস্তবতা হল, বয়স বেড়ে গেলে সে পরিমাণ একাগ্রতা থাকে না এবং সে পরিমাণ সময়-সুযোগও পাওয়া যায় না। তখন তো অনেক ঝক্কি-ঝামেলা সামাল দিতে হয়। রোজি-রোজগারের চিন্তা আপতিত হয়। পরিবার-পরিজনের দাবী-দাওয়া পূরণে ব্যস্ত থাকতে হয়। মোটকথা, চিন্তা চেতনায় 'ইনতিশার' ও বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এতগুলো প্রতিবন্ধকতার সামনে কিছুই হয়ে উঠে না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৯৭]

সাধারণ শিক্ষার পূর্বে দীনি শিক্ষা প্রয়োজন

শিশুদেরকে ইংরেজী শেখানোর পূর্বে মাতৃভাষায় আবশ্যকীয় দীনি শিক্ষা প্রদান করা উচিত। কেননা, হৃদয় ফলকে প্রথম যে বস্তুর চিত্র অঙ্কিত হয় তারই প্রভাব স্থায়ী এবং সুদৃঢ় হয়। চোখ খোলতেই শিশুদেরকে ইংরেজী শিক্ষায় লাগিয়ে দেয়া উচিত নয়। তাই প্রথমে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিন। পূর্ণ কুরআন না হলেও অন্তত দশ পারা শিক্ষা দিন এবং নিয়মিত তিলাওয়াতের আমল চালু রাখুন। তারপর কিছু দীনি বই-পুস্তক এবং জরুরি মাসআলা-মাসাইল মাতৃভাষায় হলেও কোন আলেমের কাছে শিক্ষা দিন। সেই সাথে কখনো দীন পরিপন্থী কোন বিষয় লক্ষ্য করলে সাথে সাথে সতর্ক করে দিন। যদি ফিরে না আসে তাহলে ইংরেজী পড়া বন্ধ করে দিন।

কেন এ বৈষম্য

কোন সন্তানের ব্যাপারে যদি ডাক্তার এ কথা বলেন যে, তিন বছর পর্যন্ত তার ইংরেজী পড়া বন্ধ রাখুন, অন্যথায় তার মেধা নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে আপনি মেনে নেন। এ সময়টা তার পরীক্ষা এবং পাশ করার সময় হলেও ডাক্তারের কথাই প্রাধান্য পায়। এ তিন বছর লেখাপড়া থেকে অবসর থাকলে পূর্বের সকল পড়া ভুলে যাবে এবং ভবিষ্যতে পড়ার সময় থাকবে না –এসব ব্যাপার আপনার গোচরে থাকা সত্ত্বেও মেনে নেন। কারণ, সুস্থতা সব কিছুর উপর অগ্রগণ্য। যদি

www.banglakitab.weebly.com

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কিন্তু শরীর সুস্থ না থাকে তবে চাকরি করবে কিভাবে। সুতরাং কুরআন শিক্ষার বিষয়টিও এভাবে মূল্যায়ন করুন যে, আড়াই বছরের জন্য আমরা সন্তানকে হাসপাতালে অর্থাৎ দীনি মাদরাসায় প্রেরণ করলাম। এতে সে প্রথমে নিজের রূহানী [আত্মিক] সুস্থতা লাভ করবে, পরে শারীরিক সুস্থতাও এসে যাবে।

প্রথমত, আড়াই বছরে পার্থিব কোন ক্ষতি হয় না। অনেক সময় এ পরিমাণ সময় খেলাধূলাতেও নিঃশেষ হয়ে যায়। আর যদি পার্থিব কিছু ক্ষতি হয়ও তবুও এমনটি করা চাই। কেননা, মুসলমানের জন্য দুনিয়ার তুলনায় দীন অগ্রগণ্য। আল্লাহর বিধানের সামনে অন্য কোন কিছুর গুরুত্ব নেই। প্রথমে দীনের হুকুম-আহকাম শেখাতে হবে তারপর অন্য কাজ। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৬৯]

পরিশেষে আমি বলতে চাই, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আরবী না পড়লেও অন্তত ইংরেজীর স্বার্থে হলেও আরবী পড়। একথার ব্যাখ্যা হল, আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়ার দ্বারা মেধা-বুদ্ধি শাণিত হয়। ফলে ইংরেজী শিক্ষায় বেশ সহায়তা পাওয়া যায়।

আমার এক ভাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। একবার সে মুরাদাবাদ গেল। তার মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় সকলে মুগ্ধ ছিল। আর শিক্ষকগণও তার মেধার সামনে অক্ষম ছিলেন। রমজান মাস ঘনিয়ে এলো। লোকজন ইচ্ছা করল কোনো হাফেজ সাহেবের মাধ্যমে খতমে তারাবীহ পড়ব। প্রিন্সিপ্যালের কাছে অনুমতি চাওয়া হলে জবাব দিলেন এটি একটি নতুন বিষয়। এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া যায় না। আমার ভাই বলে উঠল, জনাব, বিষয়টি পুরাতন হলে কি অনুমতি দেওয়া হতো? বললেন, হ্যাঁ। তখন আমার ভাই বলল, আপনার নিয়ম দ্বারা তো বোঝা যায় পৃথিবীতে কখনো কোন পুরাতন জিনিসের অস্তিত্বই হবে না। (অর্থাৎ কোন পুরাতন জিনিসেরও অনুমতি হবে না) কেননা, প্রতিটি পুরাতন বিষয়ই এক সময় নতুন ছিল। যদি নতুন হওয়া অনুমতি লাভের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে তাহলে তা পুরাতন হওয়ার সুযোগ পাবে কখন? একথা শুনে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। অবশেষে সে (ভাই) বলল, এ থেকে বোঝা যায়, অনুমতির মাপকাঠি পুরাতন হওয়া নয়; বরং তাতে কোন ক্ষতির দিক না থাকা। তাহলে বলুন, খতমে তারাবী পড়ার মাঝে কী ক্ষতি রয়েছে? অগত্যা প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অনুমতি দিয়ে দিলেন। এই মেধা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল আরবী যোগ্যতার ফসল।

এ জন্য আমি বলি, আল্লাহর জন্য না শিখলেও অন্তত নিজের ইংরেজী শিক্ষার সহায়িকা হিসেবেও আরবী পড়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৯২]

www.banglakitab.weebly.com

ইলমেদীন শিক্ষার ক্ষেত্রে ইখলাস না থাকলেও উপকার রয়েছে

এটা বড় দুঃসাহসের কথা, তবে অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, ইলমেদীন শিক্ষা শুরু করার সময় আমলের নিয়ত না থাকলে কোন পরোয়া করো না। ইলমেদীন তো এমন জিনিস যা নিয়তকেও পরিশুদ্ধ করে দেয়। ইলমেদীন এমন জিনিস যা একদিন না একদিন অবশ্যই নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং অর্জনকারীকে আপন করে নেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন,

تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ فَاَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ

অর্থাৎ আমরা গাইরুল্লাহর জন্য ইলম শিখছিলাম কিন্তু এক পর্যায়ে ইলম নিজেই তা মানল না এবং আল্লাহর জন্যই হয়ে গেল। একথার মর্ম হল সূচনাতে ইখলাস না থাকলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ইখলাস সৃষ্টি হয়েই গেছে। এ জন্য আমি বলি, আমলের তৌফিক না হলেও ইলম শিখতে থাক। ইনশাআল্লাহ একদিন অবশ্যই আমল নসীব হয়ে যাবে। আমি আরো বলি, দীনি ইলম এমন জ্যোতি যা দ্বারা সবকিছু উদ্ভাসিত হয়ে যায়। তার দ্বারা আখলাক-চরিত্রও সঠিক হয়ে যায়। মানুষ যদি আল্লাহওয়ালাদের জীবনী ও ঘটনা পাঠ করে তাহলে একদিন প্রতিক্রিয়া হবেই। তবে খেয়াল রাখবে, গুনাহের সংকল্প করবে না। কেননা, গুনাহের দ্বারা ইলমের নূর চলে যায়। ইখলাস না থাকলে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহের পিছে পড়বে না এবং আল্লাহ থেকে নির্ভয় হবে না।

ইমাম শাফেঈ [রহ.] তাঁর উস্তাদের নিকট নিজের মুখস্থশক্তি স্বল্পতার অভিযোগ করলে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ-

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِىْ

فَاَوْصَانِىْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِىْ

فَاِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنَ اللهِ

وَفَضْلُ اللهِ لَا يُعْطِىْ لِعَاصٍ

আমি আমার উস্তাদ অকীর কাছে মুখস্থশক্তি দুর্বলতার অভিযোগ করলে তিনি আমাকে নসিহত করলেন, তুমি গুনাহ ছেড়ে দাও। কেননা, ইলম আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। আর কোন পাপী আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত]

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন শরীফ প্রসঙ্গ

কুরআন শরীফ শিক্ষার ফযীলত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআন শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানের অনেক বড় ফযীলত বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ করেছেন,

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।

এ থেকে জানা গেল, কুরআনের দরস-তাদরীসে ব্যস্ত থাকা অনেক বড় ইবাদত। যে ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সে সবার চেয়ে উত্তম। [আত্ তাবলীগ-২১/২১৮]

কুরআনের ধারক-বাহকের গুরুত্ব

মানুষ যাদেরকে আল্লাহওয়ালা মনে করে কেবল তাদেরকেই সম্মান করে থাকে। তাই তো দরবেশদের এত কদর। কেননা, তাদেরকে আল্লাহওয়ালা মনে করা হয়। এদিকে কুরআন ওয়ালাদেরকে আল্লাহওয়ালা মনে করা হয় না। এটি অনেক বড় ভুল। কারণ, কুরআনের সাথে আল্লাহ তাআলার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে অন্য কিছুর সাথে তা নেই। প্রতিটি বস্তুর সাথে আল্লাহ তাআলার সাথে পরোক্ষভাবে। আর তাঁর সাথে কুরআনের সম্পর্ক হল প্রত্যক্ষভাবে। কেননা, পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম। আর বক্তার সাথে বক্তব্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কালামে পাকের যে পরিমাণ সম্মান ও আদব রক্ষা করতেন তা অন্য জিনিসের করতেন না। এরপরও আমাদের অবস্থা হল যদি কেউ হজ করে আসে তাহলে তার সম্মান ও ভক্তি করি এবং হাজী হওয়াকে বড় কিছু মনে করি। কিন্তু যেসব লোক সদা পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত এবং তার শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের সম্মান ও মর্যাদা হাজী সাহেবদের সমানও মনে করি না এবং যে ছেলে পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করে তাকে হাজী সাহেবের সমপর্যায়ের সম্মানী ভাবি না। অথচ পবিত্র কুরআনের মর্যাদা নিঃসন্দেহে বাইতুল্লাহ শরীফের চেয়ে বেশি। যে বাইতুল্লাহর দর্শন লাভের দুর্বার আকাঙ্খা আমরা সদা হৃদয়ে পোষণ করি তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ জিনিস আমাদের ঘরে সর্বদা থাকে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হল, আমরা সে নিয়ামতকে মূল্য দিই না। বড়ই আফসোসের কথা, এখনও পর্যন্ত মানুষের অন্তরে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত মর্যাদা স্থান পায়নি। [আত্ তাবলীগ-২১/২২৩]

www.banglakitab.weebly.com

আহলে কুরআনের আদব

যেখানে কুরআনের সাথেই আমাদের এ আচরণ এবং আমাদের অন্তরে কুরআনের সে সম্মান ও মর্যাদা নেই যা হওয়ার কেথা ছিল সেখানে কুরআনের ধারক-বাহকের মর্যাদা আমাদের অন্তরে কিভাবে হবে। তাদেরকে আমরা নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তো দূরের কথা, তুচ্ছ জ্ঞান করি।

আচ্ছা বল দেখি, যদি কোন দরবেশ তোমাদের খাটে এসে বসে যায়, তাহলে কি তোমরা তার শিয়রের কাছে বসে থাকবে? কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁকে দেখামাত্রই তো তোমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা, তোমরা তাঁকে নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে কর। সুতরাং যদি خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ এ হাদীস অনুযায়ী তোমাদের বিশ্বাস থাকে যে, কুরআনের ক্বারী ও হাফিযগণ আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহলে কী কারণে তাদের তেমন সম্মান করা হয় না। [আত্ তাবলীগ-২১/২২৫]

কুরআন শরীফ হিফয করার প্রয়োজনীয়তা

যুক্তির আলোকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, দীনি ইলম পৃথিবীতে টিকে থাকা জরুরি কী না? নিঃসন্দেহে এ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব আসবে। অর্থাৎ জরুরি। আর পবিত্র কুরআন যেহেতু ইলমেদীনের উৎস তাই তার সংরক্ষণও আবশ্যক। অন্যথায় ইলমকে শব্দ ব্যতিরেকে টিকিয়ে রাখার কোন পদ্ধতি নেই।

যদি বল, কুরআন পাঠের কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? তাহলে মনোযোগ দিয়ে শোনো, কুরআনের পাঠ বন্ধ হয়ে গেলে তার লেখা, মুদ্রণ এবং ক্রয়-বিক্রয়ও বন্ধ হয়ে যাবে। কোথাও কুরআনের কপি হস্তগত হবে না। এ কথাটির গুরুত্ব এখন অনুধাবন করা যাবে না। কিন্তু এক শতাব্দী পর দেখতে পাবে কী অবস্থা হয়। আর যদি কুরআন পাওয়া যায় তাহলে মনে করতে হবে তার সঠিক লেখা ও মুদ্রণ সবই তিলাওয়াত সংরক্ষণের বদৌলতে। যদি তিলাওয়াতও একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মানুষের স্মৃতিফলক থেকে কুরআন শরীফ মুছে যায় তখন কোন শব্দ কিংবা আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিলে কে সমাধান দিবে? তাই আমি বলি, যদি দীনি ইলম বাকীও থাকে তখনও কুরআনের তিলাওয়াত বর্জন করার সূরতে কুরআন মাজীদ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকবে না।

আমি তো আরো সামনে অগ্রসর হয়ে বলি, যদি হিফয করার ধারা বন্ধ হয়ে যায় এবং পঠন-পাঠন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং কুরআনের বিশুদ্ধ কপি বিদ্যমানও থাকে তাতেও বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা যাবে না। যেমন الر الم যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শিক্ষকের কাছে না পড়া হবে ততক্ষণ الر এবং তার মতো অন্যান্য 'হুরুফে মুকাত্তাআত' ও বিচ্ছিন্ন হরফগুলো বিশুদ্ধরূপে পাঠ করা সম্ভব হবে না।

www.banglakitab.weebly.com

এটা কিভাবে জানা যাবে যে, الر উচ্চারণে পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করা হবে। বলুন তো কুরআনের স্থানে স্থানে তিলাওয়াতের যেসব ফযীলত, নির্দেশ এবং তিলাওয়াতকারীর প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে তা কি অনর্থক বলা হয়েছে। যদি সবাই মিলে দু'তিন পারা পাঠ করে তাহলে কুরআনের হেফাযত কিভাবে হবে। আর যদি কেউ হিফয না করে কেবল নাজেরাই পড়তে থাকে তাহলে মুসলমানদের কাছে কুরআন কিভাবে বাকী থাকবে। যদি কোন দুশমন কুরআনের সকল কপি জ্বালিয়ে দেয় তাহলে মুসলমানদের কাছে কুরআন থাকার উপায় কী হবে? [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৭০]

কুরআন হিফয করার বিস্ময়কর প্রমাণ

এখন কুরআন শরীফ হিফয করার আরেকটি প্রমাণ পেশ করছি। সময়ের প্রেক্ষাপটে এটি বড় বিস্ময়কর প্রমাণ। বোঝার সুবিধার্থে প্রথমে দু'টি কথা শোন। প্রথম কথা হল, পৃথিবীতে আসমানী ও মানবরচিত যত গ্রন্থ রয়েছে তন্মধ্যে এমন একটি গ্রন্থও নেই যা মুখস্থ করার পর মুখস্থ থাকে। কেউ যদি মুখস্থ করেও ফেলে তাহলে তার অনেক বেশি মুখস্থ শক্তির প্রয়োজন। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফ খুব দ্রুত মুখস্থ হয়ে যায় এবং ছোট বয়সেই তা মুখস্থ করা সম্ভব। আমার এক বন্ধু তিন মাসের কম সময়ে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন।

দ্বিতীয় কথা হল, বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ এ কথা স্বীকার করেন যে, যে যুগে যে জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় প্রকৃতি তা-ই সৃষ্টি করে থাকে। এ বিষয়টি শরীয়তের পরিভাষায় এভাবে বলব যে, আল্লাহ তাআলা প্রতি যুগে ঐসব বস্তু সৃষ্টি করেন যার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দু'টি ভূমিকার আলোকে বলব, কী কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতির মাঝে এ বিষয়টি গচ্ছিত রেখেছেন যে, কুরআন শরীফ দ্রুত মুখস্থ হয়ে যায়। বোঝা গেল, ফিতরত বা প্রকৃতিগতভাবেই কুরআন মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং বন্ধুগণ! প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করো না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৭৫]

হাফেজ এবং ক্বারীদের ফযীলত

হাফেজ এবং ক্বারী সাহেবগণ আল্লাহ তাআলার কাছে কতই না প্রিয় ও সম্মানিত। কেননা, তারা আল্লাহ তাআলার কালামের পাঠক এবং সংরক্ষক। যার সাথে আল্লাহ তাআলার মহব্বত হবে তার সম্মান ও মর্যাদার পরিমাণ আন্দাজ করা কঠিন। পৃথিবীর কোন রাজা যদি কোন প্রজার সাথে কথা বলেন তাহলে তার মানসিক অবস্থা কী হতে পারে? দর্শকদের দৃষ্টিতে তার সম্মান বেড়ে যায়। অথচ দুনিয়া কী জিনিস এবং তার রাজত্বেই বা কী? আল্লাহ তাআলার শান তো

www.banglakitab.weebly.com

বহু উর্ধ্বে। সুতরাং আল্লাহ যাকে সম্মান করেন তার মর্যাদা কী পরিমাণ হতে পারে! এ থেকে বোঝা গেল, কুরআন হিফয করা কত বড় দৌলত। অনুরূপভাবে কুরআন তিলাওয়াত চাই দেখে হোক বা মুখস্থ তা আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা-বার্তা ও আলাপচারিতা। [আত্ তাবলীগ-১/১১৫]

কুরআন হিফয করার বড় ফযীলত এই যে, কিয়ামতের দিন হাফেযে কুরআনের সুপারিশে একটি বড় দলকে ক্ষমা করা হবে এবং তার পিতা-মাতাকে এমন মুকুট পরানো হবে যার অপূর্ব দীপ্তিতে সূর্যও ম্লান হয়ে যাবে। এ থেকে অনুমান করে নাও যে, স্বয়ং হাফেযের কী পরিমাণ মর্যাদা হবে। তাই এ অমূল্য সম্পদ অবশ্যই অর্জন করা উচিত। যার দু'চারটি সন্তান রয়েছে সে যেন তাদের মধ্য হতে অন্তত একজনকে অবশ্যই হাফেজ বানায়। কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাক এবং জান্নাতের সুউচ্চ ভবনে চড়তে থাক। যেখানে গিয়ে তোমার কুরআন পাঠ থেমে যাবে সেখানে তুমি নামবে। সেখানেই তোমার স্থান। আজ দুনিয়াবী শিক্ষিতদের কেবল স্কুলের ডিভিশন প্রয়োজন, জান্নাতের ডিভিশনের প্রয়োজন নেই। এজন্য তারা কুরআন পড়াকে বেকার মনে করে। [আত্ তাবলীগ-১/৩১৪]

কুরআন মাজীদ হিফয করলে কি মেধা দুর্বল হয়ে যায়?

কেউ কেউ বলে থাকেন, হিফয করার দ্বারা মেধা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই আমরা শিশুদেরকে হিফয করাব না। কেননা, মেধাশক্তি দুর্বল হয়ে গেলে সে কোন কাজের থাকবে না। একথার জবাবে ডাক্তারদের উক্তি বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করছি। একবার এক ডাক্তার আমাকে বলল, মেধা কেবল চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা দুর্বল হয়, মুখস্থের দ্বারা দুর্বল হয় না। কেননা, হিফয বা মুখস্থকরণ মেধার আসল চর্চা নয়। মূলত সেটি যবানের কাজ। আর মেধার কাজ হল চিন্তা-ভাবনা। তাহলে বোঝা গেল, হিফযের কারণে মেধা দুর্বল হবে না। দুর্বল হলে জিহ্বা দুর্বল হওয়ার কথা। কেননা, মুখস্থকর্মে জিহ্বার ব্যবহারই প্রধান। আর তা কখনো দুর্বল হয় না।

তারা আরেকটি বথা বলে, কুরআন ঐ সময় মুখস্থ করা হয় যখন শিশুরা কিছুই করতে পারে না। অর্থাৎ তখন শিশুদের মেধায় কোন কাজ করা ও চিন্তা ভাবনা করার যোগ্যতাই সৃষ্টি হয় না। যদি সে সময় জোর করে অন্য কোন কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চিত ক্ষতি বয়ে আনেব। যদি মেধা দুর্বল হওয়ার বিষয়টি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে আমি বলব, মেধাকে সারা জীবন নিজের কাজেই ব্যয় করা হবে। আল্লাহর জন্য দু'তিনটি বছর ব্যয় করলেই যতসব আপত্তি। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৯৯]

www.banglakitab.weebly.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তালিবুল ইলমদের সম্মান, মহব্বত ও ফযীলত

তালিবুল ইলমদের প্রতি আমার মহব্বত সবচেয়ে বেশি। মুরীদদের চেয়েও বেশি। আমার মাঝে ছাত্রত্বভাব প্রবল। আমি ছাত্রদের সামনে আমার দোষ-ত্রুটি গোপন করি না। কিন্তু কোন মুরীদের সামনে তা প্রকাশ হওয়াকে পছন্দ করি না। কেননা, পীরত্বের সম্পর্ক সামান্য অভক্তির কারণে নষ্ট হয়ে যায়। আর ছাত্রত্বের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। কেননা, তা ইলমের কারণে বহাল থাকে। আমার কোন দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও যেহেতু সে ছাত্রের কাছে এখনও আমার ইলম রয়েছে তাই আমার মহব্বত শেষ হবে না; বরং ইলম যতদিন থাকবে ততদিন তার অন্তরে আমার মহব্বত অটুট থাকবে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৯/১৩৭]

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী [রহ.]-এর ঘটনা। একবার তাঁর নিকট জনৈক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মেহমান হিসেবে আগমন করেন। খাবারের সময় হযরত তাকে নিজের সাথে বসালেন। কারণ, মেহমান নামীদামী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। হযরতের সাথে তাকে উপবিষ্ট হতে দেখে অন্যান্য দরিদ্র ছাত্র মেহমানরা পিছনে সরে গেল। তখন হযরত বললেন, আপনারা সরে যাচ্ছেন কেন? একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আমার সাথে বসেছেন বলে? ভালোভাবে বুঝে রাখবেন, আপনারা হলেন আমার সবার চেয়ে প্রিয় ও আদরের। আপনাদেরকে যে পরিমাণ সম্মানি মনে করি তার সমানে অন্যদের কোন তুলনাই হয় না। তারপর তিনি সকল ছাত্রকে একত্রে বসিয়ে খাবার খাওয়ালেন। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/৩৩]

ইলমেদীন অন্বেষণের ফযীলত

খাদ্য হল শরীরের খাবার। আর ইলম হচ্ছে রূহের খাবার। রূহানী ও আত্মিক জীবন ইলমের উপরই নির্ভরশীল। ইলমেদীন অর্জন করার একটি বড় উপকার হল তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল হয়। যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদের সওয়াব পায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করেন। [আত্ তাবলীগ-২১/১৬৯]

আরবী ও ফার্সী ভাষার ফযীলত

যদি বলা হয় যে, আরবী ভাষা জানার কী প্রয়োজন? তাহলে আমি বলব, আরবী থেকে কখনই পরিপূর্ণ অনুবাদ করা সম্ভব হয় না। কেননা, কিছু কিছু শব্দ এমন

www.banglakitab.weebly.com

রয়েছে যার দু'ধরনের অর্থ ও ব্যাখ্যা হয়। এখন যদি আরবী শব্দটি সামনে না থাকে তাহলে অর্থ সঠিক হল কি না বোঝা যাবে না। তখন অবস্থা এই হবে, যা বর্তমানে তাওরাত ও ইনজীলের হচ্ছে। সত্য অন্বেষণকারীরা প্রকৃত বিধানের সাথে পরিচিত হতে পারে না। সুতরাং মূল শব্দাবলি বাকী থাকা খুবই জরুরি। [দাওয়াতে আবয়িাত-৬/৭০]

এমন ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক যে, একটি বিশেষ দল দীনি ইলমের সকল শাখায় পরিপূর্ণ ও তাহকীকপূর্ণ জ্ঞান রাখবে এবং জীবনের একটি বড় অংশ সে ইলমের অর্জনে ব্যয় করবে। তারপর গোটা জীবন তার খেদমত ও প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত থাকবে। এ কাজ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকবে না। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

> তোমাদের মধ্যে এমন একটি জামাত থাকা আবশ্যক যারা মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান করে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করে। [সূরা আলে ইমরান : ১০৪]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আসহাবে সুফফার সদস্য সাহাবীগণ হলেন এ আয়াতের বাস্তব উদাহরণ। [তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ-২১]

এটি ফরযে কিফায়া। আর ফরযে কিফায়ার বিধান হল, যদি সমাজে এমন একটি জামাত বিদ্যমান থাকে যাদের দ্বারা সামাজের প্রয়োজন পূরণ হয়, তাহলে সকল মুসলমান গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। অন্যথায় সকল মুসলমানই গুনাহগার হবে। [তাজদীদ-১৯]

ইলম ও আলেমদের ফযীলত

হাদীস শরীফে এসেছে, العلماء ورثة الانبياء (উলামায়ে কিরাম নবীদের উত্তরাধিকারী) ইমাম মুহাম্মদ [রহ.]-কে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে শুধালেন, আপনার সাথে কী আচরণ করা হয়েছে? বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হওয়ার পর বললেন, তুমি কী চাও? আমি আরজ করলাম, يا رب اغفر لى -হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মুহাম্মদ! তোমাকে যদি আযাব দেওয়ার ইচ্ছা থাকত তাহলে আমি

www.banglakitab.weebly.com

তোমাকে ইলম দান করতাম না। আমি তোমাকে ইলম প্রদান করার উদ্দেশ্যই হল আমি তোমাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলাম।

এ ঘটনা থেকে কেউ গবেষণা করেছেন যে, কেউ একথা জানে না যে, আল্লাহ তার সাথে কী আচরণ করবেন। তবে আলেমরা জানে। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে,

مَن يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বুঝ দান করেন।

এখন বোঝা গেল, ইলমেদীনের ফযীলত কত এবং তার প্রয়োজন কত! আল্লাহর সন্তুষ্টি ইলমেদীন অর্জনের উপর নির্ভরশীল। [হাক্কুল ইতাআত-১/৪২]

আলেমদের প্রয়োজনীয়তা

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, সমাজে আলেম থাকা আবশ্যক কি না। যদি বলা হয়, প্রয়োজন নেই, তাহলে তা হবে একথা বলার নামান্তর যে, ইসলামেরও প্রয়োজন নেই। কেননা, আলেম-উলামা ছাড়া ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। কারণ, কোন পেশা বা শিল্পের অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক না থাকলে তা সামনে অগ্রসর হতে পারে না।

এটা ভিন্ন কথা যে, সকলেই অল্প-বিস্তর দীনি শিক্ষা লাভ করে নিলে একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হবে। কিন্তু এ পরিমাণ জানা শোনার দ্বারা ইসলামের অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। কোন জিনিসের অস্তিত্ব টিকে থাকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের মাধ্যমে। সে হিসেবে ইসলাম টিকে থাকার জন্য অভিজ্ঞজন তথা আলেম-উলামার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

তারপর কথা হল, এ অভিজ্ঞ জামাত কিভাবে সৃষ্টি হবে? অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, তার একমাত্র পন্থা হল, সমাজের লোকজন চাঁদার মাধ্যমে কিছু তহবিল সংগ্রহ করে আলেমদের হাতে তুলে দিবে। তাঁরা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করবেন। এতে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দীনি ইলমের পথ সুগম হবে।

গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব ছিল দীনি ইলমে পারদর্শী হওয়া। কিন্তু একজন তালেবুল ইলম সকলকে রক্ষা করেছে। গোটা জাতিকে বাঁচিয়ে, নিজে সকল কষ্টক্লেশ সহ্য করে সে ইলমেদীন অর্জন করল। সুতরাং উচিত হল, আপনি তার সম্মান ও মূল্যায়ন করবেন। অথচ আপনারা

www.banglakitab.weebly.com

উল্টো বলতে শুরু করেন যে, আরবী পড়লে খাবে কী? মসজিদের ঝাড়ুদার হবে? হ্যাঁ, জনাব দুনিয়ার কুকুর হওয়ার চেয়ে তো একাজ অনেক উত্তম।

আলেমের উপমা

আলেম হল সূর্যের মত। সূর্য উদিত হতেই অর্ধেক পৃথিবী আলোকিত হয়ে যায় এবং আঁধারেরা পালিয়ে যায়। আলেমও অনুরূপ। তবে এ সূর্যের উপমা দীনদার আলেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে আলেম জনগণের কথায় চলবেন তিনি এ উপমার যোগ্য নন। আলেম তো এমন হবে- لَا يَخَافُوْنَ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া করবে না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/৫৩]

পার্থিব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যও আলেমদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۚ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۭ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়নদের নিকটবর্তী। [সূরা আ'রাফ : ৫৫, ৫৬]

دُعَاء শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. ইবাদত ২. প্রার্থনা। এ আয়াতে দুআর পরিবর্তে ইবাদত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের সারকথা হবে, প্রথমেও ইবাদতের নির্দেশ করা হয়েছে এবং পরেও। মাঝখানে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে বারণ করা হয়েছে। যার দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইবাদত না করা হল ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা। পবিত্র কুরআন দাবী করছে ইবাদত বর্জন করা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা। আর ইবাদত পালন করা হল পৃথিবীর শৃঙ্খলা।

অতএব, আয়াতের সারমর্ম হল, ইবাদত তথা দীন না থাকা হল বিশৃঙ্খলার কারণ।

www.banglakitab.weebly.com

এ পর্যায়ে আমি বাস্তব পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করছি যে, দীন হচ্ছে কতগুলো বস্তুর সমন্বিত নাম। আর তা হল পাঁচটি জিনিস। ১. আকাইদ [বিশ্বাস], ২. ইবাদত, ৩. মুআমালাত [লেনদেন], ৪. মুআশারাত [সামাজিক আচরণ], ও ৫. আখলাকে বাতেনী তথা নৈতিক চরিত্র।

পৃথিবীতে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের দখল রয়েছে। যেমন মুআমালাত ও লেনদেনের স্বচ্ছতার প্রতিক্রিয়া সাধারণ নিরাপত্তার মাঝে প্রকাশিত হয়। কেননা, লেনদেনে স্বচ্ছতার মূল কথা হল কারো অধিকার বিনষ্ট না করা। সুতরাং বোঝা গেল, জাতীয় ঐক্যে লেনদেনের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

অনুরূপভাবে মিথ্যা না বলা, সহমর্মিতা করা, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করা ইত্যাদি নৈতিক চরিত্রেরও প্রভাব রয়েছে। বলতে গেলে গোটা পৃথিবী উক্ত নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল।

যদি দু'জন ব্যক্তির মাঝে ঐ নৈতিকতা পাওয়া যায় যাদের একজন মুসলমান এবং অপরজন অমুসলিম। তাহলে নিঃসন্দেহে উভয়ের মাঝে বিস্তর তফাত হবে। অর্থাৎ অমুসলিমের মাঝে উক্ত নৈতিকতা সীমিত সময়ের জন্য থাকবে। আখলাক অনুযায়ী চললে যদি তার পার্থিব কোন উপকার হাত ছাড়া না হয় কিংবা তার বিপরীত চললে লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে ততক্ষণ সে নৈতিক চরিত্রের উপর আমল করবে। আর যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, এ চরিত্রগুলোর পরিপন্থী কাজ করলে অপমানিত হওয়ার কিংবা পার্থিব অন্য কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই তাহলে সেই অমুসলিম নৈতিকতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নৈতিকতার সাথে সাথে আল্লাহ এবং কিয়ামতে বিশ্বাসী এক্ষেত্রে তার বিচ্যুতি ঘটবে না। কেননা, সে জানে আমি এ পৃথিবীতে বেঁচে গেলেও পরকালে আমাকে এর সাজা ভোগ করতে হবে।

এবার ইবাদত ও আমলের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করুন। একথা সকলেই অবগত আছেন যে, আখলাক ও চরিত্রের মাঝে সবচেয়ে বড় বস্তু হল বিনয়। এটি না থাকলে গোটা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটে। কেননা, বিপর্যয়ের মূল হল অনৈক্য। আর অনৈক্যের মূলে রয়েছে অহংকার। যদি অহংকার না থাকে তাহলে অনৈক্যের আর কোন কারণ, পরিলক্ষিত হবে না। অতএব ঐক্য সৃষ্টির পূর্বশর্ত হল বিনয় সৃষ্টি করা এবং অহংকার দূর করা। আর বিনয় সৃষ্টির মহৌষধ হল নামায। নামাযের দ্বারা বিনয়ের অভ্যাস গড়ে উঠে। নফসের বৈশিষ্ট্য হল, তাকে যদি অপমানিত ও লজ্জিত হওয়ার শিক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে তার মাঝে 'ফেরআউনিয়্যাত' ও বড়ত্ব সৃষ্টি হয়। আর নামাযের শুরু থেকেই আল্লাহু

www.banglakitab.weebly.com

আকবার-এর শিক্ষা রয়েছে। সুতরাং যার অন্তরে আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব থাকবে সে নিজেকে পিপিলিকার চেয়েও তুচ্ছ জ্ঞান করবে। কেননা, বড়দের সামনে থাকাবস্থায় ছোটদের উপরও রাজত্ব চলে না। তো আল্লাহু আকবার এমন শিক্ষা যা অহংকারের শেকড় উপড়ে দেয়। অনুরূপভাবে পাশবিক শক্তির কারণেও পৃথিবীতে অসংখ্য বিপর্যয়, লড়াই-যুদ্ধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে যে আমলের বড় প্রভাব রয়েছে তা হল রোযা। রোযা বা সিয়াম সাধনার দ্বারা পাশবিক শক্তি ও কুপ্রবৃত্তি অবদমিত হয়।

অনুরূপভাবে যারা যাকাত প্রদান করে তাদেরকে সকলেই ভালোবাসে। যারা গ্রহীতা তারা তো ভালোবাসেই, যারা যাকাত গ্রহণ করে না তারাও ভালোবাসে। দেখুন, দানশীলতার কারণে 'হাতেমতাই'কে সকলেই ভালোবাসে। আর ঐক্যের মূল উৎস হল ভালোবাসা। সুতরাং বোঝা গেল, একতা ও ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাকাতের কত বড় প্রভাব রয়েছে।

হজের প্রতি লক্ষ্য করুন! গোটা বিশ্বের মানুষ একটি কাজের জন্য একই সময় একই স্থানে সমবেত হয় এবং অহংকারের সমূহ উপকরণ থেকে মুক্ত হয়ে একটি মহান দরবারে উপস্থিত হয়। একতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় যার বিরাট প্রভাব রয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক লোক সমাগম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে দুর্ঘটনা এবং ঝগড়া-বিবাদ খুব কমই ঘটে থাকে।

এখন কথা হল, সামাজিক লেনদেন প্রসঙ্গে। গভীরভাবে চিন্তা করলে অনুভূত হয় যে, সামাজিকতার যতগুলো অবৈধ রীতি রয়েছে সবগুলোতেই অহংকারের গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন অবৈধ চালচলন থেকে শরীয়ত বারণ করেছে।

প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষত্ব থাকে। অনুরূপভাবে ইবাদত ও আমলের মাঝেও একটি বিশেষত্ব রয়েছে। আকাইদ এবং সামাজিক আচার-আচরণেরও মাঝেও আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তাহল এগুলোর দ্বারা অন্তরে একটি জ্যোতি সৃষ্টি হয় এবং সেই জ্যোতির পরশেই ব্যক্তির জীবন নিম্নোক্ত হাদীস অনুযায়ী হয়ে যায়।

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার যবান এবং হাতের অনিষ্ট থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

পরিশেষে লক্ষ্য করুন, আনুগত্য হল একটি আমল বা কাজ। আর এটা যৌক্তিক বিষয় যে, আমলের পূর্বশর্ত হল ইলম। ইলম ছাড়া আমল করা অসম্ভব। তো

www.banglakitab.weebly.com

পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ইলমেদীনের প্রয়োজন রয়েছে। আর ইলমেদীনের ধারক-বাহক হলেন আলেম সমাজ। এখন বলুন, আলেম সমাজের অস্তিত্ব পৃথিবীর সবচেয়ে জরুরি বিষয় কি না। এখানে আমি কোন কবিত্ব দেখাচ্ছি না বা কারো পক্ষ নিচ্ছি না। আশা করি উক্ত আলোচনায় বাস্তব বিষয়টি ফুটে উঠেছে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১১/৮৪, জরুরাতুল উলামা]

আলেমদের উসীলায় পৃথিবী টিকে আছে

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা নিম্নোক্ত হাদীস শরীফের মর্মও ফুটে উঠেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللهُ اَللهُ

> অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহর নাম জপনাকারী একজন লোকও বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।

কেয়ামত সংঘটিত না হওয়ার সংক্ষিপ্ত কারণ হল, ইসলাম হল আনুগত্য আর কুফরী হল বিদ্রোহ। দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের নীতি হল কোন শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেখানে তোপ-কামান দাগানো হয়। আল্লাহ তাআলাও যদি এমনই করতেন তাহলে বছরের অধিকাংশ সময়ই কামান থেকে গোলা বর্ষিত হত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দয়াশীল। তাঁর নিয়ম হল যদি সারা বিশ্বের মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায় আর মাত্র একজন অনুগত বান্দা থাকে তাহলে সে একজনের খাতিরে গোটা পৃথিবী সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু বিদ্রোহ ব্যাপক হয়ে গেলে ধ্বংসও ব্যাপক হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেয়ামত হয়ে যাবে। অতএব বোঝা গেল, এমন অনেক লোক রয়েছে যাদেরকে আপনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন কিন্তু তারা আপনার অস্তিত্বের কারণ। [দাওয়াতে আবদিয়্যত, জরুরাতুল উলামা-১১/৪৯]

জাতীয় উন্নতির পথে ইলমেদীনের প্রয়োজনীয়তা

একটি দুঃখজনক বাস্তবতার কথা শুনুন! আপনার স্বদেশী হিন্দুরা শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছে। তাই তো তাদের বহু সংখ্যক লোক পরীক্ষায় পাস করার পর সরকারের শিক্ষা বিভাগে ঢোকার চেষ্টা করে থাকে। কারণ, দেশের সকল শাখা শিক্ষা বিভাগের অধীন। সুতরাং শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করা হচ্ছে জাতীয় উন্নতির মাধ্যম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এ বিষয়টি অনুভব করিনি। অথচ নিজেদেরকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভেবে বসে আছি। অপরাপর কাজের তুলনায় শিক্ষা হচ্ছে ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিন সঞ্চালিত হলে পুরো গাড়ি সঞ্চালিত হয় এবং ইঞ্জিন বন্ধ

www.banglakitab.weebly.com

থাকলে পুরো গাড়ির গতি থেমে যায়। তারপরও মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। দরস-তাদরীস বা শিক্ষা ব্যবস্থা সকল বিভাগের প্রাণ। বক্তৃতা, রচনা ইত্যাদি সবই তার শাখা। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাকে সর্বাধিক বেকার মনে করা হয়। সাধারণতঃ মানুষের কাছে আলেমদের মর্যাদা খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত, জরুরাতুল উলামা-১১/৪৯]

আলেম সমাজ পার্থিব সফলতারও বাহন

আমি আরেকটু সামনে এগিয়ে বলতে চাই, গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, আলেমগণ মানুষকে দুনিয়াও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দীনের সাথে সাথে মুসলমানদের দুনিয়াবী বিষয়ও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ দীনের ক্ষেত্রে তাদের উন্নতি হওয়ার পাশাপাশি দুনিয়ার ব্যাপারেও উন্নতি সাধিত হয়ে যায়। আর যখন দীনের মাঝে ত্রুটি হবে তখন দুনিয়ার মাঝেও ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে।

মোটকথা, আমরা যখন দীন শিক্ষা দেই; মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাক-চরিত্র সংশোধন করি; তখন দুনিয়াও সংশোধিত হয়ে যায়। যেন আমরা পার্থিব সফলতার শিক্ষাও প্রদান করি এবং আমাদের দ্বারা পার্থিব উন্নতিও সাধিত হয়। [দাওয়াতে আবিদয়ত, তরীকুন নাজাত-১২/২৬]

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

দীনি শিক্ষাকেন্দ্র তথা মাদরাসা প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাদরাসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দীনি মাদরাসা : ইসলাম রক্ষার অজেয় দুর্গ

এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে দীনি মাদরাসাগুলোর অস্তিত্ব মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। পৃথিবীতে আজ ইসলাম রক্ষার কোন ব্যবস্থা থেকে থাকলে এ কমজোর চার দেয়ালের মাদরাসাগুলোই রয়েছে। কেননা, ইসলাম হল বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের নাম। যার মাঝে দীনদারী, মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাক-চরিত্র সবই শামিল আছে। একথা সুস্পষ্ট যে, আমল নির্ভর করে ইলমের উপর আর দীনি ইলমের অস্তিত্ব যদিও মৌলিকভাবে মাদরাসার উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষাপটে এখন অবশ্যই মাদরাসার উপর নির্ভরশীল। [হুকুকুল ইলম-৮৪, তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ-৬৬]

দীনি মাদরাসার গুরুত্ব

যে হারে মুক্তচিন্তা, নাস্তিকতা ও বদদীনি বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হিসেবে বর্তমানে দীনি মাদরাসার গুরুত্ব অনেক বেশি। [হাকীমুল উম্মত-১০১]

দীনের প্রচার-প্রসারে মাদরাসার গুরুত্ব

এতে কারো সংশয় হওয়া উচিত নয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) যেহেতু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেননি তাই এগুলো বেকার ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস। আমি বলি, মাদরাসা কোন কালেই বেকার নয়; বরং মাদরাসা হল নামাজের জন্য অজুর সমপর্যায়ের। নামাজের জন্য যেভাবে অজুর প্রয়োজন ঠিক তেমনিভাবে দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য মাদরাসাগুলোর অস্তিত্ব আবশ্যক। [আত তাবলীগ-২০/২৩]

www.banglakitab.weebly.com

সমাজে মাদরাসার প্রয়োজন কেন?

মাদরাসার প্রয়োজনীয়তা এজন্য দেখা দেয়নি যে, ইলমেদীন মৌলিকভাবে তার উপর নির্ভরশীল। প্রথম দিকে ইলম শ্রবণের মাধ্যমেই সংরক্ষিত ছিল। দিনরাত ইলমের প্রচার-প্রসার হতো। কিন্তু এখন না আছে আকাবিরদের মতো তাকওয়া ও খোদাভীতি আর না আছে তাদের বিস্ময়কর মেধা ও মুখস্থশক্তি। যদি শ্রবণের উপরই নির্ভর করা হত তাহলে শ্রুত বিষয়গুলো মুখস্থ থাকার নিশ্চয়তা ছিল না। দ্বিতীয়ত তাকওয়া হ্রাস পাওয়ার কারণে এরও কোন ভরসা ছিল না যে, যে যা বর্ণনা করছে তা কি সঠিক, নাকি নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন ও বিয়োজন করছে। যখন অবস্থা এদিকে গড়াল তখন আমাদের যোগ্য পূর্বসূরীগণের মনোযোগ এ দিকে নিবদ্ধ হল যে, দীন সংরক্ষণ করে রাখা উচিত। ফলে তারা হাদীস থেকে বিধিবিধান গবেষণা ও আহরণ করে সংকলন করেছেন। যাতে শরয়ী বিধানাবলী বুঝতে সমস্যা দেখা না দেয়।

বোঝা গেল, দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য বিশুদ্ধ ইলমের প্রয়োজন ছিল। আর তা সংরক্ষিত থাকার জন্য গ্রন্থাবলী প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি স্বতন্ত্র দলের প্রয়োজন ছিল। তারপর সে গ্রন্থগুলো পড়ানোর মতো শিক্ষকের প্রয়োজন পড়েছে। তার একটি পদ্ধতি এই ছিল যে, যেখানে সুযোগ পাওয়া গেল তো কারো কাছ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নিল। কারো সাথে সফরকালে পথে দু'চার লাইন পড়ে নিল। এভাবে নিয়মতান্ত্রিক পাঠ গ্রহণের সুযোগ হচ্ছিল না। এজন্য আলাদা জামাতের প্রয়োজন পড়েছে। যারা সদাসর্বদা ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং জনগণের যে কোন সমস্যার সমাধান দিবে। তারপর এলো জাতির সেবায় নিয়োজিত জামাতের বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করার পালা। তাদের থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা করা। এভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। [আদ্ দাওয়াতু ইলাল্লাহ, তাবলীগ-২০/ ২৩, ২৪]

মাদরাসার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

বর্তমানকালের মুহতামিম ও পরিচালকদের বাহ্যিক অবস্থা একথা বলে দেয় যে, মাদরাসা ইজ্জত-সম্মান এবং পদ লাভের মাধ্যম হয়ে গেছে। কেননা, মাদরাসা থাকবে না তো তাদের রাজত্ব থাকবে না। যখন আল্লাহ ও রাসূলের রেযামন্দিই লাভ হল না তো মাদরাসা থাকা না থাকা উভয়ই সমান; বরং কোন কোন দিক থেকে না থাকাই উত্তম।

প্রিয় বন্ধুরা! তোমরা পেরেশান হও কেন। মাদরাসা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য তো হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বহু পদ্ধতি

www.banglakitab.weebly.com

ও পন্থা রয়েছে। সে পদ্ধতিসমূহের একটি হল মাদরাসা। যদি মাদরাসায় খেদমতের সুযোগ হয় তাহলে কাজ করে যাও। আর সুযোগ না হলে অন্য কোথায় বসে দীনের কোন কাজ করতে থাক।

যেহেতু দীন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই মাদরাসার প্রতিষ্ঠা। সেহেতু সীমার বাইরে কদম ফেলা উচিত নয়। হকের শান কী? اَلْحَقُّ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى হক উঁচু হয়, নীচু হয় না।

সুতরাং হৃদয়ে দৃঢ় সংকল্প করো যে, যতদিন একাজ নিয়মনীতির ভেতর চলবে ততদিন কাজ করব এবং যেদিন নিয়মের উল্টো চলবে তখন থেকে তা বর্জন করব। [মালফুযাত-৪৭]

মাদরাসা সম্পর্কে আমার অন্তরে এ কথা স্থির হয়ে আছে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে হবে। পারিভাষিক আলেম বানানো উদ্দেশ্য নয়। পরীক্ষায় ভালো-মন্দ ফলাফলে কিছু আসে যায় না। কেউ অলসতা করলে সে জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। [হুসনুল আযীয-২/১৮০]

ভালোভাবে কিতাব না বুঝলেও মাদরাসায় অবস্থান করা উপকার শূন্য নয়

ইংরেজী পড়ার চেয়ে দীনি মাদরাসাগুলোতে বেকার পড়ে থাকাও অনেক উত্তম। হয়তো কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন হবে না কিন্তু আকীদা তো নষ্ট হবে না। মসজিদের খাদেম হওয়া ঐ ব্যারিস্টারী থেকে উত্তম যার দ্বারা ঈমান নড়বড়ে হয়ে যায়। মাদরাসায় বেকার পড়ে থাকা ঐ ইংরেজী পড়ার চেয়ে উত্তম যা শিখে আল্লাহ-রাসূল, সাহাবায়ে কিরামের ও আলেম-উলামাদের শানে বেআদবিমূলক আচরণ করে। হ্যাঁ, যাদের দীন-ধর্ম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই তারা যা ইচ্ছা তাই পড়তে পারে। [তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ-৭৮]

মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও মাদরাসার অস্তিত্ব গণিমত এবং আবশ্যক

কোন মাদরাসা বিশৃঙ্খলা ও সমস্যামুক্ত নয়। সেখানে হিংসা-বিদ্বেষ, মতানৈক্য ইত্যাদি যা কিছু বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় তাতে মাদরাসাকে বেকার মনে না করা। এতসব কিছুর পরও তার দ্বারা দীনের যতটুকু উপকার হচ্ছে সেগুলোর বিবেচনায় মাদরাসার অস্তিত্ব খুবই গণিমত ও আবশ্যক। এ অবস্থায়ও সকল মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, মাদরাসার সাহায্য-সহযোগিতা করা। অবশ্য পরিস্থিতি সংশোধন করার যথাসাধ্য চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। [হুকূকুল ইলম-৯১]

www.banglakitab.weebly.com

এ অবস্থায়ও এ সিদ্ধান্ত দিব না যে, মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হোক; বরং মাদরাসার অস্তিত্ব মহাকল্যাণকর। তা বন্ধ হওয়া অনুচিত। কেননা, এ যুগটাই এমন। তবে এ'তেদাল ও মধ্যমপন্থা থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। [হুসনুল আযীয-১/৫০৯]

নামসর্বস্ব মাদরাসাও উপকারী এবং প্রয়োজনীয়

একবার কেউ বলল, হযরত এ মাদরাসাগুলো তো এখন নামের মাদরাসা, কাজের মাদরাসা নয়। এগুলো দ্বারা কোন লাভ হচ্ছে না। তখন হযরত বললেন, কথাটি ঠিক না। আমি একথার সম্পূর্ণ বিরোধী। মাদরাসার অস্তিত্ব বড় কল্যাণকর ও বরকতপূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে শেখ সা'দী [রহ.]-এর একটি ঘটনা মনে পড়ল। এক শাহজাদার মুকুটের হীরকখণ্ডটি কোন শিকারক্ষেত্রে হারিয়ে গিয়েছিল। তখন ছিল রাত। অনেক খুঁজেও সেটি পাওয়া গেল না। শাহজাদা হুকুম দিল, এখানকার সকল পাথর ও কংকর তুলে নিয়ে চলো। রাজমহলে গিয়ে ধীরস্থীরভাবে খুঁজে নিব। শাহজাদার কথামত তাই করা হল এবং খুঁজে হীরা পাওয়া গেল। অনুরূপভাবে এসব কমযোর মাদরাসা থেকেই দু একজন এমন যোগ্যতম ব্যক্তি গড়ে উঠছে যারা দীনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। [মাযীদুল মাজীদ-৪৯]

এমন সময়ও আসতে পারে যখন মাদরাসা থাকবে না [আল্লাহ্ না করুন]

হযরত বলেন, আজকাল অধিকাংশ মাদরাসারই ভবন ও আবাসন ব্যবস্থা বড় জাঁকজমকপূর্ণ। প্রায় মাদরাসায়ই সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত ভবন নজর কাড়ে। কিন্তু ইলম ও আমল দিন দিন বিদায়ের পথে। মনে রাখবেন, এগুলোও গনিমত। এসব মাদরাসার মাধ্যমে এখন যা কিছু হচ্ছে, আল্লাহ না করুন, এমন দিনও আসবে যখন এটুকুও হবে না। এক ব্যক্তি আরজ করল, হযরত! এমন সময়ও কি আসবে? বললেন, অবশ্যই আসবে। সে সময়ও একটি দল আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার প্রয়াসে মগ্ন থাকবে। [আল ইফাযাত-২/২১৬]

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রসঙ্গ : মাদরাসার সাহায্য-সহযোগিতা

সাধারণ মানুষ মাদরাসার মুখাপেক্ষী

আমি মিরাঠে একটি জলসায় বলেছিলাম, তোমরা আলেম-উলামাদেরকে তোমাদের মুখাপেক্ষী মনে করো। যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে তোমরা মাদরাসার হুজুরদেরকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দাও। সকলে একজোট হয়ে সাহায্য বন্ধ করে দাও। আল্লাহর শোকর, আমাদের এতটুকু পরোয়া নেই। তখন আমরা কেউ চালের দোকান, কেউ মুদি দোকান এবং কেউ অন্যান্য জিনিসের দোকান দিয়ে ব্যবসায় লেগে যাব এবং জীবিকা উপার্জন করব। কিন্তু তোমরা তোমাদের সন্তানাদির ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করে দেখ যে, পঞ্চাশ বছর পর তোমাদের সন্তানাদির অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। কেউ ইহূদী হবে, কেউ খ্রিস্টান হবে, কেউ আরিয়া ইত্যাদি ধর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। (আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন) কেননা, তখন ইলম থাকবে না। কারণ, আলেমগণ শিক্ষা প্রদানের জন্য অবসর হবেন না। আর ইলম এমন জিনিস যা মানুষকে উপরোক্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে। [কালিমাতুল হক-৩৭]

মাদরাসার ভবন নির্মানের ফযীলত

দান-খয়রাত করার ক্ষেত্র বহু রয়েছে। কিন্তু যখন যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন বেশি হবে সেখানেই মনোযোগ দিতে হবে। এ মুহূর্তে ছাত্রাবাসের বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রাবাস প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি মুসাফিরখানা নির্মাণ করে এবং সেখানে পাপী ব্যক্তিরাও অবস্থান করে তবুও নির্মাণকারী সওয়াব পাবে। আর অবস্থানকারীরা যদি হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান তথা তালিবুল ইলাম, তাহলে কী অবস্থা! আর তালিবুল ইলমদের অবস্থান তো নিছক অবস্থানই নয়। প্রতিনিয়ত কুরআন ও হাদীসের চর্চা হতে থাকবে। অন্য কোন যিকির-অযীফা যার সমতুল্য হতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে,

اَلدُّنْيَا مَلْعُونٌ وَمَا فِيهَا مَلْعُونٌ اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ

www.banglakitab.weebly.com

দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাকিছু রয়েছে তা সবই অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর যিকির এবং ইলমেদীনের শিক্ষক, ছাত্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত।

আর ইলমেদীন চর্চাও যিকরুল্লাহ এবং এতে ছাত্র শিক্ষক সকলে শামিল আছে। [তিজারতে আখেরাত-৬৯]

মাদরাসায় সহযোগিতা করা সাদকায়ে জারিয়া

মাদরাসার সহযোগিতায় সাধ্যমত শরিক থাকাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা চাই। কমবেশির তুলনা না করে যা দিবে তাই সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। আর সাদকায়ে জারিয়ার লাভ তখন ভোগ করা যাবে যখন মানুষ মারা যাবে এবং সওয়াবের খুব বেশি প্রয়োজনীয়তা বোধ করে চিন্তা করবে যে, হায়! কেউ যদি একবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করে হলেও আমার জন্য পাঠাত! বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরামও সেখানে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করবেন। সাদাকায়ে জারিয়া সেদিন কাজে আসবে।

কিয়ামতের দিন যখন বান্দার আমলনামা পেশ করা হবে এবং সে ভাববে যে, আমার কাছে তো যথেষ্ট পরিমাণ নেকী নেই তখন পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে তার নজরে ভাসবে কোথাও বুখারী শরীফের সওয়াব লেখা আছে, কোথাও কুরআন শরীফ পড়ার সওয়াব লেখা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি আজ থেকে হাজার বছর পরে কেয়ামত আসে ততদিন পর্যন্ত যতবার বুখারী শরীফ খতম করা হবে, যতবার মুসলিম শরীফ পড়ানো হবে মাদরাসায় দানকারীর আমলনামায় তার সওয়াব লেখা হবে। কিয়ামতের কঠিন মুসীবত ও পেরেশানীর দিন ইনশাআল্লাহ বলা হবে যে, তোমরা মাদরাসার ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজে যে সহযোগিতা করেছিল তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এ পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হল। সেদিন জানা যাবে যে, এক টাকা দান করার কী ফায়দা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত যে, তিনি এত বড় মূল্যবান সম্পদ অনয়াসে প্রদান করছেন। [তিজারাতে আখেরাত-৭১]

মাদরাসার সাহায্য করা জগণের দায়িত্ব

আপনাদের চিন্তা করতে হবে যে, মাদরাসার সেবা করা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব। কেননা, মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক আলেম-উলামা সদা আপনাদের কাজেই নিয়োজিত। কেননা, দীনের হেফাযত সকল মুসলমানের উপর ফরয। তাহলে এটি সকল মুসলমানের কাজ। যারা ইলমেদীনের শিক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন তারা সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে ফরযে কিফায়া আদায় করছেন।

www.banglakitab.weebly.com

যদি তারা ইলম চর্চা ছেড়ে দেন তাহলে এ কাজ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয হয়ে যাবে। যদি কেউ সে কাজ আঞ্জাম না দেয়, সকলে গুনাহগার হবে। সুতরাং মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকের কৃতজ্ঞতা আদায় করা প্রত্যেক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। কেননা, তারা ফরযে কিফায় আদায় করে সকলকে দায়মুক্ত করেছে।

সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, যারা ইলমেদীনের চর্চা করছে তারা আপনাদের কাজেই নিয়োজিত।

আর অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা হল, ইলমেদীন অর্জনের সাথে জীবিকা অর্জন চলে না। কেউ একই সাথে উভয়টি করতে চাইলে সে পরিপূর্ণ ইলম অর্জনে ব্যর্থ হবে। যে কাজের জন্য পূর্ণ মনোযোগের প্রয়োজন তার সাথে অন্য কিছু করা সম্ভব নয়।

একটি উপমা লক্ষ্য করুন। শরীয়তের নিয়ম হল যে ব্যক্তি কারো কাজে লিপ্ত থাকে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তার উপর ওয়াজিব, যার কাজে সে লিপ্ত। তাই তো বিচারকের বেতনের ব্যবস্থা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। কেননা, তিনি তাদের কাজেই নিয়োজিত। বাইতুলমাল থেকে পাওয়া মানে সকল মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া। এ নিয়মের ভিত্তিতে আলেম-উলামাদের বেতন-ভাতার যিম্মাদার হল সকল মুসলমান। তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে আলেমদের খেদমত করা উচিত। যদি আমরা খেদমত না করি তাহলে বোঝা যাবে আমাদের নিকট ইলমেদীনের কোন গুরুত্ব নেই। [আত্ তাবলীগ-১২/২৩৮}

যতদিন পর্যন্ত বাইতুলমালের ব্যবস্থা ছিল ততদিন পর্যন্ত বাইতুলমাল থেকে ভাতা মিলেছে এবং এটা সাধারণ মুসলিম জগণের পক্ষ থেকে পাওয়া ছিল। তাই তো ফুকাহায়ে কিরাম কাজী, আলেম-উলামা, মুফতী এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের বেতন-ভাতা বাইতুলমাল থেকে দেওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

আর যখন থেকে বাইতুলমাল থেকে পাওয়ার ধারা বন্ধ হয়ে গেছে, তখন থেকে তার ব্যবস্থা এভাবে হতে পারে যে, মুসলমানগণ একমত হয়ে অল্প অল্প করে সকলেই সহযোগিতা করবে। সেটা মাদরাসার আকৃতিতেও হতে পারে। যেখানে বেতন নির্ধারিত থাকে। আবার তাওয়াক্কুলের সুরতেও হতে পারে। যেখানে বেতন নির্ধারিত থাকে না। সুতরাং আলেম-উলামা ও মাদরাসার

www.banglakitab.weebly.com

খেদমত করা যেহেতু মুসলিম সাধারণ জগণের উপর আবশ্যক তাই তারা এতে গাফলতি করলে কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। [এসলাহে ইনকিলাব, নতুন সংস্করণ-২/১৯২]

মাদরাসার সহযোগিতা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সহযোগিতার কতিপয় পদ্ধতি

মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ ফরযে কিফায়া আদায় করছে। সাধারণ মুসলিম জগণের পক্ষ থেকে তারা ইসলামের হিফাযতের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সুতরাং হে মুসলমান জনগণ! যে কাজ তোমাদের জন্য করা হচ্ছে তার ব্যয়ভার বহনে তোমরাও শরিক হয়ে যাও। (এর বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে) :

১. যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সামর্থ্য-সচ্ছলতা দিয়েছেন তারা মাদরাসার একজন বা দু'জন ছাত্রের খাবারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। অথবা দু'জনে মিলে একজন ছাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করবেন কিংবা সাতজনে মিলে পুরো সপ্তাহ পর্যায়ক্রমে খাওয়াবেন। মোটকথা, মহল্লাবাসী পরামর্শ করে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/১৫৮]

২. সহজ পদ্ধতি এই যে, দৈনিক রান্না করার জন্য যে চাউল বা আটা গ্রহণ করা হয় তা থেকে এক পট ভিন্নপাত্রে রেখে দিবে।

৩. এমনিভাবে টাকা-পয়সা খরচ করার সময় মাদরাসার জন্য দু'য়েক টাকা রেখে দাও। এ কাজে মহল্লার প্রত্যেককে শরিক করো।

৪. যে সকল ছাত্র দূর-দূরান্ত থেকে এসে পড়ালেখা করছে তাদের খাবার এবং জামা কাপড়ের ব্যবস্থা নিজের সন্তানের মতো কর।

যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা দু'য়েকজন ছাত্রের খাবার পৌঁছে দিতে পারো। তবে ছাত্রদেরকে কখনো বাড়ীতে এসে খেয়ে যেতে বলবে না। এতে তাদেরকে খাটো করা হবে; বরং তোমরা নিজেরা কিংবা কর্মচারীর মাধ্যমে মাদরাসায় খাবার পৌঁছে দিবে।

৫. শীত কিংবা গরমে নিজের সন্তানের জন্য কাপড় কিনলে, পোশাক সেলাই করলে দু'য়েক জোড়া কাপড় ছাত্রদের জন্যও সেলাই কর। পূর্বের যুগে রাজা-বাদশারা ছাত্র ও আলেমদের খেদমত করতেন। ফলে ছাত্রদের মাঝে লোভ-লালসা সৃষ্টি হত না। কেননা, না চাইতেই সম্মানের সাথে সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যেত। [আত্ তাবলীগ-২১/২২৭]

www.banglakitab.weebly.com

তালিবে ইলমদের সাহায্য করার ফযীলত

তালিবে ইলমদের খাবার খাওয়ানো এবং অন্যান্য সাহায্য করা অধিক সওয়াবের কাজ। বাহ্যিকভাবে তা ইবাদত না হলেও গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝে আসবে তাতে কী পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। যেমন আপনি একজন ছাত্রকে খাবার খাওয়ালেন। এ খাবার খেয়ে যে শক্তি হল তা দিয়ে সে কিতাবের পড়া মুখস্থ করল। এভাবে সাত আট বছর পর্যন্ত খাওয়ালেন। এক পর্যায়ে সে পড়ালেখা শেষ করে আলেম হল এবং দীনের খেদমত শুরু করল। চিন্তা করুন, এই খেদমত আপনার সেই খাবার ও সাহায্যের উসীলায় সম্ভব হয়েছে, যা আট বছর পর্যন্ত সে প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তার দীনের খেদমতের সওয়াব প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির আমলনামায় যেতে থাকবে যারা তাকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সাধারণ জনগণ এ বিষয়টি অনুধাবন করে না। তারা আল্লাহর পথে কখনো অর্থ-সম্পদ দান করতে চাইলে মসজিদে নিয়ে যায়, ছাত্রদের প্রতি খেয়াল রাখে না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/৫৩]

মাদরাসায় কিতাব দান করা চাই

অনেকেই মসজিদ বা মাদরাসায় কুরআন শরীফ ওয়াকফ করাকে অনেক সওয়াবের কাজ মনে করে। ফিকাহ্-তাফসীরের কিতাব ওয়াকফ করাকে সওয়াবের কাজ মনে করে না। যদিও বহু কুরআন এভাবে পড়ে থাকে যে, কেউ কখনো পড়ে না। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক আমল তার লক্ষ-উদ্দেশ্য অনুযায়ী উত্তম হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক আমলের লক্ষ-উদ্দেশ্য দেখা উচিত। সাধারণ জনগণ বিষয়টি বোঝে না। [প্রাগুক্ত-৯/৫৬]

মাদরাসায় সর্বধরনের সাহায্য করুন এবং আলেমদের কাতারে শামিল হোন

ইলম হয়তো নিজে শিখো এবং অন্যকে শেখাও। কিংবা তাতে সাহায্য কর। তাহলে আলেমদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে। اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ ভালো কাজের পথপ্রদর্শনকারীও সে কর্ম পালনকারীর সমতুল্য। একটু পথ দেখিয়ে দেওয়ার এই ফযীলত। যদি পরিপূর্ণ সাহায্য করা হয় তাহলে তাতে ফযীলত কী পরিমাণ বাড়বে। টাকা দিয়েও সাহায্য করুন। কেননা, বহু কাজ এমন রয়েছে যা টাকা ছাড়া সম্ভব নয়। যদি কারো কাছে টাকা না থেকে তাহলে কায়িক শ্রম প্রদান করুন। তাও না পারলে দোয়া করুন যে, হে আল্লাহ! মাদরাসায় সাহায্যকারীদের সহযোগিতা করুন। দোয়া তো সকলেই করতে

পারে। এতে কেউ অক্ষম নয়। মোটকথা, সার্বিক সাহায্য করা উচিত। তবে পরস্পরে মতবিরোধ করা থেকে বিরত থাকবেন। সকলে মিলেমিশে এখলাসের সাথে কাজ করবেন। কারণ, এটা কুরআন শরীফের খেদমত। [প্রাগুক্ত-৩/৭০]

মাদরাসার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলে তা সংশোধন করার পদ্ধতি

আজ তো অনেকে মাদরাসায় দু'চার পয়সা চাঁদা দিয়ে ভাবতে থাকে আমরা মাদরাসার মালিক বনে গিয়েছি। যারা এ চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে চায় মাঝে মধ্যে তাদেরও সংশয় হয়ে যায়। তারা দোষ-ত্রুটি অন্বেষণকে নসিহত মনে করে এবং তারপর নসীহতের আকৃতিতে দোষ বর্ণনা শুরু করে। এ কাজ থেকে বেঁচে থাকার পন্থা বলে দিচ্ছি। আপনার দৃষ্টিতে যে বিষয়টি আপত্তিকর মনে হয় সেটি প্রকাশ্যে না বলে মুহতামিম বা কোন শিক্ষকের কাছে নিরিবিলি আলোচনা করুন। তারপর এ অপেক্ষায় বসে থাকবেন না যে, আপনার বলার মতই সব হয়ে যাবে। এভাবে আপনি নসিহতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং দোষ অন্বেষণ করা থেকে বেঁচে যাবেন। সারকথা হল, মতামত ব্যক্ত করুন তবে ব্যবস্থাপনায় দখল দিবেন না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৬০]

দান-খয়রাত করে মাদরাসার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দখল দিবে না

বর্তমানে এটিও একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে যে, অধিকাংশ চাঁদা দানকারীরই মানসিকতা হল, মাদরাসা পরিচালনায় আমার মতামত কেন গ্রহণ করা হয় না। এখানে আমি সকলের মতামত গ্রহণ না করার নিগূঢ় রহস্যের প্রতি আলোকপাত করতে চাই। লক্ষ্য করে শুনুন! কোন কাজের দু'টি দিক থাকে। ১. উপায়-উপকরণ, ২. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটি তো مقصود بالذات বা সরাসরি উদ্দেশ্য আর উপকরণগুলো উদ্দেশ্যের মাধ্যম হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে সেগুলোও উদ্দেশ্য। যেমন ক্লাশ হওয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষ ও চেয়ার-টেবিল হল উপরকণ কিন্তু ক্লাশ হল আসল উদ্দেশ্য।

এখন আমি একটি উপমার আলোকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কাঠমিস্ত্রীর কয়টি ও কি কি যন্ত্র রয়েছে তা সে ভালো জানবে, না অন্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তি ভালো জানবে? উত্তর এটাই হবে যে, কাঠমিস্ত্রীই ভালো জানবে। এখন আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে, কাঠমিস্ত্রীর যন্ত্রগুলো নির্বাচন করার জন্য মিস্ত্রীর প্রয়োজন হল, এতে অন্যান্য বড় বড় শিক্ষিত ও বিদ্বানগণ কাজে এলো না। তবে কি না ইলমেদীন নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আলেমদের প্রয়োজন হয় না! সমাজে যে কাউকে মতামত দেওয়ার উপযুক্ত মনে করা হয়। তাই বলি, আলেমদেরকে

www.banglakitab.weebly.com

তাদের কাজে স্বাধীনতা দিন। তারাই ইলমেদীনের বিষয়ে ভালো বোঝেন, তারাই সব ব্যবস্থাপনা ঠিক করে নিবেন। কেবল চাঁদা দেওয়ার ভিত্তিতেই মাদরাসার পরিচালনায় প্রত্যেকের মতামত এবং পরামর্শ গ্রহণ করার এতটুকু প্রয়োজন নেই। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৫৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

ওহে আলেম সমাজ! তামরা নিজেদের কাজ আরম্ভ করে দাও। ছেলেদের নিয়ে বসে যাও এবং পাঠদান শুরু করে দাও। কেউ আরজ করলেন, হযরত! ঘরদরজাহীন অনাবাদী ভূমিতেই পড়ানো শুরু করব? বললেন, হাঁ, অনাবাদী জায়গাতেই ছেলেদেরকে আলিফ, বা, তা পড়ানোর মাধ্যমেই মাদরাসার শুভ সূচনা করে দাও। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, এটুকুই আমাদের সাধ্যের গণ্ডিতে ছিল। আমাদের সামর্থ্যে যতটুকু কুলিয়েছে তা আমরা সম্পন্ন করেছি। বাকিটুকুর মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি ইচ্ছা করলে তা পূরণ করে দিবেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সামর্থ্যের কাজটুকু সম্পন্ন কর। আল্লাহ তাআলা ভবন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিবেন এবং মাদরাসার উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবেন। [আল কাওলুল জামীল]

মাদরাসা সূচনা করার সহজ পদ্ধতি

এ পর্যায়ে আপনাকে একটি সহজ নিয়ম বলে দিচ্ছি। কোন কাজ শুরু করতে হলে যতটুকু আপনার সাধ্যে রয়েছে সে অনুপাতে কাজ শুরু করে দিন। আপনারা প্রথম দিনই কাজকে বড় করে ফেলেন। যার জন্য নিঃসন্দেহে অধিক গুরুত্ব ও মেহনতের প্রয়োজন পড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন অপ্রিয় কিছু চেষ্টা-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে হয়। তাই কোন কাজকে ছোট আকারে শুরু করুন। যদি কোনভাবে একবার আরম্ভ হয়ে যায় এবং লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলে এমনিতেই তারা সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবেন ইসলামের কাজ এভাবেই ক্রমোন্নতি লাভ করেছে।

যদি ইসলামের কাজ প্রচলিত নিয়মের আলোকে সূচনা লাভ করত তাহলে প্রথমে অন্তত একটি দল বা পরিষদ গঠন করতে হত। অথচ সেখানে এককভাবে

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৎপরতা ও ভূমিকাই লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ তাআলা ইসলামের ক্রমোন্নতির বিবরণ দিয়ে বলেন,

كَزَرۡعٍ اَخۡرَجَ شَطۡـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسۡتَغۡلَظَ فَاسۡتَوٰی عَلٰی سُوۡقِهٖ

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাচ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। [সূরা ফাত্হ : ৩৮]

সুতরাং বোঝা গেল, ইসলামের উন্নতি সদা এ ধারাবাহিকতায়ই হয়েছে। [দাওয়াতে আবিদয়ত, ফাযায়েলে ইলম-৭/৬২]

যদি আল্লাহর কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকেন তাহলে ...

যদি আল্লাহ তাআলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চান তাহলে সেভাবে করুন যেভাবে তিনি করতে বলেছেন। কারো উপর বোঝা হবেন না কিংবা কোন কূটকৌশল ও হীলা-বাহানার আশ্রয় নিবেন না। সহজ ভাষা ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রয়োজনের কথা তুলে ধরুন।

সত্যিই যদি সে কাজ আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে তাহলে কোন মসজিদ কিংবা মাদরাসা বন্ধ হবে না। আর যদি কাজ আল্লাহর জন্য না হয়; বরং নিছক নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় হয়ে থাকে তাহলে তা পূর্ণ না হওয়াই ভালো। [আত তাবলীগ, কিসাউন নিসা-৭/৮৬]

আবেগে কাজ করবে না

মনে রেখো, আবেগে কাজ হয় না। কাজ হয় সজাগ সতর্ক বুদ্ধি-বিবেচনায়। সুতরাং জোশ, আবেগ এবং হাঙ্গামার এতটুকু প্রয়োজন নেই। বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা কাজ করা দরকার। আর কাজের নিয়ম সেটাই। অর্থাৎ যার দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকু কাজ করা। আল্লাহর নামে নিজ সাধ্যানুযায়ী কাজ শুরু করা। কোন সংগঠন বা কমিটির প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই সভাপতি ও সেক্রেটারীর। দু'চারজন বা ততোধিক যে কয়জন একত্রিত হওয়া সম্ভব তারা মিলে কাজ শুরু করে দিবে। কেউ একমত না হলে একাই কাজ আরম্ভ করে দেয়া এবং কোন বিজ্ঞ আলেমের সাথে পরামর্শ করে সামনে অগ্রসর হওয়া। [আত তাবলীগ, তাওয়াছী বিল হক-১৬/৯৩]

www.banglakitab.weebly.com

ব্যর্থতার কতিপয় কারণ

বর্তমানে কমিটির নীতিমালা এবং পদাধিকারীদের তালিকায় রেজিস্টার কালো হয়ে যায় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। ফর্মালিটির পিছনে না পড়ে যার দ্বারা যে পরিমাণ কাজ হওয়া সম্ভব তা করতে থাকা। সামর্থ্যের বাইরে বড় কাজের চিন্তা করবে না। ছোট আকারেই কাজ শুরু করে দাও। আমাদের অবস্থা তো এই যে, কাজ করলে মহা সমারোহে করে থাকি অন্যথায় কিছুই করি না।

বর্তমান কালের একটি বড় সমস্যা হল, কোন কাজ শুরু করার পূর্বেই চিন্তা করা হয় এটাকে পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে, বিজ্ঞাপন ছাপতে হবে। বলুন তো এটা কি রিয়া নয়? আর রিয়া বা লোক দেখানো কি শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়? এ নিষেধাজ্ঞা কাদের জন্য? এসব কি কাফেরদের জন্য? কিছুতেই নয়। মুসলমানদেরকেই রিয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এসব করার মাঝে প্রসিদ্ধি ও যশখ্যাতি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হল সম্মিলিত ও যৌথ কাজে সর্বদা বিশৃঙ্খলা ঘটে থাকে। যে কাজে যত বেশি অংশীদারিত্ব হবে ততই ঝগড়া হবে। আর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা হল, সম্মিলিতভাবে করার পরিণতিতে যে কাজে যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তা অতি শীঘ্র নিঃশেষ হয় যায়। আর ঐ কাজ দীর্ঘস্থায়ী হয় যা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় এবং ভারসাম্যতার সাথে পরিচালিত হয়।

যারা প্রথম থেকেই দীর্ঘ পরিকল্পনা করে পরিচালনা পরিষদ গঠন করে, নানা পদবী ও পদাধিকারীর তালিকা প্রণয়ন করে, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির আয়োজন করে তাদের দ্বারা কোন কাজ হয় না। দু'চারদিন পর সকল সিদ্ধান্ত চাপা পড়ে যায়। কিন্তু কি আর বলব! বর্তমানে রুচি বদলে গেছে। ঢাকঢোল পেটানো এবং আড়ম্বরতা ছাড়া কেউ যেন কাজ করতেই জানে না। [আত তাবলীগ-১৬/৯৬]

মাদরাসারসমূহের উন্নতি কোন পথে?

১. ক্ষুদ্র পরিকল্পনার ভিত্তিতেই কাজ শুরু করবে বড় চিন্তা করবে না। মনে রেখো, প্রতিটি কাজের সূচনা সাধারণ ও দুর্বল হয়ে থাকে। ক্রমান্বয়ে তাতে উন্নতি সাধিত হয়। আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে তাঁর কাজসমূহের প্রকাশও ক্রমান্বয়ে ও ধাপে ধাপে করেছেন। মানব সৃষ্টির বিষয়টি লক্ষ্য করুন। প্রথমে বীর্য স্থিতি লাভ করে। তারপর নয় মাস পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর ধীরে ধীরে বড় হয়ে ১৫ বছরে ছেলে সাবালক হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু করতে সক্ষম। একমাত্র আমাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই

www.banglakitab.weebly.com

তিনি এ ক্রমান্বয়ে কাজ করার আদর্শ প্রকাশ করেছেন। যেন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা কাজের সূচনাতেই উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করো না; বরং ক্ষুদ্রাকারেই কাজ শুরু করে দাও। ক্রমান্বয়ে উন্নতি ও অগ্রগতির দেখা পাবে। কমিটি গঠন এবং সভাপতি-সেক্রেটারী নির্ধারণে কিছু হয় না। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের দ্বারাও কিছু হয় না। উন্নতি ও উপকার কিছু হলে তা কাজের দ্বারাই হবে। নিয়মতান্ত্রিক কাজ অল্প হলেও কাংখিত ফল আশা করা যায়। [আত তাবলীগ-১৬/৮৭]

২. মনে রেখো, যে কোন কাজে উন্নতির পূর্বশর্ত হল, শৃঙ্খলা। সম্মিলিত ও যৌথ কাজের শৃঙ্খলা হল একতা ও ঐক্য। সকল কর্মী যখন কোন ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছেন তখনই উন্নতি হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সকল শৃঙ্খলা সীমাবদ্ধ থাকে বক্তৃতা ও লেখালেখির মাঝে। সিদ্ধান্তাবলী বেশ দীর্ঘ ও চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। কিন্তু কাজ শুরু করা হলে বিশৃঙ্খলার বিষাক্ত ছোবল অল্প দিনেই সব ঠাণ্ডা করে দেয়। [আত তাবলীগ-২২/৬১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুহতামিম ও শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রসঙ্গ

মাদরাসার মুহতামিম আলেম হওয়া আবশ্যক

মাদরাসার মুহতামিম বা পরিচালক আলেম হওয়া আবশ্যক। মূর্খের দ্বারা মাদরাসা পরিচালনা অসম্ভব। আমি যখন কানপুর ফয়জে আম মাদরাসায় শিক্ষক ছিলাম, তখন সেখানে এক জাহেল মুহতামিম ছিলেন। জনৈক ছাত্র শরহু মিআতি আমিল কিতাব পড়ার জন্য মাদরাসায় ভর্তি হলে আমি মুহতামিম সাহেবকে বললাম, এ ছাত্রের খানা জারি করে দিন। তিনি বললেন, সে কী কিতাব পড়ে? আমি বললাম, শরহু মিআতি আমিল পড়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি হাদীসের কিতাব? এবার আন্দায করুন, তিনি কোন পর্যায়ের মূর্খ ছিলেন। এমন লোক আলেম সমাজের নেতৃত্ব দিবে কিভাবে? [কালিমা- ৪৬ পৃ.]

মুহতামিমের কিছু গুণাগুণ

মাদরাসার মুহতামিম আমলওয়ালা আলেম হওয়া চাই। যিনি ইলমের আলোকে ভালো-মন্দ পরখ করতে পারবেন। কেননা, মুহতামিম অযোগ্য হলে ছাত্রদের দুঃসাহস বেড়ে যায়। আর যিনি আলেম হবেন তিনি সকল বিষয় বুঝবেন। ফলে

www.banglakitab.weebly.com

ছাত্রদের উপর তার প্রভাব পড়বে। মুহতামিম সাহেব আলেম না হলেও অন্তত আলেমদের সোহবত ও সংস্পর্শপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। যাতে আলেমদের সব কিছু বুঝতে পারেন। এমন লোককে কিছুতেই মুহতামিম পদে নিয়োগ দেয়া যাবে না যিনি আলেম নন কিংবা আলেমের সোহবত প্রাপ্তও নন। [আত তাবলীগ-২/৭৬]

যোগ্যতার ভিত্তিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতার বংশীয় কোন আলেম মুহতামিম হওয়ার অধিক উপযুক্ত

আমি যখন এ মর্মে অবগত হলাম যে, মাওলানা কারী তাইয়্যেব সাহেবকে [রহ.] দারুল উলূম দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিম নিযুক্ত করা হচ্ছে তখন আমি সে প্রস্তাবের সাথে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলাম যে, আমার মনে হচ্ছে যোগ্যতার ভিত্তিতে মাওলানা তাইয়্যেবই দারুল উলূমের মুহতামিম হওয়া উচিত। এর দু'টি কারণ রয়েছে।

১. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ইমাম হবে কুরাইশ বংশ হতে।

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ [রহ.] লিখেছেন, ইসলামের সাথে অন্যদের কেবল ধর্মীয় সম্পর্ক রয়েছে আর কুরাইশদের সেই সাথে বংশীয় সম্পর্কও রয়েছে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বংশের ছিলেন। মোটকথা, কুরাইশরা ইসলামের সাহায্য করবে দু'কারণে।

অনুরূপভাবে মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী [রহ.]-এর বংশীয় লোকদের মাদরাসার প্রতি দুই ধরনের সম্পর্ক থাকবে। [আল কাওলুল জামীল- ৭৪ পৃ.]

অযোগ্যদের কোন পদ না দেওয়া

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

যখন দেখবে যে, দীনি খেদমতের দায়িত্ব অযোগ্যদের প্রদান করা হচ্ছে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে।

বর্তমানে তাই হচ্ছে। অযোগ্যদের পদ দেওয়া হয় আর যোগ্য ব্যক্তিদেরকে দায়িত্ব থেকে দূরে রাখা হয়। কেননা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশভূষায় তারা অনুন্নত হওয়ার কারণে দুনিয়াদাররা মনে করে তাদের কারণে আমাদের পরিষদের মান যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

আজকাল তো পোশাকের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়। যার বেশভূষা যত উন্নত তাকেই সভাপতি এবং সেক্রেটারী পদে আসীন করা হয়। চাই আদতেই তার কাজের যোগ্যতা না থাকুক। বর্তমানে এমন অকর্মণ্য সভাপতি-সেক্রেটারীর অভাব নেই। তারা পরিষদের বাগডোর হাতে নিয়ে যাচ্ছেতাইভাবে কাজ করতে থাকে। এ ব্যাপারেই হাদীসে এসেছে,

طَالِبُ التَّوْلِيَةِ لَا يُوَلّٰى

পদপ্রার্থীকে পদ দেওয়া হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্বল এবং বিত্তহীনদেরকে প্রাধান্য দিতেন। আর আজ আমরা প্রভাবশালীদেরকে সামনে রেখে কাজ করি। অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচনের প্রথম দৃষ্টি দুর্বলদের প্রতি নিবদ্ধ হত। কারণ, দুর্বলদের মাঝে আধ্যাত্মিক শক্তি, সাহস, বরকত ও ইখলাস সবলদের অপেক্ষা বেশি থাকে। [মাজাহেরুল আমওয়াল- ৬৫৫ পৃ.)

যাদেরকে পদ এবং দায়িত্ব না দেওয়া উচিত

১. আমরা অতীব গর্বের সাথে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

যখন দেখবে, দীনি খেদমতের দায়িত্ব অযোগ্যদের প্রদান করা হচ্ছে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করো।

আর হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, যে পদপ্রার্থী হয় সেও পদের অযোগ্য। সুতরাং কোন পদের আকাঙ্খীকে পদ দেওয়া যাবে না। বলুন তো, পৃথিবীর কোন জাতি বা ইজমের কাছে অনুরূপ স্বচ্ছ নীতির উপমা পাওয়া যাবে কি?

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে এ শিক্ষা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান বা নেতৃবৃন্দ পদপ্রার্থীদেরকেই পদ বা দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। প্রতিটি পদের জন্য তাদের কাছে অজস্র আবেদন জমা হয়। তন্মধ্য হতে একজন পদ পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইসলামী শরীয়তের বিধান হচ্ছে, পদের আকাঙ্খীদেরকে কিছুতেই পদ দেওয়া যাবে না। কেননা, সে স্বার্থপর হবে এবং নিজের সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। [মাজাহেরুল আমওয়াল- ৫৭২ পৃ.]

www.banglakitab.weebly.com

২. হযরত উমর (রাদি.)-এর নীতি এ ছিল যে, নিজের স্বজনদেরকে কর্মচারী নিযুক্ত না করা। তাই তো তিনি তাঁর খেলাফত আমলে কোন আত্মীয়কে কোন পদে নিয়োগ দেননি। [হুসনুল আজীজ-৩/১৩৮]

পদ প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় লক্ষ্যণীয়

কাউকে কোন পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১. কাউকে কোন পদে আসীন করার পূর্বে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে যে, তার মধ্যে উক্ত পদের যোগ্যতা আছে কি-না। সে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম কি-না।

২. কোন পদের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি পদ প্রদানকারীর অনুগত ও বাধ্য হওয়া। যেমন বাদশা কাউকে ভাইসরায় করে প্রেরণ করলে দু'টি বিষয়ে লক্ষ্য করবে। এক. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তার সর্বোচ্চ দক্ষতা আছে কি-না। দুই. তার মধ্যে সরকারের পূর্ণ আনুগত্যের মানসিকতা আছে কি-না। তার মাঝে বিরোধিতা ও বিদ্রোহের সংশয়ও থাকতে পারবে না। কোন বাদশা এমন কাউকে দায়িত্ব প্রদান করেন না যার মাঝে সামান্যতম বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণের আশঙ্কা থাকে।

কেউ ভাইসরায়ের যোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি করলে কিংবা তার বিশ্বস্ততার উপর অনাস্থা আনলে তার দায়ভার প্রকৃতপক্ষে বাদশার উপরই বর্তাবে। কেননা, তিনি তাকে পদে নিয়োগ দিয়েছেন।

সুতরাং আপত্তির সারনির্যাস এই হবে যে, বাদশা একজন অযোগ্য কিংবা সরকারের বিদ্রোহীকে ভাইসরায় নিযুক্ত করেছেন। তাই ব্যক্তি নির্বাচনে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। [দীন ও দুনিয়া-৫৭১ পৃ.]

কারণবশতঃ কোন শিক্ষক কিংবা কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদান

কোন কর্মকর্তার সাথে তার অধীনস্থদের বনিবনা না হলে তাকে সরিয়ে দেওয়াই হল কল্যাণকর। তার কোন ভুল না থাকলেও এমনটি করা সুফল বয়ে আনবে। (অধীনস্থ বলতে শিক্ষক, কর্মচারী কিংবা ছাত্র সকলেই উদ্দেশ্য হতে পারে)। হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাদি.)-এর ঘটনা বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে। তা থেকে এক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘটনার সংক্ষিপ্ত মর্ম হল, হযরত উমর (রাদি.)-এর কাছে হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের অধীনস্থগণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। ঘটনা তদন্তের পর সে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হল। কিন্তু কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এবং পরস্পরের স্বভাবের মাঝে সামঞ্জস্য না হওয়ায় হযরত উমর (রাদি.) হযরত সাদ (রাদি)-কে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে দেন। [মালফুজাতে খিবরত-৩/৪৭]

www.banglakitab.weebly.com

মুহতামিম ও পরিচালকদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা

মুহতামিমগণ নিজেদের দায়িত্বকে আল্লাহর হক মনে করবেন। খুবই ইখলাসের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। ইখলাসের দু'টি দিক রয়েছে। একটি জাহেরী আরেকটি বাতেনী। বাতেনী ইখলাস হল নিজেকে 'আবদ' ও দাস এবং আল্লাহকে মাওলা ও মনিব মনে করে হুকুম তামিল করা। আর জাহেরী ইখলাস হল নিজেকে হাকেম ও শাসক না বলা; বরং খাদেম বলা। যেসকল উপাধিতে মাতাব্বরী এ বড়ত্বের গন্ধ রয়েছে তা ব্যবহার না করা। বর্তমানে একটি ব্যাধি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাহল ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজের জন্য বড় বড় পদ ও উপাধি আবিষ্কার করা হচ্ছে। ছোট একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের একজন সভাপতির পদ গ্রহণ করছে আরেকজন সেক্রেটারীর উপাধী ধারণ করছে।

[-দাওয়াতে আবদিয়্যত, হুকুকুল কুরআন,৩/৬২]

মাদরাসায় বাইরের শিক্ষক রাখা উচিত

জনৈক মৌলভী সাহেব এলাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে বেড়ায় যে, আমরা নানা জায়গায় চাকরি খুঁজে পেরেশান। অথচ আমাদের মহল্লার মাদরাসায় বাইরে থেকে শিক্ষক রাখা হয়, আমাদেরকে রাখা হয় না। এ ব্যাপারে আমার অভিমত হল, মহল্লার কাউকে শিক্ষক না রেখে বাইরের শিক্ষক রাখা অনেক ভালো। এলাকার শিক্ষক রাখার মাঝে অনেক সমস্যা রয়েছে। আমি একবার চিন্তা করলাম, স্থানীয় এবং বাইরের সকল ছাত্রকে মাদরাসা হতে ভাতা দেওয়া উচিত। উভয় ধরনের ছাত্রকেই ভাতা পাওয়ার যোগ্য মনে করে তা দেওয়াও শুরু হল। কিন্তু বাস্তবে অনেক সমস্যা ধরা পড়েছে। আইনের ভিত্তিতে কোন অপরাধের কারণে কোন ছাত্রের ভাতা বন্ধ করারও প্রয়োজন পড়ে। দূরের কোন ছাত্র হলে তা নীরবে মেনে নেয়। আর মহল্লার কোন ছাত্র হলে দশ পনেরজন সুপারিশকারী দাঁড়িয়ে যায়। ফলে মাদরাসার আইন বহাল রাখা ভারি মুশকিল হয়ে পড়ে। তখন আমার বুঝে এসেছে যে, বড়দের কথায় দখল দেওয়া ঠিক নয়। তাঁরা যে আইন-কানুন তৈরি করে গেছেন তা সবই যথার্থ। - [মালহুজাতে জাদীদ-৫৫]

আরেকবার বলেন, মহল্লার মানুষ থেকে ওয়াফাদারীর আশা খুবই কম থাকে। এজন্য শিক্ষক-কর্মচারী বাইরের হওয়া উচিত। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-২৮৭]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসায় যাদেরকে রাখা উচিত নয়

এমন লোকদেরকে মাদরাসায় শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী হিসিবে রাখা ঠিক না, যাদের দ্বারা অন্যদের ক্ষতি হয়। কেউ কেউ অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে শিক্ষক-কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করে থাকে। তাদের নজর থাকে কেবল তার কাজ ও যোগ্যতার প্রতি। আর আমার দৃষ্টি থাকে কাজের উৎসের প্রতি। অর্থাৎ কাজটি কি কারণে সংঘটিত হচ্ছে তার প্রতি চিন্তা করি। কেউ সেটিকে 'লাযিম' [অসংক্রামক] মনে করে আর আমি 'মুতাআদ্দী' [সংক্রামক] মনে করি। অন্যদের জন্য ক্ষতিকর এমন ব্যক্তিদেরকে মাদরাসায় রাখা উচিত নয়। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত, মালফুজাত-১৯/১৩৫]

ব্যবস্থাপনা বিষয় থেকে শিক্ষকগণ পৃথক থাকা উত্তম

আমি আমার বন্ধু-বান্ধবকে সর্বদা এই পরামর্শ প্রদান করি যে, যদি আল্লাহ্ তাআলা কাউকে কোন দীনি মাদরাসায় দরস-তাদরীস ও পাঠদানের সুযোগ প্রদান করেন তাহলে তারা যেন ইহতিমাম ও ব্যবস্থাপনার কাজকে নিজের জন্য গ্রহণ না করেন। কেননা, উভয়টির মাঝে বৈপরিত্যের সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষক এবং ইলমী খেদমতকারীদের জন্য এসব কাজে আত্মনিয়োগ করা অশোভনীয়। তারা স্থানীয় এবং জাতীয় রাজনীতি থেকেও পৃথক থাকবেন। - [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৮৫]

প্রাথমিক স্তরের কিতাবাদি পাঠদানকারীকে যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে

মীযানুস্ সরফ কিতাব পাঠদানকারীও বিজ্ঞ আলেম হতে হবে। প্রাথমিক স্তরের কিতাবাদী পড়ানোর জন্য সাধারণ শিক্ষককে যথেষ্ট মনে করা মস্তবড় ভুল। অনেকে বলে থাকে, মীযান কিতাবে আর কী আছে? তা যে কেউ পড়াতে সক্ষম। আমি বলি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উঁচু পর্যায়ের যোগ্যতা ও ব্যুৎপত্তি দরকার। - [কালিমাতুল হক-১৮০]

শিক্ষকতার ফযীলত

আমি নির্জনবাসের চেয়ে শিক্ষকতাকে উত্তম মনে করি। আমি মুরীদদের মাঝে আত্মশুদ্ধির যে কাজ করছি, তা যদি মাদরাসায় না হয়ে অন্য কোথাও হত তাহলে আমি কিতাব পড়ানোকেই প্রাধান্য দিতাম। সূফীদের দৃষ্টান্ত হল [সুলতান মাহমূদের প্রিয় গোলাম] আয়াজের মত। আর আলেমদের দৃষ্টান্ত হল হাসানের মত। আয়াজ সুলতানের অনেক প্রিয় হলেও ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কাজ হাসানের স্কন্ধেই অর্পিত থাকত। [আল কাউলুল জালীল-৭৯]

www.banglakitab.weebly.com

মুহতামিম এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতার শরয়ী হুকুম

জানা দরকার, সব ধরনের বেতন 'উজরত' ও পারিশ্রমিক নয়; বরং কিছু বেতন হল 'হাবসুল ওয়াক্ত' বা সময় ব্যয় করার ভাতা। স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং কাজি ও বিচারকের বেতন এ পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য উজরত এবং ভরণপোষণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নাফক্বাহ্' তথা ভরণপোষণের ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারিত হয় না; বরং তাতে প্রয়োজন অনুপাতে ভরণপোষণের অধিকারী হয়ে থাকে। প্রয়োজনের অধিক বস্তুর অধিকারী হয় না। তবে স্ত্রীর ভরণপোষণেও কখনো পরিমাণ নির্ধারণ করা জায়েয আছে। যাতে ঝগড়া-বিবাদ না হয় এবং উভয়ের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষিত থাকে। এভাবে নির্ধারিত হওয়ার দ্বারা সেটি ভরণপোষণই থাকবে বেতন হয়ে যাবে না। সুতরাং স্ত্রীর ভরণপোষণ বিচারক কর্তৃক নির্ধারণের পর ভরণপোষণই থেকে যায়। অনুরূপভাবে যদি শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও নির্ধারিত হয় তাহলে শুধু নির্ধারণের দ্বারা তা শিক্ষার উজরত ও পারিশ্রমিক হবে না; বরং তা সময় ব্যয় করার ও ভরণপোষণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এখন লক্ষ্যণীয় হল, কার বেতন পারিশ্রমিক এবং কার বেতন ভরণপোষণের পর্যায়ের। যদি কারো বেতন পারিশ্রমিক পর্যায়ের হয় তাহলে তাতে গুনাহ নেই। কেননা, পরবর্তী আলেমগণ এ ব্যাপারে জায়েযের ফতুয়া দিয়েছেন।

তবে এ অবস্থায় শিক্ষাদানের সওয়াবও পাওয়া যাবে না। কেননা, এতে শিক্ষকের উদ্দেশ্য কেবল বেতন হয়ে থাকে। এ অবস্থায় তালীম ও তাদরীস ইবাদত হবে না; বরং বড়জোর একটি মোবাহ ও বৈধ কাজ বলে বিবেচিত হবে, যার ব্যাপারে পরবর্তী আলেমগণ জায়েযের ফতুয়া দিয়েছেন।

মৌলিকভাবে তা'লীম ও শিক্ষাদান দীন এবং ইবাদত ছিল কিন্তু যেহেতু শিক্ষকের উদ্দেশ্য দীন শিক্ষা নয়; বরং পরিশ্রমিক তাই لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى এর আলোকে সে সওয়াবের অধিকারী হবে না। - [আততাবলীগ, কাউসারুল উলূম-১২/১০০, ১০৭]

কী পরিমাণ ছাত্র ভর্তি করা যাবে

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيدٌ অর্থাৎ লেখক এবং সাক্ষী কাউকেই কষ্ট দেয়া যাবে না।

এ থেকে বুঝে আসে যে, ছাত্ররা মুহতামিম ও শিক্ষকদের কাছে তাদের পড়ালেখা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের দাবি সে পরিমাণ করতে পারবে যা পূরণ

www.banglakitab.weebly.com

করতে কর্তৃপক্ষের কষ্ট না হয়। যত ছাত্র আসবে সকলেরই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে- এটা শিক্ষকদের দায়িত্ব নয়। তবে সুযোগ থাকলে অবশ্যই করবেন। - [ইসলাহে ইনকিলাব জাদীদ-১/২৯০]

হযরত থানবী [রহ.]-এর মাদরাসার নিয়ম

প্রত্যেকটি মাদরাসার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম কানুন রয়েছে। আমার মাদরাসায় দু'টি বিশেষ কানুন রয়েছে। একটি হল কোন যোগ্যতার শর্ত ব্যতিরেকেই মাদরাসার সামর্থ্য থাকলে ফ্রি খানা দেয়া হবে। না থাকলে দেয়া হবে না। কেননা, এটি তাওয়াক্কুলের কারখানা। দ্বিতীয় কানুন হল, আমরদ ও দাড়িবিহীন ছাত্ররা মাদরাসার বাইরে অবস্থান করবে। তাদের দ্বারা সংঘটিত বদ আখলাকীর দায়িত্ব কে নিবে? এটি তাদের অভিভাবকদের দায়িত্ব। সবকের বাইরের সময়ে দাড়িবিহীন ছাত্রদের মাদরাসায় অবস্থান নিষিদ্ধ। - [কালিমাতুল হক-১৮০]

ইলমে দীনের জন্য ছাত্র নির্বাচন করা

সকলের জন্য ইলম উপকারী নয়। কারো জন্য ক্ষতিকরও হয়। তাই আল্লাহওয়ালাগণ এ ব্যাপারে খেয়াল রাখেন। যার জন্য ইলম ক্ষতিকর মনে করেন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত রেখে শুধু মৌখিকভাবে ফরযে আইন পরিমাণ প্রয়োজনীয় ইলম শিখিয়ে দেন। - [আত তাবলীগ, আহকামুল মাল-১৫/২৫]

সালফে সালেহীন ও পূর্ববর্তী মনীষীগণ বাছাই করে পড়াতেন। যোগ্য অযোগ্য নির্বিচারে পড়াতেন না। যাদের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন যে, এরা জাতির মুকতাদা ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে কেবল তাদেরকেই ইলমেদীনের গভীর জ্ঞান দান করতেন। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অপাত্রে ইলম প্রদানকারী শিক্ষকদেরও জবাবদিহি করতে হবে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত, তরীকুন নাজাহ্-১২/৪৩]

ছাত্র নির্বাচনের মাপকাঠি

সালফে সালেহীনের কাছে নির্বাচনের মাপকাঠি বংশ ছিল না; বরং তারা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করতেন। যার মধ্যে উত্তম গুণাবলী ও যোগ্যতা অবলোকন করতেন তাদেরকেই দীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান দিতেন। আর যাদের মধ্যে মন্দস্বভাব [লোভ, বদকারী ইত্যাদি] প্রত্যক্ষ করতেন তাদেরকে প্রয়োজন পরিমাণ ইলম শিখিয়ে অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দিতেন। যদিও

www.banglakitab.weebly.com

প্রথমজন অতি সাধারণ বংশের হয় এবং দ্বিতীয়জন অনেক উঁচু বংশের হয়। তাঁরা বংশ দেখতেন না; বরং আখলাক-চরিত্র দেখতেন। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-২/৪৩]

নির্বাচনের দ্বিতীয় মাপকাঠি

পূর্ববর্তী যুগে সকলকে আলেম হওয়ার অনুমতি ছিল না। এ নীতির মাঝে বড় কল্যাণ নিহিত ছিল। তবে এতটুকু ক্রটি ছিল যে, নির্বাচন ভুল ছিল। সে নীতিতে বিশেষ বিশেষ বংশকে নির্বাচন করা ছিল। নির্দিষ্ট বংশের লোকই আলেম হতে পারত। বস্তুত, নির্বাচনের মাপকাঠি এই হওয়া উচিত যে, শিক্ষকগণ ছাত্রদের আখলাক-চরিত্র যাচাই করবেন। লক্ষ্য করবেন, কার মধ্যে দুনিয়ার লোভ ও মোহ বিরাজমান আর কার মধ্যে নেই। যার মধ্যে দুনিয়ার মোহ প্রবল হবে তাকে বিদায় করে দিবেন এবং যার মধ্যে দুনিয়ার মোহ না থাকবে তাকে দীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করবেন। -[দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/১৮]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাদরাসার গঠনতন্ত্র

মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতার প্রকৃত মর্ম

একবার দেওবন্দ থেকে একজন আমার কাছে এমর্মে পত্র লিখল যে, আমার অমুক সমস্যাটির সমাধান করে দিন। কেননা, আপনি মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক। দায়িত্ব পালন না করলে আপনাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আমি তার পত্রের জবাবে লিখে দিলাম, আমি পৃষ্ঠপোষক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমি সেখানকার প্রশাসক; বরং আমি পরামর্শদাতা। আমার কাছে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা বা পরামর্শ চাইলে যা ভালো মনে হবে বলে দিব। এছাড়া আর কী? পৃষ্ঠপোষকতার এ ব্যাখ্যা আমি একবার মাওলানা গাঙ্গুহী [রহ.]-এর সামনেও পেশ করেছিলাম যে, পৃষ্ঠপোষক মানে পরামর্শদাতা; বিচারক বা প্রশাসক নয়। সাহাপানপুর মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। তৃতীয়পক্ষ আমাকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়েছিল। মাওলানা গাঙ্গুহী [রহ.] আমাকে পত্র লিখে বললেন, তুমি সে দায়িত্বটি গ্রহণ করো। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে দিলাম যে, যদি পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ এই হয় যে, আমার কাছে কোন ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া হলে পরামর্শ দিবো, তাহলে ভালো কথা। এতে আমি সম্মত আছি। আর যদি পৃষ্ঠপোষক মানে প্রশাসক হয় অর্থাৎ সবকিছু তদারকি করে আমাকে বলতে হয়

www.banglakitab.weebly.com

যে, এটা করো, ওটা করো না, তাহলে এমন পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করতে আমি সম্মত নই। - [মালহূজাত-১০৩]

এক সময় কেউ কেউ আমার কাছে এমর্মে পত্র লিখত যে, আপনি দেওবন্দ মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক। আপনি এটা করেন না, ওটা করেন না। একবার আমার কাছে কিছু আপত্তিকারী আগমন করলে আমি তাদেরকে আমার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বাবলী প্রদর্শন করলাম। তারা বলল, এ দায়িত্বসমূহ দেখে তো কারো আপত্তি করার জো নেই।

সারকথা, পৃষ্ঠপোষক মানে উপদেষ্টা ও পরামর্শ দানকারী; প্রশাসক ও বিচারক নয়। অর্থাৎ আমাকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিবো। এমনকি পরামর্শ দেয়ার পর তদনুযায়ী কাজ না করলেও জিজ্ঞাসা করব না যে, আমার পরামর্শ অনুযায়ী কেন করা হল না। তবে পরামর্শ মোতাবেক কাজ হওয়ার আশা অবশ্যই করব। আমার কাছ থেকে তো অন্যান্য মাদরাসার মুহতামিমগণও পরামর্শ নিয়ে থাকেন। তবে দেওবন্দের বিষয়টি একটু ভিন্ন। অন্যরা পরামর্শ চাইলেই কেবল প্রদান করে থাকি। আর দেওবন্দের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করা ছাড়াও যদি মাথায় কোন বিষয় আসে তাহলে বলতে দ্বিধা করি না। চাই তদনুযায়ী কাজ হোক বা না হোক। [মালহূজাতে জাদীদ-১০৭]

শূরা গঠনের পূর্বের জরুরি কাজ

আমি তো সকল মাদরাসার কর্তৃপক্ষকে বলে থাকি, শিক্ষক-ছাত্র কর্মচারী সংক্রান্ত যত সমস্যা সামনে আসে মুফতী সাহেবদের কাছ থেকে জেনে সেসবের বিধিবিধান একত্রিত করুন। সেটিই হবে মাদরাসার কানুন। এতে সবচেয়ে বড় কল্যাণকর দিক হল শরীয়তের অনুসরণ। বিষয়টি ব্যবস্থাপক ও পরিচালকদের জন্যও সহজ। কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে কিছু করতে হলে শরীয়তের কানুন দেখিয়ে নিজেদের ওজর পেশ করবে। অন্যদের জন্যও এটি হুজ্জত ও প্রমাণ হবে। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৮১]

মাদরাসার গঠনতন্ত্র নির্ধারিত না হলে করণীয়

মাদরাসার নিয়মাবলী লিখিত ও সংকলিত থাকলে তা مشروط বা শর্তযুক্ত বিষয়ের মত। আর যদি সংকলিত ও প্রস্তুতকৃত না থাকে তাহলে অন্যান্য মাদাসার গঠনতন্ত্রের অনুসরণ করা হবে। [আনফাসে ঈসা-৪৫৯]

www.banglakitab.weebly.com

হাকীমুল উম্মত থানবী [রহ.] কর্তৃক সংকলিত কওমী মাদরাসার মৌলিক নিয়মাবলী [গঠনতন্ত্র]

১. মৌলিক গঠনতন্ত্রের গুরুত্ব

এগুলো মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকানুন। এগুলোকে ভিত্তি বানিয়ে অন্যান্য সার্বিক ও আংশিক বিষয়ের নীতিমালা তৈরি করা যেতে পারে। এ নীতিমালা মেনে চললে মাদরাসাগুলো নানা ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা থেকে সংরক্ষিত থাকবে। স্থায়িত্ব ও টিকে থাকা তো আল্লাহর কুদরত ও ইলমের অধীনে রয়েছে। - [বায়াজে আশরাফী-৮৬]

বিধানটি সকল সদস্যের ঐকমত্যে গৃহীত হয়েছে।

২. গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদসমূহের গুরুত্ব

এ গঠনতন্ত্রের মধ্যে যেসব বিষয় শরীয়তের দৃষ্টিতে অবশ্যপালনীয় সেগুলোতে কখনো কোন পরিবর্তন করা যাবে না। আর যেসব বিষয়ের অন্য কোন বৈধ দিক রয়েছে তাতে পরিবর্তন করা যাবে। তবে পরিবর্তন করতে হলে সব সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে করতে হবে। একজন সদস্যের ভিন্নমত থাকাবস্থায়ও পরিবর্তন বৈধ হবে না। - [বায়াজে আশরাফী-৮৫]

৩. সদস্যদের নিয়োগ ও বিয়োগের বিধান

কোনো সদস্যের হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি গৃহীত শর্তাবলীর অধীনে একমাত্র সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতেই হতে পারবে। এতে অন্য কারোর হস্তক্ষেপ থাকবে না।

৪. মুহতামিম নিয়োগ ও বরখাস্তের বিধান

অনুরূপভাবে মুহতামিম নিয়োগ করা ও বরখাস্ত করাও গৃহীত নীতিমালার আলোকে একমাত্র সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মত মতেই হবে। এতেও কারো হস্তক্ষেপ থাকবে না।

৫. সহকারী মুহতামিম ও কর্মচারী নিয়োগের বিধান

সহকারী মুহতামিমসহ অন্যান্য সাধারণ শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগের ক্ষেত্রে সদস্যমণ্ডলীর মতামতের পাশাপাশি মুহতামিমেরও সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে।

৬. ছাত্রদের ভর্তি ও বহিষ্কারের বিধান

ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে মুহতামিম সাহেবের পূর্ণ কর্তৃত্ব সংরক্ষিত থাকবে। আর বহিষ্কার করার অধিকার মুহতামিমের পাশাপাশি মজলিসে আমেলারও থাকবে। অর্থাৎ মুহতামিম সাহেব বহিষ্কার করতে চাইলে মজিলসে আমেলার সম্মতি লাগবে। আর যদি মজলিসে আমেলা বহিষ্কার করতে চায় তাহলে মুহতামিমেরও সম্মতি লাগবে।

৭.শিক্ষকবৃন্দের অব্যাহতি প্রদান

মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মচারীদের অব্যাহিত প্রদান ও বরখাস্তকরণের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য থাকবে। সারকথা হল, কর্মচারীদের নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের [মুহতামিম ও কমিটি] সম্মতি প্রয়োজন। আর ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে শুধু মুহতামিম সাহেবের একক সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। আর কর্মচারী ও ছাত্রদের অব্যাহতি ও বহিষ্কারের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ থেকে যে কোন এক পক্ষের মতামত যথেষ্ট হবে। - [বায়াজে আশরাফী]

জরুরি জ্ঞাতব্য

উপরে বর্ণিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধারার ক্ষমতা ঐ মুহতামিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যিনি ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। যদি এমন গুণসম্পন্ন মুহতামিম পাওয়া না যায় তাহলে উক্ত দু'টি ধারার ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ পুনর্বিবেচনা করে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখবেন।

৮.মাদরাসার হিসাব-নিকাশ দেখা এবং মুহতামিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার যাদের রয়েছে

মুহতামিমকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার একমাত্র সদস্যবৃন্দের রয়েছে। যে কোন একজন সদস্যেরও এ অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর যদি মুহতামিম সাহেব ঠিক হয়ে যান তাহলে তো ভালো। আর যদি তিনি নিজের আপত্তিকর কাজেই নিরত থাকেন, তাহলে উক্ত সদস্য অন্যান্য সদস্যদেরকে অবগত করতে পারবেন। সকল সদস্য একমত হলে মুহতামিমের জন্য নিজের অবস্থান পরিবতন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি সদস্যদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে নিয়ম মোতাবেক যে পক্ষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে তাদের কথা মানা মুহতামিমের জন্য অপরিহার্য হবে।

www.banglakitab.weebly.com

৯. কমিটির সদস্য বহির্ভূত লোকদের অধিকার

কমিটির সদস্য বহির্ভূত সাধারণ জনগণের পক্ষে মাদরাসা সংক্রান্ত এমন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়ার অধিকার থাকবে যে বিষয়ে মুহতামিমের উপর কোন আপত্তি না উঠে। আর কোন ব্যাপারে তার ভুল কিংবা সঠিক আপত্তি থাকলে মুহতামিম এ অষ্টম ধারা ও পরবর্তী নবম ধারার উদ্ধৃতি দিয়ে জবাব দিতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। কমিটির সদস্য ব্যতীত অন্য কারো জন্য মাদরাসার হিসাব দেখা ও সে সম্পর্কে কিছু জানার ন্যূনতম অধিকারও থাকবে না। তার প্রশ্ন করার মাঝে কোন আপত্তির সুর না থাকলেও এ ব্যাপারে কথা বলা ঠিক হবে না। তবে মাদরাসার কল্যাণ ও উন্নতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুহতামিম কিংবা সদস্যবৃন্দকে সুপরামর্শ দেওয়ার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানেরই থাকবে। পরামর্শ প্রদানকৃত বিষয়টি মুহতামিমের ক্ষমতা বহির্ভূত হলে অর্থাৎ সে ব্যাপারে মুহতামিমের ক্ষমতা না থাকলে তিনি রীতিমত সদস্যবৃন্দকে সে ব্যাপারে অবহিত করবেন। তারপর পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি মুহতামিম কিংবা সদস্যবর্গের কাজ। পরামর্শদাতার জন্য পরামর্শ প্রদানের বাইরে কোন অধিকার থাকবে না। - [বায়াজে আশরাফী-৮৮]

১০. কমিটি বহির্ভূত সাধারণ দাতাদের আপত্তি এবং অধিকার

সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ মুহতামিম কিংবা মাদরাসার হিসাবপত্র সম্পর্কে অথবা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে জরুরি খোঁজ-খবর কিংবা কোন সন্দেহ দূর করতে চাইলে প্রতি মাসে কমপক্ষে দশ টাকা অথবা বছরে একশত বিশ টাকা [সে যুগের হিসাবে] চাঁদা প্রদানকারী হতে হবে। অথবা মাদরাসার কোন ওয়াকফিয়া সম্পত্তির ওয়াকফকারী কিংবা কোন ওয়াকফকারীর পক্ষ থেকে মুতাওয়াল্লী কিংবা কোন ওয়াকফিয়া সম্পত্তির আয়-উপার্জন মাদরাসায় প্রেরণকারী হয় তার জন্য কেবল খোঁজ-খবর ও সন্দেহ দূর করার অধিকার রয়েছে। তারও পদ্ধতি হল, সে কমিটির কোন সদস্যকে মাধ্যম বানাবে। অর্থাৎ সদস্যের কাছে আবেদন করবে। তারপর উক্ত সদস্য বিষয়টি যুক্তিসঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে তার আবেদন মঞ্জুর করে নিজে কিংবা মুহতামিম সাহেবের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নিয়ে দরখাস্তের জবাব দিয়ে দিবে। আর যদি বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত না হয় তাহলে প্রথমেই অপারগতা প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে সদস্যকে কারণ দর্শাতে বলা যাবে না।

আর যদি জিজ্ঞাসাকারী চাঁদা প্রদানকারী না হয় কিংবা মাসে দশ টাকার কম চাঁদা প্রদান করে কিংবা মাদরাসার কোন ওয়াকফ সম্পত্তির ওয়াকফকারী কিংবা

www.banglakitab.weebly.com

মুতাওয়াল্লী না হয় তাহলে তার জন্য এমন বিষয়ে খোঁজ-খবর করার সামান্যতম অধিকারও নেই।

অবশ্য এ অবস্থায় সে তার চাঁদা বন্ধ করে দেয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু যদি সে অর্থ ওয়াকফের হয় তাহলে তা বন্ধ করতে হলে মুফতী সাহেবের নিকট জায়েয-নাজায়েয সম্পর্কে মাসআলা জেনে নিবে। [বায়াজে আশরাফী-৮৮]

১১. মাদরাসার ব্যাপারে অভিযোগ ও আপত্তি

যদি কেউ মাদরাসার ব্যাপারে কোন অভিযোগ প্রচার করতে থাকে তাহলে অভিযোগ সত্য হলে মাদরাসার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করার ঘোষণা দিবে। আর যদি অভিযোগ ভুল হয় তাহলেও বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে তার জবাব প্রচার করা হবে। এ জবাবকে কেউ খণ্ডন করলে পূর্বের জবাবে কোন কথা অস্পষ্ট থাকলে তা প্রকাশ করে পাল্টা জবাব প্রচার করা হবে। এরপরও যদি বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কেবল মিথ্যা অপপ্রচার করতে থাকে তাহলে আর জবাব দিবে না। এতে সময় ক্ষেপণ ছাড়া আর কোন উপকার হবে না। এ অপপ্রচার অনেক সময় নফসানিয়্যাতের কারণেও হয়ে থাকে।

ان ارید الا الاصلاح مااستطعت وماتوفیقي الا بالله وعلیه توکلت والیه انیب

নিবেদক

আশরাফ আলী

মুহতামিম এবং শূরা সদস্যদের শরয়ী দৃষ্টিকোণ এবং ক্ষমতা

মুহতামিম ও শূরা সদস্যগণ চাঁদা প্রদানকারীদের পক্ষ হতে উকিল। দাতাদের অনুমতি ও সম্মতির উপর তাদের সম্পদ ব্যবহারের বৈধতা ও অবৈধতা নির্ভর করে। উকিলকে যে ধরনের 'তাসাররুফ' ও হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয়া হবে তার জন্য সে ধরনের হস্তক্ষেপ জায়েয আছে। যদি সুস্পষ্টভাবে কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে দাতাগণ উক্ত কানুন সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং তাদের সম্মতি বোঝা যায় তাহলে চাঁদা থেকে বেতন দেয়া জায়েয আছে। - [এমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৪৮]

মাদরাসার অর্থ-সম্পদ ওয়াকফ নয়। তবে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এবং কোন বাইতুলমাল বা কোষাগারের কর্মচারীগণ হলেন দাতা এবং গ্রহীতাদের পক্ষ থেকে উকিল। অতএব তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং দাতাগণ তাদের দান ফেরতও নিতে পারবে না। - [এমদাদুল ফাতওয়া-৬/২৭৩]

www.banglakitab.weebly.com

মাশওয়ারার গুরুত্ব

কারো যদি শায়খ ও পীর জীবিত না থাকেন, তার জন্যও বিপদ-সমস্যায় নিজের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত না নেয়া উচিত; বরং ছোটদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। মোটকথা, ছোটরা বড়দের অনুসরণ করবে, আর বড়রা ছোটদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে। এ উম্মতের ছোট-বড় সকলেই কাজের।

এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। তিনি ইরশাদ করেছেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ করা হয়েছে, আপনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন। [আনফাসে ঈসা-৩১১]

পরামর্শের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা

পরামর্শ করার বিধান কেবল এজন্য প্রদান করা হয়েছে যে, এর বরকতে সঠিক বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পরমর্শদাতাদের যে কোন একজনের মত দ্বারাও সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। আবার সকলের মতামত শ্রবণের দ্বারাও কোন সঠিক সুরত মাথায় আসতে পারে। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ আপনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন। যদি বড়রা ছোটদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে তাহলে ইনশাআল্লাহ ভুল-ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকবে। আর ছোটরা বড়দের কাছে পরামর্শ করলে তো ভুল থেকে বেঁচে যাবেই। - [আনফাসে ঈসা]

সত্যায়ন ও সমর্থন দেয়াও পরামর্শ

কোন ব্যাপারে সত্যায়ন করা বা সমর্থন দেয়াও এক ধরনের পরামর্শ। আর পরামর্শের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। [কিন্তু এতে মনক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা দেখা দিলে মনক্ষুণ্ন হতেন না। - [আনফাসে ঈসা-১/৪১৭]

পরামর্শদাতাদের মতামত অনুসরণ করা আবশ্যক নয়

পবিত্র কুরআনে পরামর্শ সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।

www.banglakitab.weebly.com

এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেয়ামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ হুকুম দেয়া হয়নি যে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আমল করুন; বরং আমলের ব্যাপারে সামনে বলা হয়েছে- فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ অর্থাৎ পরামর্শ করার পর আপনার ইচ্ছা জাগ্রত হবে আল্লাহর উপর ভরসা করে তদনুযায়ী কাজ করবেন। পরামর্শদাতাদের পরামর্শ অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়।

অর্থাৎ যখন আপনার প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে সে কাজটি সম্পন্ন করে ফেলুন। এটা বলা হয়নি যে, فَاِذَا عَزَمُوْا যখন তারা দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিংবা এও বলা হয়নি যে, فاذا عزم اكثرهم তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে....। আয়াতের মর্ম এটাই যে, পরামর্শ তাদের কিন্তু সিদ্ধান্ত আপনার। পরামর্শের পর যে ব্যাপারে আপনার মনের গতি স্থির হবে তা বাস্তবায়ন করুন। পরামর্শদাতাদের মতামত অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। [আততাবলীগ-১৮/১১৪]

মজলিসে শূরার নীতিমালা ও গঠনতন্ত্র

১. শরীয়তের অনুসরণ

মজলিসে শূরার সদস্যগণ পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের বিধি-বিধানের উপর আমল করবে। শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ করবে না এবং শরীয়তবিরোধী কোন মতামত গ্রহণ করবে না। জায়েয নাজায়েযের ব্যাপারে দ্বিধা-সংশয় হলে আলেমদের কাছ থেকে জেনে নিবে। যদি মুফতী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিংবা মুফতীদের ফতুয়ার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে সভাপতির নির্ধারণকৃত মুফতীর ফতুয়া আমলযোগ্য হবে। কোন সদস্য বিষয়টির সাথে একমত না হলে তাকে মানতে বাধ্য করা হবে না। তাকে নীরব থাকা এবং সে কাজে অংশগ্রহণ না করার অবকাশ দেয়া হবে। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক ও পর্যালোচনা করার অনুমতি নেই। অনুরূপভাবে আইনের বাইরেও কোন কাজ করা হবে না। - [ইফাদাতে আশরাফিয়া-৪০]

২. সভাপতি নির্বাচন

সদস্যবৃন্দের মধ্য হতে তাদের সকলের সর্বসম্মতিক্রমে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হবে।

www.banglakitab.weebly.com

৩. সদস্যদের সংখ্যা

সদস্যদের সংখ্যা অনেক বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ পরিমাণ সদস্য নেয়া উচিত যারা প্রয়োজনের সময় সহজে আসতে পারেন। চাই তারা স্থানীয় হোক বা বাইরের।

৪. নতুন সদস্য নির্বাচন

নতুন সদস্য নেয়ার ক্ষেত্রে পুরাতন সদস্যগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে।

৫. সভাপতি ও সদস্যের অব্যাহতি প্রদান

সভাপতি এবং সদস্যের নিয়োগ ও নির্বাচন যেমন সকল সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়েছিল অনুরূপভাবে তাদের অব্যাহতি ও অপসারণও সকলের ঐকমত্যে হতে হবে।

৬. সভাপতি ও সদস্যদের অব্যাহতি গ্রহণ

সভাপতি এবং কোন সদস্যের অব্যাহতিপত্র কারো মঞ্জুরীর অপেক্ষা রাখবে না। অব্যাহতি চাওয়া মাত্রই গৃহীত হবে।

৭. কোরাম বা সদস্যদের উপস্থিতি সংখ্যা ক'জন হবে

পরামর্শ সভায় সভাপতি এবং তিনজন সদস্যের উপস্থিতি যথেষ্ট। সভাপতির কোন ওজর ও সমস্যা থাকলে তিনি অস্থায়ীভাবে কোন সদস্যকে তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করবেন। সভাপতি সফরে থাকলে সদস্যগণ তাদের মধ্য হতে কাউকে সভাপতির স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করে নিবেন।

৮. কোন কাজ পরামর্শ ছাড়া করা যাবে না।

৯. সদস্যবৃন্দের মাঝে মতভেদ দেখা দিলে

শূরার সদস্যদের মাজে যদি মতভেদ দেখা দেয় তাহলে যেদিকে সভাপতির রায় হবে সেটিই প্রাধান্য পাবে। চাই সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হোক বা সংখ্যালঘুদের মত হোক। আর যদি শূরা এবং সভাপতির মাঝে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে সতর্কতার দিকটি প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, বিবাদমান বিষয়টির ক্ষেত্রে যদি একটি রায়ে উপকারের দিকটিই প্রবল, ক্ষতির আশঙ্কা নেই; আরেকটি রায়ে উপকার ও ক্ষতির কোন দিক সুস্পষ্ট নয়, তাহলে উপকার

www.banglakitab.weebly.com

সংশ্লিষ্ট রায়কে প্রাধান্য দেয়া হবে এবং তদনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হবে। যদি একটি রায়ে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে এবং আরেকটি রায়ে অপ্রয়োজনীয় উপকার থাকে তাহলে ক্ষতির আশঙ্কার রায়টি প্রাধান্য দিয়ে কাজটি বর্জন করা হবে। আর যদি একটি রায়ে ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় এবং অপর রায়ে প্রয়োজনীয় উপকার নিহিত থাকে এবং মতভেদ খুব চরমপর্যায়ের হয় তাহলে সভাপতির মত প্রাধান্য পারে।

সত্যায়ন ও স্বাক্ষর :

উপরে বর্ণিত সকল ধারা সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত সম্মত। এতে দলীল প্রমাণেরও কোন প্রয়োজন নেই।

বিনীত

আশরাফ আলী

২২ রবীউল আউয়াল ১৩৪৯হি.

- [ইফাদাতে আশরাফিয়া-৪৪]

সিদ্ধান্তকৃত বিষয়ে রদবদল

যে বিষয়টি পরামর্শের মাধ্যমে স্থির হবে তাতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হলে সদস্যবৃন্দের অবগতি সাপেক্ষে করতে হবে। [হুসনুল আজীজ-১/৩৭৭]

পৃষ্ঠপোষক এবং সদস্যদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে

কয়েক বছর যাবৎ দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, পৃষ্ঠপোষকের যা সিদ্ধান্ত হবে তা সকল সদস্যের মতের বিরোধী হলেও সেটিই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী [রহ.] তাতে এভাবে রদবদল করে দিয়েছেন যে, মতবিরোধ দেখা দিলে তো তাই করতে হবে কিন্তু ঐক্যমতের সময় তা প্রযোজ্য হবে না। তখন সদস্যদের মাঝে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেলে আমি বললাম, শাহ সাহেবের পরিবর্তন মেনে নেয়া হোক। তবে আমাকে একমত হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। আমি আমার সিদ্ধান্ত বলে দিব। বাস্তবায়নকারীদের অধিকার থাকবে সেটি মানা বা না মানার। অবশেষে এটাই সিদ্ধান্ত হয়। [আল কালামুল হাসান-৫১]

www.banglakitab.weebly.com

সিদ্ধান্ত হওয়ার পর মতবিরোধ না করা

এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন যে, বাদশা কোন ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে শূরা সদস্যদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে সে সম্পর্কে কী বিধান? বাদশার মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করা দোষণীয় নয় কি? [হযরত বললেন,] কল্যাণ ও কল্যাণকামিতা, দীন ও দীনদারীর ভিত্তিতে মতবিরোধ করা দোষণীয় নয়। এর জন্যও একটি সীমা রয়েছে। অর্থাৎ এ মতবিরোধও ঐ সময় পর্যন্ত বৈধ আছে যতক্ষণ পরামর্শ চলে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর সে রায়ের বিরোধিতা করা দোষণীয়। সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর তো আনুগত্য অপরিহার্য হয়ে যায়। - [মালফুজাতে হাকীমুল উম্মত- পর্ব : ৮৬, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২]

অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য নিযুক্ত না করা

দেওবন্দের এলাকাবাসী মাদরাসার মজলিসে শূরাতে অনুপ্রবেশ করতে চাইলে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.] নিষেধ করেছিলেন। এ নিয়ে অনেক হৈচৈ ও গণ্ডগোল হচ্ছিল। বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা ছিল। সে নাজুক পরিস্থিতিতে আমি হযরত গাঙ্গুহী [রহ.]-এর কাছে এ মর্মে পত্র লিখলাম যে, হযরত! হৈচৈ-শোরগোল বন্ধ করার জন্য এলাকার দু'একজনকে মজলিসে শূরার অন্তর্ভুক্ত করে নিলে কী সমস্যা? সংখ্যা তো আমাদের লোকজনেরই বেশি থাকছে। আর সিদ্ধান্তও তো সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আমার পত্রের জবাবে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.] লিখেন, অযোগ্যকে সদস্য বানানো গুনাহ। এতে আল্লাহ এবং রাসূল অসন্তুষ্ট হন। এ জন্য আমরা অযোগ্যকে মাদরাসা কমিটির সদস্য বানাব না। চাই মাদরাসা থাকুক বা না থাকুক। মাদরাসা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তো হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। [মালহুজাতে জাদীদ মালফুজাত-৪৯]

শূরা ও কমিটি হওয়ার যোগ্য কে

পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে তার কাছ থেকে যার মধ্যে দু'টি জিনিস রয়েছে। একটি হল তার সম্পর্কে পূর্ণ আশ্বস্ত হতে হবে যে, সে আমার কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্খী। আরেকটি হল যে বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে তার জানাশোনা ও অভিজ্ঞতা থাকা। - [আশরাফুল মাওয়ায়িজ-২/১০২]

www.banglakitab.weebly.com

প্রসঙ্গ : শূরা সদস্যদের যাতায়াত ভাড়া ও খরচ

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ও সেবায় সদা নিয়োজিত থাকে এবং সে কারণে সে নিজের জীবিকার সংস্থান করতে অক্ষম হয় তাহলে তার ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার ঐ ব্যক্তির উপর আবশ্যক হয়ে যায় যার কল্যাণ ও সেবায় সে নিয়োজিত। ফুকাহায়ে কেরামের কাছে এর প্রসিদ্ধ উপমা হল, কাজী ও বিচারকের ব্যয়ভার। আরেকটি উদাহরণ হল, সাক্ষীদের ব্যয়ভার। কেননা, তারা যার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার কাজে নিয়োজিত। এজন্য তাকে খরচাদি দেয়া হবে। আর যেহেতু পরামর্শদাতারাও সাধারণ জনগণের কল্যাণে নিয়োজত, তাই তাদের ব্যয়ভারও সমগ্র জাতির উপর বর্তাবে। তাদের সকলের চাঁদা থেকে তা বহন করা হবে। - [ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত-২/১৯২]

ভাড়া ও জরুরি খরচের বাইরে অতিরিক্ত পয়সা দেয়া জায়েয নেই

শরীয়তে মতামত প্রদান করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নেই। এটি ঘুষ বলে সাব্যস্ত হবে। সারকথা হল, শরীয়ত যে জিনিসকে মূল্যবান বস্তু বলে স্থির করেনি, তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়। উদাহরণত আপনার শোফা বা পিয়নশনের অধিকার ছিল। আপনি একশত টাকার বিনিময়ে তা ছেড়েদিলেন। এ একশত টাকা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। সেই সাথে পিয়নশনের অধিকারও শেষ হয়ে গেছে। কেননা, শরীয়ত 'শোফা'র কোন মূল্য নির্ধারণ করেনি। বিচারকের কাছে সুপারিশ করানোও এ পর্যায়ভুক্ত কর্ম। অবশ্য যে কাজে কোন মেহনত ও কষ্ট রয়েছে তার মূল্য ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে। - [আততাবলীগ, আহকামুল মাল-১৫/৫৭]

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয় অধ্যায়

মাদরাসায় মতবিরোধ, বিশৃঙ্খলা, আন্দোলন ও ধর্মঘট

প্রথম পরিচ্ছেদ : মতবিরোধ

সকল মতবিরোধ মন্দ নয়

ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার মর্ম হচ্ছে কোন অবস্থা শরয়ী ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলা। আর এটা মতভেদ ও অনৈক্যের সাথে বিশিষ্ট নয়; বরং কখনো 'ইত্তেফাক' ও ঐকমত্যের মাঝেও ফাসাদ নিহিত থাকে। সুতরাং এ ধরনের ঐক্যও নিন্দিত। কুরআন কারীমের একটি উপাধি হল فرقان [পার্থক্যকারী]। এ থেকে বুঝে আসে যে, কুরআন কারীম সর্বদা সম্পর্ক স্থাপন করে না; বরং সে কখনো স্থাপন করে আবার কখনো ছিন্নও করে। যারা হক ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কুরআন তাদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপনকারী আর যারা বাতিল ও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক ছিন্ন ও বিচ্ছেদকারী। অনৈক্য এ কারণে নিন্দনীয় যে, এটা দীনের জন্য ক্ষতিকর। যদি দুনিয়ার ব্যাপারে ক্ষতিকর হয়ে দীনের জন্য উপকারী হয় তাহলে সেটা নিন্দনীয় নয়। হযরত ইবরাহীম [আ.] একটি অনৈক্য গ্রহণ করেছিলেন। তাকে কেউ নিন্দনীয় বলতে পারবে না। অপরদিকে হযরত ইবরাহীম [আ.]-এর প্রতিপক্ষ কাফেররা পরস্পরে পরিপূর্ণ ঐক্য বজায় রেখেছিল। কিন্তু সে ঐক্যকে কেউ কিছুতেই পছন্দনীয় ও নন্দিত বলে না। হযরত ইবরাহীম [আ.] তাদের ঐক্যের ভিত চুরমার করে দিয়েছেন। কেননা, সে ঐক্যের ভিত্তি ছিল সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতার উপর। [কামালাতে আশরাফিয়া-২৭]

মতবিরোধ নন্দিত ও নিন্দিত হওয়ার মাপকাঠি

ভালো করে বুঝে নাও, ঐক্য কেবল ঐ সময় কাম্য ও নন্দিত হবে যখন তাতে দীনের উপকার ও কল্যাণ নিহিত থাকবে। আর অনৈক্যও তখনই ক্ষতিকর হবে যখন তা দীনের জন্য ক্ষতিকর হবে। যদি ঐক্য দীনের জন্য ক্ষতিকর এবং অনৈক্য উপকারী হয় তখন অনৈক্যই কাম্য ও প্রশংসিত হবে। [কামালাতে আশরাফিয়া-২৬]

www.banglakitab.weebly.com

মতবিরোধের কারণে দুইপক্ষ কিংবা গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ অনুচিত

আমি বলি না যে, মতবিরোধের মাঝে আলেমদের কোন ভুল বা দোষ নেই। এতে অবশ্যই তাদের ভুল রয়েছে। তবে আপনার ব্যাপারে এতটুকু অভিযোগ অবশ্যই করব যে, আলেমদের মতানৈক্যের কারণে গোটা আলেম সম্প্রদায় থেকেই বিমুখ হওয়া একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

কিছু কিছু মানুষ আলেমদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকে যে, সকল আলেমকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। অনৈক্য খুব মন্দ জিনিস। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, অনৈক্য কি নির্বিচারে অপরাধ, নাকি তার জন্য কোন শর্ত-শারায়েত আছে? যদি মতানৈক্য ঢালাওভাবে অপরাধ হয়ে থাকে এবং সে কারণে উভয় পক্ষ অপরাধী সাব্যস্ত হয় তাহলে তো আদালতের উচিত হবে তাদের কাছে কোন বাদী দাবী পেশ করলে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত না করেই বাদী বিবাদী উভয়কেই শাস্তি প্রদান করা। কেননা, এক পক্ষ দাবী করছে, অপর পক্ষ তা অস্বীকার করছে। এতে তো অনৈক্য প্রমাণিত হল। আর আপনার কথায় অনৈক্য ঢালাওভাবে অপরাধ। সুতরাং বাদী বিবাদী উভয়েই অপরাধী। যদি আদালত এমনটি করে বসে তাহলে আপনিই সবার আগে প্রতিবাদের ঝড় তুলে ফেলবেন যে, এটা কোন ধরনের বিচার বা ইনসাফ।

সুতরাং পারস্পরিক অনৈক্য ও মতবিরোধের কারণে সকল আলেমকে অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং উভয় পক্ষকে অপর পক্ষের সাথে ঐক্যমত গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত ; বরং সর্বপ্রথম আপনাকে যাচাই করতে হবে যে, কারা হকের উপর রয়েছে এবং কারা বাতিলের উপর রয়েছে। যাচাইয়ের পর যাদেরকে অন্যায়ের উপর পাবেন তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করুন এবং তাদেরকে হকপন্থীদের সাথে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য বাধ্য করুন। অন্যাথায় হকপন্থীদেরকে অন্যের সাথে ঐক্য গড়ে তোলতে বাধ্য করার মর্ম তো হল তারা হককে বাদ দিয়ে অন্যায় পথ গ্রহণ করুক। এটা কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নিবে না। আলেমদের মতবিরোধ সম্পর্কে আমাদেরও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু অভিযোগটা তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য যারা অন্যায় পথে রয়েছে। - [কামালাতে আশরাফিয়া-৮১]

www.banglakitab.weebly.com

ফায়সালা করা এবং সমঝতা করানোর পদ্ধতি

ইসলাহ্ এবং সংশোধনের অর্থ হল আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফায়সালা করা। আর নিঃসন্দেহে হকপন্থীকে দমন করা আল্লাহর হুকুমের খেলাফ। সুতরাং হকের দাবী এটাই যে, যখন দুই দলের মাঝে কিংবা দু'ব্যক্তির মাঝে মতভেদের সৃষ্টি হয় তখন প্রথমে জেনে নিতে হবে কে ন্যায়ের উপর আছে আর কে অন্যায়ের উপর। যখন ন্যায়-অন্যায় নির্ণিত হবে তখন ন্যায়পক্ষকে কিছু বলা হবে না। অন্যায়পন্থীকে মতবিরোধ করা থেকে বারণ করা হবে। উভয় পক্ষকেই দোষারোপ করা কিছুতেই সমঝতা করানোর পদ্ধতি হতে পারে না। আজ এ রীতিটা বেশ ব্যাপকতা পেয়েছে। উভয় পক্ষের মধ্যে যে ন্যায়ের পথে রয়েছে তাকেও দমন করা হয়। অথচ এটা তার প্রতি স্পষ্ট জুলুম। কেননা, এতে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। যে অন্যায়ের পথে রয়েছে তাকে দমন করা জুলুম নয়; বরং এটা তার প্রতি অনুগ্রহ। কেননা, এর দ্বারা তাকে কারো ক্ষতি করা থেকে বারণ করা হচ্ছে। তাই তো কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ج
فَإِن بَغَتْ احدٰيهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُو الَّتِي تَبْغِى حَتّٰى
تَفِيْءَ إِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَإِنْ فَآئَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

মুনিদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে- যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। [সূরা হুজুরাত : ৯]

অর্থাৎ মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে সন্ধি ও সমঝতা করো আর যদি সে অনুযায়ী সমঝতায় সম্মত না হও তাহলে সকলে মিলে ভ্রান্ত নীতিকে ভেঙ্গে দাও। -[কামালাতে আশরাফিয়া-৮১]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসায় মতবিরোধ দেখা দিলে কী করণীয়

যখন কোন ব্যাপারে মানুষ তোমার সাথে ঝগড়া করে তখন তুমি সত্য-মিথ্যা সব তার উপর সোপর্দ করে নিজে সরে পড়। সারা জীবন আমার এ আমল ছিল। হাদীস শরীফে এসেছে,

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ إِنْ أُحْتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنْ أُسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنِي نَفْسَهُ

খুবই উত্তম মানুষ ঐ ফকীহ্ যার প্রয়োজনীয়তা লোকজন অনুভব করলে তিনি তাদেরকে উপকৃত করেন আর যদি তার কাছ থেকে বিমুখ হয় তাহলে তিনিও অনুরূপ আচরণ করেন।

আর এজন্যই বর্তমানে দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের সময় আমার নেই। - [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-১৯০]

একটি ঘটনা :

বিরুদ্ধবাদিরা মাদরাসা ছেড়ে চলে যেতে বললে কী করণীয়

থানাভবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, খানকা এবং মাদরাসা এদের থেকে মুক্ত করতে হবে। আমি সর্বদা এজন্য প্রস্তুত ছিলাম যে, একটি শিশু বাচ্চা এসেও যদি আমাকে চলে যেতে বলে তখন কোন প্রকার ঝামেলা করা ছাড়াই আমি খানকা ছেড়ে চলে যাব। সাথী-সঙ্গী ও বন্ধু-বন্ধবরা বেশ চিন্তিত ছিলেন যে, এখান থেকে চলে গেলে ফের কোথায় এ সমাবেশ মুখরিত হবে। আল্লাহর কুদরতে সে সময় একটি আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটল।

জনৈক ব্যক্তি ইন্তেকালের পূর্বে থানাভবন খানকা ও মাদরাসার জন্য চার হাজার টাকা অসীয়ত করেছিলেন। তার ইন্তেকালের পর সে টাকার সংবাদ এলো। তখন সে টাকা দিয়ে কোথাও নতুনভাবে খানকা নির্মাণ করা যেত। এর জন্য আমি একটি জায়গাও নির্ধারণ করে রেখেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে বিরুদ্ধাবাদী সকলের মাথা নীচু হয়ে গেল। পরবর্তীতে তাদের দু'একজন প্রতিনিধি এসে আবেদন করতে লাগল যে, আপনি এখান থেকে যাবেন না। আপনি চলে গেলে আমরা বড় লজ্জিত হব। সে সময় আমি এ কথাটি বলা উপযুক্ত মনে করলাম যে, আমাকে এখানে হযরত হাজী সাহেব [রহ.] বসিয়ে গেছেন। আমি কিভাবে এখান থেকে যেতে পারি। সে সময়ও আমরা আদালতের শরণাপন্ন হওয়া পছন্দ করিনি। [আল কাওলুল জামীল-৬৬]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসায় আন্দোলন ও ধর্মঘট হলে

সাম্প্রতিক সময়ে দেওবন্দ মাদরাসায় তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। সে আন্দোলন থামানোর জন্য মাদরাসার মুহতামিম ও কমিটির সদস্যবৃন্দ খুব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি মুহতামিম সাহেবকে লিখে দিয়েছি যে, তোমরা এখন থেকে যে কোন পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকুন। মাদরাসা থাকুক কিংবা তোমাদের নেতৃত্ব থাকুক এ চিন্তা মাথায় রাখবে না। মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলেও তোমরা তাতে সন্তুষ্ট থেকো। আর আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজেদের উসূল ও মূলনীতির উপর মজবুতভাবে স্থির থাক। আর এ শক্তি 'তাফবীয' ও সঁপে দেয়া ছাড়া অর্জিত হবে না। এর মর্ম এই নয় যে, তদবির ও চেষ্টা ছেড়ে দিবে। কেননা, তদবির বর্জন করার নাম 'তাফবীয' নয়; বরং তাফবীয হল তদবিরের উপর ভরসা না করা এবং নিজের সিদ্ধান্তে কোন দিককে নির্ণয় না করা যে, এমনটি হওয়া উচিত। আমার লেখার দারুন প্রতিক্রিয়া হল। আমার লেখা পড়ে মুহতামিম সাহেব খুব শক্ত হলেন। তিনি লিখেছেন, আপনার চিঠি পড়ে আমাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। - [বাদায়ে'-১৮৬]

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.] ও মাওলানা খলীল আহমদ [রহ.] মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী [রহ.]-এর নামে পত্র লিখেছিলেন। তারা বিরুদ্ধবাদীদের কারণে কিছুটা পেরেশান ছিলেন। সে পত্রের একটি বাক্য এই ছিল যে, আমার স্নেহধন্যরা! তোমরা চিন্তিত হচ্ছ কেন? আমাদের তো মাদরাসা উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির অনেক পন্থা রয়েছে। তার মধ্যে মাদরাসাও একটি পন্থা। মাদরাসায় কাজ করার সুযোগ থাকলে কাজ করবে অন্যথায় অন্য কোথাও বসে কাজ করবে। [মালহুজাত-৪৮]

আন্দোলন থামানোর একটি বিস্ময়কর তদবির

আন্দোলন চলাকালে আমি দেওবন্দের কর্তৃপক্ষকে লিখেছিলাম, এতদিন যাবত তো আপনারা চেষ্টা-তদবিরে লিপ্ত ছিলেন, এখন তদবির বর্জন করে দেখুন। এটি একটি বড় অভিজ্ঞতালব্ধ পন্থা। তদবির বর্জন করার মধ্যে ক্ষতি থাকলেও সে পরিমাণ নেই যে পরিমাণ ক্ষতি তদবির করার মাঝে রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ চেষ্টা-তদবিরেই লেগে থাকে। [আল কালামুল হাসান-২৩]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসার ফেতনা-ফাসাদের কতিপয় কারণ

বর্তমানে মাদরাসাসমূহে ফেতনা-ফাসাদ এবং বেবরকতী হচ্ছে। তার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ হল, চাঁদা আদায়ে সতর্কতার অভাব। এ চাঁদার ক্ষেত্রে আজ অনেক অনিয়ম দেখা দিয়েছে। জায়েয-নাজায়েযের তোওয়াক্কা খুবই কম করা হয়। কারো মনের সন্তুষ্টি ছাড়া তার কাছ থেকে চাঁদা উসূল করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। এ ব্যাপারে একেবারেই সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে না। - [আল ইফাজাতুল ইওয়াওমিয়াহ্-২৩]

সাধারণ ব্যাধি

কিছু বিষয় বলার মতো নয়। তবুও বলছি এজন্য যে, হয়ত শুনে কেউ নিজের অবস্থা শোধরে নিবে। বর্তমানে একটি ব্যাধি ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হচ্ছে। কেউ তো মূল গুনাহেই লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর কেউ তার আনুষাঙ্গিক বিষয়ে লিপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ পরনারী ও দাড়িবিহীন বালকের প্রতি কুদৃষ্টি। হাদীস শরীফে এসেছে اللسان يزني الخ যবানও যিনা করে। হাত দিয়ে স্পর্শ করা এবং কুদৃষ্টিতে দেখা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মনোতুষ্টির জন্য কোন সুন্দর ছেলে কিংবা সুন্দরী মেয়ের সাথে কথা বলাও যিনা কিংবা সমকামিতার অন্তর্ভুক্ত। আর অন্তরের যিনা হল কল্পনা করা। যার দ্বারা স্বাদ অনুভূত হয়। যিনার ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক অনুরূপভাবে সমকামিতার ক্ষেত্রও বিস্তৃত। অনেক মানুষ এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। হাজারে দু'একজন তা থেকে মুক্ত আছেন হয়ত; বাকী প্রায় সবাই এতে লিপ্ত।

একবার থানাভবনে মহামারি দেখা দিয়েছিল। মহামারি ছড়ানোর পূর্বে একদিন শেষ রাতে বসে আছি। ঘুমের সামান্য চাপ ছিল। সে মুহূর্তে আমার অন্তরে লূত সম্প্রদায় সম্পর্কিত একটি আয়াত ভেসে উঠে,

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

আমরা এই জরপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করব। কারণ, ওরা পাপাচার করছিল। [সূরা আনকাবূত : ৩৪]

সে সম্পর্কে আমি মানুষদেরকে সতর্ক করলাম। আর আমি জানি এ যুগে সমকামিতার ব্যাধি খুব প্রকট আকার ধারণ করেছে। তাই বললাম, এ কাজ থেকে তওবা করো, অন্যথায় আযাবের আশঙ্কা রয়েছে। আমি বিষয়টি ওয়াজ মাহফিলে বর্ণনা করেছি। কিন্তু লোকজন তাতে ভ্রুক্ষেপ করেনি। অবশেষে

www.banglakitab.weebly.com

আযাব এসেই পড়ে। মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। মোটকথা, মাদরাসার বিশৃঙ্খল অবস্থার একটি কারণ লূত সম্প্রদায়ের উক্ত মন্দ কর্মটিও রয়েছে। - [হুসনুল আজীজ-৪/১৬১, দাওয়াতে আবদিয়্যাত-৯/১১৮]

বর্তমানে ছাত্রদের মাঝে খুব বেশি স্বাধীনতা এসে গেছে। প্রত্যেকেই খোদ মুখতার বনে গেছে। যা ইচ্ছা তাই করছে। এটাই হল সে ব্যাধি যা দেওবন্দের ছাত্রদের মাঝে বৃদ্ধি হতে হতে বর্তমানে বিশৃঙ্খলার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ আন্দোলন ও ধর্মঘট ইত্যাদি। [আত তাবলীগ-৮]

মতবিরোধিতার মূলভিত্তি

আমাদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী [রহ.] বলতেন, মতবিরোধ ও পরস্পরে ঘৃণাবোধের মূল হল অহংকার। মতবিরোধ সর্বদা নফসানিয়্যত ও অহংবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। - [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-২৭৮, হুসনুল আজীজ-৪/২৪২]

ঐক্য ধরে রাখার পদ্ধতি

হযরত হাজী সাহেব [রহ.] বলতেন, ঐক্যের মূল হল বিনয়। দু'জন অহংকারীর মাঝে কখনো ঐক্য হতে পারে না। কেননা, কারো মাঝে বিনয় থাকলে তার পক্ষে অন্যের আনুগত্য করা কঠিন নয় এবং সে নিজের রায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য পীড়াপিড়ি করে না। আর অহংকারীর পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। - [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৯৮]

ঐক্যের মূল হল বিনয়। বিনীয়দের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হতেই পারে না। বিনয় ছাড়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। - [মাহাসিনুল ইসলাম]

মাদরাসায় সাংগঠনিক তৎপরতার কুফল

[হযরত বলেন,] আমি প্রচলিত ছাত্র সংগঠনের বিরোধী। বিশেষভাবে দীনি মাদরাসায় উক্ত সংগঠন ও আঞ্জুমানের ঘোর বিরোধী। কেননা, এতে ছাত্রদের মাঝে স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি হয়, যা মাদরাসার পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

জনৈক মৌলভী সাহেব ছাত্রদের দ্বারা সংগঠন গড়ে তোলেছেন। কোন ছাত্র অন্যায় করলে সংগঠনের সদস্য ছাত্রদের নিয়ে বৈঠক করে পরামর্শ করতেন যে, তার কি সাজা হওয়া উচিত। এতে পরিণাম ভালো হয়নি। একদিন সকল ছাত্র

www.banglakitab.weebly.com

উক্ত মৌলভী সাহেবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে মাদরাসা ছাড়া করেছে। এ হল আযাদী ও স্বাধীনতার কুফল।

আরেকটি ব্যাপার হল, এ ধরনের সংগঠনের একটি অপরিহার্য বিষয় হল, বয়ান বক্তৃতা। ছাত্ররা বক্তৃতা তৈরির ফিকিরে ক্লাসের পড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এতে মূল উদ্দেশ্য তথা পড়ালেখা ব্যাহত হয়। এজন্য আমার এখানে নিয়ম হল, যারা যে কিতাব পড়ে তাদেরকে সে কিতাব সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যারা কাফিয়া পড়ে তারা কাফিয়ার কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। যারা মেশকাত পড়ে তারা মেশকাতের কোন হাদীস নিয়ে বক্তৃতা করবে। এতে যবানও খুলবে অর্থাৎ বলার যোগ্যতা এসে যাবে এবং পড়ানোর অভ্যাসও গড়ে উঠবে। আর পড়ালেখার ঘাটতিও পূরণ হবে। - [আল কালিমাতুল হক-১২৪]

বর্তমানে সভা-সমিতি একেবারে উদ্দেশ্যহীন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এর ধরণও সঠিক নয়। অনেক মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এটাকে কেবল রসম-রেওয়াজ ভেবেই গ্রহণ করেছে। উপকার লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। [তিজারাতে আখেরাত-৩০]

পারস্পরিক মতানৈক্য ও কোন্দলের অশুভ প্রভাব

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সকল দীনি মাদরাসা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরও কিছু কিছু মাদরাসা পরস্পরে লড়াইয়ে অবতীর্ণ। কোথাও তো এক মাদরাসার বিরুদ্ধে অন্য মাদরাসা প্রকাশ্যে পোস্টার-হ্যান্ডবিল বিতরণ করে কিংবা মঞ্চে সমালোচনা করে। দাতাগোষ্ঠীকে অন্য মাদরাসায় চাঁদা প্রদান করতে নিরুৎসাহিত করে। আর কোথাও পরোক্ষভাবে সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হয়। প্রথমে জনগণ তা বুঝতে পারে না। বিশেষ শ্রেণী তথা শিক্ষক ও কমিটির সদস্যবৃন্দই বুঝে ফেলেন। তারপর হতে হতে সাধারণ জনগণের মাঝেও তা ছড়িয়ে পড়ে।

এর অশুভ ফল এই হয় যে, সাধারণ জনগণ মনে করে এসব মাদরাসা বুঝি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ এবং নাম-যশ কুড়ানোর জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর এ কোন্দল আরো তীব্রতর হয়ে ছাত্রদের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক মাদরাসা ছাত্রদেরকে নিজের দিকে টানে। নানা সুযোগ সুবিধার ঘোষণা দিয়ে ছাত্র ভর্তি করার পর ছাত্রদের কথায়ই মাদরাসা চালানো হয়। এসবই হল ইখলাস না থাকার প্রমাণ। [হুকুকুল ইলম-৯১]

www.banglakitab.weebly.com

আলেমদেরকে মন্দ বলা কিংবা তাদের সমালোচনা শ্রবণ করা উভয়টিই ক্ষতিকর

অন্য আলেমদেরকে মন্দ বলা অনেক সময় গুনাহ্ হয়ে যায়। সাধারণ জনগণের উপর এর মন্দ প্রভাব পড়ে। তারা সবার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে। যদি কাউকে বাতিলের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতেই হয় তাহলে শিষ্টতার সাথে তাকে অবগত করে দেয়াই যথেষ্ট। আর যেমনিভাবে নিজে তাতে লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর তেমনিভাবে অন্য কেউ সমালোচনা করলে তা শ্রবণ করাও ক্ষতিকর। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত]

আলেমদেরকে দুর্নাম ও মন্দ ধারণা থেকে বাঁচানোর গুরুত্ব

আলেমদের সাহায্য সহযোগিতা করা দীনের দাবী। যদিও তারা বদ আমল হোক না কেন। কেননা, সাধারণ জনগণের অন্তর থেকে আলেমদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা উঠে গেলে দীন ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, তারা সবার প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে আর কোন কোন কথায় মনোযোগ দিবে না। - [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-১৩১]

সাধারণ একজন মানুষ যদি আলেমদের ব্যাপারে আপত্তি করে এবং তার আপত্তি সঠিকও হয় তবুও আলেমদের পক্ষ অবলম্বন করতে মন চায়। বাহ্যত এটি সাম্প্রদায়িকতা মনে হলেও আমার নিয়ত এই থাকে যে, সাধারণ জনগণ যেন আলেমদের প্রতি খারাপ ধারণা না করে। কারণ, এমনটি হলে তাদের দীন ও ঈমানের অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে যাবে। - [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-১৬৬]

সাধারণ জনগণের অন্তর থেকে আলেমদের মর্যাদা ও ভক্তি কমানো কিছুতেই উচিত নয়। আমি নির্জনে বসে ইবাদতকারীদের চেয়ে মাদরাসার শিক্ষকদেরকে উত্তম মনে করি। আমি এখানে মুরীদদের তরবিয়ত ও তালকীনের যে কাজ করছি অন্যখানে হলে আমি কিতাবাদি পড়াতাম। - [আল কাওলুল জামীল-৭৯]

আলেমদের সম্মান রক্ষা করা এবং তাদেরকে দুর্নাম থেকে বাঁচানো

আমার এটা সহ্যই হয় না যে, একজন ইলমহীন মূর্খ লোক কোন আলেমের ব্যাপারে আপত্তি করবে কিংবা তার মানহানী করবে। 'বিঘরা' একটি কসবা। সেখানে একটি মাহফিল হয়েছিল। উলামায়ে কেরামের সম্মানে সভাস্থল সুসজ্জিত করা হয়েছিল। আড়ম্বরপূর্ণ প্যান্ডেল সাজানো হয়েছিল। দেওবন্দের কিছু আলেম এ অবস্থা দেখে মাহফিল থেকে ফিরে যান। ঘটনাক্রমে তার কিছু

www.banglakitab.weebly.com

দিন পূর্বে একবার 'লাটুস লেফট্যানেন্ট' গভর্নর দেওবন্দ মাদরাসা পরিদর্শনে গিয়েছিল। সেখানে তার জন্য অনুরূপ কৃত্রিমতাপূর্ণ আয়োজন করা হয়েছিল। আজ এখানকার অবস্থা দেখে আলেমদের চলে যাওয়ার কারণে একজন আমার সামনে আপত্তি জানাল যে, মাওলানাগণ নিজেদের জন্য সবকিছু জায়েয করে নেন আর অন্যদের জন্য নাজায়েয করে রাখেন। আমি বললাম, মেহমানকে তার রুচি অনুযায়ী সম্মান ও আপ্যায়ন করতে হয়। সেখানকার অতিথি ছিল একজন দুনিয়াদার, তাই তার জন্য ওটাই ছিল সম্মান। আর এখানে অতিথি হয়েছেন উলামায়ে কেরাম। এটা তাদের সম্মান নয়। তোমরা কিছু বোঝ না। উভয়টিকে একই রকম মনে করছ। উভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

আমার এ জবাবের উদ্দেশ্য হল, জনগণ যেন আলেমদের উপর অভিযোগ করার দুঃসাহস না পায়। যে লোকটি আপত্তি করেছিল তার সাথে আমার এ কথা হয়েছিল। আমি তাকে আরো বলেছি, আমি স্বীকার করি উক্ত জবাব আমি এ নিয়তে দেইনি যে, এমন আয়োজন করা ভালো। এ ব্যাপারে আমিও তোমাদের সাথে একমত। কিন্তু নিয়তের বিষয়টি বাদ দিলেও আমি যে কারণটি বর্ণনা করেছি তা সঠিক কিনা? তিনি বললেন, কারণটি তো সম্পূর্ণ সঠিক। আমি বললাম, উপরোক্ত জবাব প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হল, জনগণের হৃদয় থেকে যেন আলেমদের সম্মান ও ভক্তি দূর না হয়ে যায়। কেননা, তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা কমে যাওয়া বড় বিপদজনক বিষয়। যদি জনগণের অন্তরে আলেমদের প্রতি ধারণা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য কোন পথ থাকবে না। তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমি তো বলি, আলেম যতই বদ আমল হোক না কেন, ফতুয়া দেওয়ার সময় সঠিকটিই দিবে। - [আল ইফাজাত-১/২২৩]

মাদরাসা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা

হযরত বলেন, সময় সময় মাদরাসার হিসাব-নিকাশ জানার জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধিদল যারা আসে তাদের কোন প্রশ্নের জবাব দিবে না এবং মাদরাসা সম্পর্কে তাদের সাথে কোন আলোচনা করবে না; বরং তাদেরকে সাফ বলে দিবে, আপনাদের কিছু বলার থাকলে শূরা-সদস্যদের কাছে বলুন। তারা আমাদেরকে বলবেন এবং আমাদের থেকে জেনে তারাই আপনাদেরকে বলে দিবেন। এটা হল নিয়মসিদ্ধ জবাব।

দেওবন্দ মাদরাসার হাঙ্গামার সময় আমি মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে বলে পাঠিয়েছি যে, সাধারণ অভিযোগ ও আপত্তিকারীদের সাথে প্রশ্নোত্তর করার মাঝে উপকার

www.banglakitab.weebly.com

নেই। যারা মাদরাসার ব্যাপারে আপত্তি করে তাদের সামনে একবার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরবেন। তারপর আর কোন কথার জবাব দিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ এ কথা ঘোষণা করে দিন যে, আমরা সঠিক নীতিমালার আলোকে মাদরাসা পরিচালনা করব এবং আয়-ব্যায়ের হিসাব বছরে একবার প্রকাশ করব। জনে জনে হিসাব দিতে আমরা বাধ্য নই। এ শর্ত মোতাবেক আমাদের প্রতি কারো আস্থা হলে চাঁদা পাঠাবেন, অন্যথায় পাঠাবেন না। - [আল কালামুল হাসান-৫৪]

কাউকে কোন ব্যাপারে যোগ্য মেনে নেওয়ার পর তার কর্মকাণ্ডে আপত্তি না করা উচিত। যদি কারো কোন কাজের হেকমত বুঝে না আসে তো কোন এক অবসরে তার কাছ থেকে নিবেদনের ভঙ্গিতে তা জেনে নেয়া যেতে পারে। মৌলিকভাবেই আপত্তি তোলার অবকাশ নেই। কেননা, নিয়োগ দেয়ার সময়ই তাকে সে ব্যাপারে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মানা হয়েছে।

কিছু কিছু মানুষ মাদরাসায় গিয়ে নানা ধরনের মতামত প্রদান করে। কেউ বলে, সিলেবাস এমন হওয়া উচিত; তেমন হওয়া উচিত। কেউ বলে মাদরাসায় স্বনির্ভরতামূলক শিক্ষা দেয়া দরকার। যাতে লেখাপড়া শেষ করে ছাত্ররা বেকার না থাকে, স্বনির্ভর হতে পারে। আমি বলি, মাদরাসার ব্যাপারে তোমরা কী জানো? যাদের হাতে মাদরাসা পরিচালনার ভার রয়েছে তারাই এ ব্যাপারে ভালো জানবেন। সিলেবাসে কী থাকবে, কী থাকবে না সে ব্যাপারে তারাই ভালো বুঝবেন। তোমরা তাদেরকে যোগ্য স্বীকার করেই তো তাদের হাতে মাদরাসা তুলে দিয়েছো। তাই তাদের মতামতের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিবে না।

হাঁ, তারা অযোগ্য প্রমাণিত হলে তাদেরকে সরিয়ে যোগ্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া হোক। আর তাদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাদের সিদ্ধান্তে দখল দিবে না। এক ব্যক্তিকে কোন কাজের ক্ষেত্রে যোগ্য স্বীকার করার পর তার রায় না মানা বড়ই অন্যায় কথা। মোটকথা, যে ব্যক্তি যে কাজের যোগ্য তাকে একমনে সে কাজ করতে দাও। [আত্তাবলীগ-৭/২২]

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রসঙ্গ : ছাত্র ধর্মঘট [স্ট্রাইক]

জিজ্ঞাসা : দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংঘর্ষের ভিত্তিতে ধর্মঘট করা অর্থাৎ ক্লাশ বর্জন করার শরয়ী বিধান কী? সাধারণভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক শরয়ী কোন বিধান থাকলে দলিল-প্রমাণসহ লিখতে মর্জি করবেন। আর যদি কিছু বিস্তারিত আলোচনা থেকে থাকে তাহলে মেহেরবানি করে তা বিবৃত করবেন।

প্রশ্নটির সূত্র হল, ছাত্ররা মাদরাসায় এক সপ্তাহ ক্লাশ বর্জন করে হরতাল বা ধর্মঘট করেছিল। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের এ কর্মটি সঠিক কি-না? শরীয়তের আলোকে দলিল-প্রমাণসহ জানতে চাওয়া হয়েছে। - [এমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০১]

সমাধান : ধর্মঘটের স্বরূপ ও তার শরয়ী বিধান।

স্ট্রাইক ও ধর্মঘট হল এমন দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা যারা তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী। আর দীনি শিক্ষা দেওয়া হল ইবাদত এবং তার সাহায্য-সহযোগিতা হল ইবাদতের মাঝে সাহায্যকারী। এ কারণে তারা নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসের বাস্তবরূপ বলে পরিগণিত হবেন।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরে সহযোগিতা কর। [সূরা মায়েদাহ : ০২]

রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الدُّنْيَا مَلْعُونٌ وَمَا فِيهَا مَلْعُونٌ إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاه أَوْ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই অভিশপ্ত। কেবল আল্লাহর যিকির এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু, আলেম এবং তালিবুল ইলম অভিশপ্ত নয়।

www.banglakitab.weebly.com

তাছাড়া শিক্ষক মহোদয়গণ ছাত্রদের জন্য স্নেহশীল ও কল্যাণকামী। আর নিজের প্রতি অনুগ্রহকারীর সাথে সুসম্পর্ক ও হৃদ্যতা বজায় রাখার ব্যাপারে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

مَن لَّم يَشكُرِ النَّاسَ لَم يَشكُرِ اللهَ

যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করল না সে আল্লাহ তাআলারও কৃতজ্ঞতা আদায় করল না।

এ হাদীস থেকে উস্তাদবৃন্দের সাথে মহব্বত রাখার নির্দেশ পাওয়া যায়।

হাদীস শরীফে আরো এসেছে,

مَنْ عَلَّمَ عَبدًا اٰيَةً مِن كِتابِ اللهِ فهو مَولَاه لَايَنبَغِي اَن يَّخذُلَهٗ وَلَايَتَاَثَّرُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে কিতাবুল্লাহর একটি আয়াত শিক্ষা দিল সে তার মনিব হয়ে যায়। তার জন্য উচিত হবে না তাঁকে ছেড়ে দেয়া বা তাঁর উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া।

এ হাদীসে স্বীয় উস্তাদ এবং দীনের সাহায্যকারীদের প্রতি সম্মান, ভক্তি ও মহব্বতের সম্পর্ক রাখার নির্দেশ আবশ্যিকভাবে করা হয়েছে। আর এ আবশ্যিক সম্পর্ককে ছিন্ন করলে নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত ধমকের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ

তারা ঐ সব সম্পর্ককে ছিন্ন করে যা বজায় রাখার নির্দেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল এবং তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। [সূরা বাকরা ; ২৭]

উক্ত আয়াত দ্বারা ধর্মঘট নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হওয়া সাব্যস্ত হল। এটা হচ্ছে ধর্মঘটের সত্তাগত শরয়ী বিধান। আরেকটি বিধান রয়েছে 'আওয়ারেজ' ও আনষাঙ্গিক বিষয়ের দিক থেকে। তার আলোচনা বেশ দীর্ঘ। [ইমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০২]

www.banglakitab.weebly.com

ধর্মঘট অবৈধ হওয়ার প্রমাণ

স্ট্রাইক বা ধর্মঘট ইউরোপের আবিষ্কার। মুসলমানগণ তা সম্পর্কে অবগত ছিল না। এজন্য কুরআন, হাদীস ও ফেকাহর গ্রন্থসমূহে এ ব্যাপারে সরাসরি কোন বিধান পাওয়া জটিল হবে। তবে শরীয়তের মূলনীতির আলোকে তার বিধান জানা যায়। তাই বলা হয়, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মাদরাসায় ছাত্রদের ধর্মঘট করা শরীয়তের নীতিমালার আলোকে অবৈধ।

অবৈধ হওয়ার প্রথম দলিল

প্রথমতঃ এজন্য যে, ধর্মঘটের উদ্দেশ্য হল, কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং নিজেদের দাবী মানার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা। আর ছাত্রদের জন্য কোন অবস্থাতেই এ ধরনের প্রভাব সৃষ্টির অধিকার নেই। কেননা, ছাত্ররা হল শাসিত বা অধীনস্থ। আর কর্তৃপক্ষ হলেন শাসক। শাসিতদের উপর শাসক শ্রেণীর আনুগত্য করা ঐ সময় পর্যন্ত আবশ্যক যতক্ষণ তারা কোন প্রকার শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়ের নির্দেশ না দেয়। সুতরাং কর্তৃপক্ষের উপর ছাত্রদের প্রভাব বিস্তার করা শরীয়ত বদলে ফেলার নামান্তর। তাই ধর্মঘট জায়েয হতে পারে না। -[এমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০৩]

দ্বিতীয় দলিল

দ্বিতীয়তঃ ছাত্ররা মাদরাসায় ভর্তির প্রাক্কালে মাদরাসার নিয়ম-কানুন মান্য করার কথা স্বীকার করে থাকে। তাই ধর্মঘট করে তারা মাদরাসার নিয়ম ভঙ্গ করল। আর এটা সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল। এজন্য ধর্মঘটের অনুমতি হতে পারে না। - [প্রাগুক্ত]

তৃতীয় দলিল

যেহেতু মাদরাসার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা-দীক্ষা এবং মাদরাসার ভবনসমূহ পড়ুয়া ছাত্রদের আরামের জন্য নির্ধারিত। তাই পড়ালেখা বর্জন করা অবস্থায় মাদরাসার ভবন ব্যবহার করা একপ্রকার আত্মসাতের শামিল। যা বৈধ হতে পারে না। - [প্রাগুক্ত-২০৪]

ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ও ক্ষতি

ধর্মঘটের উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষকে এমন কিছু দাবী পূরণে বাধ্য করা যা তাদের উপর আবশ্যক নয়। আর এ অনাবশ্যকীয় দাবী-দাওয়া পূরণে কাউকে বাধ্য করা নিশ্চিতভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ।

www.banglakitab.weebly.com

প্রশ্ন হতে পারে, সে দাবীগুলো ধর্মঘটকারীদের প্রাপ্য অধিকার না হলেও তা আল্লাহ তাআলার অধিকার। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য সেগুলো আদায় করে দেয়া ওয়াজিব এবং সেগুলো অনাদায়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয হবে।

উত্তরে বলি, এ প্রশ্নটিও ভুল। কেননা, ধর্মঘটকারীরা এ অধিকারগুলো ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার প্রতি কখনোই ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা কেবল নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়ার অজুহাতে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। এতেই তারা ক্ষান্ত হয় না; বরং তারা কল্যাণকামী কর্তৃপক্ষের দুর্নাম করে, তাদের সমালোচনা করে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে দুস্কৃতিকারীদের ক্ষেত্রেও নাজায়েয। আর নির্দোষ পুন্যাত্মাদের ক্ষেত্রে কিভাবে জায়েয হতে পারে? [ইমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০২]

জুলুমের উপর জুলুম, অনিষ্টের উপর অনিষ্ট

যেসব ছাত্র ধর্মঘটে অংশগ্রহণ না করে নিরিবিলি থাকতে চায় ধর্মঘটকারীরা তাদেরকেও বাধ্য করে থাকে। এতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় ক্ষতি হয়ে থাকে। ফলে ধর্মঘটকারীরা يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ [তারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী] এবং لَاضَرَارَ فِي الْإِسْلَامِ [ইসলামে কারো ক্ষতি সাধন করা জায়েয নেই] এর মেসদাক বনে যায়।

এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত ক্ষতির সাথে সাথে স্বয়ং সাদরাসার ক্ষতি হয়ে তা জাতীয় ক্ষতিতে পরিণত হয়। [যেমনটি বর্তমানে দেখা যায়]।

বর্তমানে স্ট্রাইকগুলোতে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এক বা একাধিক নেতা গোছের ছাত্র অন্যান্য ছাত্রদেরকে নিজেদের শঠতামূলক বক্তৃতার মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য উত্তেজিত করে। আর যেসব ছাত্র তাদের এ বক্তৃতায় প্রভাবিত হয় না, তাদের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের দলে নিয়ে আসে। এসব কিছুই শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এজন্য স্ট্রাইকও অবৈধ। [ইমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০২, ২০৬]

একটি বড় বিপর্যয়

ধর্মঘটকারীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে মহল্লার ফাসেক ও বদদিল প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে, যারা [ছাত্রদের ধারণা মতে] কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি ও জঘন্য অন্যায়ে সদা লিপ্ত থাকে। এবং তাদেরকে এসব অন্যায় থেকে বিরত রাখার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। ফলে নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত সতর্কবাণী তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে :

www.banglakitab.weebly.com

يُرِيدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوتِ

তারা শয়তানের কাছে নিজেদের বিচার-আচার পেশ করতে চায়।

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ

তারা যেসব অপকর্ম করত তা থেকে তারা বিরত হত না।

সেই সাথে তারা বতিলপন্থীদের কর্মপদ্ধতি ও রীতিনীতিকে হকপন্থীদের রীতিনীতির উপর প্রাধান্য দেয়। যার ফলে নিম্নোক্ত আয়াতের ধমকীতেও নিপতিত হয়। ইরশাদ হয়েছে,

يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا
هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا

তারা জিবত ও তাগূতে বিশ্বাস করে। তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, 'এদেরই পথ মুমিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।' [সূরা নিসা : ৫১]

[এমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০৩]

ধর্মঘটের ক্ষতি এবং তা অবৈধ হওয়ার প্রমাণ

ধর্মঘটের মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে কয়েকটি ক্ষতির দকি রয়েছে। যেমন :

১. এটা ইউরোপ থেকে আবিস্কৃত বিষয় হওয়া।

২. শরীয়তের হুকুম পরিবর্তন করা।

৩. মাদরাসার কানুন ভঙ্গ করে অঙ্গীকার ভঙ্গের কাজে লিপ্ত হওয়া।

৪. অন্যকে ধোঁকা দেয়া।

৫. অন্যদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতি উৎসাহিত করা।

৬. পরিচালক ও কর্তৃপক্ষের উপর অবৈধ আক্রমণ করা।

৭. ধর্মঘটে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ছাত্রদের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

৮. মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এমন খারাবী সৃষ্টি করা যার সংশোধন অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ছাত্ররা যখন ধর্মঘট ও আন্দোলনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে তখন তারা মাদরাসার এমন কোন আইন চলতে দেয় না যা তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী হয়। আর এর পরিণাম ফেতনা-ফাসাদ হওয়া স্পষ্ট ব্যাপার।

www.banglakitab.weebly.com

আর কোন মাদরাসা এ অবস্থায় চলতে পারে না। যেন এর মাধ্যমে মাদরাসাকে ধ্বংস করে দেয়া হল। এ বিষয়গুলো এমন যেগুলো নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। এজন্য স্ট্রাইক, হরতাল ও ধর্মঘট নাজায়েয।

وَفِي مَفَاسِدِ هٰذَا الْعَمَلِ كَثْرَةٌ لَا تُحْصٰى ÷ وَعَلٰى مَنْ تَتَبَّعَ وَاسْتَقْرَأَ لَا تَخْفٰى

- [প্রাগুক্ত]

ধর্মঘট করার ক্ষতি

স্ট্রাইকের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল, স্ট্রাইককারী ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করতে গিয়ে সীমিত সময় কিংবা চিরদিনের জন্য দীনি ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং নিম্নোক্ত আয়াতের কাছাকাছি মেসদাকে পরিণত হয়ে পড়ে। ইরশাদ হয়েছে :

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ (سورة البقرة)

ঐ অবস্থা খুবই মন্দ যা গ্রহণ করে তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চায়। আর সে অবস্থা হল এই যে, তারা কুফরী করে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ বস্তুর কেবল এ ব্যাপারে জিদ ধরে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে পছন্দ করেন তার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ নাযিল করেন। - [প্রাগুক্ত]

ধর্মঘট সমর্থকদের বৈধতার প্রমাণ

বিজ্ঞ প্রাবন্ধিকের মূল উদ্দেশ্য হল, মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্ররা যে ধর্মঘট করেছে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণরূপে সঠিক এবং ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ছাত্রদের খাবার বন্ধ করে দেয়া কিংবা হল থেকে বের করে দেয়া জায়েয নেই। বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য তিনি চারটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম প্রমাণ :

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [রাদি.]-এর উপর অপবাদ আরোপের দায়ে হযরত আবুবকর [রাদি.] তার গোলাম মিসতাহ'র ভরণপোষণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, তার কোন উপকার করবেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে আখলাকীভাবে এ কসম থেকে বারণ করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় প্রমাণ :

বিশ্বের মধ্যে গ্রাম্য সামাজিকতা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। এতদসত্ত্বেও সকল গ্রামবাসীর মধ্যে বয়কট করার রেওয়াজ চালু রয়েছে। গ্রামের কেউ অন্যায় করলে অন্যরা তার ঘরে পানাহার বন্ধ করে দেয়। এটাও ধর্মঘটের সাধারণ একটি ধরণ।

তৃতীয় প্রমাণ :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রথম দিকে কুরাইশের সকলে একজোট হয়ে একটি অঙ্গীকারনামা লিখে পবিত্র কা'বাগৃহে ঝুলিয়ে রেখেছিল। অঙ্গীকারনামার বিষয়বস্তু এই ছিল যে, কুরাইশ বংশের কেউ তার কন্যাকে বনী হাশেম বা বনূ মুত্তালিবের কারো কাছে বিবাহ দিবে না। তাদের মাঝে লেনদেন ও বেচাকেনা করবে না। তাদের সাথে কথাবার্তা ও উঠাবসা করবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রমাণ :

ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে যখন কোন ব্যক্তি জাতীয় স্বার্থের উপর ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দিত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম [রাদি.] তার বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা নিতেন। তাবুকের যুদ্ধে হযরত কা'ব ইবনে মালেক, মুগিরা ইবনে রবীআ এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া [রাদি.] কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাদের এহেন কর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ রাগান্বিত হন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সকল সাহাবাকে তাদের সঙ্গে সালাম-কালাম, কথা-বার্তা ও উঠা-বসা করতে নিষেধ করে দেন। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে ক্ষমার ঘোষণা অবতীর্ণ হলে বয়কট তুলে নেন। - [বুখারী শরীফ]

এ হচ্ছে ধর্মঘট সমর্থকদের দলিল-প্রমাণের সারকথা। [এমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০৬]

ধর্মঘট সমর্থকদের দলিলের জবাব, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

বর্ণিত দলিলসমূহের মধ্যে প্রথম দলিল তথা হযরত সিদ্দীকে আকবর [রাদি.]-এর ঘটনার সাথে প্রচলিত ও বিতর্কিত ধর্মঘটের কোন সম্পর্ক নেই। পবিত্র কুরআন সেটি পছন্দ করেনি সেটা ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয় দলিল তথা গ্রাম্য বয়কট অর্থাৎ হুক্কাপান বন্ধ করে দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি নিজেই অনুমান করতে পারেন যে, শরয়ী জায়েয-নাজায়েযের সাথে তার কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে। আর একটি ধর্মীয় বিষয় প্রমাণিত করার জন্য গ্রাম্য

www.banglakitab.weebly.com

সভ্যতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা কতটুকু সঠিক হয়েছে। - [এমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০৬]

জায়েয হলে ছাত্রদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের ধর্মঘট করা জায়েয হতে পারত।

অবশ্য তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রমাণ তথা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশের বয়ক এবং তিন সাহাবীর বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বয়কটের প্রসঙ্গটি এ ধরনের বিতর্কিত বিষয়ে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত উল্লেখ করার সুযোগ রয়েছে। বস্তুত, মুসলমানদের বিশ্বাস মতে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিন-ইনসান, আরব-অনারব সকলের জন্য পথপ্রদর্শক ও শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর অবস্থান সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছে- إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا আমি বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।

এ হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল বনু আদমের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ছাত্রত্বের সম্পর্ক থাকা উচিত। সুতরাং বিজ্ঞ প্রাবন্ধিকের আলোচনার জবাবে আমাদের পক্ষ থেকে একথা বলা বেশি উপযোগী মনে হচ্ছে যে, কুরাইশরা নিজেদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যে বয়কট করেছিল তা যেহেতু শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রের বয়কট ছিল তাই সেটি নিঃসন্দেহে ঘৃণা ও নিন্দার যোগ্য [অবৈধ] ছিল।

পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর কতিপয় সাহাবীর বিরুদ্ধে উদাসীনতার দায়ে যে বয়কট হয়েছিল সেটি শিষ্যের বিরুদ্ধে শিক্ষকের বয়কট হওয়ার কারণে সঠিক এবং যথার্থ ছিল।

সে বয়কটের ফলাফল হযরত কা'ব ইবনে মালেক ও তার সঙ্গীদের ক্ষেত্রে এভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, যখন মুসলমানগণ তাদের সাথে সবধরনের সম্পর্ক ও লেনদেন বন্ধ করে দেয় তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করে কান্নাকাটি করেছেন। ফলে নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের ব্যাপারে সুসংবাদ নাযিল হয়েছে এভাবে,

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُم ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ- وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى

www.banglakitab.weebly.com

إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيهِم أَنفُسُهُمْ وَ
ظَنُّوا أَن لَا مَلجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ، إِنَّ اللهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটকালে–এমনকি যখন তাদের এক দলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন; তিনি তো তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্তেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত, পরে তিনি তাদের তওবা কবূল করলেন যাতে তারা তওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তাওবাহ : ১১৭, ১১৮]

প্রচলিত স্ট্রাইক সম্পর্কে যারা আলোচনা করেছেন তারা সকলেই ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ককে পিতাপুত্রের সম্পর্কের সাথে উপমা দিয়েছেন। আর উপমাটি এ হিসেবে খুবই উপযোগী যে, পিতার দৈহিক তরবিয়তের চেয়ে শিক্ষকের রূহানী তরবিয়ত কোন অংশে কম নয়। আর পিতা-মাতার বিরুদ্ধে সন্তানের বয়কটের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ লক্ষণীয়। ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا-(سورة لقمان)

যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করে যে, তুমি আমার সাথে এমন বস্তুকে শরিক করবে যার ব্যাপারে কোন দলিল তোমার কাছে নেই তাহলে তাদের একথা না মানা এবং তাদের সাথে দুনিয়াতে সুসম্পর্ক রাখা।

অতএব, ছাত্ররাও শিক্ষকের বিরুদ্ধে [বিশেষভাবে] শিক্ষক যদি ছাত্রের আখলাক সংশোধনকারী হন] এর চেয়ে বেশি কিছু করার অধিকার রাখে না।

এ হিসেবে মক্কার কুরাইশ এবং তাবুক যুদ্ধের যে ঘটনা দ্বারা বিজ্ঞ প্রাবন্ধিক বয়কট ও ধর্মঘট বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নিজের দাবী প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন

www.banglakitab.weebly.com

তা থেকে তাদের বিরুদ্ধেই একথা প্রমাণিত হল যে, কোন জাতীয় কিংবা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাদের শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক বা হরতাল-ধর্মঘট করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। আর যদি শিক্ষকগণ কখনো কতিপয় ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ স্ট্রাইক করেন তাহলে তা শুধু জায়েযই হবে না; বরং উত্তম কর্ম বলে বিবেচিত হবে। والله اعلم

[এমদাদুল ফাতাওয়া-৬/২০৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছাত্রদেরকে মাদরাসা থেকে বিহষ্কার করা প্রসঙ্গ

যেসব ছাত্রকে মাদরাসায় না রাখা উচিত

১. বড় পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, মাদরাসার কিছু কিছু ছাত্রকে সুন্নতের খেলাফ দাড়ি রাখতে এবং শরীয়তের পরিপন্থী পোশাক পরতে দেখা যায়। তাদের উপর সবচেয়ে বেশি আযাব রয়েছে। প্রথমতঃ এ কারণে যে, তারা অন্যদের তুলনায় বেশি অবগত। দ্বিতীয়তঃ তারা জনগণকে নসিহত করে, মাসআলা বলে অথচ নিজে আমল করে না।

আমলহীন আলেমের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে সাংঘাতিক ধমকী এসেছে। তাদেরকে দেখে দেখে সাধারণ মূর্খ জনগণ গোমরাহ হয় এবং তাদের গোমরাহীর দায়ভারও তাদের উপর বর্তায়।

মাদরাসার মুহতামিম ও শিক্ষকবৃন্দের উপর আবশ্যক হল, যে ছাত্র এরূপ আচরণ করবে কিংবা শরীয়তবিরোধী কোন পোশাক পরবে সে যদি তাওবা করে ফেলে তাহলে তো ভালো। অন্যথায় তাকে মাদরাসা থেকে বের করে দেয়া উচিত। এমন ব্যক্তিকে জাতির নেতা বানানো মানে গোটা জাতিকে ধ্বংস করা। ছাত্রদের সব বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদেরও খোঁজ-খবর রাখবে। যারা কোট-প্যান্ট পরে তাদেরকে আলেমদের পোশাক কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে নসিহত কর। অন্যথায় মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করে দাও। পোশাক পরিপূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী হোক বা আংশিক হোক সর্বাবস্থায় তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও যে, যদি ইলম হাসিল করতে এসে থাক, তাহলে তালেবুল ইলমদের বেশভূষা গ্রহণ কর, অন্যথায় চলে যাও। [মাজাহিরুল আমাল-৫৫]

www.banglakitab.weebly.com

২. কারো আখলাক-চরিত্র খারাপ হলে প্রথমে তার আখলাক সংশোধনের ব্যবস্থা নিবে। প্রতিটি কথায় তাকে ধরা হবে। যদি সংশোধনের আশা না হয় তাহলে মাদরাসা থেকে বের করে দেয়া হবে। - [তাজীমুল ইলম-২৪]

৩. আমি এমন লোককে মাদরাসায় রাখার পক্ষপাতি নই যার দ্বারা অন্যদের কষ্ট হয়। [মাকালাত]

৪. অনুরূপভাবে যে ছাত্রদের স্বভাব বক্র বলে মনে হয়, শান্ত না হয়, তাকে পূর্ণ সিলেবাস পড়াবেন না। কারণ, সিলেবাস সম্পন্ন করার পর যে নিজে এবং অন্যরাও তাকে আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তি মনে করবে। আর এমন লোক আলেম হয়ে যে তাণ্ডব চালাবে তা বলাই বাহুল্য।

আমার মতে এ ধরনের লোকদেরকে জরুরি মাসায়েল সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস পড়ানো উচিত। এ সংক্ষিপ্ত সিলেবাস দ্বারা দীনের জরুরি বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে বলে দেয়া হবে- যাও, দুনিয়ার কোন কাজ শিখে হালাল রিজিক উপার্জন করো। - [তাজীমুল ইসলাম]

আগের যুগের আলেমগণ যে ছাত্ররে মাঝে দুনিয়াবী পদ ও মর্যাদা লাভের ব্যাধি প্রত্যক্ষ করতেন তাকে ক্লাশ থেকে বের করে দিতেন। [আল কালামুল হাসান-৫৫]

আলেম কিংবা পথপ্রদর্শক হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তার মধ্য হতে বড় শর্ত হল তার মধ্যে সত্য অনুসরণ থাকতে হবে এবং নফসপূজা থাকতে পারবে না। অন্যাথায় নিজের লোভের কারণে মাসআলা বদলে ফেলবে।

এ জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য আমার পরামর্শ হল, নিজেদের আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে হলে মন্দচরিত্রের লোকদেরকে মাদরাসায় ভর্তি করবেন না। ছাত্র সংখ্যা কম-বেশি হওয়াকে মোটেও পরোয়া করবেন না; বরং যে ছাত্রের অবস্থা দেখে অনুভব করবেন যে, সে জাতির পথপ্রদর্শক হওয়ার যোগ্য নয়, তাকে সঙ্গে সঙ্গে মাদরাসা থেকে বের করে দিবেন। কারণ, আমরা অনেককে মাওলানা বানানো জায়েয মনে করি না।

এসব লোভীদের কারণেই বর্তমান আলেম সমাজের বদনাম হচ্ছে। যার মধ্যে নিজ মতের পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাধি রয়েছে সে কিছুতেই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নয়। যদি তার এ ব্যাধির বিকিৎসা না করা হয় তাহলে তার এ অভ্যাস সবসময়ের জন্য সুদৃঢ় হয়ে যাবে। যে কথাই তার দু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে পড়বে সেটিই সাব্যস্ত করার চেষ্ট করবে। সত্য মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তবের কোন তোয়াক্কা করবে না। এতে দীনের উপর যে প্রভাব পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। - [তা'জীমুল ইলম-৪১]

www.banglakitab.weebly.com

চতুর্থ অধ্যায়

মাদরাসার শাখা ও বিভাগ

মাদরাসায় খানকার ব্যবস্থা তথা সুলূক ও আত্মশুদ্ধির চর্চা থাকা আবশ্যক

বর্তমানে যারা খানকা প্রতিষ্ঠা করেন তাদের উচিত হল খানকা নাম না দেয়া; বরং মাদরাসার নাম দিয়েই তাতে খানকার কাজ করা। কেননা, প্রথমতঃ খানকার নাম বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ এক সময় খানকার মধ্যে বিদআত হতে থাকে। কেউ উরস করে, কেউ কাওয়ালী ও গান-বাজনার আসর বসায়। হতে হতে গদ্দিনিশীন হওয়া নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর চেয়ে উত্তম হল খানকার নাম না দিয়ে সরাসরি মাদরাসা বানাও এবং তাতে আখলাক গঠন ও আত্মশুদ্ধির কাজ করো। সেটাই হবে প্রকৃত প্রাণসম্পন্ন মাদরাসা এবং সেটাই হবে রসম-রেওয়াজ বর্জিত খানকা।

মোটকথা, যেখানে ইলমের সাথে আমলেরও তালীম এবং গুরুত্ব প্রদান করা হয় সেটিই হল প্রকৃত মাদরাসা। হে মাদরাসার কর্তৃপক্ষ! তোমরা তোমাদের মাদরাসাগুলোর খোঁজ-খবর রাখ এবং তাকে প্রকৃত মাদরাসায় পরিণত কর। অর্থাৎ ছাত্রদের আমলেরও খোঁজ-খবর রাখ। অন্যাথায় মনে রেখো হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ [তোমরা প্রত্যেকেই অধীনস্থদের দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে] এ নীতির আলোকে ছাত্রদের ব্যাপারেও তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কেননা, তোমরা ছাত্রদের 'নেগাহবান' এবং তারা তোমাদের অধীনস্থ। তাই তোমরা কেবল সবক পড়িয়ে আলাদা হয়ে গেলেই দায়িত্বমুক্ত হবে না; বরং তাদের মধ্যে কে তার ইলম তোমাবেক আমল করে আর কে করে না, তাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যার মাঝে আমলের 'ইহতিমাম' রয়েছে তাকে পড়াও, আর যার মাঝে আমলের ইহতিমাম নেই তাকে মাদরাসা থেকে বের করে দাও। আর তখনই মাদরাসা প্রকৃত 'দারুল উলূম' হবে।

ছাত্রদের সব ব্যাপারেই তত্ত্বাবধান করো। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিও খেয়াল রাখ। যারা কোট-প্যান্ট পরে তাদেরকে আলেম-উলামাদের জন্য শোভনীয় পোশাক পরিধানের ব্যাপারে নসিহত করো। না মানলে মাদরাসা থেকে বের করে দাও। বিজাতির সাথে পরিপূর্ণ কিংবা আংশিক সাদৃশ্য হোক, সে ব্যাপারে

www.banglakitab.weebly.com

কঠোর হও। তাদেরকে সুস্পষ্ট বলে দাও, যদি ইলম হাসিল করতে চাও, তাহলে তালেবুল ইলমদের ভূষণ গ্রহণ করো। অন্যথায় 'রুখসত' গ্রহণ করো।

মাদরাসার পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি

আমার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক মাদরাসায় এ মর্মে বারবার পত্র লিখেছি যে, আপনাদের মাদরাসায় যেমন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে পড়ালেখা শিক্ষা দেয়া হয় অনুরূপভাবে মাদরাসার পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ব্যাপকভাবে করা উচিত। ছাত্রদেরকে পড়ানো হল বিশেষ তাবলীগ আর জনগণকে দীন বোঝানো হল সাধারণ তাবলীগ। ছাত্রদেরকে পড়ানোর জন্য যেমন বেতন দিয়ে শিক্ষক রাখা হয় তেমনি মাদরাসার পক্ষ থেকে বেতন দিয়ে মুবাল্লিগ ও দাঈ রাখা উচিত। এদেরকে বিভিন্ন মহল্লা ও গ্রামে পাঠিয়ে জনগণকে দীন বোঝানো আবশ্যক। তাদেরকে বলে দেয়া যে, জনগণের কাছে কোন প্রকার চাঁদা না চাওয়া; বরং তাদেরকে শরীয়তের আহকাম শোনাবে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলছি, কেউ এ পরামর্শের প্রতি গুরুত্ব দেয়নি। অথচ এ পদ্ধতিতে অনেক উপকারের আশা করা যায়। এমনকি এ পদ্ধতিতে মাদরাসার জন্য চাঁদাও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। [মাজাহেরুল আমাল-৫৬১]

প্রতিটি মাদরাসায় কমপক্ষে একজন বক্তা থাকা আবশ্যক

প্রতিটি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ও সংস্থার পক্ষ থেকে একজন ওয়ায়েয ও বক্তা রাখা উচিত। মনে করতে হবে দীনি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন শাখা বৃদ্ধি করা হল। যেমনিভাবে মাদরাসার শিক্ষকগণ ছাত্রদের শিক্ষক তেমনিভাবে বক্তাগণও জনসাধারণের শিক্ষক। প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্তৃপক্ষ মনে করবেন সাধারণ জনগণের মাঝে দীনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য এটি প্রতিষ্ঠানের একটি পৃথক শাখা। - [আল কাওলুল জালীল-৪৩]

মাদরাসার অধীনে মুবাল্লিগ এবং বক্তা থাকার উপকারিতা

বর্তমানে মাদরাসা প্রতিষ্টা ও দীনি তালীমের প্রতি উলামায়ে কেরামের খুব মনোযোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আসলে এমনটি হওয়াও উচিত। কেননা, ইসলামী শিক্ষা টিকে থাকার ব্যবস্থা এটিই। এ দীনি শিক্ষা রক্ষার জন্যই তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে চাঁদা কালেকশন করে থাকেন। আর চাঁদা প্রদানকারীদের অধিকাংশই সাধারণ জনগণ। সুতরাং আলেমদের উচিত হল, সাধারণ জনগণকে তাদের প্রতি ধাবিত করা। আর তার একমাত্র পদ্ধতি হল প্রতিটি মাদরাসায়

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াজ ও তাবলীগ করার জন্য একজন শিক্ষক রাখা। যার কাজ হবে জনগণের কাছে গিয়ে শরীয়তের আহকামের তাবলীগ করা। তাকে জনগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকার হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে দেয়া হবে। এমনকি মাদরাসার জন্যও চাঁদা সংগ্রহ করতে নিষেধ করে দেয়াও ভালো হবে। কেউ স্বেচ্ছায় দিতে চাইলেও নিজে গ্রহণ না করে মাদরাসার ঠিকানা বলে দিবে। যিনি বক্তা হিসেবে নিযুক্ত হবেন তিনি চাঁদা আদায়কারী হবেন না। চাঁদা আদায় করার জন্য ভিন্ন লোক থাকবে। বক্তা শুধু ওয়াজ ও তাবলীগ করে বেড়াবে। এতে উপকার হল, যেহেতু তার ওয়াজে চাঁদা সংগ্রহ উদ্দেশ্য হবে না তাই তা হবে নিঃস্বার্থ ওয়াজ। আর এ ধরনের ওয়াজ শ্রোতাদের মাঝে বেশ প্রভাব ফেলে। তারপর মাদরাসার সাথে জনগণের সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। তারা নিজেরাই ভাববে যে, অমুক মাদরাসার মাধ্যমে আমরা দীনি ফায়দা লাভ করছি। তাই আমাদের সে মাদরাসার সাহায্য করা উচিত।

বর্তমানে তো জনগণের বড় আপত্তি হল, এসব মাদরাসা দ্বারা আমাদের কোন লাভ নেই? যারা আরবী পড়ে তাদেরই কিছু লাভ রয়েছে। আর বাস্তবেও একটি পর্যায় পর্যন্ত এ আপত্তি সঠিকই বলতে হবে। কেননা, যাদের কাছ থেকে আপনি চাঁদা সংগ্রহ করছেন তাদেরও তো মাদরাসা থেকে কিছু ফায়দা হওয়া উচিত। যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিটি মাদরাসা থেকে একজন বক্তা ও দাঈ নিযুক্ত করা উচিত। যদি প্রতিটি মাদরাসা থেকে একজন করে বক্তা জনগণের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যায় তখন দেখবেন মাদরাসার সাথে জনগণের কেমন সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং কী পরিমাণ চাঁদা আসতে থাকে।

এটি একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। সন্দেহ হলে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার উপকারিতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। আমি মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে বলি, পরীক্ষামূলক হলেও কিছুদিনের জন্য তা আমল করে দেখুন। যদি আপনাদের মাদরাসার কোন উপকার না হয়, তাহলে সে কাজ বন্ধ করে দেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আপনাদের রয়েছে। -[হুকুক ও ফারাইজ-১১৬]

বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বড় মাপের দাঈ ও বক্তা হবে

আমার অভিমত হল ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র যেমন দেওবন্দ ও সাহারানপুর মাদরাসার পক্ষ থেকে সব জায়গায় মুবাল্লিগ ও দাঈ থাকবে। বিশ্বের সব অঞ্চলে তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান হবে। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেখানে দাওয়াতের কাজ চালাবে।

www.banglakitab.weebly.com

সকল মাদরাসার উদ্দেশ্যে জরুরি পরামর্শ

আমি সকল মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, প্রতিটি মাদরাসা থেকে কিছু মুবাল্লিগ ও দাঈও থাকা উচিত। এটি সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর পড়া ও পাঠদান এ উদ্দেশ্যেরই ভূমিকামাত্র। তাবলীগই হল মূল উদ্দেশ্য।

কিছুদিন পূর্বে আমি দেওবন্দের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুবাল্লিগদের জামাত যাওয়া উচিত। যাদের কাজ হবে শুধু তাবলীগ করা। প্রতিটি শহরের জনবসতির অনুপাতে মুবাল্লিগ নিযুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। -[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ-৬/৩৮৯]

ওয়ায়েযের যোগ্যতা

যিনি ওয়ায়েয বা বক্তা হিসেবে নিযুক্ত হবেন তিনি গভীর ইলমের অধিকারী না হলেও চলবে। কিন্তু দীনি মাসআলা মাসাইল সম্পর্কে যথেষ্ট জানাশোনা অবশ্যই থাকতে হবে। যাতে আলোচনায় কিংবা কোন প্রশ্নের জবাবে ভুল কোন মাসআলা বর্ণনা না করে বসে। - [তাজদীদে ইলম-১৮৮]

মুবাল্লিগ ও বক্তার উদ্দেশ্য জরুরি দিকনির্দেশনা

১. বিনা প্রয়োজনে বিতর্কিত বিষয় উপস্থাপন করবে না। কখনো প্রয়োজন পড়ে গেলে সহজভাবে পেশ করবে। কারো নাম নিতে হলে তার সম্পর্কে কোন কঠোর মন্তব্য করবে না। স্বাভাবিকভাবে কেবল সংশয়ের সমাধান করে দিবে। কেউ মানুক আর না মানুক। এ নিয়ে চিন্তা করবে না।

২. সাধারণভাবে বক্তা কারো বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করবে না। তবে দাওয়াত প্রদানকারী জানাশোনা এবং মুখলিস হলে তার দাওয়াত গ্রহণ করতে কোন সমস্যা নেই। আবার অপরিচিত হয়েও যদি কাউকে মুখলিস মনে হয় তাতেও কোন সমস্যা নেই। তবে কোন অবস্থাতেই কারো কাছ থেকে নগদ অর্থ বা কোন উপহার গ্রহণ করবে না।

৩. বক্তা কোন রাজনৈতিক বিষয়ে কিংবা কারো ব্যক্তিগত বিষয়ের সমাধান কর্মে জড়িত হবে না। এ ব্যাপারে তাকে জোর অনুরোধ করা হলেও না। কেউ করলে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে।

www.banglakitab.weebly.com

৪. কাউকে তাবীয-কবজ দিবে না এবং কাউকে মুরীদ করবে না। সে উক্ত ব্যাপারে যোগ্য হলেও সম্পূর্ণভাবে তা থেকে বিরত থাকবে।

৫. কোন মাদরাসা কিংবা প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধও করবে না। উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া কেউ দিলেও নিজে গ্রহণ না করে সরাসরি মাদরাসায় পৌঁছে দেয়ার কথা বলবে।

লেখনী ও বক্তৃতায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

অন্যান্য বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি লেখনী ও বক্তৃতার ময়দানেও ভালো যোগ্যতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মাদরাসাগুলোতে উভয়টির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত। এগুলো ছাত্রদের জন্য ঐচ্ছিক না রেখে আবশ্যিক করে দিতে হবে। - [হুকুকুল ইলম-৫২]

তাবলীগের আরেকটি পূর্বপ্রস্তুতি রয়েছে। তা হল, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ। মাদরাসার মধ্যে এর ব্যবস্থা গ্রহণের দারুন সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ হাতছাড়া হতে দিবে না। এমন সুযোগ আর কোথাও পাবে না। [আদাবে তাবলীগ-১২১]

আমরা অনেক এমন আলেমও দেখতে পাই যারা লেখনী কিংবা বক্তৃতায় অক্ষম। তাদের দ্বারা খুব অল্প মানুষই উপকৃত হয়ে থাকে। আর লেখনীর তুলনায় বক্তৃতায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা বেশি। কেননা, লেখনী দ্বারা বিশেষ শ্রেণী তথা ছাত্র ও শিক্ষিত জনগণের উপকার হয়। আর বক্তৃতায় ব্যাপক উপকার রয়েছে। তাতে বিশেষ জনগোষ্ঠীও শামিল রয়েছে। তাই আমাদের ছাত্রদের জন্য উভয়টি যোগ্যতাই অর্জনের পূর্ণ চেষ্ট করতে হবে। যখন তারা ওয়াজ করবে তখন সাধারণ জনগণ পরিপূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন, আবার যখন কিতাব পড়াবে তখন ছাত্ররাও ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে। [তালীমুল বয়ান-১৫]

অশিক্ষিত দীনদার এবং শুধু হাফেজদের জন্য বিভিন্ন শিল্প শেখার পৃথক বিভাগ প্রসঙ্গে

এমন লোকদেরকে দুনিয়াবী কোন কর্মও শিখিয়ে দেয়া যেতে পারে। যাতে তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে দীনকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম না বানায়। এর জন্য সহজ পদ্ধতি হল, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা চাঁদা সংগ্রহ করে স্থানে স্থানে হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শেখার কোন প্রতিষ্ঠান চালু করবে এবং ছোটকাল থেকেই সকলকে কোন একটি হস্তশিল্প অবশ্যই শিক্ষা দেয়া হবে। - [ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত-৫০]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসায় বৈষয়িক শিক্ষা না শেখানোই গৌরবের বিষয়

দারুল উলূম দেওবন্দ সম্পর্কে বড় বড় ইংরেজ পণ্ডিত ও গবেষকগণ মন্তব্য করেছে যে, যদি এ মাদরাসার ধর্মীয় শিক্ষার মাঝে জাগতিক বিদ্যারও অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলে তার ধর্মীয় নিখাদ রঙ অক্ষুণ্ণ থাকবে না। যা এ মাদরাসার গৌরবের বিষয়। - [হুসনুল আযীয-৪/৩০৮]

হযরত মাওলানা ইয়াকুব [রহ.] একবার দস্তারবন্দী জলসায় বলেছিলেন, এ মাদরাসার অবস্থা দেখে অনেকের মনে একথা উদয় হতে পারে যে, এখানে জীবিকা উপার্জনের মতো কোন বিদ্যা শেখানো হয় না। তাদের সংশয়ের জবাব হল, আদতেই এ মাদরাসা এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর আমরাও দাবী করি না যে, এখানে পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানো হয়। এ মাদরাসা তো কেবল তাদের জন্য যাদেরকে পরকাল ভাবনা পাগল করে রেখেছে। - [হুসনুল আযীয-২/১১০]

মাদরাসায় উঁচু পর্যায়ের ইংরেজী ভাষা এবং জীবিকা উপার্জন বিদ্যা কেন শিক্ষা না দেয়া উচিত

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী [রহ.] বলেন, ইসলাম ও মুসলমানের কিছু হিতাকাঙ্ক্ষী ও বুদ্ধিজীবি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বলে থাকেন, মাদরাসার বর্তমান পাঠ্যক্রম সমাপ্তকারী ছাত্রদের জীবিকা উপার্জনের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এ শিক্ষা তো কেবল তাদের জন্য যারা পরকালের জন্য পাগলপারা এবং সর্বস্ব উৎসর্গকারী। যদি এসব মাদরাসায় কিছু ইংরেজী শিক্ষা এবং হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ চালু করা যেত তাহলে এ শিক্ষাটি সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য উপকারী হত।

উপরোক্ত প্রস্তাবের জবাবে হযরত নানুতুবী [রহ.] বলতেন, দীন ও আখেরাত প্রাত্যাশীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের সামর্থ্যে ছিল আমরা তা বাস্তবায়ন করেছি। আল্লাহর কোন বান্দার তৌফিক হলে সে তাদের জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থাও করে দিক।

তারপর তিনি বলেন, বাস্তবতা সাক্ষী যে, নগদ এবং বাকী উভয়টি যখন একত্রিত হয় তখন প্রত্যেকেই নগদকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বাকীতে কেউ রাজি হতে চায় না। মনে করুন, দীনি ইলম এবং আখেরাতের শিক্ষা হল বাকী পর্যায়ের। আর জাগতিক বিদ্যা ও শিল্প হল নগদ পর্যায়ের। উভয়টি একত্রিত হলে ফলাফল কী দাঁড়াবে? যেহেতু নগদের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি তাই দুনিয়াবী শিক্ষা ও

তার লাভের দিকেই সকলের মনোযোগ হবে এবং আখেরাতের শিক্ষা পিছনে পড়ে যাবে, এমনকি উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাবে।

(হযরত থানবী রহ. বলেন,) সুবহানাল্লাহ্! হযরত কী বলিষ্ঠ জবাব দিয়েছেন। যেন পরিণাম চোখে দেখে দেখে বলে দিয়েছেন। এটা তো কেবল ঐ ঈমানের নূর ও জ্যোতির প্রভাব যা বুযুর্গদের পুণ্য সান্যিধ্যের বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন।

তাই বলি, উক্ত পদ্ধতি উপকারী প্রমাণিত হবে না; বরং ক্ষতিকরই হবে। মাদরাসায় ইংরেজী অনুপ্রবেশের দ্বারা হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হবে। বর্তমানে মাদরাসায় 'টোটা-ফাটা' যতটুকু কাজ হচ্ছে তখন এতটুকুও হবে না। তখন মাদরাসা একটি মিশ্রিত পদার্থে পরিণত হবে। তার জন্য উত্তম পন্থা হল, মাদরাসাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিন। সেখানে যে কাজ হচ্ছে তা হতে দিন। আর ইংরেজীর জন্য পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানেই গড়ে তুলুন। কেননা, অন্যদের তত্ত্বাবধানকৃত প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী শিখলে ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যায়। তখন ছাত্রদের মাঝে দীনদারীর রঙ বাকী থাকবে না। মাদরাসা থেকে পৃথক হওয়ার পর স্কুল-কলেজে গেলে তাদের আমলী ও আখলাকী চেতনা অক্ষুণ্ন থাকা ভারি কঠিন হবে। ফলে গোমরাহী অনিবার্য। [আল ইফাজাত-২/১০]

জীবিকা নির্বাহের জন্য আলেমদের কোন শিল্প শিক্ষা করা উচিত

কোন এক আলেমের চাকরির আলোচনা এলে হযরত বলেন, আলেমদের জন্য ইলম ছাড়াও অল্প করে অন্য কোন শিল্প শিখে রাখা উচিত। আমার পরার্মশ হল, প্রয়োজন অনুপাতে কিছু চাষাবাদ করা যেতে পারে। তাহলে যখন বেশি প্রয়োজন দেখা দিবে তখন বেশি পরিমাণেও করতে পারবে। যেসব রমনী কখনো পালং থেকে নামেনি হাঙ্গামার সময় তারাও আত্মরক্ষার তাগিদে দশ বারো মাইল হেঁটেছিল। বিপদে পড়লে সবকিছুই করা যায়। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৩১৭]

আফসোস লাগে, মানুষ দীনকে আয়-রোজগারের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ এ ইলমকে তো একমাত্র 'ইসলাহে নফস' ও আত্মশুদ্ধির জন্য শেখা উচিত। তবে আয়-রোজগারের ব্যাপারে ভিন্ন কিছু করা যেতে পারে। ব্যবসা, চাষাবাদ, শিল্প ইত্যাদি যে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে। আর আয়-রোজগারের উপায় বানানোর নিয়তে দীনি ইলম শিক্ষা করা উচিত নয়। - [আল্ ইফাজাত-২/১০]

www.banglakitab.weebly.com

আলেমদের জন্য আয়-রোজগারের সহজ পন্থা

হস্তশিল্প জাতীয় কিছু গ্রহণ করে আয়-রোজগার করা বেশি নিরাপদ ও সহজ। মাদরাসা থেকে ফারেগীনদের জন্য জীবিকা উপার্জনের কয়েকটি উপযোগী পন্থা নিম্নরূপ:

১. ছেলেদের স্কুলে চাকরি করা। ২. চিকিৎসা করা। ৩. পাঠ্য কিতাব ছাপিয়ে ব্যবসা করা বা তার ভালো কোন শরাহ্ ও হাশিয়া লেখা কিংবা কেতাবত করা বা ছাপাখানায় প্রুপ দেখা ও সম্পাদনার কাজ করা। তবে সর্বাবস্থায় অবসর সময়ে অধ্যয়ন এবং কোন দীনি মাদরাসায় শিক্ষকতার কাজ চালিয়ে যাবে। [তাজদীদে তা'লীম-১১১]

আলেমদের জন্য চিকিৎসাকে প্রধান পেশা বানানো অনুচিত

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.] চিকিৎসাকে দীনদারীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করতেন। শিক্ষকগণ দীনদার না হলে ফাসেক হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আমি কিছু কিছু ডাক্তারের চিকিৎসালয়ে পতিতা ও যৌনকর্মীদের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করেছি। [হুসনুল আযীয-২/১৫৯]

আজকে আসা এক ছাত্রের পত্রে উপরোক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। সে ছাত্রটি এখানে পড়ত। তার পিতার চিন্তায় এলো ছেলেকে এমন কোন বিদ্যা শেখা উচিত যার দ্বারা আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে সে এখান থেকে চলে গিয়ে দিল্লী মাদরাসা তিব্বিয়ায় ভর্তি হয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিখে চিকিৎসার পেশা গ্রহণ করেছে।

এখন সে পত্রে লিখেছে যে, আমি মাদরাসা তিব্বিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গেছি। কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে আমার জানা হয়েছে যে, এমন জায়গায় পড়াশোনা করব যেখানে ইলমেদীন এবং চিকিৎসাবিদ্যা উভয়টি অর্জন করা যায়। আর ইলমেদীন এবং চিকিৎসাবিদ্যা একত্রিত হতে পারে না। প্রতিনিয়ত গুনাহে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করি। - [হুসনুল আযীয-২/৮২]

দীনি যিম্মাদারী পালনকারী আলেমদের স্বতন্ত্র পেশা গ্রহণের ক্ষতি

যারা আলেমদের ব্যাপারে আপত্তি করে বলে যে, এরা দুনিয়াবী উন্নতি ও অগ্রগতি কেন করে না, মেশিন ও কারখানা কেন চালায় না; তাদের ভালো করে জেনে রাখা উচিত যে, এক ব্যক্তি দু'দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। সরকারি কোন কর্মচারী যদি অন্য কাজ করে তাহলে নিঃসন্দেহে সরকারি

www.banglakitab.weebly.com

কাজে বিঘ্ন ঘটবে। এজন্য তাকে চাকরিরত অবস্থায় অন্য কাজ করার অনুমতি দেয়া হয় না। তদ্রূপ আলেমগণ যদি দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে দীনের কাজে ঘাটতি হবে।

একজন আলেম কোন মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। সাথে সাথে তিনি লাকড়ীর ব্যবসা করতেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, মাদরাসায় ছাত্রদের পড়াতে বসেছি। এমন সময় গ্রাহক এসে গেলেন। সে লাকড়ীর দাম করতে চাইল। এখন মাওলানা সাহেব দো'টানায় পড়ে গেল। ক্লাস ছেড়ে উঠলে মাদরাসার ক্ষতি, আর না উঠলে নিজের ব্যবসার ক্ষতি। বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হয় ভাই, একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি। এতে সামান্য মিথ্যাও পাওয়া যায়। মোটকথা, পড়ানো থেকে তার মন উঠে যেত। প্রথম দিকে তো হাসি-খুশিতে শান্ত মনে পড়াচ্ছিলেন কিন্তু এখন অন্য দিকে মন চলে গেছে। দায়সারাভাবে তাড়াহুড়া করে সবক পড়িয়ে দেন। ছাত্ররা কিছু জিজ্ঞাসা করলে রেগে যান। কেননা, তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে উঠতে দেরী হবে।

সুতরাং আলেমদের দুনিয়ার কাজে নিমগ্ন হওয়ার এই পরিণতি। এতে তারা দীনের কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। [আত তাবলীগ-২/৬]

দীনি দায়িত্বশীল আলেমদের জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত হওয়ার অনুমতি নেই

পবিত্র কুরআনের আয়াত لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا দ্বারা বোঝা যায় যে, এমন জামাতকে জীবিকা উপার্জনের কাজে নিমগ্ন না হওয়া উচিত।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে। এ থেকে এ সংশয়ও দূর হয়ে গেল যে, আলেমগণ পার্থিব জীবিকা উপার্জনে অক্ষম। আরো প্রমাণিত হল যে, এ অর্থে অক্ষম হওয়াটা আবশ্যক। এখানে রহস্য হল, এক ব্যক্তি একত্রে দুই কাজ করতে পারে না। বিশেষভাবে একটি কাজ যদি এমন হয় যে, প্রতিমুহূর্ত তাতে ব্যস্ত থাকতে হয়। মুখ, হাত ও অন্তর সব কিছু দিয়ে তাতে নিমগ্ন থাকতে হয়। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দীনের কাজ এমন ধরনেরই কাজ। আর দীনি ইলম শিক্ষা দেয়া জীবিকা উপার্জনের মধ্যে শামিল নয়; বরং তা দীনের বিরাট দায়িত্ব পালন।

যখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ তাদের মধ্যে অন্য কাজ করার শক্তিই নেই। শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শরয়ী শক্তি অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের অন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি নেই। এ বিষয়টি

www.banglakitab.weebly.com

আমি একটি উদাহরণ দিয়ে সুস্পষ্ট করছি। আমাদের এলাকার এক ব্যক্তি সরকারি চাকরিজীবি ছিল। এর ফাঁকে তিনি একটি ছাপাখানা দিয়েছিলেন। এক কান দু'কান করে এ খবর প্রশাসনের গোচরে চলে যায়। তখন তার নামে নোটিশ জারি হল যে, হয় তুমি সরকারি চাকরি থেকে অব্যহতি গ্রহণ করো অন্যথায় ছাপাখানা বন্ধ করে দাও। বলুন তো এ নির্দেশের হেতু কী ছিল? হেতু হল ছাপাখানা খোলা অবস্থায় তিনি চাকরির দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পারছিলেন না।

দুনিয়াদার আলেমের উপর থেকে আস্থা উঠে যায়

একদিন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক বৃদ্ধা নারী দরজা দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে ছিল। আমাকে দেখে ডেকে বলল, বৎস, এ দিকে এসো তো। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, একটি মাসআলা বলে দাও। আমি মাসআলা বলে দিলাম। তিনি বললেন, এ মাসআলাটি অমুক লাকড়ী বিক্রেতা আলেমের কাছেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুমি যা বলেছ তিনিও তাই বলেছিলেন। কিন্তু তার কথায় আমার আস্থা হয়নি। মনে হয়েছে তিনি নিজ স্বার্থ মোতাবেক মাসআলা বলেছেন। এখন তোমার কাছ থেকে জানার পর বিশ্বাস হয়েছে। আমি তখন বৃদ্ধাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আলেমদের প্রতি এমন ধারণা করা জায়েয নেই।

এটাই তো হল আলেমদের দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হওয়ার কুফল। তাদের মাসআলার প্রতিও আস্থা থাকে না। [আত তাবলীগ-৬৯]

উলামায়ে কেরামের জীবিকা নির্বাহ হবে কিভাবে

অনেক দুনিয়াদার জিজ্ঞাসা করে থাকে, এ যুগে মাদরাসায় পড়ে কী করবে এবং কোথা থেকে খাবে? নিয়মতান্ত্রিক জবাব হল, দুনিয়াদারদের কাছ থেকে সম্পদ উসূল করে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। কেননা, যারা মাদরাসায় পড়ছে তারা তো মূলতঃ দীনের প্রচার-প্রসার এবং হেফাযতে নিরত রয়েছেন। তারা মানুষের সংশোধনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন।

পবিত্র কুরআন হল মুসলমানদের সম্মিলিত সম্পত্তি। এজন্য তার হেফাযত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও সকলের কর্তব্য। কিছু মানুষ এমন থাকা দরকার যারা কেবল জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকবে। কেননা, সকলেই যদি জীবিকা উপার্জনের কাজে লেগে থাকে তাহলে দীন-ধর্মের অগ্রগতি হবে না। দীনের কাজে কেউ আত্মনিয়োগ না করলে দীনি কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য একটি জামাত শুধুমাত্র দীনের খাদেম ও সেবক হয়ে থাকা উচিত, যারা একাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না।

www.banglakitab.weebly.com

বোঝা গেল, আলেম সমাজ সাধারণ মুসলিম জনতার প্রয়োজনেই নিজেদেরকে দীনি কাজে আটকে রেখেছেন। আর ফেকাহর মূলনীতি হল, যে ব্যক্তি কারো কাজে নিজেকে আটকে রাখে তার ভরণ-পোষণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্বে থাকবে। এ ভিত্তিতেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর। কাজি ও বিচারকের বেতন বাইতুল মালের উপর এবং সাক্ষীর খরচ যার জন্য সাক্ষ্য দেয়া হবে তার উপর বর্তায়।

সুতরাং উলামায়ে কেরাম যেহেতু মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে নিমগ্ন থেকে তাদের ধর্মের হেফাযত করেন, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান প্রদান করেন তাই তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বর্তাবে। কেননা, এটা এমন ব্যস্ততা যার সাথে অন্য কোন কাজ করা যায় না। মানে অন্যটা করলে এ কাজে ঘাটতি এসে যায়। বাস্তবতা সাক্ষী, যারা এর সাথে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়েছে তাদের দ্বারা হেফাযতের কাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় হয় না। সুতরাং আলেমদের ভরণ-পোষণ ও জীবিকার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বর্তাবে। অতএব, আলেমগণ কোথায় খাবে, কী করবে এসব প্রশ্ন করা মানে নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/১৪২]

কুরআনী দলীল

ওহে মুসলিম জাতি! ভালো করে শুনুন, আলেম সমাজ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। উপরে বর্ণিত নিয়মের ভিত্তিতে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা আপনাদের উপর কর্তব্য। আর এটা যেমন শরীয়তের নিয়ম, তেমনি সমাজিকভাবেও এ নিয়ম স্বীকৃত। প্রথমে শরীয়তের দিকটি তুলে ধরছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الخ

লক্ষ্য করুন, আয়াতে বর্ণিত শব্দ للفقراء এর লাম বর্ণটি استحقاق বা অধিকার জ্ঞাপক। فقراء শব্দটি মুখাপেক্ষিতা নির্দেশ করে। احصروا শব্দটি আটক রাখা এবং في سبيل الله এর ব্যাখ্যায় তালিবে ইলমদের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর لايستطيعون ضربا দ্বারা জীবিকা নির্বাহের সুযোগ না থাকার ইঙ্গিত বহন করছে।

অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম ভরণ-পোষণের অধিকার রাখেন। তোমরা স্বেচ্ছায় না দিলে মামলা করে নিতে পারেন। মুসলিম জাতি তাদের সেবা-যত্নে ত্রুটি করলে কেয়ামতের দিন তারা জিজ্ঞাসিত হবে। দুনিয়াতে কেউ মামলা না করলে বা

www.banglakitab.weebly.com

আদালত মামলা গ্রহণ না করলে কেয়ামতে আল্লাহর আদালতে দেখতে পাবেন আপনাদের বিরুদ্ধে কত নোটিশ জারি করা হয়।

আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষেত্রে فقراء বা দরিদ্র শব্দ ব্যবহার করেছেন। বর্তমানকালে ফকীর শব্দটি অপমানকর শব্দ। এ ফকীর শব্দ যদি অপমানের হয়, যেমনটি মানুষ মনে করেছে, তাহলে শুনে রাখ আলেমরাই কেবল ফকীর নয়, কুরআনের ভাষায় গোটা বিশ্ববাসীর জন্য এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ

হে মানব সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর কাছে ফকীর ও দরিদ্র।

[দাওয়াতে আবদিয়্যত, ফাজায়েলে ইলম-৭/৩৯]

সামাজিক দলীল

এখন আমি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত করব। রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রী-এমপিরা যে ভাতা প্রাপ্ত হন, তার হাকিক কী? তার হাকিকত হল, জনসাধারণের কষ্টার্জিত এক পয়সা, দু'পয়সা সংগৃতীত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। কেন প্রদান করা হয়? রাজা ও মন্ত্রী-এমপিগণ জাতীয় কর্মকাণ্ডে এমনভাবে ব্যস্ত থাকেন যে, তাদের অন্য কোন কাজ করার সুযোগ থাকে না। [যদি প্রকৃতভাবে দায়িত্ব পালন করে] এজন্য জাতির সঞ্চিত সম্পদ থেকে তাদেরকে ভাতা দেয়া হয়ে থাকে। এ থেকেও বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি জাতীয় কাজে নিমগ্ন থাকবে জাতির সম্পদ থেকেই তার বেতন-ভাতা দেয়া হবে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত, ফাজাইলে ইলম-৭/৩৯]

দীনি শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার মাঝে পার্থক্য

জাগতিক শিক্ষায় তো দীন জোটেই না। এমনকি সকলের ভাগ্যে দুনিয়াও জোটে না। এক ভদ্রলোক সুন্দর বলেছেন, জাগতিক শিক্ষায় একটি পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছলে কোন কাজের হওয়া যায় না। আর ইলমেদীন যে যতটুকুই শিখে ততটুকুই উপকারে আসে। আখেরাতে তো উপকার রয়েছেই, দুনিয়াও হাতছাড়া হয় না। কেউ যদি দীনি শিক্ষা হাসিল করতে গিয়ে শুধু আযান শিখে, যা সবচেয়ে কম পর্যায়ের ইলম, তবু সে তার পেট পালতে পারে। দুই বেলা একেবারে রান্না করা খাবার খেতে পারে। পক্ষান্তরে জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারের নিচে যারা রয়েছে তাদেরকে তো বেকার মনে করা হয়। আর ইন্টার

www.banglakitab.weebly.com

পাশও বর্তমানে তেমন কাজে আসে না। কেননা, কলেজ-ভার্সিটি পাশ লোকের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে। ফলে প্রায় ডিপার্টমেন্টেই বি.এ, এম.এ সনদধারীরা পূর্ব থেকেই দরখাস্তের স্তুপ করে রাখে। উঁচু সনদ থাকতে ইন্টার পাশদের কে জিজ্ঞাসা করে? - [আত তাবলীগ-১০/২২০]

সামান্য দীনি শিক্ষার অধিকারীও না খেয়ে থাকে না

মাওলানা মুহাম্মদ ওমর সাহেব রহ. দীনি ইলম ও দুনিয়াবী শিক্ষার মাঝে খুব সুন্দর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, দুনিয়াবী শিক্ষা তো একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত না হলে নিষ্ফল। পক্ষান্তরে দীনি ইলমের কোন অংশও নিষ্ফল নয়। দীনি ক্ষেত্রে তো তা উপকারীই এমনকি দুনিয়ার ব্যাপারেও উপকারী। এমনকি কোন নবমুসলিম যদি শুধুমাত্র আযানের বাক্যগুলোও শিখে এবং কোন মসজিদে গিয়ে আযান দিতে থাকে আর মসজিদের লোটায় পানি ভরে রাখো, চাটাই বিছিয়ে দেয়, ঝাড়ু দেয়, এতেই তার খাবার আসতে শুরু করে। এটি দীনি শিক্ষার খুবই নিম্নস্তর। এতেই দুনিয়ার এ ফায়দা। আর আখেরাতের ফায়দা তো ভিন্নভাবে রয়েছেই। - [হুসনুল আযীয়-২/৮০]

মেট্রিক এবং ইন্টার পাশের অবস্থা

মেট্রিক পাশ শিক্ষিতদের চেয়ে তো ঐ মহিলারাই ভালো আছে যারা দুধ পান করিয়ে মাসে আট রূপি উপার্জন করে। মেট্রিক সনদধারীরা তো এতটুকুও পায় না। কানপুর কাস্টমে একজন পরিচারকের স্থান খালি হলে ৬ জন মেট্রিক পাশ প্রার্থী আবেদন করেছিল। এমনকি ইন্টার পাশও দুয়েকজন আবেদন করেছিল। এখন বলুন, সরকার কোথা থেকে চাকরি দিবে? - [হুসনুল হাযীয-২/২২৩]

ক্ষুদ্রতম চাকুরীও মূল্যায়নযোগ্য

গরিব-অসহায় মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহের সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল, চাকরি। হিন্দুদের অবৈধ সুদের মতো চাকরির বেতনও উঠতে বসতে বৃদ্ধি হতে থাকে। যে কোন চাকরিরই ব্যবস্থা হোক, তার মূল্যায়ন করা উচিত। [হুসনুল আযীয-২/১৫৯]

আলেম এবং ফকীহদের কাজ খুবই পরিশ্রমসাধ্য

কোন আল্লাহওয়ালা আলেমকে পরনির্ভর বলা যাবে না। কেননা, আলেম হলেন সরকারি লোক। চিন্তা করে দেখুন, একজন রাষ্ট্রপতি মাসে বেশ মোটা অংকের বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। অথচ বাহ্যিকভাবে তাকে বড় কোন কাজ করতে হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

তারপরও তাকে এত বেশি বেতন দয়ার কারণ হল, তিনি কায়িকভাবে কঠিন কোন কাজ না করলেও অন্যদের তুলনায় তাকে অনেক বেশি মেধা খাটাতে হয়। আল্লাহওয়ালা আলেমগণ দীনের জন্য প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ মেধা ব্যয় করেন আপনি কিছুদিন তা ব্যয় করলে পাগল হয়ে যাবেন। তাদের শরীর কর্মহীন হলেও আত্মা ও বিবেক বড় কাজের। তাদের আত্মা এ পরিমাণ বোঝা ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছে যা গ্রহণ করতে পাহাড়-পর্বতও সম্মত নয়। আসমান-জমিনও যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে আলেমগণ তা বরণ করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

যদি আমি এ কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি সেটিকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখতে। সূরা হাশর : ২১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ.

আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল। [সূরা আহযাব : ৭২]

মোটকথা, যাদের রূহ ও আত্মা এত বিশাল বোঝা বহন করেছে তাদেরকে কিভাবে নিষ্কর্ম ও বেকার বলা যেতে পারে? [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৮৭]

আমার অবস্থা

আমি বড় কিছু নই। তবে আমি যখন কোন বই বা পুস্তিকা রচনায় ব্রত হই তখন বহু রজনী বিনিদ্র কাটে। কাগজ-কলম সাথে নিয়ে ঘুমাই এবং যা মনে পড়ে তা রাতে উঠে উঠে লিপিবদ্ধ করি। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৭৯]

প্রকৃত আলেম না খেয়ে থাকে না

www.banglakitab.weebly.com

রয়েছে যার সামনে পৃথিবীর কোন স্বাদের মূল্য নেই। পৃথিবীতে এমন কি স্বাদ রয়েছে যা ইলমের সামনে এসে দাঁড়াতে সক্ষম? আর অন্ন-বস্ত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন। যার কাছে ইলম রয়েছে সে কখনো না খেয়ে থাকতে পারে না। এর চেয়ে বেশি তোমাদের আর কিসের প্রয়োজন? আলেমদেরকে 'ইস্তিগনা' ও অমুখাপেক্ষিতার শান অর্জন করতে হবে। [আত্ তাবলীগ-২১/১৬৫]

ওহে মুসলিম জাতি! স্মরণ রেখো, তোমরা যদি আলেম সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ না করো; বরং তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দাও তবুও এরা টিকে থাকবেন। তাঁরা খেয়েই থাকবেন। যদি জানতে চাও কিভাবে? কোত্থেকে? তাহলে বলছি, শোন, তারা কোত্থেকে খাবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ج فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ج وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ط وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ج وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم

দেখ, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন; তারা তোমাদের মতো হবে না। [সূরা মুহাম্মদ : ৩৮]

মোটকথা, তোমাদেরকে আল্লাহর রাহে দান করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণতা করছে। আর তার কৃপণতা তার জন্যই ক্ষতিকর। কেননা, আল্লাহ তাআলা হলেন ধনী এবং তোমরা হলে দরিদ্র। যদি তোমরা দায়িত্বে অবহলো কর তাহলে আল্লাহ তাআলা ভিন্ন একটি জাতি সৃষ্টি করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।

বেতন অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত

এক আলেম আবেগ তাড়িত হয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর কি আপনি ইলমেদীনের

www.banglakitab.weebly.com

খেদমত করবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই করব, তবে সেটি আল্লাহর ওয়াস্তে করব। আমি বললাম, আপনার ব্যাপারে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আপনি দীনি খেদমত করতে পারবেন না। একটু চিন্তা করে বলল, হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। হযরত বললেন, চাকরি ও বেতনের কারণে তো কিছু কাজ করে থাকেন। বেতন না হলে এতটুকুও হবে না। কেননা, বেতন থাকলে কিছুটা মানুষের ভয় থাকে, আর কিছুটা খেয়ানতের ভয় থাকে। চাকরি ছেড়ে দিলে তো কোন কাজই হবে না। [হুসনুল আযীয-২/২৬৫]

নফসের প্রবঞ্চনা

কিছুদিন পূর্বে একজন আলেম আমার কাছে এলেন। তার নফস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে পড়াবেন। কারণ, বেতন নিলে ইখলাস থাকে না। আমি তাকে বল্লাম, এটি শয়তানের ধোঁকা। শয়তান যখন দেখল যে, লোকটি দীনের কাজে লেগে আছে। তাকে এ পবিত্র কাজ থেকে যে কোন উপায়ে সরাতে হবে। তাই যদি সে বলে, তুমি পড়ানো ছেড়ে দাও তাহলে সে কিছুতেই ছাড়বে না। এজন্য এমন পন্থা আবিষ্কার করেছে যাতে দীনদারীর ছাপ রয়েছে। দীনদারীর প্রধান শর্ত তথা ইখলাসের দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছে। এখন তো চাকরির চাপে হলেও কিছু কাজ হচ্ছে, তখন কিছুই হবে না। ক্রমান্বয়ে পড়ানোই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন শয়তান জয়ী হয়ে যাবে। এজন্য চাকরি কিছুতেই না ছাড়া উচিত। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৩১]

স্বচ্ছল আলেমকেও বেতন গ্রহণ করা উচিত

আমার মতে কোন আলেম ধনী হলেও তাকে বেতন নিয়ে পড়ানো উচিত। মনে আবেগ ও জযবা থাকলে বেতন বাবদপ্রাপ্ত অর্থ মাদরাসায় দান করে দিবে। কিন্তু বেতন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যাতে গুরুত্বসহকারে দায়িত্ব পালিত হয়। আমাদের ফকীহগণকে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাঁরা লিখেছেন, কাজি ও বিচারক যদি ধনী হন তবুও তাকে বেতন গ্রহণ করা উচিত। তার কারণ হল, যদি কোন কাজি নিজ স্বচ্ছলতার দরুন বেতন না নেয় এবং তিনি দশ বছর যাবত দায়িত্বরত থাকে, তাহলে তার পরে কোন অস্বচ্ছল কাজি দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে তার জন্য বেতন জারি করা জটিল হয়ে পড়বে। সুবহানাল্লাহ! ফুকাহায়ে কেরামের কী ধরনের 'সমঝ' ও অনুভূতি ছিল। বস্তুত, তারা ছিলেন বাস্তবতা সম্পর্কে যথার্থ ওয়াকেফহাল। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৩১]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসা থেকে বেতন গ্রহণ করা কি অপমানের বিষয়?

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী রাজকোষ থেকে যে বেতন গ্রহণ করে থাকেন, তাও এজন্য যে, তিনি সর্বদা প্রজাদের কাজে নিয়োজিত। কেননা, বাদশা বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যাকে জনগণ নিজেদের হাকেম বানায় এবং বাইতুল মাল থেকে তাকে বেতন দেয়। এখন চিন্তা করে দেখুন, রাজকোষ কাকে বলে? আমি তার স্বরূপ তুলে ধরছি। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে এক পয়সা, দু'পয়সা করে চাঁদা আদায়ের পর সেগুলো যে কক্ষে রাখা হয় তাকে 'খাযানা' বা সরকারি ধনভাণ্ডার বলা হয়। এর মূল উৎস হল জনগণের চাঁদা। সেখান থেকে বাদশা বেতন প্রাপ্ত হন। শুধু 'রাজকোষ' শব্দের কারণে তার সম্মান বেড়ে গেছে। মানুষ বলে এটি রাজকীয় কোষাগার। অথচ জনগণের চাঁদাই হল তার মূল উৎস। এবার শুনুন, আলেমদের বেতন-ভাতা যেসব চাঁদা থেকে প্রদান করা হয় তাও অনুরূপ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দান। কিন্তু আলেমদের ক্ষেত্রে মানুষ চাঁদা বা কালেকশন শব্দ জুড়ে দেয় এবং এভাবে বেতন পাওয়াকে তারা অপমানকর মনে করে। অথচ একই জিনিস বাদশার জন্য অপমানকর মনে করে না। অবশ্য পার্থক্য এই যে, বাদশা বেতন পেয়ে থাকেন লাখ লাখ টাকা। তাই তাতে অপমান মনে করা হয় না। আর আলেম বেচারা বেতন পেয়ে থাকেন যৎসামান্য। তাই একে অপমানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আলেমরা ভিক্ষা করে খায়। অথচ চিন্তা করে দেখুন, উভয়টির স্বরূপ একই। আর স্বরূপ যদি একই সাব্যস্ত হয় তাহলে যিনি বেশি গ্রহণ করেন তার জন্য বেশি অপমান হওয়া উচিত ছিল। আর যিনি কম গ্রহণ করেন তার জন্য অপমানও কম হওয়া উচিত ছিল। অথচ সমাজের মূল্যায়ন চলছে উল্টো পথে। - [আত্ তাবলীগ-২/৭৪]

আলেমগণ যে কারণে বেতন-ভাতার যোগ্য

এখন কথা হল, বাদশা রাজকোষ থেকে বেতনের অধিকারী হওয়ার কারণ কী? তার কারণ হল তিনি রাজ্যের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এজন্য তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব প্রজাসাধারণের উপর ন্যস্ত। শুধু বাদশাই নন, মন্ত্রী-এমপি ও বিচারপতি সকলের বেতনই জনগণের চাঁদা থেকে দেয়া হয়। এটি বিবেকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হল। শরীয়তও এ নীতির সমর্থক। যেমন স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর আবশ্যক।

www.banglakitab.weebly.com

এখন বলুন তো, উক্ত নীতির আলোকে উলামায়ে কেরামও বেতন-ভাতা পাওয়ার যোগ্য কি-না? অবশ্যই যোগ্য। কারণ, তারাও জাতির দীনি খেদমতে আত্মনিয়োগ করে আছেন। এজন্য তাদের ভরণ-পোষণও জাতির দায়িত্বে আবশ্যক। কেননা, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আয়-রোজগারের কাজ থেকে মুক্ত না হন, দীনের কাজ করতে সক্ষম হন না। যদি জনগণ তাদের খেদমত না করেন তাহলে তারা কোথা থেকে খাবেন? [আত্ তাবলীগ-২/৭৪]

আলেমদের বেতন কারো অনুগ্রহ নয়

আলেমদের উপর কারো অনুগ্রহ নেই। কেননা, তারা যেমনিভাবে আপনাদের বেতন গ্রহণ করেন তেমনিভাবে আপনাদের দীনি খেদমতও করে থাকেন। তাদের বেতন দেয়া তো আপনার দায়িত্ব ছিল। দুনিয়াতে না দিয়ে থাকলে পরকালে আদায় হতে পারে। আলেমগণ যদি দীনি কাজে নিয়োজিত না থাকেন তাহলে শিক্ষা-দীক্ষা, দাওয়াত-তাবলীগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং দীনের সকল অঙ্গনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। [আত্ তাবলীগ- ২/৭৫]

বেতনের পরিমাণ কি হবে?

বস্তুত, বেতন দেয়া হয় ভরণ-পোষণ হিসেবে। আর ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে প্রয়োজন অনুপাতে। কিন্তু এতে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে। শ্রমিক বলে এ মাসে আমার পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হয়েছে। অপরজন বলবে আমার বিশ টাকই ব্যয় হয়েছে। এভাবে ঝগড়া-বিবাদ চলতে থাকলে পড়ালেখার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ সমস্যার কারণে শৃঙ্খলার জন্য বেতন বির্ধারণ করারও অনুমতি রয়েছে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৪/৩৮]

আমি বলি, এতে আলেমদের দোষ নেই। দোষ তাদের যারা তাদের লোভী বানিয়েছে। জনগণের উচিত ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের উপযুক্ত বেতন নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে যথার্থ মর্যাদার সাথে রাখা। আক্ষেপের বিষয় হল, লোকজন আলেমদেরকেও কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে এবং তাদেরকেও লোভী মনে করে থাকে।

বেতন কম ধার্য করলে ইলমেদীনের অবমূল্যায়ন হবে

যদি আমাদের মাঝে আসলেই দীনের মর্যাদা ও মূল্যবোধ থাকত তাহলে কুরআনের ধারক-বাহকদের কষ্ট ও পরিশ্রমের মূল্যও বেশি নির্ধারণ করতাম। আসলে আমরা দীনের অবমূল্যায়ন করছি। এজন্য ইমাম মুয়াজ্জিন ও শিক্ষকদের

www.banglakitab.weebly.com

বেতন এত কম ধার্য করে থাকি। মৃতদের খাবার এবং কাপড় দ্বারা তাদের সাহায্য করে থাকি। চারদিন, দশদিন এবং চল্লিশার খাবার তাদের জন্য বরাদ্দ করে থাকি। - [আত্ তাবলীগ-১০/৭০]

প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন কেবল জায়েযই নয়; বরং উত্তম এবং পছন্দনীয়

একজন আলেম জিজ্ঞাসা করেছেন যে, দীনি কিতাবাদী পড়িয়ে প্রয়োজনের বেশি পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয কি-না? আমি বললাম, জায়েয। বিশেষভাবে এ যুগে। কারণ, আসবাব ও উপকরণ গ্রহণ করা অল্পেতুষ্টি ও আত্মার প্রশান্তি লাভের প্রকৃতিগত মাধ্যম। আর মানুষের আত্মিক দুর্বলতার এ যুগে অল্পেতুষ্টি ও চিত্তপ্রশান্তি খুবই বড় নেয়ামত। তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন কিভাবে জায়েয হবে? সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা ভালো। কারণ, অভাবের সময় নিরুপায় হয়ে দীন-ধর্ম ধ্বংস করে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য অবশ্যই বেতন গ্রহণ করতে হবে এবং সেখান থেকে কিছু অতিরিক্ত হলে তা সঞ্চয় করে রাখবে।

বৃহস্পতিবার মসজিদে মুয়াজ্জিনের জন্য যে রুটি আসে আমি তা জারি রাখার পক্ষপাতি। কোন কোন মুয়াজ্জিন তার প্রয়োজন না থাকার কারণে ফিরিয়ে দিত। আমি বললাম, ফিরিয়ে দিবেন না। হতে পারে এ অমুখাপেক্ষিতার অবস্থা চিরদনি থাকবে না। তারপর কোন মুয়াজ্জিনের প্রয়োজন হলে আর মানুষের অভ্যাস না থাকলে সে মুয়াজ্জিন বিরক্ত হয়ে মসিজদ ছেড়ে দিবে এবং মসজিদ বিরান ও অনাবাদ হয়ে পড়বে। শিক্ষকের বেতন গ্রহণের ক্ষেত্রেও এ যুক্তিটি প্রযোজ্য। কেননা, প্রথাটি চালু থাকলে মাদরাসার প্রতি সাহায্যকারীদের দৃষ্টি থাকবে। সেই সাথে বেতন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে পরোক্ষভাবে ইমাম শাফেয়ী [রহ.]-এর প্রতি আপত্তি উঠে। কেননা, তাঁর মতে বেতন গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ। [আল কালামুল হাসান-২৩]

বেশি বেতনের কারণে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া

কেউ এক প্রতিষ্ঠানে অল্প বেতনে চাকরি করছে। এ অল্প বেতনে তার সংসার সুন্দরভাবে চলছে। এ অবস্থায় অন্য কোথাও শুধু বেশি বেতনের কারণে চলে যাওয়া আল্লাহ তাআলার নাশোকরী হবে। আমি কানুপুর মাদরাসায় শিক্ষকতা করার সময় এক জায়গা থেকে একশত রুপি বেতনের আমাকে আহ্বান করা হয়েছিল। সে সময় কানপুরে আমার বেতন ছিল চল্লিশ রুপি। আমি উত্তরে লিখেছিলাম, যে ব্যক্তি এক জায়গায় কর্মরত আছে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত নয়; বরং যে বেকার ও কর্মহীন পড়ে আছে তাকে ডেকে নিন। যাতে

www.banglakitab.weebly.com

তার প্রয়োজন পূরণ হয়। আরেকটি কথা হল আমি যদি এখন আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাই তাহলে আমার প্রতি আপনার আস্থা রাখা উচিত হবে না। কেননা, যে ব্যক্তি বেশি বেতনের আশায় আপনার এখানে এসেছে সে অন্য কোথাও এর চেয়ে বেশি বেতন পেলেও সেখানে চলে যাবে। [আল কালামুল হাসান-২৩]

বেশি বেতনের আশায় অন্যত্র চলে গেলে শান্তি জোটে না

বেশি বেতনের মোহ আলেম এবং হাফেজদেরকে শেষ করে দিল। যত মানুষ এখান থেকে শুধু বেশি বেতনের কারণে চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে তারা জীবনে স্বস্তি লাভ করতে পারেনি। যদি কারো প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ হচ্ছে তাহলে শুধু বেশি বেতনের কারণে কোন স্থান থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা নোশোকরী হবে। অবশ্য যদি আগের বেতন প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মতো না হয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন অন্যত্র যেতে অসুবিধা নেই। [হুসনুল আযীয-২/২২৪]

যে ব্যক্তি এমদাদুল উলূম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র অধিক বেতনের উদ্দেশ্যে অন্য মাদরাসায় চলে গেছে তার ভাগ্যে স্থিরতা জোটেনি। অথচ এটা বড় জিনিস। এর সামনে রাজত্বেরও কোন মূল্য নেই। [হুসনুল আযীয-২/৩৬]

মুখলিস এবং অমুখলিসের পরিচয়

আমার মতে ‘উজরত’ (পারিশ্রমিক) ও ‘নাফকাহ্’ (ভরণপোষণ)-এর মধ্যে ব্যবধানের মাপকাঠি হল, কোন শিক্ষক কোন মাদরাসায় বেতন নিয়ে পড়াচ্ছেন। সেখানে তিনি ২৫ টাকা বেতন পান এবং এ বেতনে তার প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে। প্রয়োজন পূরণ হওয়ার অর্থ হল, উক্ত বেতনে চলতে কষ্টও হবে না আবার বিলাসিতাও হবে না। এ অবস্থায় যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অধিক বেতনের প্রস্তাব আসে যেখানে দীনের খেদমত এখান থেকে বেশি হবে না, তাহলে দেখতে হবে তিনি সেখানে চলে যেতে চান কি-না? যদি যেতে না চান তাহলে তার বেতনটি হবে ‘নাফকাহ্’ পর্যায়ের এবং তিনি হবেন মুখলিস ও আখেরাত অন্বেষণকারী। আর যদি তিনি চলে যান তাহলে তার বেতনটি হবে ‘উজরত’ (বিনিময়) পর্যায়ের। আর তিনি হবেন দুনিয়া প্রত্যাশী। অবশ্য এতেও গুনাহ হবে না। কারণ, পরবর্তী আলেমগণ

www.banglakitab.weebly.com

দীনি ইলম শিক্ষা দিয়ে বেতন নেয়া জায়েয বলে ফতুয়া দিয়েছেন। তবে এ শিক্ষকতার মাঝে তিনি কোন সওয়াব পাবেন না। কেননা, তার উদ্দেশ্য কেবল বেতন। এ অবস্থায় এ শিক্ষকতা ইবাদত বলেও গণ্য হবে না।

আর যদি বেতন এ পরিমাণ কম হয় যে, অভাব ও কষ্টে দিন যাপন করতে হয় অথবা দিন যাপন করতে কষ্ট হয় না কিন্তু সেখানে অন্য অসুবিধা থাকে যেমন পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ, একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা অথবা অনুরূপ আরো কোন সমস্যা থাকে তাহলে এমতাবস্থায় অন্য প্রতিষ্ঠানে যাওয়া নিন্দনীয় নয়। কেননা, তখন তার উদ্দেশ্য অধিক বেতন নায়; বরং অসুবিধা ও 'রোকাওয়াট' দূর করা।

অথবা যদি অন্য জায়গায় বেতন বেশি হওয়ার পাশাপাশি দীনের কাজও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এ অবস্থায়ও অন্য প্রতিষ্ঠানে যেত অসুবিধা নেই। কেননা, তার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে বেশি করে দীনের কাজ করা। বাকী অন্তরের ব্যাপার আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। নিজের নিয়ত দেখে নিজেই সিদ্ধান্ত করে নেয়া উচিত। - [আত্ তাবলীগ-১২/১০৮]

www.banglakitab.weebly.com

পঞ্চম অধ্যায়

মাদরাসার সংশোধন প্রসঙ্গ

মাদরাসার সংশোধন খুবই জরুরি

মাদরাসাগুলোতে এমন কিছু বিষয় পরিলক্ষিত হয় যার সংশোধন খুবই জরুরি। সেগুলোর সংশোধন না হলে আলেম সমাজ আপত্তিকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দা ও ভর্ৎসনার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। সেই সাথে মাদরাসার রূহ তথা ইলম মোতাবেক আমলের দিকটিও দুর্বল হয়ে যাবে। সেসব বিষয় দেখলে অন্যান্যরা দীনি ইলম থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে এবং আলেম সমাজই তার হেতু বনবেন। প্রকারান্তরে যেন তারা يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ এর মেসদাক ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। - [হুকুকুল ইলম-৮৫]

মাদরাসাসমূহের ইসলাহ ও সংশোধন খুবই প্রয়োজন। আলেম সমাজে ইসলাহ মানে আলম তথা বিশ্বের ইসলাহ। - [তাজদীদে ইলম-৭৮]

বেতন নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা উচিত

হযরত বলেন, অনেক ভদ্রতা ও বিনয় প্রকাশকারী আদতে প্রতারক হয়ে থাকে। যে নিজের ব্যাপারে বেশি বলে সে অনেক বিকৃত হয়ে থাকে। একজন হাফেজ সাহেব সাদরাসায় নতুন এলেন। আসার সাথে সাথে মাদরাসার পক্ষ থেকে তার বেতন ধার্য করা হল। বেতন পাওয়ার পর তিনি চলে গেলেন। হযরত বলেন, এমন সমস্যা এজন্য সৃষ্টি হয় যে, নতুন আগমনকারী শিক্ষকদের আসার সাথে সাথেই নানা সুযোগ সুবিধা চালু করা হয়ে থাকে। এমনটি হওয়া উচিত নয়; বরং অপেক্ষা করা। যাচাই-বাছাইয়ের পর সুযোগ সুবিধা প্রদান করা উচিত। - [হুসনুল আযীয-১৯]

স্থানীয় ছাত্রদের ভাতা না দেয়ার তাৎপর্য

আমার অভিমত হল, মাদরাসায় মহল্লার শিক্ষক না রেখে বাইরের শিক্ষক রাখা অনেক ভালো। এতে অনেক সমস্যা রয়েছে। আমি একবার চিন্তা করলাম, স্থানীয় এবং বাইরের সকল ছাত্রদেরকে মাদরাসা হতে ভাতা দেওয়া উচিত। উভয় ধরনের ছাত্রকেই ভাতা পাওয়ার যোগ্য মনে করে তা দেওয়াও শুরু হল। কিন্তু বাস্তবে অনেক সমস্যা ধরা পড়েছে। আইনের ভিত্তিতে কোন অপরাধের

www.banglakitab.weebly.com

কারণে কোন ছাত্রের ভাতা বন্ধ করারও প্রয়োজন পড়ে। দূরের কোন ছাত্র হলে তা নীরবে মেনে নেয়। আর মহল্লার কোন ছাত্র হলে দশ পনের জন সুপারিশকারী দাঁড়িয়ে যায়। ফলে মাদরাসার আইন বহাল রাখা ভারি মুশকিল হয়ে পড়ে। তখন আমার বুঝে এসেছে যে, বড়দের কথায় দখল দেওয়া ঠিক নয়। তাঁরা যে আইন-কানুন তৈরি করে গেছেন তা সবই যথার্থ। - [মালহুজাতে জাদীদ-১৫৫]

তরিবয়্যত ও চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা

একটি ত্রুটি এই যে, অনেকে শিক্ষাকে জরুরি মনে করলেও তরবিয়্যত ও চরিত্র গঠনকে জরুরি মনে করে না। অথচ শিক্ষার চেয়েও চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্বদিক দিয়ে বেশি। কারণ, পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা 'ফরযে আইন' নয়। অধিকাংশ সাহাবী পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। সেটা তাদের জন্য আবশ্যক করে দেয়া হয়নি। কিন্তু আত্মশুদ্ধি সকলের জন্য ফরয ছিল। এভাবে সাধারণ শিক্ষাও মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং আত্মশুদ্ধিই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। কারণ, তা'লীম হচ্ছে শিক্ষাদান করা আর তরবিয়্যত হল আমল করানো। আর ইলমের দ্বারা আসল উদ্দেশ্যই হল আমল। মোটকথা, আত্মশুদ্ধি পুঁথিগত শিক্ষা থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থায়ই এটা থেকে দৃষ্টি ফিরানো এবং একে আবশ্যকীয় মনে না করার সুযোগ নেই। - [ইসলাহে ইনকিলাব-২/১৯৭]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি। তার সহজ পদ্ধতি হল মাদরাসার পরিচালক কর্মচারী কিংবা সরাসরি ছাত্রদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার গোটা মাদরাসা পরিষ্কার করাবেন। - [হুকুকুল ইলম-৩২]

পরিধেয় বস্ত্র বেং শরীরের পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে

কৃত্রিমতা ও বাড়াবাড়ি না করে শরীর এবং কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ কাপড় তাড়াতাড়ি ময়লা ও দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। এজন্য সপ্তাহে অন্তত দু'বার গোসল করে কাপড় বদলানো উচিত। আর কারো যদি এতটুকু অবকাশ না থাকে তাহলে অন্তত গায়ের কাপড়গুলো ধুইয়ে পরিষ্কার করে নিবে। কাপড়ের মধ্যে লৌকিকতা এবং ইস্ত্রী করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হল ময়লা না থাকা এবং ঘামের দুর্গন্ধ না হওয়া। কারণ, দুর্গন্ধের কাণে অন্য লোকের কষ্ট হয়। বিশেষভাবে শিক্ষকদের কষ্ট হয়।

www.banglakitab.weebly.com

আপনারা হাদীস পড়েছেন,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

প্রকৃত মুসলমান সে, যার মুখ এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর ঘামের দ্বারা দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়ে অন্যদের কষ্ট হয়। তাই তো জুমার গোসল সুন্নত হওয়ার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, كَانَ يُوذِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا অর্থাৎ একজনের ঘামের গন্ধে অন্যদের কষ্ট হত বিধায় জুমার দিন গোসল করার হুকুম দেয়া হয়। হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে, কাচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে গমন করো না।

তাছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে নানা রোগ-ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুস্থ্যতার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার অনেক বড় প্রভাব রয়েছে। কেননা, পরিচ্ছন্নতার দরুন মনের মাঝে প্রফুল্লতা ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/৪৪]

আঙ্গীনা এবং কামরাসমূহের পরিচ্ছন্নতা

ইসলামে পরিচ্ছন্নতার খুব তাকিদ রয়েছে। এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতে গিয়ে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ

তোমরা তোমাদের বাড়ীর আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখো। বাড়ীর আঙ্গিনা নোংরা রেখে ইহুদীদের মতো হয়ো না।

আঙ্গিনা বলা হয় ঘরে বাইরে দরজার সম্মুখস্থ অংশকে। যেখানে ঘরের বাইরের অংশ পরিষ্কার রাখার এত গুরুত্ব সেখানে ঘরের অভ্যন্তর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব কতটুকু হবে তা বলাই বাহুল্য। বর্তমানকালের তালিবুল ইলমদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, খোদ কামরার ভেতর এক হাত পর্যন্ত ময়লা জমলেও তা পরিষ্কার করে না। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩৩]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা

আমের মৌসুমে মাদরাসার এখানে সেখানে আমের খোসা এবং বিচি পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমি থানাভবনে এক স্থানে একটি বড় ঝুড়ি রেখে দিয়ে সকলকে বলে দিয়েছি তোমরা খোসা এবং বিচি এদিক সেদিক না ফেলে ঝুড়িতে ফেলবে। এতদসত্ত্বেও কারো ঝুড়ি ব্যবহারের তৌফিক হয়নি। তার কারণ হল

www.banglakitab.weebly.com

মেজাজ ও স্বভাবে পরিচ্ছন্নতা নেই। এমনিভাবে গরমের কারণে অনেকেই আঙ্গিনায় ঘুমোয়। খুব কম সংখ্যককেই ঘুম থেকে উঠে নিজের চৌকিটি যথাস্থানে রাখতে দৈখা যায়। অধিকাংশই যত্রতত্র ফেলে রাখে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/৪৪]

নেগরান ও তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদ নির্ধারণ এবং তাদের দায়িত্ব

মাদরাসাসমূহে প্রতি দশ/বিশ জন ছাত্রের জন্য একজন বয়স্ক নেগরান নিযুক্ত করা জরুরি। যিনি ছোট ছাত্রদেরকে বড়দের সাথে উঠাবসা করতে বারণ করবেন। ছাত্রদের নামে কোন চিঠি এলে তিনি চেক করে দিবেন। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখবেন। ছাত্ররা সাদাসিধা পোশাক পরবে। ধনীর দুলাল হলে দামি পোশাক পরবে কিন্তু তা সাধারণ ডিজাইনের হতে হবে। নামাযের জামাতে তাদের উপস্থিতির ব্যাপারে চিন্তা করবেন। কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলে যথাসম্ভব তাদের সাথে থাকবেন। উপরোক্ত বিষয়ের কোনটির বিরুদ্ধাচরণ করলে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। - [তাজদীদে তালীম ও তাবলীগ-৮১]

ছাত্রদের আমল ও আখলাকের তদারকি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফরে আমাদের পিছনে রইলেন এবং এমন সময় এসে আমাদের সাথে মিলিত হলেন যে, নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা অজু করছিলাম। তাড়াতাড়ি অজু করতে গিয়ে আমার পায়ের কিছু অংশ শুকনো রয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দুই তিনবার উঁচু আওয়াজে বললেন, সাবধানব! ঐ গোড়ালির জন্য আযাব রয়েছে যা শুকনো থাকে।

বর্ণিত হাদীস থেকে ছাত্রের তিনটি হক ও অধিকার প্রমাণিত হল। একটি হল, ছাত্রকে শুধু শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না; বরং তাদের আমলের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে এর প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দেয়া হয় না। শিক্ষকগণ কেবল সবক পড়িয়ে দেয়াকেই জরুরি মনে করেন। [প্রাগুক্ত-১২৬]

ছাত্রদেরকে কানুনের প্রতি যত্নবান করে গড়ে তুলুন

এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অমুক সাহাবী এত দীর্ঘ নামায পড়ায়

www.banglakitab.weebly.com

যে, আমার আশঙ্কা হয় সাহস হারিয়ে জামাতই বর্জন করে বসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযুক্ত সাহাবীর উপর এ পরিমাণ রাগান্বিত হলেন যে, এর পূর্বে কখনো তাঁকে এত রাগ করতে দেখা যায়নি। তারপর তিনি বললেন, তুমি মানুষকে দীন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে ফেলছ। যে নামাযের ইমামতি করবে তার জন্য উচিত হল, নামায হালকা করে পড়ানো।

এ হাদীস থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হল। একটি হল, কোন শিক্ষকের পড়ানোর ব্যাপারে ছাত্ররা কোন অভিযোগ করলে তা শোনা এবং তদন্ত করার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ছাত্রদের অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেয়া উচিত হবে না। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, কোন ছাত্রের কোন ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারলে যদি রাগের সাথে সংশোধন করলে উপকার বেশি হয় তাহলে সেভাবেই করা উত্তম। - [তাজদীদে তালীম-১২৮]

ছাত্রদের বেশভূষা ও চালচলনের প্রতি লক্ষ্য রাখা

অনেক মাদরাসায় ছাত্রদের আমল-আখলাক, চাল-চলন ও বেশ-ভূষার প্রতি একেবারেই লক্ষ্য রাখা হয় না। সাধারণ জনগণ এবং স্বয়ং সে ছাত্রদের উপর এর যে মন্দ প্রভাব পড়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। - [হুকুকুল ইলম-৮৯]

এক ব্যক্তি কালো পাঞ্জাবী কালো পায়জামা ও কালো কটি পরে এলো। যা স্পষ্টই সাজসজ্জার পোশাক ছিল। হযরত বললেন, তুমি যে উদ্দেশ্যে মাদরাসায় এসেছো এ পোশাক তার জন্য উপযোগী নয়; বরং তার পরিপন্থী। এ ধরনের বেশ-ভূষা থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পোশাক পরলে মনে হয় কোন বড় নেতা এসে গেছেন। তারপর বললেন, এ গ্রীষ্মকালে কটি পরার উদ্দেশ্য সাজসজ্জা ছাড়া আর কী হতে পারে? যাও এ পোশাক পাল্টে এসো। হাদীস শরীফে এসেছে, اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ সাদাসিধে চলা ঈমানের নিদর্শন।

এ বেশ-ভূষা শরীয়তের বিধানে নিন্দিত না হলেও সুস্থ মস্তিষ্ক বলে দেয় যে, কোন আকৃতি ও বেশ-ভূষা কিসের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। মূল্যবান পরিধেয় যদি নিজের চিত্ত প্রফুল্লতার উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয় তাহলে তা জায়েয এবং এ আয়াতের অধীনে থাকবে- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ আর যদি মানুষের মাঝে গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয় তাহলে তা হারাম এবং এ আয়াতের অধীনে থাকবে- وَزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৪/৫৫]

www.banglakitab.weebly.com

আসাতিযায়ে কেরাম ও তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি উপদেশ

হে জাতির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং প্রত্যেককেই তার অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

তাই শিক্ষক মহোদয়গণকে বলি, আপনারা হলেন আপনাদের ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। তারা আপনাদের অধীনস্ত। আপনারা যদি তাদের আমল-আখলাক সম্পর্কে খোঁজ-খবর না রাখেন তাহলে কি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না? এজন্য ছাত্রদের সকল অবস্থা সম্পর্কেই আমাদেরকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়া উচিত। খুব বেশি গোয়েন্দাগিরী করতে হবে না। কথা-বার্তা, চাল-চলন ও অন্য কোন উপায়ে তাদের কোন দোষ-ত্রুটি ও অসঙ্গতি ধরা পড়লে সে ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক করতে হবে। সবিশেষ চারিত্রিক দুর্বলতার সংশোধন আবশ্যিকভাবে করতে হবে। ফরয এবং ওয়াজিব আমলসহ সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলগুলো পালনের জন্যও তাদেরকে বাধ্য করা উচিত। - [আদাবুল মুতাআল্লিমীন-১০৮]

দুষ্ট ও অবাধ্য ছাত্রের সংশোধন পদ্ধতি

কানপুর মাদরাসায় একটি ছেলে ছিল ভারি দুষ্টু। শিক্ষকগণ তাকে পড়াতে পড়াতে ত্যক্ত হয়ে গেলেন এবং তার সংশোধনে নিরাশ হয়ে গেলেন। এক মৌলভী সাহেব বললেন, আমি তাকে পড়াতে পারব। তিনি তাকে পড়াতে শুরু করলেন। তিনি একটি নিয়ম করলেন যে, প্রতিদিন দুষ্টু ছেলেটিকে দশটি বেত্রাঘাত করবেন। প্রথম দিন যখন তাকে দশ বেত প্রয়োগ করলেন, সে বলল, হুজুর আমি কী অপরাধ করেছি? হুজুর বললেন, অপরাধ বলতে কিছু নেই, তবে এটা তোমার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ব্যস, এভাবে দশ বেত প্রয়োগ করে তাকে সংশোধন করলেন। - [হুসনুল আযীয-২/১৯৩]

ইসলামী এবং আরবী পরিভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে

মানুষ শব্দকে সাধারণ বিষয় মনে করে। অথচ শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দ দ্বারাই বিবাহ সংঘটিত হয় এবং শব্দ দ্বারাই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। শব্দের কারণেই

www.banglakitab.weebly.com

মানুষ মুসলমান হয় এবং শব্দের কারণেই কাফের হয়। শরীয়তে শব্দের এ পরিমাণ গুরুত্ব রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ

অর্থাৎ কারো যদি বমি বমি ভাব হয় তাহলে সে একথা বলবে না যে, আমার তবিয়ত (স্বভাব) খারাপ; বরং বলবে আমার বিম বমি ভাব হচ্ছে। কেননা, মুসলমানের স্বভাব খারাপ হতে পারে না। যার কাছে ঈমানের অমূল্য সম্পদ রয়েছে সে কোন অবস্থাতেই খারাপ হতে পারে না। দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সাধারণ সাধারণ ক্ষেত্রেও শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। বোঝা গেল, শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি সুন্দর শিক্ষা লক্ষণীয়। তিনি বলেন-

لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَهَا الْعَتَمَةَ

অর্থাৎ জাহেলী যুগে এশার নামাযের সময়কে 'আতামাহ্' বলা হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরবের বর্বর লোকেরা যেন 'আতামাহ্' শব্দের ব্যবহারে তোমাদের উপর জয়ী না হয়ে যায়। অর্থাৎ তোমরাও যেন তাদের মতো আতামাহ বলতে শুরু না করো।

বর্ণিত হাদীস থেকে শিক্ষা পেলাম যে, শরীয়ত যে শব্দকে নিজের কোন পরিভাষা রূপে গ্রহণ করেছে মুসলমানদের জন্য সে পরিভাষাই ব্যবহার করা উচিত। সেটি পরিহার করে বিধর্মীদের পরিভাষা ও শব্দ গ্রহণ করা উচিত নয়।

নিজেদের পারস্পরিক কথা-বার্তায় ইসলামী শব্দ ব্যবহারের নির্দেশটিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো সাধারণ ব্যাপার মনে হবে কিন্তু তা পরিহার করার মাঝে যে অনিষ্ট ও ক্ষতি রয়েছে তা অনুধাবন করলে বিষয়টির মূল্য ও গুরুত্ব বুঝে আসবে। যদি সকল মুসলমান ইসলামী পরিভাষাকে মামুলি জিনিস মনে করে অন্য ভাষায় মাস গণনা শুরু করে তাহলে রমযান, ঈদ, হজ ইত্যাদি সম্পর্কে কারো খবর থাকবে না যে, কবে এলো আর কবে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়ে কেবল শব্দকে সংরক্ষণ করেননি; বরং এর দ্বারা তিনি দীন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হল, বর্তমানে লোকজন এটিকে সাধারণ বিষয় জ্ঞান করে। [আসবাবুল ফিতনা, আত্ তাবলীগ-১০/৩০-৩৩]

www.banglakitab.weebly.com

আরবী মাস এবং তারিখ ব্যবহার প্রসঙ্গ

একটি বিষয় মনে পড়ে গেল। সে ব্যাপারেও কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। সেটি হল, দৈনন্দিন জীবনে আমাদেরকে আরবী মাস ও তারিখ ব্যবহার করা উচিত। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্য মাসের ব্যবহারে সমস্যা নেই। যেমন মানি অর্ডারে দস্তখত করতে গিয়ে কিংবা আদালতের কাগজপত্রে। এছাড়া দৈনন্দিনের কথা-বার্তা, পরস্পর চিঠিপত্রে আরবী মাস ব্যবহার করা উচিত। কেননা, এতে অন্যান্য মাস ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই। অতএব, বিনা প্রয়োজনে ইসলামী পদ্ধতি ও রীতিনীতি পরিহার করে অন্যদের রীতিনীতি কেন ব্যবহার করব? কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়টির প্রতি একটুও ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অধিকাংশ যুবকেরা আরবী মাসের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে। ফলে অনেকের খবরও থাকে না যে, রমযান কবে, ঈদ কবে। আর যাদের খবর আছে তাও ইংরেজী মাসের মাধ্যমে। এক ভদ্রলোক বলতে লাগল, এবার ২০ জুলাই ঈদ হবে। অথচ ঈদ হচ্ছে ইসলামী বিষয়। অথচ তারা এ সময়টিও ইংরেজী মাসের মাধ্যমেই জানতে চায়।

আরবী মাস এবং তারিখ ব্যবহারের শরয়ী বিধান

যেহেতু শরীয়তের আহকাম ও বিধিবিধানের ভিত্তি রাখা হয়েছে চন্দ্রমাসের উপর সেহেতু সংরক্ষণ ও মুখস্থ রাখা নিঃসন্দেহে ফরযে কেফায়া। আর তা মুখস্থ রাখার সহজ পদ্ধতি হল দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার করা।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ফরযে কেফায়া হল ইবাদত। আর ইবাদত সংরক্ষণের মাধ্যমও এক প্রকারের ইবাদত। সুতরাং চান্দ্রমাসের ব্যবহারও শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য বিষয় সাব্যস্ত হল। সৌরমাসের ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয নয়, তবে এটা সাহাবায়ে কেরাম (রাদি.) এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গদের আমলের পরিপন্থী হওয়ার কারণে নিঃসন্দেহে অনুত্তম বলে বিবেচিত।

www.banglakitab.weebly.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ছাত্র ও আলেম সমাজের সংশোধন

প্রথম পরিচ্ছেদ : আলেমদের করণীয়

আলেমদের উচিত দীনের সকল শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করা

ওহে আলেম সমাজ! আপনারা জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তি। এজন্য আপনাদের মাঝে দীনের সকল শাখার ইলম থাকা উচিত। আলেম তো তাকে বলা হয় যে ইলমের সকল বিষয়ে পরদর্শী হবে। 'হাসীন' বা সুন্দর তো তাকে বলা হয় যার নাক, কান, চোখসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাযথ হয়। যদি সবগুলো অঙ্গই সুন্দর হয় কিন্তু চোখ অন্ধ থাকে কিংবা নাক কাটা থাকে তাহলে তাকে সুন্দর বলা হবে না। অনুরূপভাবে দীনদার সে ব্যক্তি, যে দীনের সকল দিক মেনে চলে। [তাজদীদে তা'লীম- ২২৭]

তালেবুল ইলম ও আলেমদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সম্ভাষণ

[ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব আমলের মাঝে]

উলামায়ে কিরাম ও তালিবুল ইলম ভাইদেরকে সম্বোধন করে বলছি, আপনারা 'ইলম'-এর ধারক-বাহক হওয়াতে গর্ববোধ করেন, নিজেদেরকে সে ইলমের ফযীলত ও উঁচু মর্যাদার যোগ্য ও অধিকারী ভাবেন। জনগণের সম্মুখে আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি অধিকহারে পাঠ করেও শোনান। কিন্তু আপনাদের কি একথা জানা আছে যে, এতসব ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব কোন ইলমের ব্যাপারে? এ ফযীলত কি নিছক ইলমের নাকি আমলসমৃদ্ধ ইলমের? শুনুন! যদি কুরআন-হাদীসে আমলহীন আলেমের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী বিধৃত না হতো তাহলে আপনাদের গর্ব ও আত্মতৃপ্তি যেভাবেই হোক মানা যেত। কিন্তু যেহেতু কুরআন-হাদীসে এ সম্পর্কে বহু সতর্কবাণী ও ধমকী এসেছে, তাই নিছক 'ইলম' কিভাবে গর্বের কারণ হতে পারে শুনি? [আল ইফাজাত-৩/৫৩]

www.banglakitab.weebly.com

[সুহবতের প্রয়োজনীয়তা]

শুধু কিতাব পড়লেই ইলম অর্জন হয় না; ইলম ভিন্ন জিনিস। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইপুস্তক পড়ে কেউ ডাক্তার বনে যায় না; বরং যার মাঝে চিকিৎসার যোগ্যতা ও দক্ষতা সৃষ্টি হয় সেই ডাক্তার বলে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ক কিতাবাদি পড়ে নিলেই কেউ আলেম বনে যায় না এবং ইলমের হাকীকত লাভে ধন্য হতে পারে না। এতে শুধু কিছু শব্দ শেখা যায়। ইলমের হাকীকত লাভের জন্য কিতাবাদি ছাড়াও ভিন্ন একটি বস্তুর প্রয়োজন। আর সেটি হল আল্লাহ ওয়ালাদের 'সুহবত' ও সাহচর্য। জনৈক কবি সুন্দর বলেছেন,

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

সম্পদ, বই-পুস্তক আর ওয়াজ-নসিহত দ্বারা দীন আসে না।
দীন আসে বুযুর্গদের 'নেক নজর' দ্বারা।

আজকের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের পবিত্র সুহবত হতে বহু দূরে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কারো এর প্রতি ভ্রুক্ষেপই নেই। এজন্য প্রকৃত ইলমওয়ালার সংখ্যাও খুবই নগণ্য। [আত্ তাওয়াছী বিল হাক-৩৬]

মাওলানা সাহেবরা তো এ আত্মতৃপ্তিতে ডুবে আছেন যে, আমরা আরবী বই-পুস্তক ভালো বুঝি। কিন্তু এতে কি হবে? মূল উদ্দেশ্য তো হল ভিন্ন কিছু। আরবী জানা কোন কৃতিত্ব নয়; বরং আল্লাহকে জানা হল প্রকৃত কৃতিত্ব। [আনফাসে ঈসা-১/৪১১]

স্বীয় ইলমের উপর তোমরা বড় গর্বিত। নিজেদেরকে আলেম মনে কর। মনে রেখ, নিজেকে বিলীন করে না দিলে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ অনুভূতিটুকু জাগ্রত হবে না যে, আমি কিছুই নই। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কিছুই নও; বরং ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত। [আল ইফাজাত-৪/৩৮১]

আমরা ইলম শিখতে শিখতে পূর্ণতর স্থানে পৌঁছে 'আকমাল' হতে পারি কিন্তু 'আফযাল' ও উৎকৃষ্ট হতে পারি কিনা তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সন্দেহ নেই, একজন জাহেল ব্যক্তির তুলনায় একজন আলেম 'আকমাল' কিন্তু উভয়ের মাঝে কে 'আফযাল' তা আল্লাহ তাআলাই জানেন। কেননা, একমাত্র আলেমই আফযাল হবেন, এর কোন দলীল নেই। হতে পারে জাহেলের কলবে এমন

www.banglakitab.weebly.com

কিছু আছে যা আল্লাহর নিকট ইলমের চেয়ে অধিকতর প্রিয়। সুতরাং ইলমের ময়দানে কৃতিত্বের ভিত্তিতে নিজেকে আফযাল (শ্রেষ্ঠ) ভাবা কিছুতেই ঠিক হবে না। আর কামেল বুযুর্গের সুহবতেই কেউ আফযাল হতে পারে। [ইফাজাতে ইয়াওমিয়া-৩৬৮]

একবার উলামায়ে কিরামের কোন এক মজলিসে অহংকার ও যিনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত কথা উঠল একজন আলেম কিভাবে নিজেকে হীন ও তুচ্ছ ভাবতে পারে? এটাতো অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, যে ইলম শিখেছে সে কিভাবে একথা ভাববে যে, আমি পড়িনি। একজন হাফেজ কি নিজেকে গায়রে হাফেজ ভাবতে পারে? থানবী [রহ.] এর জবাবে বলেন, কোন 'কামাল' বা যোগ্যতার কারণে নিজেকে আকমাল মনে করা তো জায়েয কিন্তু আফযাল বা মাকবুল মনে করা জায়েয নেই। অর্থাৎ নিজেকে আলেম ভাবতে কোন সমস্যা নেই; বরং এই সঙ্গে নিজেকে আল্লাহর কাছে মাকবুল ভাবাই হল সমস্যা। সুতরাং এটা মনে করতে হবে যে, কোন ব্যক্তি জাহেল হলেও তার মাঝে এমন কোন গুণ থাকতে পারে যা আল্লাহর নিকট প্রিয়। পক্ষান্তরে আমরা বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মাঝে এমন কোন খারাবী থাকতে পারে যা তাঁর কাছে অপ্রিয়। [মালহুযাতে জাদীদ মালফুযাত : ১২৭]

প্রকৃত ইলম ও প্রকৃত আলেম

পবিত্র কুরআনে বনী ইসরাঈলদের প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। [বাকারা : ১০২

অতপর ইরশাদ হয়েছে,

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত।

প্রথমে বলা হয়েছ ولقد علموا (নিঃসন্দেহে তারা অবগত হয়েছে) এটা তাদের ওরফ অনুযায়ী বলা হয়েছে। কারণ, তারাও শুধু জানা এবং পড়াকেই ইলম বলে আখ্যায়িত করত। তারপর বলা হয়েছে لو كانوا يعلمون (যদি তারা জানতো)

www.banglakitab.weebly.com

এটা আল্লাহ নিজের দৃষ্টিতে বলেছেন এবং এর দ্বারা তাদের আমলহীন ইলমকে নাকচ করেছেন।

বোঝা গেল, শরীয়তের পরিভাষায় আলফায (শব্দ) এবং অর্থ জানার নাম ইলম নয়। কারণ, বনী ইসরাঈলের আলেমদের কাছে তো আলফাযের ইলম বিদ্যমান ছিল। তারপরও কুরআনে তাদের ইলমের অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। মোটকথা ইলমের সাথে যখন আমলের সমন্বয় ঘটে তখনই তা ইলম বলার যোগ্য হয়। একটি হাদীসে এসেছে, إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا (নিঃসন্দেহে বহু ইলম এমন রয়েছে, যা মূর্খতার নামান্তর) বলা বাহুল্য, একটি জিনিস একই সঙ্গে ইলম ও মূর্খতা হতে পারে না। তাই হাদীসের মর্ম হল, إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ النَّاسِ لَجَهْلًا عند الله অর্থাৎ ওরফে প্রচলিত অনেক ইলম আল্লাহর দৃষ্টিতে মূর্খতা বলে গণ্য হয়ে থাকে।

এ থেকে বোঝা গেল যে, কেবলমাত্র জানাজানির নাম ইলম নয়; বরং তার হাকীকত ও স্বরূপ ভিন্ন কিছু। আর সেদিকে ইঙ্গিত করেই একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'কিছু ইলম বান্দার স্বপক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে যখন আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে। সুতরাং একটি হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার যে, আমরা যারা নিজেদেরকে আলেম এবং ফকীহ মনে করি ইলম অনুযায়ী আমাদের আমল কতটুকু হচ্ছে। আমলের মাঝে ইলমের কতটুকু প্রভাব পড়েছে। আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা সাধারণ মুসলমানদেরকে নিজেদের চেয়ে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করি। মঞ্চ-মাহফিলে ইলমের যেসব ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করি তা কেবল নিজেদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই বলে থাকি। জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করি যে, আমাদের সম্মান করা উচিত। এটা বড়ই লজ্জার কথা। -[হুকুক ও ফারাইজ-৭৫]

উপকারী ইলম ও ক্ষতিকর ইলম

ইলম শিখেও যার মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি হয় না তার চেয়ে ঐ মূর্খই উত্তম যার মাঝে খোদাভীতি রয়েছে।

ইলম উপকারী ও ক্ষতিকর হওয়াকে তলোয়ারের ধারের সাথে তুলনা করা যায়। তার আঘাতে শত্রু-মিত্র উভয়ের দেহই কাটে। তরবারি সঞ্চালনকারী আনাড়ি হলে কখনো তা দিয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকে। যেমন কেউ শত্রুকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে আঘাত করল কিন্তু সেদিকে না গিয়ে তার নিজের গায়েই এসে পড়ল। ঠিক তেমনিভাবে ইলমেরও একই অবস্থা। তা বড়

www.banglakitab.weebly.com

স্পর্শকাতর জিনিস। তাতে নিরাপত্তা ও আশঙ্কা উভয়টিই নিহিত রয়েছে। কল্যাণের সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে। লক্ষ্য করবেন, পৃথিবীময় যতগুলো ভ্রান্ত দল সৃষ্টি হয়েছে তা শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরই সৃষ্ট। জাহেল ও মূর্খের কথা কে শুনে? [আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ : ৩৫২]

বর্তমান সমাজে আলেম হওয়ার ভুল মাপকাঠি

বর্তমানে যার মাঝে বক্তৃতা দেওয়ার কিঞ্চিত যোগ্যতাও থাকে এবং ঘটনাক্রমে জনগণের মাঝে দু'চারটি বক্তৃতা করে নাম করে ফেলতে পারে সেই হল জনগণের দৃষ্টিতে বিদগ্ধ গবেষক, অদ্বিতীয় আলেম এমনকি যুগের আল্লামা। আদতে সে পাক্কা জাহেল ও বদদীনই হোক না কেন। [আল ফাসলু ওয়াল ওয়াসলু-৪১৪]

দু'চারটি আরবী কিতাব পড়ে নিলেই কেউ আলেম বনে যায় না

বর্তমানে কেউ দু'চারটি আরবী কিতাব পড়ে নিলেই মানুষ তাকে মাওলানা বলতে শুরু করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে মাওলানা নয়। প্রকৃত মাওলানা তো সে ব্যক্তি, যে শরীয়তের আহকাম ও বিধিবিধান ভালোভাবে অনুধাবন করে তদনুযায়ী আমল করে। যিনি আল্লাওয়ালা হবেন তিনি কোন দিন শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারেন না।

বোঝা গেল, শুধুমাত্র আরবী বই-পুস্তক পড়তে পারলে, আরবী বলতে পারলে বা লিখতে পারলেই কেউ মাওলানা হয়ে যায় না। [তা'মীমে তালীম : ২৭]

আজকাল কিছু মানুষের মাঝে এ পাগলামি চেপে বসেছে যে, তারা আরবীতে বক্তৃতা দিতে পারাকেই বড় কৃতিত্ব এবং গর্বের কারণ মনে করে। আমি বলি, তোমরা যত বড় আলেমই হও না কেন, এমনকি যদি আবুল ইলম (ইলমের জনক)ও হয়ে যাও, তবু আরবী বলতে সক্ষম হবে না যেভাবে আবু জেহেল আরবী বলত। যদি আরবীতে কথোপকথন করার নামই ইলম হয়, এবং এটা কোন কৃতিত্ব হয়; তাহলে তোমাদের সকলের চেয়ে বড় আলেম আবু জেহেল হওয়া উচিত। অথচ সে আবু জেহেলই রয়ে গেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাকে আবু জেহেলই বলা হবে। [মাজাহেরুল আকওয়াল : ৬৬]

আমলই হল আসল

আসল বস্তু হল আমল। আমল ছাড়া সব কিছুই বৃথা। ইলমে জাহেরী হোক বা ইলমে বাতেনী হোক তাতে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। প্রকৃত ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব হল

www.banglakitab.weebly.com

আমলের মাঝে। আমল দ্বারা দীনের পূর্ণতা লাভ হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রাদি.)-এর একাডেমিক বা পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না। কিন্তু তাদের কবুলিয়ত বা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা দিবালোকের চেয়েও সুস্পষ্ট। তার কারণ হল তাদের কাছে ইলমের চেয়ে আমল বেশি ছিল। [ইফাজাত-৩/২১১]

আমলশূন্য গবেষণা-পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনর্থক

আমি আলেমদেরকেও বলি, আপনাদের এসব বক্তৃতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক গবেষণা ইত্যাদি সব পড়ে থাকবে যাবে। আত্মশুদ্ধির পথের সাধকদেরকেও বলি, আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন ওয়াজ, যওক, মাআরিফ ও হাকায়েক ইত্যাদি বেকার।

সাজসজ্জা ও ফ্যাশন চাকরের জন্য শোভা পায় না, খেদমত ও সেবা-ই তাকে মানায়।

ইমাম গাযালী [রহ.] লিখেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত জুনাইদ বাগদাদী [রহ.]-কে স্বপ্নে দেখল। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? বললেন, সকল ইবাদত, আসরার, নিয়ত ও ইশারাত ইত্যাদি গায়েব হয়ে গেছে। সেগুলো কোন কাজে লাগেনি। কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত কয়েক রাকাত নামায কাজে এসেছে যা রাতের আঁধারে পড়া হয়েছে।

সুধীবৃন্দ! মূল বস্তু তথা আমলকে মজবুতভাবে ধারণ করা হল বড় কাজ। মুখ্য বিষয়ের পাশাপাশি যদি অমুখ্য বিষয়ও শামিল হয়ে যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। যদি মুখ্য বিষয় অর্জন না হয় তাহলে বাকীগুলো কোন উপকার বয়ে আনবে না। [হুকুকুয যাওজাইন : ৫২৭]

ইলমের পর আমল ও ইখলাসের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলের পাশাপাশি তার অন্তরের খবরও রাখেন। তিনি লক্ষ্য রাখেন কার অন্তরে ইখলাস আছে এবং কার অন্তরে নেই। স্বীয় ইলম ও আমলের উপর গর্ববোধ করতে নেই। কেননা, ইবলিস শয়তান এবং 'বালআম বাউরা'ও এ ইলম ও আমলের অধিকারী ছিল। প্রসিদ্ধ মতে শয়তান ফেরেশতাকুলের উস্তাদ ছিল, আর বালআম বাউরা স্বীয় গোত্রের মান্যবর ওয়ায়েজ ছিল। তারা উভয়ে ইলমের পাশাপাশি বাহ্যিক আমলেও অনন্য ছিল। বড় ইবাদতগুযার ও কঠোর সাধনাকারী বুযুর্গ ছিল। কিন্তু অন্তর ছিল ইখলাস এবং আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও মারিফাতের পূর্ণ ঝলক থেকে শূন্য। এজন্য ইলম ও আমল বিনষ্ট হয়ে গেল।

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং ইলমের পাশাপাশি ভিন্ন একটি জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে, যার নাম ইসলাহে বাতেন বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি ছাড়া ইলম ও আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ বিশেষ অবস্থা কোন সাহেবেহাল বুযুর্গের জুতা সোজা করার বদৌলতে নসীব হয়। মোটকথা ইলম, আমল ও হাল তিনটিই হাসিল করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ইলম ও আমল-এর সাথে 'হাল' বা ইখলাসও আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শুধু তোমাদের জাহেরী আমল দেখেন না; বরং অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও খবর রাখেন। [হুকুক ও ফারাইজ]

ইখলাসের গুরুত্ব

ইখলাস শব্দটির সাথে সকলেই পরিচিত। কিন্তু তা নিজের মাঝে সৃষ্টি করার ভাবনা কারোর নেই। আমরা (আলেম সমাজ) ও নিজেদের অবস্থার প্রতি ভেবে দেখি না যে, আমাদের মাঝে কি কি ত্রুটি রয়েছে। ইখলাস এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, তা ব্যতীত কোন ইবাদতই কবুল হয় না। ইবাদতের সঙ্গে ইখলাসের আবশ্যকীয়তাই তার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণ করে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-২/৫৭]

ইখলাসের হাকীকত ও স্বরূপ

ইখলাসের আভিধানিক অর্থ খালেস বা খাঁটি করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইখলাস বলা হয় ইবাদতকে গায়রে ইবাদত থেকে মুক্ত করা। অর্থাৎ তাতে এমন কোন উদ্দেশ্যের সংমিশ্রন না ঘটা যা শরীয়তে কাম্য। যেমন খাঁটি ঘি বলতে আমরা এটিকেই বুঝি যাতে অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণ থাকে না। [আত্ তাবলীগ-২/১৩৭]

ইখলাসের নিদর্শন

আল্লামা শা'রানী [রহ.] ইখলাসের একটি বিশেষ আলামতের বিবরণ দিয়ে বলেছেন, মনে করো, তোমরা দীনের কোন কাজ করছ। এমন সময় একই কাজের মিশন নিয়ে তোমাদের চেয়ে উত্তম একজন লোক সে অঞ্চলে আগমন করল। আর সে কাজটি এমন হয় যা ফরয আইন বা সকলের উপর আবশ্যকীয় নয়, দু'চারজন আদায় করলেই যথেষ্ট। যেমন, মসজিদ মাদরাসা পরিচালনা, ওয়াজ করা, পীর-মুরীদী করা, কল্যাণমূলক কাজে চাঁদা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। তখন সে ব্যক্তির আগমনে তোমরা আনন্দিত হবে, ব্যথিত হবে না; বরং তোমরা নিজেরা জনগণকে তার কাছে যাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলবে, তার কাছে যান।

www.banglakitab.weebly.com

তিনি আমার চেয়ে উত্তম। যাবতীয় কাজ তার দায়িত্বে অর্পন করে নিজে এক কোনে নির্জনে বসে যাও। মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় কর যে, তিনি মেহেরবানি করে এমন লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন যিনি তোমাদের বোঝা লঘু করে দিয়েছে। যদি এমনটি করতে পার তাহলে বুঝবে যে, তোমরা প্রকৃত মুখলিস। কিন্তু এখন তো অবস্থা এই যে, কোন আলেমের অঞ্চলে অপর কোন যোগ্য আলেম চলে এলে এবং জনগণ তার প্রতি অনুরক্ত হলে তার মনে জ্বালাপালা শুরু হয়ে যায়। মনে মনে কামনা করে নবাগত আলেম থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাক যাতে তার প্রতি জনগণের ধারণা খারাপ হয়ে যায় এবং তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা মনে করে, অঞ্চলের সকল মানুষ আমাদের কাছেই আসা-যাওয়া করুক। অন্য দিকে না যাক। এমতবস্থায় তোমরা কিছুতেই মুখলিস নও। মনে করতে হবে তোমরা ইখলাসের সম্পদ থেকে বঞ্চিত। [আত্ তাবলীগ-২/২৪৮]

দীনি ইলম অর্জনের জন্য নিয়তের পরিশুদ্ধি প্রয়োজন

দীনের দু'টি অপরিহার্য অংশ রয়েছে। ১. ইলম, ২. আমল। আমলের মাঝে যেমন ইখলাস থাকা আবশ্যক তেমনিভাবে ইলমের মাঝেও ইখলাস থাকা অপরিহার্য। এখন ভেবে দেখ, ইলম হাসিল করার মাঝে তোমাদের কি ধরনের নিয়ত থাকে। এমন তালিবুল ইলমের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিলের নিয়তে ইলম শিখছে। এখন বল, ইলমের মাঝে ইখলাস না থাকলে আমলের মাঝে কোথা হতে ইখলাস আসবে? সর্বপ্রথম ইলমের মাঝে ইখলাস সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য ইলম হাসিলের সূচনা থেকেই নিয়ত খালেস থাকা দরকার। যদি শুরুতে কারো নিয়তে গণ্ডগোল থেকে থাকে তাহলে ইলম হাসিল বন্ধ করবে দিবে না; বরং এক সময় ইখলাস এসে যেতে পারে। [আদ্দীনুল খালেস-৪৮]

আমলহীন ইলমের দৃষ্টান্ত

ইমাম গাযালী [রহ.] লিখেন, যে ব্যক্তি অগাধ ইলম অর্জন করেছে কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্ত হল ঐ সিপাহীর ন্যায় যার কাছে বিপুল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র থাকাসত্ত্বেও পথিমধ্যে দুশমনের সাথে মোকাবিলার মুহূর্তে সে তার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করল না। বলুন তো, সে কি শত্রুর মোকাবিলায় জয়ী হতে পারবে? অনুরূপভাবে এ ইলম হল শয়তানকে প্রতিহত করার হাতিয়ার। কেবল হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়েই সুখবোধ করলে

www.banglakitab.weebly.com

চলবে না। সময় মতো তা ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় তা কোনো কাজের নয়। [হাকীকতে তাসাউফ : ৫৫৫]

দরস-তাদরীসে বিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় তালিবুল ইলম ভাইয়েরা!

নিয়ত যদি খাঁটি থাকে তাহলে আপনাদের পড়াশোনাও তাবলীগ হবে। إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ। নিয়তের উপর আমলের প্রতিদান নির্ভর করে। আপনার নিয়ত যদি এই হয় যে, পড়াশোনা সমাপ্ত করে 'আমরে বিল মারূফ' বা দীনের তাবলীগ করব, তাহলে এ পড়াশোনাও তাবলীগের একটি অংশ হবে। এ নিয়ত না থাকলে তা তাবলীগ হবে না। লক্ষ্য কর, কেউ নামাযের নিয়ত না করলে নামায হয় না। অনুরূপভাবে দিনভর উপোস থাকলেও নিয়ত ছাড়া রোযা হবে না। দুঃখের কথা, আমরা রাতদিন পঠন-পাঠনে মগ্ন, অথচ আমলের নিয়ত অনুপস্থিত থাকায় সওয়াব লাভে বঞ্চিত হচ্ছি।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তাবলীগের মর্যাদাশীল অংশ। যদি কিতাবাদি সংকলিত ও লিপিবদ্ধ না হত, তাহলে বিরাট হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে দীনের মাঝে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হত। কিতাবাদি রচিত না হলে পূর্বসূরী মনীষীদের মূল্যবান বাণী আমাদের কাছে পৌঁছার কোন ব্যবস্থা হত না। আল্লাহ তাআলা বিরাট দয়াপরবশ হয়ে গ্রন্থাবলি সংকলন ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠাসহ ইলমের যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিতাবাদি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এটা বিদআত নয়; বরং সুন্নত। কেননা, এ পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যই হল, তাবলীগ। মোটকথা এ দরস-তাদরীস তাবলীগের বিরাট অংশ। কিন্তু আমরা নিয়ত না করার দরুন তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। [দাওয়াত ও তাবলীগ-১৯]

ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে ইখলাস সৃষ্টি করার পদ্ধতি

এক বুযুর্গের ঘটনা। তিনি তাঁর কোন এক মুরীদের বাড়িতে গেলেন। ঘরের ভেতর একটি ছিদ্রপথ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কেন রেখেছ? মুরীদ আরজ করল, আলো প্রবেশের জন্য।

বললেন, আলো তো নিয়ত ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করে। যদি তুমি তা বানানোর সময় এ নিয়ত করে নিতে যে, এ ছিদ্র দ্বারা আযানের ধ্বনি আসবে, তাহলে তুমি সওয়াবও পেতে। আর আলো তো এমনিতেই আসত। [হাকীকতে তাসাউফ ও তাকওয়া-৬১০]

আজ ইলম শেখার মাঝে বিভিন্ন ধরনের খারাবী সৃষ্টি হয়ে গেছে। অনেকে বলে, আমরা ফিকাহ এজন্য পড়েছি যে, ফতুয়া লিখব, মানুষ মুফতী বলবে। অনেকে এ নিয়তে হাদীস পড়ে যে, দেশে দেশে ওয়াজ করে বেড়াবে। মানুষ আমাদের নজর-নিয়াজ প্রদান করবে। অথচ তাদেরকে এ নিয়ত করা উচিত ছিল যে, ইলম শিখে আহকামে ইলাহীর প্রতি নিজেও যত্নবান হব এবং জনগণকে পথপ্রদর্শন করব। আমি অসীয়ত করে বলছি, তোমরা চাকরির নিয়তে পড়বে না। চাকরি তো এমনিতেই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। [আদ্দীনুল খালিস-৫৪]

ইলম অর্জনের নিয়তে ভেজাল থাকলেও তা বাদ দেওয়া উচিত নয়

আমি একথা বলছি না যে, নিয়তে গণ্ডগোল হলে ইলম হাসিল করা ছেড়ে দাও। পড়াশোনা তো সর্বাবস্থায়ই জরুরি। কেননা, ইলম হাসিলের সূচনা লগ্নে যদি ইখলাস না থাকে তবুও আশা করা যায় যে, ইলম হাসিলের এক পর্যায়ে তাতে ইখলাস চলে আসবে। আর যদি ইলম অর্জন করা ছেড়ে দেয় তাহলে এ আশাটুকুও বাকী থাকে না।

অনুরূপভাবে যদি আমলের মাঝে ইখলাস না থাকে তবুও তা বর্জন করো না। আমল করতে থাক। এভাবে এক সময় আমলের বরকতেও ইখলাস সৃষ্টি হয়ে যায়। কেননা, এ উভয়টির মাঝে এ ধরনের আকর্ষণ ও চুম্বকশক্তি রয়েছে। কখনো আমল দ্বারাও নিয়ত ঠিক হয়ে যায়। যেমন ইলম দ্বারাও অনেক সময় তা সঠিক হয়ে যায়। সুতরাং নিয়ত খালেস না হলেও ইলমচর্চা বন্ধ করে দিবে না। কেননা, সামনে তা লাভ করার আশা রয়েছে। বুযুর্গানেদীনের উক্তি রয়েছে-

تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ فَأَبَى الْعِلْمُ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ

আমরা গায়রুল্লাহর জন্যই ইলম শিখছিলাম। কিন্তু সে তা মানেনি তাই তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই রয়ে গেছে।

ধরুন, দুনিয়ার নিয়তে কেউ ইলম শিখছে। এক পর্যায়ে তার সামনে কুরআনের এমন একটি আয়াত পড়ল যাতে ইলম দ্বারা দুনিয়া উপার্জনের নিন্দা ও সতর্কবাণী বিধৃত হয়েছে। অথবা এমন একটি হাদীস নজরে পড়ল। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ
عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি ইলমেদীন যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা হয় তা দুনিয়া উপার্জনের নিয়তে অর্জন করে সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

www.banglakitab.weebly.com

কেউ উক্ত হাদীস পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ধাক্কা লাগল যে, আমিও তো এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। তখন সে নিজেকে ভর্ৎসনা করল এবং কাঁদতে শুরু করল।

এভাবেই একদিন সে আমলকারী আলেমে পরিণত হয়ে যাবে। এ থেকেই বুঝা যায়, ইলম দ্বারা একদিন না একদিন ইখলাস এসে যায়। তাই উচিত হল, ইলম অর্জনের সূচনাতেই নিয়ত ঠিক করে নেওয়া। যদি কারোর নিয়ত এখনও খালেস না হয়, সে ইলম চর্চা কিছুতেই বন্ধ করে দিবে না। কেননা, আশা রয়েছে এক পর্যায়ে ইখলাস সৃষ্টি হয়ে যাবে। এজন্য বুযুর্গানেদীন বলেন, এক ব্যক্তি আমল করে, কিন্তু তার মাঝে রিয়া বা লোক দেখানোর ব্যাধি রয়েছে, সে ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম যে একেবারেই আমল করে না। কেননা, এক পর্যায়ে তার মন থেকে রিয়া দূর হয়ে যাবে এবং আমল থেকে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি ভালোভাবে চিবিয়ে খাবার না খায় তাহলে তাকে এ কথা বলা হবে না যে, তুমি খাবার খাও কেন? বরং তাকে বলা হবে, ভালো করে চিবিয়ে কেন খাও না? [আদ্দীনুল খালিস-৪৫-৪৮]

ছাত্রদের নিয়ত হতে হবে ইমাম গাযালী [রহ.]-এর মত

একদিন বাদশা নিজামুদ্দীন মাদারাসায়ে নিজামিয়ার পরিদর্শনে গেলেন। গোপনে ছাত্রদের মনমানসিকতা ও চিন্তাধারা যাচাই করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, তারা কি উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করছে। ছদ্মবেশে একজন ছাত্রকে সুধালেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে পড়াশোনা করছ? ছাত্র বলল, আমার আব্বাজান একজন বিচারক। আমি এজন্য পড়াশোনা করছি যে, আলেম হওয়ার পর আমিও বিচারক পদে আসীন হব। আরেকজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমার পিতা মুফতী সাহেব। আমিও মুফতী হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। মোটকথা, যাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, সে-ই কোন না কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যের কথা বলেছে। বাদশার সাংঘাতিকভাবে মন খারাপ হল। বললেন, আফসোস! ইলমেদীন দুনিয়ার জন্য পড়া হচ্ছে আর হাজার হাজার টাকা অনর্থক ব্যয় হচ্ছে। অন্যদের মতো এক কোণে বসে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় অধ্যয়ন করছিলেন ইমাম গাযালী [রহ.]। ছাত্র হিসেবে সেখানে তাঁর কোন প্রসিদ্ধি ছিল না। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নিয়তে পড়াশোনা করছ? তিনি বললেন, আমি প্রকৃত মালিকের সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পড়াশোনা করছি। বাদশা এ ছাত্রের উত্তর শুনে আনন্দিত হলেন। এবার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি এ দেশের বাদশা। আমি ইচ্ছা করেছিলাম এ মাদরাসাটি ভেঙ্গে ফেলব। কিন্তু শুধু তোমার কারণে তা বহাল রাখলাম।

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং এ নিয়তে ইলম হাসিল করতে হবে, যে নিয়তে অর্জন করেছেন ইমাম গাযালী [রহ.]। যে পার্থিব স্বার্থের কারণে ইলম হাসিল করবে সে ইলম দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/২০]

ইখলাসহীন ইলম চর্চাও উপকারী

অনেকে বলে, ইংরেজী শিক্ষা করা যদি খারাপ হয়, বর্তমান যুগের ছাত্রদের আরবী শিক্ষাও ভালো নয়। কেননা, এতে তাদের নিয়তও ভালো নয়। উভয়টি শিক্ষার উদ্দেশ্যই পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা, তাই উভয়টিই খারাপ। বলি, এগুলো হল, শয়তানের ধোঁকা। উভয়টি কিছুতেই সমান নয়। কেননা, আরবী পড়ুয়ার মুখ দিয়ে যখন কুরআন হাদীসের ধ্বনি উচ্চারিত হবে, তখন তা কানেও গুঞ্জরিত হবে। তারপর সে তাতে চিন্তাভাবনা করবে। এভাবে একদিন প্রতিক্রিয়া হয়ে ইসলাহ ও সংশোধন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইংরেজী পড়ার মাঝে সংশোধনের কোন আশা করা যায় না। উভয়ের মাঝে আসমান-জমিন সমান পার্থক্য রয়েছে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৯/৪৪]

প্রথমতঃ চেষ্টা করবে যে, শুরু থেকেই যেন ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত খাঁটি থাকে। যদি কারো নিয়ত এখনও খাঁটি না থাকে তাহলে কিছুতেই ইলম অর্জন ছেড়ে দিবে না। আশা করা যায় এক সময় তাতে ইখলাস এসে যাবে। এজন্য আল্লাহওয়ালাগণ বলেন, কেউ যদি রিয়া ও লোকদেখানোর উদ্দেশ্যেও কোন কাজ করে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে কোন কাজই করে না। হতে পারে কোন এক সময় রিয়া দূর হয়ে পূর্ণ প্রতিদান পেয়ে যাবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি চাবানো ছাড়া খাবার খায় তাহলে তাকে বলা যাবে না যে, খাবার খাও কেন? অবশ্য এটা বলা যাবে যে, ভালোভাবে চিবিয়ে খাচ্ছনা কেন? - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৯/৭৭]

আলেমদের মর্যাদা আমলের কারণে

সম্মানিত উলামায়ে কিরাম! আপনারা হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের যোগ্য উত্তরাধিকারী। সে উত্তরাধিকারী হল ইলমের দিক দিয়ে। ইরশাদ হচ্ছে,

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

এ উত্তরাধিকারের বিষয়টি প্রত্যেক আলেমই বড় আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)-এর মাঝে ইলমী যোগ্যতার পাশাপাশি আমলী যোগ্যতা বলতে কিছু ছিল কি না? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ প্রশ্নের জবাব ইতিবাচকই

www.banglakitab.weebly.com

হবে। কেননা, যদি আম্বিয়ায়ে কিরামের মাঝেও আমলী যোগ্যতা পাওয়া না যায়, তাহলে আর কার মাঝে পাওয়া যাবে। কারণ, তারাই হলেন আফযালুল মাখলুকাত বা সৃষ্টিজীবের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তাই এটা বলতেই হবে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম আমলের ময়দানেও সকলের শীর্ষে ছিলেন। এখন লক্ষ্য করার বিষয় হল, উত্তরাধিকারের কারণ কি শুধু ইলম, নাকি আমলও তাতে শামিল রয়েছে? চিন্তা করলে বুঝা যায়, শুধু ইলমই উত্তরাধিকারের কারণ হতে পারে না। কেননা, আমলহীন আলেমের মাঝে আমরা মাকবুলিয়তের কোন দিক খুঁজে পাই না। অথচ নবীর ওয়ারিস হওয়ার জন্য মাকবুল হওয়া জরুরি।

যেমন ইবলিস শয়তান অনেক বড় আলেম। তার আলেম হওয়ার প্রমাণ হল, সে উলামায়ে কিরামকে পথভ্রষ্ট করার চক্রান্ত আঁটে। অনেক সময় তাতে সফলও হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা সেই পরিবর্তণ করতে পারে যে অন্তত ঐ ব্যক্তির সমান দক্ষ হবে। আইন বিশেষজ্ঞকে সেই ধোঁকা দিতে পারে যে নিজেও আইনের ফাঁক-ফোকড় সম্পর্কে অবগত রয়েছে। সে মতে শয়তান উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কামিয়াব হওয়াই পরিস্কার বলে দিচ্ছে যে, সে নিজেও মস্ত বড় আলেম। কিন্তু তার পরিণতিও সকলের কাছে সুবিদিত।

বনী ইসরাঈলের আলেমদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে- اَنۡتُمۡ تَتۡلُوۡنَ الۡكِتٰبَ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। কিন্তু খোদ কুরআনেই তাদের মন্দ পরিণতির কথা বিধৃত হয়েছে। বহু জায়গায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে। কুরআনে কোন জাতির এত বেশি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়নি যতটুকু বনী ইসরাঈলদের করা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, কেবল ইলমই উত্তরাধিকারের বিষয় নয়; বরং ইলমের সাথে আমলেও আবশ্যকীয়তা রয়েছে। কারণ আমল ছাড়া কবুলিয়ত আসে না। আর গায়রে মাকবুল ব্যক্তি আম্বিয়াদের ওয়ারিস হতে পারে না। এ বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا

وَلٰكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

এ হাদীসে ইলমকে حظ وافر বলা হয়েছে। আর ইলম তখনই حظ وافر হতে পারে যখন তা আমলের সঙ্গে যুক্ত হবে। শুধু ইলমকে حظ وافر বলা যায় না। কেননা, তার পরিণতিও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا

নিশ্চয় কিছু ইলম মূর্খতা বলে আখ্যায়িত।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

মোটকথা, হাদীসে এরূপ ইলমকে মূর্খতা বলা এবং আয়াতেও প্রথমে علموا বলার পর لو كانوا يعلمون বলা দ্বারা পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আমলহীন ইলম কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমলহীন ইলম حظ وافر হতে পারে না। কেননা, যে ইলম শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে না তা حظ وافر কিভাবে হয়? সুতরাং حظ وافر ঐ ইলমই হবে যা আমলের সঙ্গে যুক্ত এবং সাধারণ ইলম উত্তরাধিকারের কারণ নয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/৯]

অধিকতর আক্ষেপ আলেম সমাজের প্রতি

এমনিতেই মুসলমানদের মাঝে আমলের অভাব রয়েছে। এ অবস্থায়ও যা কিছু আমল হচ্ছে তাও অনেক ত্রুটিপূর্ণ। আর সবচেয়ে বেশি আক্ষেপ জাগে আলেম সমাজের প্রতি। কেননা, তারা জানা সত্ত্বেও আমলে অলসতা করে। একটু নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন। চিন্তা করুন, আমাদের মাঝে আমলী শান পাওয়া যায় কি-না? যদি পাওয়া না যায় তাহলে ওরাছাতুল আম্বিয়ার গৌরবময় দাবী আমাদের বর্জন করা উচিত। [দাওয়াতে আবিদয়্যত-১৩/১৫]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইলম মোতাবিক আমল করার গুরুত্ব

ইলম মোতাবিক আমল না করার শাস্তি

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এ অবস্থায় দেখা যাবে যে, তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে পড়ে আছে এবং সে তার চারপাশে ঘুরছে। মানুষ তার এ শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, আমি আমার ইলম অনুযায়ী আমল করতাম না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/১১]

www.banglakitab.weebly.com

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

وَيلٌ لِمَن لَا يَعلَمُ وَلَو شَاءَ اللهُ لَعَلِمَهُ وَاحِدٌ مِّنَ الوَيلِ وَوَيلٌ لِمَن يَعلَمُ وَلَا يَعلَمُ سَبعٌ مِنَ الوَيلِ (رواه سعيد بن منصور في سننه كذا في العزيزى)

অর্থাৎ জাহেলের জন্য একটি বিপদ আর আলেমের জন্য সাতটি বিপদ।

বলুন তো, এ হাদীসের উপর কারা আমল করবে? আমরাই তো করব, নাকি ভিন্ন কোন জাতির আবির্ভাব ঘটবে?

বেআমল আলেম গোটা আলেম সমাজের কলঙ্ক

আলেম সমাজের মাঝে দু'একজন বেআমল হলেই গোটা সমাজের বদনাম হয়। কারণ, তার প্রতিক্রিয়া দু'একজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এদের দেখাদেখি অন্যরাও প্রভাবিত হয়। আলেম সমাজের কোন একজনও যদি বেপারোয়াভাবে বদ আমলে লিপ্ত হয় তাহলে সকলের উপর তার প্রভাব পড়ে। আর এর প্রভাব দু'ভাবে পড়ে। ১. তাকে দেখাদেখি অন্যরাও বদ আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। ২. জনগণ গোটা আলেম সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। আর এভাবেই তারা আলেমদের ব্যাপারে আপত্তি ও সমালোচনায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা আলেমদেরকে গালি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এক্ষেত্রে জনগণ যদিও ভুল পথে রয়েছে। কেননা, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى (একে অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না।) কিন্তু এ জন্য আমরাই সবচেয়ে দায়ী। তাদের আপত্তি ও সমালোচনাকে হিংসা বা বিদ্বেষ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ, তা শত্রুদের পক্ষ থেকে হচ্ছে না। অথবা একথা বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই যে, জনগণের সমালোচনায় কি আসে যায়? নবীগণও তো সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। ভালো করে বুঝুন! নবীদের প্রতি আপত্তি এসেছিল কাফের-মুশরিকদের পক্ষ থেকে। আর আলেমদের প্রতি কিন্তু তাদেরই আপনজনরা আপত্তি তুলছে। এটা বড় দোষের কথা যে, আপনজনরাও আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। এ অবস্থা আমাদের জন্য সীমাহীন বেদনাদায়ক। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/১৫, ১৮]

www.banglakitab.weebly.com

এতে সাধারণ জনগণের উপর বিরাট মন্দ প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ তাদের বলার সুযোগ হয় যে, আলেমগণ এমন এমন হয়ে থাকে। এখলাস এবং তাকওয়া অন্তত এ উদ্দেশ্য গ্রহণ করা উচিত যে, এতে সাধারণ জনগণ বীতশ্রদ্ধ হবে। অন্যথায় আলেম সমাজ يصدون عن سبيل الله (তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়) এর আওতায় পড়ে যাবেন। কেননা, হাত দ্বারা বাধা প্রদান যেমন নিষেধ তেমনি মানুষ বিরত থাকার কারণ ও মাধ্যম হওয়াও নিষেধ। কারণ, এটাও বাধা প্রদানের মাঝে শামিল। কোন পাপের কারণ হওয়াও পাপ। - [আদাবুল মুতাআল্লিমীন-১১১]

আমলহীন আলেমও সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য

তাই বলে সাধারণ লোক কিছুতেই আমলহীন আলেমদেরকে অমর্যাদা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করবে না; বরং তাদেরকে ঐ ডাক্তারের মতো মনে করবে যে রোগীকে নানা বিষয় থেকে বারণ করা সত্ত্বেও নিজে তা আমল করে না। কেননা, রোগী তার পরামর্শ অনুযায়ী চলে অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবে। তাই ডাক্তার সর্বদা সম্মানের যোগ্য।

অনুরূপভাবে বেআমল আলেমও সরকারি ঐ উকিলের মতো যে নিজে আইন লঙ্ঘন করার কুফল ভোগ করে। যেহেতু সে আইনের ফাঁক-ফোকর সম্পর্কে অবগত সেহেতু মামলা মোকাদ্দমায় তার কাছ থেকে পরামর্শ নিলে উপকারই হবে। অতএব, জনসাধারণের উচিত হল বেআমল আলেম হলেও তার কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করা। তবে ভুল মাসআলা প্রদানকারী এবং নিজ স্বার্থচরিতার্থকারী আলেম –যে প্রশ্নকারীর মনমত উত্তর দেয়– তার থেকে দূরে থাকা উচিত। সে বিশ্বাসঘাতক ডাক্তার, মিথ্যুক উকিল এবং ছদ্মবেশী ডাকাতের মত।

যদি বেআমল আলেম সহীহ মাসআলা বলে তাহলে তার মুখ থেকে মাসআলা শুনে তার উপর আমলও করবে কিন্তু তার সাহচর্য গ্রহণ করবে না। সাহচার্য গ্রহণ করতে হবে কোন আমলদার ও সুন্নতের অনুসারী আলেমের। যাতে পরকালের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং আমলের উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যিত-৩/১৫,১৮]

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নফল আমলের গুরুত্ব

নফল এবং মুস্তাহাব আমলের প্রতি আলেমদের উদাসীনতা

অধিকাংশ তালিবুল ইলমের মাঝে একটি ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায়। তাহল এই যে, তাদের অন্তরে মুস্তাহাব আমলের কোন গুরুত্ব থাকে না। منية المصلى কিতাবটি পড়ার আগ পর্যন্ত আমি নিয়মিত নফল নামায পড়তাম। যখনই তা পাঠ করলাম এবং তাতে নফলের পরিচয় জানলাম তখন থেকে নফসের ধোঁকায় পড়লাম। ভাবতাম, মুস্তাহাব বিষয়ের উপর আমল না করলে তো কোন জবাবদিহিতা নেই! এ সুবাদে নফল আমল ছুটতে লাগল। জেনে রাখুন, নফসের মাঝে মারাত্মক ধরনের ধোঁকা রয়েছে। নফস তো শয়তানের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, শয়তানকেও তার নফসই ধ্বংস করেছে।

তালিবুল ইলমদের অবস্থা হল, তারা যখনই কোন আমল সম্পর্কে জানতে পারে যে, এটা মুস্তাহাব বা নফল তখন থেকেই সে আমলটি ছেড়ে দেয়। জাহেলরা তো মুস্তাহাব বিষয়ও গুরুত্বের সাথে মানে কিন্তু সমস্যা শুধু পড়ুয়াদের নিয়ে। এটা নফসের বিরাট ধোঁকা। যা আহলে ইলমদেরকে সমূহ বরকত ও কল্যাণ থেকে মাহরূম করে রেখেছে। এ থেকে বাঁচা উচিত। মুস্তাহাব ও নফল আমলের প্রতিও যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। [আত্ তাবলীগ-৮/১৮]

নফলের গুরুত্ব

অনেকেই নফল আমলকে একটি বাড়তি বিষয় মনে করে। বিশেষকরে আলেম সমাজ ব্যাপকহারে এ ভুলের মধ্যে ডুবে আছে। কেননা, শুরু থেকেই তালিবুল ইলমদেরকে নফলের বিধান এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যা করলে সওয়াব রয়েছে এবং না করলে কোন পাপ নেই। তারা মনে করে এই যদি হয় নফলের হাকীকত, তাহলে আমল না করলেই বা কি! এখানেই শেষ নয়, ভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা এও প্রদান করা হয় যে, নফল কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যেন শরীয়তে নফল ও মুস্তাহাব অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার!

ভালো করে বুঝে নিন, নফল অনর্থক ও প্রয়োজনীয় বিষয় নয়; বরং তা ফরযের পরিপূরক হওয়ার কারণে খুবই গুরুত্ববহ। এছাড়াও এটি বিশেষ মহব্বতের একটি বড় নিদর্শন। একটি উদাহরণ দিলে সহজে বুঝে আসবে। ধরুন, খাবার রান্না করার জন্য দু'জন চাকর নিযুক্ত করা হল। একজন তার নির্ধারিত রন্ধনকর্ম

www.banglakitab.weebly.com

শেষ করেই চলে যায়। অপরজন রন্ধনকর্ম সেরে স্বতপ্রণোদিত হয়ে মালিকের বিভিন্ন খেদমত করে দেয়। বলুন, উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি না?

হ্যাঁ, বিস্তর ব্যবধান রয়েছে নিঃসন্দেহে। মালিকের মনে স্বতঃস্ফূর্ত খেদমতে আত্মনিয়োগকারী সেবকের মূল্যায়ন বেশি হবে; বরং অনেক সময় তার বাড়তি খেদমতের মূল্য আসল নির্ধারিত দায়িত্বের চেয়েও বেড়ে যায়। কেননা, নির্ধারিত দায়িত্ব তো সকলেরই করতে হয়। এটা চাকরদের থেকে জোর-জবরদস্তি আদায় করা হয়। আর এ বাড়তি খেদমতসমূহ হল ভালোবাসা ও নিষ্ঠার প্রমাণ। ভালোবাসা ও নিষ্ঠার বিনিময়ে অন্যের কাছ থেকেও ভালোবাসাই পাওয়া যায়। মোটকথা, এ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি মালিকের বিশেষ মহব্বত হবে। ভিন্নভাবে বললে, দ্বিতীয় ব্যক্তি মালিকের প্রিয়পাত্র বলে সাব্যস্ত হবে এবং প্রথম ব্যক্তি চাকর এবং মজদুরই রয়ে যাবে। নফলেরও ঠিক এই অবস্থা। যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধি-বিধানের মধ্য থেকে শুধু ফরযসমূহকে পালন করে। যেমন কেবল পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়ে, ওয়াজিব পরিমাণ যাকাতই দেয়, অন্য কোন নফল দান-সদকা করে না, সে ধরাবাধা চাকরের মত। তার থেকে জোরপূর্বক কাজ আদায় করা হবে। সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলা পরিলক্ষিত হলেই আর রক্ষা নেই! কিছুতেই একথা বলা যাবে না যে, তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার খাস মহব্বত রয়েছে। প্রিয় সুধী! নফল-মুস্তাহাব অধিকহারে পালন করাই হল ভালোবাসার নিদর্শন। এখন বুঝলেন তো, নফল কি পর্যায়ের জিনিস? [আত্ তাবলীগ-১/১৪]

তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব ও তালিবুল ইলম

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল [রহ.]-এর ঘটনা। এক ছাত্র তাঁর বাড়িতে মেহমান হয়েছিল। রাতে শোবার সময় তিনি তার কাছে লোটা ভর্তি পানি রেখে দিয়েছিলেন। ভোরে তিনি অতিথি ছাত্রের কক্ষের দিকে গেলে লক্ষ্য করলেন যে, লোটার পানি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তাই তিনি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি তো পাত্রে পানি ভরে রেখেছিলাম যাতে রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে তোমাকে পানির জন্য কষ্ট করতে না হয়। কিন্তু আমি দেখছি তুমি পানি ব্যবহার করনি। বোঝা যাচ্ছে তুমি তাহাজ্জুদ পড় না।

খুবই আফসোসের কথা! ছাত্রদেরকে আমলের প্রতি যত্নবান হতে হবে। যদি ছাত্র ও আলেমগণই আমলের প্রতি যত্নবান না হন তাহলে আর কারা হবে? -[বযমে জামশেদ-২৮]

www.banglakitab.weebly.com

নফল ইবাদতে কতটুকুই বা সময় ব্যয় হয়ে যায়!

ইলম অন্বেষু ছাত্র ভাইয়েরা! যদি চাশত ও ইশরাকের সময় দুই রাকাত নামায পড়ে নেন, শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নিয়তে দু'রাকাত পড়ে কিতাব মুতালাআয় লেগে যান এবং হাদীস অধ্যয়নকারীগণ অহেতুক গল্প-গুজব পরিহার করে চলতে ফিরতে মুখে দরূদ শরীফ পাঠ করেন, তাহলে বলুন, এতে তদের পড়াশোনায় কিই বা ক্ষতি হয়ে যাবে? যদি খেয়াল করা হয় তাহলে ছাত্রদের মাঝে ইবাদতের নূর ও যিকিরের স্বাদ সৃষ্টি হবে এবং পড়াশোনায়ও কোন ঘাটতি হবে না; বরং উন্নতি হওয়ারই প্রবল আশা।

বোঝা দরকার, আমল এবং তাকওয়ার মাধ্যমে যে পরিমাণ মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায় তা অন্য কিছু দ্বারা হাসিল হতে পারে না। তাহলে বলুন, আমলের প্রতি যত্নবান হওয়াটা তালীমের জন্য উপকারী, না ক্ষতিকর? আমার বুঝে আসে না যে, নফল ও মুস্তাহাবকে কেন ক্ষতিকর মনে করা হয়?

অবশ্য রীতিমত তাসাউফ চর্চা এবং সুফিয়ায়ে কিরামের খান্দানী যিকির থেকে ছাত্রদেরকে বারণ করা উচিত। কারণ, এর দ্বারা হালত ও কাইফিয়ত প্রবল হয়ে উঠে। ফলে তা'লীম অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তবে হাদীস শরীফে বর্ণিত যিকিরসমূহ সংক্ষেপে আদায় করা এবং নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা কিছুতেই বাড়তি বিষয় মনে করা যাবে না। [আদাবুল মুআশারাত-১৯০]

নফল এবং মুস্তাহাব আমলের বিধান

সাধারণভাবে সুন্নত এবং মুস্তাহাব আমলের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস প্রোথিত রয়েছে যে, এগুলো পালন করলে সওয়াব রয়েছে আর না করলে কোন গুনাহ নেই। এজন্য তা বর্জন করাকে সহজ মনে করা হয়। অথচ কুরআন-হাদীস গবেষণা করলে জানা যায় যে, সুন্নত এবং মুস্তাহাব হল কোন আমল শুরু করার পূর্বের হুকুম। শুরু করার পর তার হুকুম বদলে যায়। একটি হুকুম তো সে আমলে লিপ্ত থাকার সাথে নির্দিষ্ট। তা হল নফল আমল শুরু করার পর পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আরেকটি হুকুম হল ব্যাপক। যা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। তা হল যে মুস্তাহাব আমলটির উপর আমল শুরু করা হয় এবং কিছুদিন ধারাবাহিকবাবে তা পালন করা হয় সেটি বাদ দেয়া এবং ধারাবাহিকতা বর্জন করা মাকরূহ। বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। হাদীসটি নিম্নে প্রদত্ত হল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদি.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন,

www.banglakitab.weebly.com

يَاعَبْدَاللهِ لَاتَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَهُ

অর্থাৎ হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না। সে রাতে উঠে নফল নামায পড়ত। কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দিয়েছে।

বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সাহাবীর অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বোঝা গেল, মুস্তাহাব ও নফল আমল কিছুদিন করে ছেড়ে দেয়া মাকরূহ ও নিন্দনীয়।

এজন্য আল্লাহর ওলীগণ বলেছেন, ফরয এবং ওয়াজিব আমলের পর ঐ পরিমাণ নফল আমল করবে যতটুকু নিয়মিত আদায় করতে পারো। অন্যথায় শুরু করবে না। এতে বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

মানুষের অভ্যাস হল, কোন কিছু নিয়মিত করতে থাকলে তাতে একঘেয়েমি চলে আসে। ফলে তা বন্ধ করে দেয় এবং এ বন্ধ অবস্থা দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। এমনকি সারা জীবনে আর সে আমলের উপর নিয়মিত হতে পারে না। পূর্বের আমল বাদ দিয়ে আরেকটি আমল শুরু করে। কিছুদিন পর তাও ছেড়ে দেয়। আজ তাহাজ্জুদ ছুটল তো কাল ফজর নামাযই ছুটে গেল। এটি সুস্পষ্টভাবে মুস্তাহাব ছাড়ার পরিণতি।

www.banglakitab.weebly.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা

তাকওয়া দ্বারা কী হাসিল হয়

তাকওয়া দ্বারা 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন' এবং কুরআনের বুঝ লাভ করা যায়। কিন্তু এ বুঝ ও অনুভূতি কী জিনিস তা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। তা বুঝার পদ্ধতিই হল তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া অর্জন করলেই তা বুঝে আসবে। শব্দের ভূষণে সকল বাস্তব রূপ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব [রহ.] বলেন, 'যওক' ও রুচির সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের হাকীকত ভাষার মোড়কে ফুটিয়ে তোলা যায় না। মনে করুন, কেউ যদি আম না খেয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমের স্বাদ ও মিষ্টির বর্ণনা দিয়ে তাকে আম চিনাতে পারবেন না। বিবরণ শুনে সে জিজ্ঞাসা করবে আম কি গুড়ের মত? আপনি বলবেন, না। সে বলবে, চিনির মত? আপনি বলবেন, না। সে বলবে আঙ্গুর বা ডালিমের মত? আপনি বলবেন, না। তখন সে জিদ ধরে বলবে, আচ্ছা ভালোভাবে বলুন দেখি আম কেমন হয়? আপনি বলবেন, আপনাকে আম চিনাবার ক্ষমতা আমার নেই। একবার খেয়ে দেখুন, নিজেই বুঝতে পারবেন আম কেমন হয়। সে একটি আম কেয়ে দেখল। এবার সে মুগ্ধ হবে এবং বিশ্বাস করবে যে, সত্যিই শব্দের মাধ্যমে আমের বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। আম খাওয়ার পর সে নিজেও কারো কাছে আমের পরিপূর্ণ বিবরণ দিতে সক্ষম হবে না।

উক্ত বিষয়টি কেবল কামালাতে হাকিকিয়া বা বাস্তব যোগ্যতার সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো রুচির সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর বর্ণনাও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। [আত্ তাবলীগ-২/১২৪]

তালিবুল ইলম এবং আলেম সমাজের জন্য তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা

আরবী পড়ুয়া মানেই আলেম নয়। কেননা, ভাষা এক জিনিস আর ইলম আরেক জিনিস। আমি তো আরো অগ্রসর হয়ে বলি, ইলমেদীন শিখেও যদি কেউ আমল না করে তাহলে সেও মুহাক্কিক আলেম নয়। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের সম্পর্কে বলেছেন, لوكانوا يعلمون (যদি তারা জানত)। যেহেতু ইহুদীরা ইলম অনুযায়ী আমল করত না তাই প্রথমে ولقد علموا (অবশ্যই তারা জানে) বলা সত্ত্বেও পরে তাদেরকে অজ্ঞ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমলের অনুপস্থিতির কারণে তাদের ইলমকে নাকচ করা হয়েছে। বোঝা গেল, কাঙ্ক্ষিত ইলম সেটি যার সাথে আমল রয়েছে। তাই বলি, আলেম

সমাজ যেন কিছু কিতাব পড়েই গর্ব করা শুরু না করেন যে, আমরা আলেম বনে গেছি। মনে রাখবেন, ইলমের হাকীকত হল শরীয়তের বিধিবিধানকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা।

আমি কসম করে বলতে পারি, তাকওয়া ছাড়া ইলমের হাকীকত নসীব হবে না। মনে করুন, দু'জন সমবয়সী ব্যক্তি। উভয়েই এক উস্তাদের ছাত্র। মেধা ও অনুধাবন ক্ষমতাও সমান। পার্থক্য এইটুকু যে, একজন মুত্তাকী অপরজন মুত্তাকী নয়। স্মরণ রাখবে, মুত্তাকীর ইলমের মাঝে যে বরকত ও নূর হবে, তার বুঝ যেমন সঠিক হবে তা গায়রে মুত্তাকীর মাঝে কখনো পাওয়া যাবে না। ওরফে যদিও সে আলেম হিসেবে পরিচিত এবং আরবী কিতাবাদি পড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু তাকওয়ার অনুপস্থিতিতে তা বেকার বলে বিবেচিত।

তাকওয়ার মাধ্যমে দীনের সহীহ্ বুঝ ও কুরআনের সঠিক সমঝ লাভ করা যায়। কেউ চাইলে পরীক্ষা করে দেখতে পার। তাকওয়া অবলম্বন করে দেখ কেমন ইলম তোমার হাসিল হয়। যদি ইখলাসের সঙ্গে তাকওয়া হাসিল করা হয় তবে তো তার বরকতের সীমা নেই। যদি ইখলাস নাও থাকে তবুও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কিছুদিন করে দেখ, তাতেও কিছু না কিছু অনুভব করতে পারবে। মোটকথা, তালিবুল ইলমদেরকে তাকওয়া অর্জনের পথে বিশেষভাবে ব্রতী হতে হবে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৫/১২১]

তাকওয়া ও আমলের ক্ষেত্রে তালিবুল ইলমদের উদাসীনতা

তাকওয়া ইলম বৃদ্ধির কারণ। এদিকে ছাত্রদের একেবারেই গুরুত্ব নেই। এতে তাদের সীমাহীন উদাসীনতা। তালিবুল ইলমদের মাঝে তাকওয়া কম হওয়ার কারণ হল, তাদের মনে আল্লাহ তাআলার ভয়-ভীতি নেই। অনেকে বলে, আমরা তো এখনও পর্যন্ত ছোট! মনে রেখ, তোমাদের গড়ার সময় এটাই। এখন যে কাজটি অভ্যাসে পরিণত হবে তা কখনো ছুটবে না। এজন্যই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, مُرُوا صِبْيَانَكُم إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا অর্থাৎ বাচ্চাদের বয়স যখন সাতের কোটায় পৌঁছে তখন তাদেরকে নামাযের আদেশ কর। অথচ নামায ফরয হয় বালেগ হওয়ার পর। আর সাধারণতঃ কেউ পনের বছরে বালেগ হয়ে থাকে। কিন্তু সাত বছর বয়স থেকেই নামাযের নির্দেশ করা হয়েছে- অভ্যাস হওয়ার জন্য। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৫/১২৭]

অনেকে মনে করে, এখন তো আমাদের ইলম শেখার সময়। এখন আমলের কোন প্রয়োজন নেই। এটা নির্ঘাত শয়তানের ধোঁকা। কুরআন হাদীসের বিধানে

www.banglakitab.weebly.com

উলামা এবং তালাবার কোন পার্থক্য করা হয়নি। তবে হ্যাঁ, দীর্ঘ অযীফা পাঠ ও রিয়াজত-মুজাহাদায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ছাত্রদের জন্য মুতালাআ ও তাকরারই উত্তম। [তাজদীদে তা'লীম-৪৮]

ছাত্রদের একটি ভুল ও শয়তানের একটি ধোঁকা

অনেক ছাত্র মনে করে আমরা তো এখনো ইলম অর্জনে ব্যস্ত রয়েছি। এ সময় আমল করা তেমন প্রয়োজন নেই। এটি সরাসরি শয়তানের ধোঁকা। কুরআন-হাদীসের বিধিবিধানে ছাত্র ও আলেমের কোন পার্থক্য করা হয়নি। অবশ্য অধিক নফল ইবাদত ও রিয়াজত-মুজাহাদায় নিরত হওয়ার চেয়ে ছাত্রদের জন্য মোতালাআ ও তাকরার উত্তম। [তাজদীদে তালীম-৪৮]

ছাত্রদের সাথে কয়েকটি খোলামেলা কথা

আমি অতীব বিনয়ের সাথে তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা আরয করব। ওহে তালিবুল ইলমগণ! একমাত্র ইলম ও আমলের কারণেই আপনাদের প্রয়োজন হয়েছে। এছাড়া আপনাদের কোন মূল্য নেই। মনে রাখবেন, খাবার যত সূক্ষ্ম ও দামি হবে তাতে তত তাড়াতাড়ি পচন ধরে ও তাতে তত বেশি দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। ভালো থাকাবস্থায় যেমন উপকারী তেমনি নষ্ট অবস্থায় ক্ষতির কারণ। এজন্য আপনাদের ইসলাহের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। আর আপনাদের ইসলাহর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। ১. ইলম হাসিলের জন্য দীনদার উস্তাদ নির্বাচন করবেন। বদদীন বেআমল উস্তাদের কাছে ইলম শিখবেন না। ২. কিছুদিন পড়ালেখা করার পর কোন আল্লাহওয়ালার সাহচর্য গ্রহণ করুন। এভাবে আপনারা দীনের খাদেম হতে পারবেন এবং সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারলে মানুষ আপনাদের পা ধুইয়ে দেয়াকে গর্বের বিষয় মনে করবে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১১/৮৫]

বর্তমান যুগের ছাত্রদের মাথায় একটি ধারণা বদ্ধমূল। তাহল, পড়াশোনা থেকে ফারেগ হয়ে আমল ধরব। এটা নিতান্তই শয়তানের একটি বড় ধোঁকা। যার ফলে সারা জীবনেও আমলের তৌফিক হয় না। মনে রেখ, প্রত্যেকটি বস্তুরই শুরুতে যে প্রতিক্রিয়া থাকে পরবর্তীতে তা থাকে না, ইলম হাসিলের জামানায় যখন কোন সওয়াব বা গুনাহের কাজ সম্পর্কে জানা হয়, তখন অন্তরে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়। এ প্রতিক্রিয়ার মুহূর্তেই যদি আমলের ইহতিমাম করা যায়, তবেই তা পরবর্তীতে বাকী থাকবে। অন্যথায় তা অন্তর থেকে দূর হয়ে

www.banglakitab.weebly.com

যায়। পুনরায় তা সহজে সৃষ্টি হয় না। পড়াশোনার সময়ই যদি কুরআন-হাদীসের তারগীব-তারহীব তোমাদের দিলের মাঝে প্রভাব না ফেলে তাহলে ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলবে- এর কি সম্ভাবনা? প্রথম থেকেই যখন তোমরা এ চিন্তায় চোখ বন্ধ করে বসে আছ যে, ছাত্র যামানা আমলের সময় নয়। তাহলে মনে রেখ, ফারেগ হওয়ার পর তোমাদের অন্তরে তার কোন প্রতিক্রিয়া থাকবে না। প্রথমবারই যখন তোমাদের নফস তা পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, পরবর্তীতে কি আর স্বীকৃতি দিবে? [আদাবুল মুতাআল্লিমীন-১০৭]

হেদায়া গ্রন্থকারের তাকওয়া

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল হেদায়া'র মান্যবর লেখক গ্রন্থ রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিত রোযা রেখেছেন। আশ্চর্যের কথা হল, তার রোযার কথা কেউ জানত না। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন কত দিনে কিতাব রচনা সমাপ্ত হয়েছে, আর কত দিন রোযা রেখেছেন। এভাবে একাধারে রোযা রাখা এবং কেউ তা অবগত না হওয়া কী পরিমাণ ইখলাসের পরিচয় ছিল?

বৈঠকঘরে বসে কিতাব লিখতেন। পরিচারিকা ঘর থেকে খাবার এনে রেখো যেত। সামনে দিয়ে কোন অপরিচিত পথচারী দেখলে তার হাতে খাবারটুকু তুলে দিতেন। কিন্তু বিশেষজনদের কাছে হয় তো تحديث بالنعمة নিয়ামতের বিবরণ দিতে গিয়ে এ ঘটনা আলোচনা করেছেন। বিধায় আমাদের পর্যন্ত বর্ণিত হয়ে এসেছে। এ ইখলাসের বরকতে যারা 'ফাহম' ও অনুধাবনের 'নূর' প্রাপ্ত হয়েছেন তারা জানেন বেতন গ্রহণ করার মাঝে হেকমত রয়েছে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৩২]

তাকওয়ার মর্ম

যিকির-আযকার ও মুরাকাবা ইত্যাদির নাম তাকওয়া নয়; বরং এগুলো তাকওয়ার ভূষণ। আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার মর্ম বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

www.banglakitab.weebly.com

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীনদের পরিচয় তুলে ধরছেন। আকাইদ, ইবাদতে মালিয়া এবং ইবাদতে বাদানিয়াকে তাকওয়ার মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং মুত্তাকী ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, যার মাঝে পরিপূর্ণ দীনদারী রয়েছে। যার আকাইদ বিশুদ্ধ এবং যিনি আর্থিক ও শারীরিক ইবাদতে যত্নবান।

শরীয়তের দৃষ্টিতে দীনের উপর পরিপূর্ণ আমলের নামই হল তাকওয়া। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ

এ পর্যন্ত আকীদা ও বিশ্বাসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল পূর্ণ সৎকর্মের একটি অংশ হল আকীদা বিশুদ্ধকরণ।

তারপর বলা হয়েছে,

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ وَفِى الرِّقَابِ

এখানে আর্থিক ও কায়িক ইবাদতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর ইরশাদ হয়েছে,

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَحِيْنَ الْبَاْسِ

এখানে আখলাক-চরিত্রের মূলনীতি বলা হয়েছে।

মোটকথা, এ আয়াতে জাহেরী এবং বাতেনী, আর্থিক ও শারীরিক ইত্যাদি সব আমলই রয়েছে। এগুলো উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে,

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

এসব আমল সম্পাদনকারীরাই হল মুত্তাকী।

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, দীনের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভই হল তাকওয়ার মূল কথা। আকীদা বিশুদ্ধকরণ, আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত সম্পাদন এবং মুআমালা-মুআশারা ঠিক রাখা ইত্যাদি হল তাকওয়ার একেকটি অংশ। [আত্ তাবলীগ-২/১৩২]

www.banglakitab.weebly.com

সর্বাধিক বড় তাকওয়া

তাকওয়া হাসিলের জন্য যাবতীয় গুনাহ পরিহার করতে হবে। আর যাবতীয় গুনাহ থেকে তখনই বেঁচে থাকা সম্ভব যখন সকল নির্দেশিত বিষয়সমূহও পালন করা হয়। কেননা, নির্দেশিত বিষয় বর্জন করাও গুনাহ। তাকওয়া হাসিলের জন্য এ গুনাহকেও বর্জন করতে হবে। নফল নামায, যিকির আযকার ইত্যাদি বেশি না হোক কিন্তু গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি অধিক যত্নবান হতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে,

لَا تَعْدِلُ بِالرِّعَةِ (ليس الورع كالكف)

অর্থাৎ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাই হল সবচেয়ে বড় তাকওয়া।

[তাবলীগ-১৩২]

ছাত্ররা এ ব্যাপারে একেবারেই গুরুত্ব দেয় না এবং সীমাহীন আলসতা করে থাকে। সে আলসতা ও উদাসীনতার আর কত বিবরণ দিব। ছাত্রদের মাঝে তাকওয়ার যে ঘাটতি তার একমাত্র কারণ হল তাদের মনে আল্লাহর ভয় নেই। [আত্ তাবলীগ-১৩৪]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আলেমদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশভূষা কেমন হওয়া উচিত

আলিম সমাজের জন্য অনাড়ম্বর জীবন অপরিহার্য

আমার মতে, চিন্তা করলে বঝা যায়, আমরা আলিম সামাজের মাঝে সাদাসিধা ও অনাড়ম্বরতার লেশমাত্র নেই। অতীব দুঃখের বিষয় হল, বর্তমানে অধিকাংশ আলেমের মাঝে মহিলাদের মতো সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে। জনাব! এটা আমাদের দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই মারাত্মক ক্রটি। এতে ইজ্জতের বদলে যিল্লতি বাড়ে।

আমাদের পোশাক-আশাক বা অন্যান্য সামগ্রীতে শান-শওকত, চাকচিক্য না থাকাই মানানসই। এতেই আমাদের শোভা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সমাজের চিত্র বদলে গেছে। অধিকাংশ তালিবুল ইলমকে দেখে বুঝার উপায় থাকে না যে, সে কি তালিবুল ইলম না কোন নবাবের পুত্র! চেনা যায় না সে কোন দীনদার, নাকি দুনিয়ার!

www.banglakitab.weebly.com

কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হলে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা সব কিছু সে দলের অনুরূপ হওয়া উচিত। ইলমের চাহিদাও এটা যে, যে তার ধারক বাহক হবে তার বেশভূষাও হবে আহলে ইলমের মত। ওহে আলেম সমাজ! অন্ততপক্ষে এতটুকু চিন্তা করুন যে, আপনারা কার উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবীদার! ভেবে দেখুন, আপনাদের উত্তরসূরীর অবস্থা কেমন ছিল? খোদার কসম! আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় এখনও আমাদের মাঝে পুরোপুরিভাবে দীনের প্রভাব পড়েনি। আমাদের অন্তরে দীন ভালোভাবে আসন গ্রহণ করেনি। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/২১]

সালফে সালেহীন ও আকাবিরদের অবস্থা এমন ছিল

আমাদের আকাবিরদের অবস্থা তো ই ছিল যে, যদি কোন বৈধ কাজও পাপাচারদের প্রতীক বনে যেত বা লৌকিকতার পরিচায়ক হত তাও তারা পরিহার করে চলতেন। এ কারণেই তারা পাতলা কাপড় পরিধান ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ মর্মেই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِيْنُهُ যার কাপড় পাতলা তার দীনও পাতলা (দুর্বল)।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা। একবার জনৈক সাহাবী কিংবা তাবিঈ কোন খলীফাকে মিহিন পোশাক পরিধান করতে দেখে বলেছিলেন,

اُنْظُرُوْا اَمِيْرَنَا هٰذَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ

> আমাদের আমীরের দিকে লক্ষ্য করে দেখ, তিনি ফাসেকদের পোশাক পরিধান করেন।

সে সময় যেহেতু সালফে সালেহীনদের মাঝে অনাড়ম্বরতা প্রবল ছিল, তাই তাঁরা চিকন কাপড় পরতেন না। ফাসেক-ফুজ্জাররাই কেবল তা পরিধান করত। এজন্য খলীফাকে সে পোশাকে দেখে একজন প্রজা এ আপত্তি করেছেন।

সুতরাং বর্তমান সময়েও যেসব বিষয় বাতিলপন্থী বা অহংকারীদের রীতিনীতি ও চালচলন হিসেবে বিবেচ্য প্রকৃতপক্ষে তা বৈধ হলেও পরিহার করা উচিত। যেমন ইংলিশ বুট জুতা, জরি ও লেইসযুক্ত চকমকা টুপি ইত্যাদি। প্রথমত, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত সাদৃশ্যতার বিষয়টি বাদ দিয়েও নিঃশর্ত মুবাহ মেনে নিলেও যেহেতু তা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বেশভূষা নয়, সে হিসেবেও তা পরিত্যাজ্য। আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা এমন হওয়া চাই, যাতে লোকজন দেখেই বুঝতে পারে যে, সে মৌলবাদী হুজুর। আর এ উপাধি আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৩৩]

www.banglakitab.weebly.com

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গহী [রহ.] একেবারে সাধারণ সাদাসিধে বেশে থাকতেন। কিন্তু তাঁর সামনে কেউ কথা বলার সাহসটুকুও পেত না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/২১]

অনাড়ম্বর জীবনই আলেমদের শোভা পায়

কোন কোন আলেম নিজেকে এহেন যত্নসহ পরিপাটি ও সজ্জিত করে রাখে, যা ইলমের শানের পরিপন্থী এবং তা ইলমের আবশ্যকীয় খেদমত থেকে ভাবনাহীনতা ও উদাসীনতারই প্রতীক। কারণ, ইলমের খেদমতের চিন্তা-ভাবনা থাকলে খাওয়া-পরার বিলাসিতার প্রতি দৃষ্টি থাকার কথা নয়।

অনুরূপভাবে মাহফিলের স্টেজ ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে বসার কামনা, পথ চলতে অগ্রে চলার বাসনা, সভা-সেমিনারে সভাপতি হওয়ার ভাবনা; এসব কিছুই রিয়া ও অহংকারের একেকটি শাখা। বিনয়, অনাড়ম্বরতা ও সাদাসিধের মাঝেই ইলমেদীনের শান নিহিত রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে- البذاذة من الايمان সরলতা হল ঈমানের নিদর্শন। তবে অনাড়ম্বরতার মাঝে পাকপবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা জরুরি। [হুকুল ইলম-৯৪০]

লৌকিকতা ও সাজসজ্জার কুফল

এমনিই তো লৌকিকতা ও অতিরিক্ত সাজসজ্জা সরলতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এছাড়াও এর একটি বড় ক্ষতি রয়েছে। তাহল যখন কেউ সদাসর্বদা লৌকিকতা প্রদর্শন ও সাজগোছে ব্যস্ত থাকবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ইলমের প্রতি তার মনোযোগ থাকবে না। এক পর্যায়ে সে ইলম চর্চা থেকে হাত গুটিয়ে নিবে। কারণ, আরবী প্রবাদে আছে :

اَلنَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهُ اِلٰى شَيْئَيْنِ فِىْ اٰنٍ وَّاحِدٍ

একই সময় মেধা দু'টি বস্তুর দিকে মনোযোগী হতে পারে না। আর বাস্তবতাও এই যে, যারা সর্বক্ষণ সাজগোছ, পরিপাটি, পরিচর্যায় ডুবে থাকে তারা কোন যোগ্যতার অধিকারী হয় না। আর একথা নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় কাজে লিপ্ত থাকে মামুলি ও ছোট জিনেসের প্রতি তার দৃষ্টি যায় না। গোসল করা বা কাপড় পালটানোর কথাও তার মনে থাকে না। এ কারণেই পুতঃপবিত্র শরীয়ত এক সপ্তাহে অন্তত একবার গোসল করার কানুন জারি করে দিয়েছে। এটা তো একটি স্বভাবগত বিষয়। কিন্তু যারা কাজ করেন তাদের এদিকে ভ্রুক্ষেপ থাকে না। এজন্য কানুনের প্রয়োজন পড়েছে। একদিকে তো অনাড়ম্বর

www.banglakitab.weebly.com

জীবন যাপনের নির্দেশ এসেছে। যাতে সাজসজ্জার প্রতি অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেওয়া হয়। অপরদিকে যেহেতু কারো কারো অমনোযোগিতা এহেন আকার ধারণ করে যে, নিজের গা-গতরের পরিচ্ছন্নতার সংবাদটুকু রাখেন না, তাই বলা হয়েছে, এক সপ্তাহে অন্তত একবার অবশ্যই গোসল করা যাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত না হয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৩৫]

কর্মীগণ সাদাসিধে ও অনাড়ম্বরই হয়ে থাকেন

জাগতিক কাজকর্মেও আমরা লক্ষ্য করি যে, যে ব্যক্তি কোন কাজে লিপ্ত থাকে, ক্ষুদ্র জিনিসের প্রতি তার দৃষ্টি যায় না। যেমন, বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যারা বিবাহের ব্যবস্থাপনার দয়িত্বে নিয়োজিত থাকেন তারা অন্যদের জন্য কেনাকাটা করলেও নিজেদের সাজসজ্জার ব্যাপারে কোন ফিকিরই করেন না এবং এটাকে লজ্জাও মনে করেন না। তারা মহৎ একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পেরেই গর্ববোধ ও আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। বোঝা গেল, বড় কাজে মগ্ন হওয়ার জন্য অনাড়ম্বরতা অপরিহার্য।

যে তালিবুল ইলম আপন পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকবে, তার কোনদিন এ ভাবনা আসবে না যে, আমার উন্নত মানের জুতা বা রুমাল আছে কিনা। বড় বড় মনীষীদের জীবনী পাঠেও বোঝা যায় যে, তারা খুবই অনাড়ম্বর সাদাসিধে জীবন যাপন করেছেন। জাগতিক মনীষীদের বেলায়ও একই কথা। সুতরাং যারা সদাসর্বদা সাজসজ্জা ও পরিচর্যায় আকণ্ঠ ডুবে থাকে তাদের সম্পর্কে বুঝতে হবে যোগ্যতার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

আলেম তো হল জাতীয় গাড়ির ড্রাইভার

ড্রাইভারের সাবান মেখে শরীর থেকে ময়লা ঝেড়ে গোসল করার ফুরসত কোথায়! ১ম শ্রেণীর ও ২য় শ্রেণীর কোন বিলাসী যাত্রী যদি আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা ড্রাইভারের উসীলায় বোম্বাই বা কলকতা পৌঁছি এবং সেখান থেকে বড় বড় ডিগ্রী লাভ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করছি, তিনি কেন আমাদের মতো বিলাসী পোশাকে আচ্ছাদিত নন; এ আপত্তি মূর্খতা ছাড়া আর কী হবে? [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৩/৩৫]

দামী ও সুন্দর কাপড় এবং লৌকিকতায় সম্মান নেই

যারা সদা লৌকিকতা ও ফ্যাশনের পিছনে পড়ে থাকেন তাদেরকে বলি, একটু ভেবে দেখুন তো এ লৌকিকতা প্রদর্শন ও ফ্যাশনের উদ্দেশ্য কি? নিজেদের

www.banglakitab.weebly.com

সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা ও মানুষের চোখে প্রিয় হওয়াই তো উদ্দেশ্য? এছাড়া তো আর কোন উদ্দেশ্য নেই! জেনে রাখুন, আলেম সমাজের মর্যাদা এর দ্বারা বাড়ে না। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ইলমী যোগ্যতা অর্জন করার দ্বারা। পায়জামা অর্ধনালী পর্যন্ত হোক, কিংবা পরিধানের কাপড় নাই বা থাকুক। তাতে কিছু আসে যায় না।

কানপুরে থাকাকালীন এক ঘটনা। আমি মাদরাসায় সবক পড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ এসে একজন লোক বসল। তার পরনে ছিল একটি লুঙ্গি এবং গায়ে ছিল মাত্র একটি চাদর। তার এ অবস্থা দেখে কেউ তার প্রতি লক্ষ্য করেনি। লোকটি যখন কথাবার্তা শুরু করল তখন বোঝা গেল যে তিনি একজন বড় মাপের আলেম। এরপর সকলের মনে তাঁর এ পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা সৃষ্টি হল যে, সকল ছাত্র তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল। এটাই ছিল সেই যুগের ছাত্রদের অবস্থা। একেবারে সাদাসিধে থাকতেন। জামা-পায়জামার কোনটাই জাতে উঠার মতো ছিল না। এরপরও তারাই ছিলেন যুগের ইমাম। বর্তমানে যারা পোশাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তারা এ মর্যাদা কোথায় পাবে? অনুসন্ধান করলে বোঝা যায়, সাধারণ জনগণের মনোভাবও এই যে, তাদের দৃষ্টিতে আলেমদের মর্যাদা, লেবাস-পোশাকে নয়; বরং এতসব জাঁকজমক অযোগ্যদেরই মানায়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/৩৬, ৩৭]

মান-অপমানের মাপকাঠি

বস্তুত, সম্মান রয়েছে অমুখাপেক্ষিতার মাঝে, আর অসম্মান রয়েছে মুখাপেক্ষিতার মাঝে। এতে পোশাক-পরিচ্ছদ ও ফ্যাশনের কোন দখল নেই। কাপড় পুরাতন হলেও এবং সাত মহাদেশের কোথাও এক হাত জমিনের মালিক না হলেও সে সম্মানিত। আর রাজকীয় পোশাক পরে এবং বহু জায়গাজমির মালিক হয়েও যদি কেউ মুখাপেক্ষি থাকে তাহলে সে অপমানিত। ওহে আলেম সমাজ! আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি হবে ইলম ও তাকওয়া এবং তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির দ্বারা। আলেমের সম্মান বৃদ্ধির উপায় হল যোগ্যতা অর্জনে। আলেমের চালচলন, লেবাস-পোশাক অকৃত্রিমই হয়ে থাকে। তার কাপড়ে কখনো জোড়া-তালি দেখা যায়। কখনো তার বোতাম থাকে উন্মুক্ত। অবশ্য এহেন পোশাকে অপমানের সন্দেহ করা হয় কিন্তু মূলত এতেই রয়েছে বিনয় ও নম্রতা। [তাজদীদে তা'লীম-৩৪]

ফ্যাশন পূজারীদের যুক্তি

আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি তার বাড়িতে এসে কেউ তাকে ডাক দিলে সে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা পর বেরিয়ে আসত। খোঁজ নিয়ে বিলম্বের কারণ জানা গেল

www.banglakitab.weebly.com

যে, আগন্তুকের ডাকের আওয়াজ তার ঘরে পৌছলে সে আয়না চিরুনী খোঁজ করত। একেবারে বউয়ের মতো সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে বের হত। এটা কি পাগলামী নয়!

এমক লৌকিকতাপন্থীদের অনেকের কাছেই দুই এক সেট কাপড় এমন থাকে যা তারা শুধু বাইরে বেরুলেই পড়ে। ঘরে ফেরার পর আবার সেই লেংটিই পরে থাকে। এদের পোশাকগুলো যেন হাতির দাঁতের মতো কিছু খাওয়ার জন্য, আর কিছু প্রদর্শনের জন্য।

এদেরকে শয়তান ধোঁকায় ফেলেছে। তারা বলে, إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। সে সুবাদে আমাদেরকে সুন্দর হয়ে থাকতে হবে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এ সাজসজ্জা যদি একমাত্র সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে তাহলে লৌকিকতা করে কেবল লোকসম্মুখেই সুন্দর পোশাক পরার কারণ কি? আল্লাহ তাআলা কি একাকী সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন না! এসব হল শয়তানের শেখানো ব্যাখ্যা। লক্ষণ দিয়েই বুঝা যায় উদ্দেশ্য কি? আমি অনেককে দেখি, খুব অল্প দামের কাপড় পরিধান করে কিন্তু এমন ভাব দেখায় যাতে অন্যরা খুব দামী মনে করে তাকে বড় কিছু ভাবে। অনুরূপভাবে অনেক ধনীকেও দেখেছি যে, খুবদামী কাপড় পড়ে কিন্তু খুব সাধারণ আকৃতির। আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা দান করলে মূল্যবান কাপড় পরিধান করবেন এতে দোষের কি আছে? তবে লক্ষ্য রাখবেন, তার ডিজাইনে যেন কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা না থাকে।

লৌকিকতা এবং সরলতার ব্যাখ্যা

হাদীস শরীফে আছে : اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ সরলতা ঈমানের নিদর্শন।

অনেকে অপরিস্কার থাকা, ধূলাবালি ও ময়লাযুক্ত থাকাকেই সরলতা মনে করে। অথচ ময়লার সঙ্গে সরলতার কোন সম্পর্ক নেই। তালিবুল ইলম এবং আলিম সমাজের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এদিকে অনেকে মোটেও লক্ষ্য করে না। কিছু কিছু লোক লৌকিকতায় অভ্যস্ত কিন্তু তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা মোটেও নেই। অথচ লৌকিকতা নয়, পরিচ্ছন্নতাই কাম্য।

আমাদের অবস্থা হল, আমরা পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করলে নবাবের পর্যায়ে পৌছে যাই আর সরলতা অবলম্বন করলে এ পরিমাণ নীচে নেমে যাই যে, কাপড় এবং শরীর উভয়টিতেই দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে রাখি। শরীয়ত যে মাপকাঠিও নির্ধারণ করে

www.banglakitab.weebly.com

দিয়েছে তার কোন পরোয়া করি না। অথচ উচিত হল, পরিচ্ছন্নতা ও সরলতার কোনটিই যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়; বরং উভয়ের মাঝে হয় সুসমন্বয়। [দাওয়াতে আবিদয়্যত-১৩/৩৬]

কাপড়ের মধ্যে থাকে একটি মূল পদার্থ আর থাকে একটি আকৃতি বা ডিজাইন। মানুষ সাধারণতঃ আকৃতি ও ডিজাইনেই লৌকিকতা দেখায়। দামী ও উন্নতমানের কাপড় দিয়েও যদি কেউ সাদাসিধে ডিজাইনের পোশাক তৈরি করে সেটা সাদাসিধে হিসেবেই গণ্য হবে। আর কমদামের সাধারণ মানের কাপড় দিয়ে চাকচিক্যপূর্ণ ডিজাইনের পোশাক তৈরি করলে সেটা লৌকিকতা হিসেবেই গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছলতা দান করে থাকলে দামী কাপড় পরিধান করবে। তবে তার ডিজাইন হবে একেবারে সাদাসিধে। তাতে কৃত্রিমতা এবং সাজসজ্জা করবে না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/৪৩]

ব্যতিক্রমধর্মী বসন-ভূষণ থেকে বিরত থাকা

আমাদের বুযুর্গরা ব্যতিক্রমী অবস্থা থেকে বেঁচে থাকতেন। তাই তারা আবা, কটি, শেরওয়ানী ইত্যাদি পরার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। এগুলো পরলে অন্যদের চেয়ে বিশিষ্ট মনে হয়। সদরিয়া পরার ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। আমি তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। আমরা আমাদের আকাবিরকে সদরিয়া পরায় অভ্যস্ত দেখিনি। আজকাল এগুলোর ব্যাপক রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এগুলোকে মানুষ আলেমদের বিশেষ প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়েছে। আমাদের আকাবির এসব থেকে বেঁচে থাকতেন। এমনকি যদি কখনো নির্জনতা অবলম্বনের মাঝে ব্যতিক্রমতা মনে হত তাহলে তারা তা পরিহার করে লোকালয়ে থেকেই যবান হেফাযত করতেন। - [তাকলীলুল এখতেলাত্ব-৩২৬]

www.banglakitab.weebly.com

তালিবুল ইলম এবং আলেমদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

শরয়ী বেশ-ভূষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

আপনারা ইলমের অধিকারী তথা দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত। মূর্খ ও সাধারণ মানুষ নন। প্রবাদ আছে, اَلْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। আমরা যদি সঠিকভাবে চিন্তা করি তাহলে অনুভব করব যে, আমাদের অন্তরের অতি গভীরে অহংকারের বীজ রয়েছে। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ তথা সব কিছুতেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তা না হলে এ চাকচিক্যপূর্ণ পোশাক পরার উদ্দেশ্য কি? মাদরাসায় ডাল-ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে। ছাত্ররা যাকাত, ফিৎরা, কুরবানীর চামড়ার পয়সায় বোর্ডিং থেকে খাবার খায় অথচ পোশাক দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। ঋণ করে হলেও আনকমন ডিজাইনের দামী কাপড় পরবে। তবু সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন কোন ত্রুটি না হয়। এতো হল সম্পূর্ণ মিথ্যার পোশাক।

কিছু ছাত্রের মেজায হল সব কিছুতেই মেচিং চাই। জামা যে কালারের হবে পাজামা, টুপি, জুতাও একই কালারের হবে।

আর কিছু ছাত্র আর এক ধাপ এগিয়ে অতিরিক্ত নতুন ফ্যাশনের উপর চলে। ইয়া বড় টুকরির মতো রঙ্গিন টুপি মাথায় দেয়। পাজামার বদলে পরে পেন্ট। জামার কলারে সর্বদা টাই লাগানো থাকে। দেখে মনে হবে না যে, সে কোন মাদরাসার ছাত্র; বরং মনে হবে সে কোন নবাবজাদা!

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা!

নিজের সামর্থ্য এবং সচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখ। ইলমী এবং শরয়ী চালন-চলন এড়িয়ে চলবে না। তোমরা শিক্ষিত হয়ে মূর্খদের অনুসরণ করবে এটা বড়ই লজ্জার কথা। উচিত ছিল, মূর্খরা তোমাদের অনুসরণ করবে। উল্টো তারা তোমাদের অনুসরণীয় হয়ে গেল।

একটু ভেবে দেখ তো, তোমরা এ পদ্ধতি কার কাছ থেকে গ্রহণ করলে? বলতে দ্বিধা নেই, তোমরা এটা গ্রহণ করেছো বাতিলপন্থীদের থেকে। পোশাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তোমরা বিধর্মীদেরকে পথপ্রদর্শক বানালে। সন্দেহ নেই, এতে অহংকার, রিয়া ইত্যাদিই মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়া বিধর্মীদের আদলে তৈরি যে পোশাক তোমরা পরিধান করছ তা তো তোমাদের সামর্থেরও বাইরে। শরীয়ত এবং যুক্তি বলে, মানুষের এমন কাজ করা উচিত যা তার সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী হয়। সৌন্দর্য এবং জাঁকজমকও সামর্থ্য অনুযায়ী করা উচিত।

www.banglakitab.weebly.com

বৈধ-অবৈধের মাপকাঠি

আমি তোমাদেরকে একটি মাপকাঠি বলে দিচ্ছি। এ মাপকাঠির আলোকে তোমরা কোন বেশভূষণ ও চাল-চলনকে বৈধ বা অবৈধ হিসেবে নিরুপণ করতে পারবে।

বল দেখি, দামী সুন্দর ডিজাইনের পোশাক পরলে তোমার অন্তরে কোন পরিবর্তন হয় কি না? আত্মগৌরব এবং অহংকার অনুভূত হয় কি না? তোমার অবস্থা যদি আগের মতই থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে মূল্যবান সুন্দর পোশাকের মাঝে কোন অসুবিধা নেই। তবে সে সৌন্দর্য হতে হবে শরীয়তের গণ্ডির ভেতর। কিন্তু যদি দামী সুন্দর পোশাক পরিধানের পর কিছুটা আত্মগৌরব ও অহংকারের গন্ধ আসে তাহলে তা হারাম বলে সাব্যস্ত হবে। তবে মনে রাখতে হবে, বিধর্মীদের চলন-বলন রীতি সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। অহংকার ভাব থাকুক বা না থাকুক। কেননা, এক্ষেত্রে হারাম হওয়ার মূলনীতি অহংবোধ নয়, অন্য কিছু। সেটি হল বিধর্মীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন। শুধুমাত্র অহংকারবোধ না থাকলেই হারাম হবে না এমন কথা নয়। হারাম হওয়ার ভিন্ন কারণও থাকতে পারে।

পরিশেষে বলি, ইলম ও আমলই হল তোমাদের যোগ্যতা এবং সৌন্দর্য। ইলম-আমলের ভূষণে ভূষিত হও। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করো। ইলম-আমল থাকলে তোমার আর কিছুর অভাব হবে না। ইলমেদীন সকল বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষি করে দেয়। অতএব, এই মেয়েলী সাজসজ্জা পরিহার করে সাধারণ জীবন যাপন করা উচিত।

ঈমানের নিদর্শন

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা ঈমানের নিদর্শন। আপনারা নায়েবে রাসূল। মানুষ আপনাদেরকে অনুসরণ করে চলে। আপনারা যদি আপত্তিকর পোশাক ও বেশ-ভূষা গ্রহণ করেন জনসাধারণের অবস্থা কী হবে? তারা তো পাক্কা ইংরেজই বনে যাবে। জনসাধারণ গাফলতী ও উদাসীনতার শিকার হবে এবং আপনাদেরকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করবে। ফলে সকলের দায়ভার আপনাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হবে। হাদীস শরীফে ঘটনা এসেছে যে, কোন খলীফা পাতলা কাপড় পরে জুমার খুৎবা দিতে এলে জনৈক সাহাবী সাথে সাথে দাঁড়িয়ে আপত্তি করে বলেন-

www.banglakitab.weebly.com

أُنْظُرُوْا إِلَى أَمِيْرِنَا هٰذَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ

[আমাদের খলীফার দিকে তাকিয়ে দেখ তিনি ফাসেকদের পোশাক পরিধান করেন।]

লক্ষ্য করুন, শুধু পাতলা পোশাক পরার অভিযোগে, যা সে সময়ের পাপাচারীদের পরিধেয় ছিল, খলীফাতুল মুসলিমীনকে জনসম্মুখে কিভাবে ভর্ৎসনা করা হল।

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

[যে যে জাতির সাদৃশ্যতা গ্রহণ করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।]

বলা বাহুল্য, আপনাদের সাজসজ্জা ও ফ্যাশন যদি কাফের-বেঈমানদের কাছ থেকে ধার করা হয় তাহলে আপনারাও তাদের দলে পরিগণিত হবেন।

তালিবে ইলমদের জন্য এ ধরনের পোশাক কিছুতেই শোভনীয় নয়। এতে ইলমের নাশোকরী ও অবমাননা হয়। বিশেষভাবে তালিবে ইলমী অবস্থায় তো সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে পোশাক পরা উচিত। আমি মূল্যবান পোশাক পরতে নিষেধ করি না। আল্লাহ তাআলা যাকে সামর্থ্য দিয়েছেন সে দামি পোশাক করবে। আমি তো কেবল গর্ব-অহংকারের পোশাক পরতে নিষেধ করি। এছাড়া যাদের মাঝে গর্ব-অহংকারের উপসর্গ নেই তারা যে কোন ধরনের পোশাক পরুক না কেন তাতে তালিবে ইলমী শান ব্যহত হয় না। কেননা, সে তো মূল্যবান পোশাক ও পরেও এমন উস্কুখুস্কু থাকে যে অবস্থায় তালিবে ইলমের নিদর্শন সুস্পষ্ট ফুটে উঠে। আর যারা সাজসজ্জার ধান্ধায় থাকে কিংবা নিত্যনতুন ফ্যাশন ধারণ করে তাদের চেহারা-সুরতে তালিবে ইলমের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না।

আক্ষেপ করে বলতে হয়, তারা নাকি এ ধরনের বেশ-ভূষা এজন্য গ্রহণ করে থাকে যে, জনগণ তাদেরকে তালিবে ইলম মনে না করে। যেন তারা বলতে চায় আমরা তালিবে ইলম নই; আমরা বিশিষ্ট ও রুচিশীল ছাত্র সমাজ।

ফ্যাশনপ্রিয় ছাত্রদের যুক্তি

ফ্যাশণ প্রিয় ছাত্ররা তাদের সাজসজ্জার এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, আমরা এ সাজসজ্জা এজন্য গ্রহণ করি যাতে সাধাণ লোকেরা আমাদেরকে হীন ও তুচ্ছ না ভাবে। তাদেরকে বলি, একটু চিন্তা করে দেখ, মূর্খদের দৃষ্টিতে সম্মানী হওয়া- এ

www.banglakitab.weebly.com

কেমন সম্মান? প্রকৃত সম্মান সেটাই যাকে জ্ঞানী সমাজ সম্মান মনে করেন। আলেমদের জন্য স্বীয় পূর্বসূরী আলিমদের অনুকরণ করা উচিত। এতেই উভয় জগতের কল্যাণ ও সফলতা মনে করা উচিত।

এটা তোমাদের ছেলেবেলা। এখন নফসকে যেভাবে ইচ্ছা সংশোধন করতে পারো। পরবর্তীতে তা সংশোধন করা জটিল হবে।

নিজেদের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বেশ-ভূষা বর্জন করবে না। গরিব মিসকীন এবং বুযুর্গদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করো। এতে যদি তোমরা মূর্খ ও অবুঝদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র হও তার জন্য গর্ববোধ করো। কেননা, এ অপমানই হল প্রকৃত সম্মান। সাধারণ জনগণের মনে তো ঐ আলেমের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাবোধ থাকে যিনি সলফে সালিহীন ও বুযর্গদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করেন।

জানি না কেন যে, আপনারা নিজেদের বেশ-ভূষা বদলে ফেলছেন এবং প্রাচীন রীতি-নীতি থেকে সরে যাচ্ছেন। কেউ কেউ তো এত টাইটফিট কোট-প্যান্ট পরে থাকে যে, মনে হয় তিনি এখনই লন্ডন থেকে এসেছেন। আর বিস্ময়ের ব্যাপার হল ভাবখানা ইংরেজদের মতো হলেও জিজ্ঞাসা করলে দেখা যাবে একটি ইংরেজী হরফও বলতে পারে না।

আমি মনে করি, এসব পোশাক ও বেশ-ভূষা ধারণকারীগণ জনসাধারণের দৃষ্টিতেও হেয়প্রতিপন্ন। সলফে সালিহীনদের পোশাক তো বিশেষদের মাঝে সর্বসম্মতিক্রমে সম্মানিত, সাধারণ জনগণও তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেন।

ধরে নিলাম জনসাধারণ বুযুর্গদের পোশাকে আপনাকে হীন মনে করে কিন্তু আধুনিক পোশাকে তো বিশেষ এবং সাধারণ উভয় ধরনের মানুষ আপনাকে হীন মনে করে। উভয় দিক থেকেই নিন্দাবাদ হতে থাকে।

এর চেয়েও বড় কথা হল, পোশাক-পরিচ্ছদে যাদের গর্ব-অহংকার ফুটে উঠে তাদের অন্তর তো অহংকারে টইটুম্বুর থাকে। ফলে কখনো নিজের অপরাধ স্বীকার করে না। কথায় কথায় তাবীল করে ও যুক্তি পেশ করে। প্রবাদ আছে-

ہر کلامیکہ محتاج یعنی باشد لایعنی است

[যে কথায় 'অর্থাৎ' এর প্রয়োজন তা 'অনর্থক' হয়ে থাকে।]

মোটকথা, ফ্যাশনপূজারীদের সব কিছুতেই لان বা হেতু নিহিত থাকে। আচকান, জুতো, জামা, টুপিসহ সব পোশাকেই হেতু থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

ইলম অন্বেষণের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য

বন্ধুগণ! এসব লৌকিকতা পরিহার করো। তোমরা হলে তালিবুল ইলম। ইলমের শান ও বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করো্ একই মুহূর্তে মানুষ দুই দিকে দৃষ্টি করতে পারে না। তাই লৌকিকতার ধান্ধায় থাকলে পোশাক-পরিচ্ছদের ভেতরই থেকে যাবে, মূল উদ্দেশ্য হাত ছাড়া হয়ে যাবে। বলো দেখি, এসব আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদে কোন্ রাজত্ব নিহিত রয়েছে? এসব বাদ দিয়ে সালফে সালিহীনের বেশ-ভূষা গ্রহণ করো। তাতেই 'কামাল' ও 'জামাল' রয়েছে। তাতেই সম্মান ও মর্যাদা রয়িছে। মূল্যবান অভিজাত পোশাক পরার মাঝে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন 'কামাল' নেই। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখ, রাজা-বাদশাদের জীবনীর কোথাও তাদের প্রশংসায় একথা লেখা হয়নি যে, অমুক বাদশা খুব উন্নত ও অভিজাত পোশাক পরিধান করতেন; বরং কোন বাদশা সাধারণ ও কমদামি পোশাক পরে থাকলে সেটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। সেটি তার বিশেষ প্রশংসার বস্তু মনে করা হয়। তার বড় বড় অবদান ও কীর্তিগুলো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার সাথে সাথে তার অনাড়ম্বর জীবনচারকেও মূল্যায়ন করা হয়। এমনকি এটি তার প্রথম স্তরের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তোমরা হাদীস শরীফে পড়েছো,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَىٰ مَالَا يُرِيْبُكَ

অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করে নিশ্চিত বিষয় গ্রহণ করো, যার মধ্যে কোন ক্ষতির সংশয় নেই।

অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَكْمُلُ وَرَعُ الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا مِمَّا بِهٖ بَأْسٌ

অর্থাৎ মানুষ যখন সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে তখনই সে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে।

তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা

এটিই হল পরিপূর্ণ ও প্রথম স্তরের তাকওয়া। এটা গ্রহণ করুন। আধুনিক ফ্যাশনের পোশাক-পরিচ্ছদকে তাবীল ও ব্যাখ্যা করে আপনি বড়জোর জায়েয বানাবেন কিন্তু তা সন্দেহজনক হওয়ার ক্ষেত্রে কারো আপত্তি নেই। এবার বলুন, আপনারা সন্দেহজনক বস্তু কেন গ্রহণ করবেন?

www.banglakitab.weebly.com

তালাবায়ে আযীয ও উলামায়ে কেরাম! আপনারা সালাফে সালিহীনের জীবন ও কর্ম লক্ষ্য করুন। হযরত আলী (রাদি.) একবার একটি জামা পরলেন, যা তার খুব পছন্দ হল। এতে নফস তাজা হতে লাগল। তাই তিনি কেচি দিয়ে সে জামাটির আস্তিন থেকে অল্প অল্প করে কেটে দিলেন। যাতে তা অসুন্দর দেখায় এবং তাতে নফসের কোন অংশ না থাকে।

জানি না আর কোন খারাবী আছে কি না, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা এসব আধুনিক বেশ-ভূষা কেবল নফস ও রিপুর তাড়নায় গ্রহণ করে থাকেন। অথচ আপনাদের পূর্বপুরুষগণ রিপুর তাড়না থেকেও বিরত থাকতেন।

আমি আপনাদেরকে একটি মূলনীতি বলে দিচ্ছি। সেটি স্মরণ রাখবেন এবং নিজের বেশ-ভূষাকে সে আলোকে যাচাই করবেন। মনে রাখবেন, যখন তোমরা নিজেদের দৃষ্টিতেও নিজেদেরকে ভালো মনে করো তখন বুঝতে হবে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমরা খারাপ অবস্থানে আছেন। কোন যোগ্যতা, সৌন্দর্য, বক্তৃতা বা লিখনীর দ্বারা যখন নিজেদের কাছে নিজেদের গুণ ফুটে উঠবে তখন আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের আত্মগৌরবের দোষ প্রকাশিত হবে।

হাদীস শরীফে إِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ অর্থাৎ নিজস্ব মতামত ও চিন্তাধারাকে উত্তম মনে করার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। আর সে নিন্দার মূল রহস্য হল 'ওজব' ও আত্মপুলক অহংকারের পূর্বাভাস। কেননা, ওজবের কারণে মানুষ প্রথমত নিজেকে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ দেখে। তারপর অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এটাই হল অহংকার। আর ভূমিকার ঐ হুকুম হয়ে থাকে যা মূল বস্তুর হয়ে থাকে। সুতরাং শরীয়তের স্বতন্ত্র নির্দেশনা ছাড়া এ প্রমাণ দ্বারাও আধুনিক পোশাক হারাম সাব্যস্ত হল।

এবার আধুনিক ফ্যাশনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানকারীগণ চিন্তা করে বলুন তো এসব পোশাক পরলে মনের মাঝে ওজব ও আত্মপুলক জাগে কি-না? এবার আপনাদের এখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছামত তাবীল ও ব্যাখ্যা পেশ করতে থাকুন। আমাদের বলার দায়িত্ব ছিল বলে দিলাম। আপনারা আহলে ইলম। নিজেরাও অনেক কিছু জানেন ও অনুভব করেন।

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

গরিমা কোন ক্ষেত্রেই ভালো না

এতো হল পোশাক-পরিচ্ছদের গরিমা। শুধু পোশাক-পরিচ্ছদই নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও গরিমা প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থা খুবই নাজুক। অনেক ছাত্রকে তো দেখে মনেই হয় না যে, সে তালিবে ইলম না-কি কোন নবাবের পুত্র। অনেক আলেমকে দেখে বোঝা যায় না যে, তিনি দুনিয়াদার না-কি দীনদার। কেউ যদি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে বেশ-ভূষা ও রীতিনীতি সবদিক থেকে সে দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। মনে রাখবেন, আলেমদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করার মাঝেই ইলমের শোভা। - [হাকীকতে তাসাউফ ও তাকওয়া-১৪৬৯]

তালিবে ইলম ও আলেমদের বেশ-ভূষা কেমন হবে

ইলমের চর্চা ও খেদমতে নিরত হয়ে ইলমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বেশ-ভূষা গ্রহণ করুন। আলেমদের পোশাক তো এমন হবে যে, মানুষ তাকে 'আজনবী' ও অপরিচিত মনে করবে। এখন তো তুর্কি টুপির ছড়াছাড়ি। যারা জাতির পথপ্রদর্শক ও অনুসরণীয় নয় তাদের জন্য তা পরতে অসুবিধা নেই। কিন্তু আলেমদের জন্য তা না পরাই ভালো। - [কালিমাতুল হক-১৭৩]

আমাদের মতো তালিবে ইলমদের জন্য অভিজাত ও গৌরবময় পোশাক পরিধান করা এবং শান-শওকতের সাথে চলা উচিত নয়; বরং গরিবদের মতো থাকা উচিত। কেননা, আমাদের সাথে গরিবদেরই ওঠাবসা বেশি। এমতাবস্থায় জাঁকজমকপূর্ণ বেশ-ভূষা তাদের প্রতি একপ্রকার ভীতি সৃষ্টি করবে। ফলে তারা আমাদের কাছে আসতে ইতস্তত বোধ করবে এবং 'ইস্তেফাদা' হাসিল করতে ব্যর্থ হবে। এজন্য আমি এ বিষয়টির প্রতিও খেয়াল করি।

তবে একেবারে অসহায়দের মতও থাকবে না। যাতে কেউ দেখে অভাবী ও মুখাপেক্ষি মনে না করে। যদি আল্লাহ তাআলা তাওফীক ও সামর্থ্য দান করে থাকেন তাহলে মধ্যম পর্যায়ের জীবন যাপন করা উচিত। হাদীসের শিক্ষা خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا -এর উপর আমল করবে। - [আল ইফাজাত-১/২২৪]

যাকে নিজের চেয়ে বড় ও সম্মানী মনে করবে তার সামনে তার কাপড়ের চেয়ে অধিক মূল্যবান কাপড় পরে যাওয়া বেআদবি। তার সামনে থাকাকালীন সব জিনিসই তার চেয়ে কমদামি ব্যবহার করা উচিত।

উল্লেখ্য, যারা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে তারা সর্বদা জাঁকজমকের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কেননা, এটা ব্যতিরেকে শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব। - [মাযীদুল মাজীদ-২৬]

www.banglakitab.weebly.com

তালিবুল ইলমের ইউনিফরম

আমি দেওবন্দ মাদরাসার কর্তৃপক্ষকে বলেছি, ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদের একটি বিশেষ ডিজাইন নির্ধারিত হওয়া উচিত। যেমনটি আমাদের বুযুর্গরা পরিধান করতেন। কেউ কেউ বলেন, বর্তমানকালের ছাত্ররা এটাকে নিজেদের জন্য অপমান বোধ করে। কিন্তু এমন কথার প্রতি কেন ভ্রুক্ষেপ করা হবে? - [আল কালামুল হাসান-৫৩]

তালিবুল ইলম ও আলেমদের উদ্দেশ্য কতিপয় নসিহত

১. হে মাদরাসার তালিবুল ইলমগণ! মনে রেখ, তোমরা যে দলের অন্তর্ভুক্ত তাদের পরিভাষা, বেশ-ভূষা ও রীতিনীতি গ্রহণ করার মাঝেই তোমাদের গর্ব।

২. পোশাক ও বেশ-ভূষায় কিংবা দুনিয়াদারদের আদলে কথা বলার মাঝে ইজ্জত ও সম্মান খোঁজা মানুষের কাজ নয়। এটা খুবই দৃষ্টিকটু ব্যাপার।

৩. মাখলুকের কাছে মর্যাদা না পেলে পরোয়া কিসের? খালেকের কাছে তো নিঃসন্দেহে সম্মান পাওয়া যাবেই।

৪. তোমাদের মাঝে এমন বিনয় ও নম্রতা থাকা উচিত যা দেখে গোটা পৃথিবী তোমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তোমাদের মর্যাদা এতেই নিহিত রয়েছে।

৫. তোমরা নিজেদেরকে বিলীন করে দাও এবং অপ্রসিদ্ধ করে রাখ। তাহলে দেখবে তোমাদের জনপ্রিয়তা কত তুঙ্গে উঠে। সকল মানুষের মধ্যে তোমাদের সুনাম-সুখ্যাতির চর্চা হবে। - [আনফাসে ঈসা-১/২৭৩]

www.banglakitab.weebly.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা

বিনয়ের প্রয়োজনীয়তা

'খুশ' নম্রতা অন্তরের আমল। এটা আমাদের মাঝে খুব কম পাওয়া যায়। অথচ এটা সকল ইবাদতের মূল। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা করি না এবং এটাকে গুরুত্ব দেই না।

আলেমদেরকে বিনয় ও নম্রতা বিশেষভাবে গ্রহণ করা উচিত। এটা তাদের ভূষণ ও শোভা। আমাদের অন্তরের বিনয়শূন্যতার অভিযোগ পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট শব্দে রয়েছে। কুরআন বলে,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

মুমিনদের কি এখনও আল্লাহর স্মরণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি?

বোঝা গেল, বিনয় ও নম্রতা খুবই জরুরি আমল। এর বিপরীত বস্তু হল 'কাসাওয়াত' বা রুঢ়তা। ইরশাদ হয়েছে,

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। [সূরা যুমার : ২২]

তারপর বলা হয়েছে,

ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

তারপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়।

[সূরা যুমার : ২৩]

এ আয়াতে 'লীন' ও নম্রতাকে 'কাসাওয়াত' ও রুঢ়তার বিপরীত বস্তুরূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর 'লীন'ই হল খুশু বা বিনয় ও নম্রতা।

বোঝা গেল, খুশুর বিপরীত বস্তু হল 'কাসাওয়াত'। আর কাসাওয়াত সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّ أَبْعَدَ الشَّيْءِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُّ

আল্লাহ্ থেকে অধিক দূরবর্তীকারী বস্তু হল এমন অন্তর যার মাঝে রূঢ়তা রয়েছে (অর্থাৎ বিনয় নেই)।

বিনয় আবশ্যক হওয়ার জন্য এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী প্রয়োজন? অতএব প্রত্যেক ছাত্রের জন্য আবশ্যক হল তারা যেন অন্তরে বিনয় সৃষ্টি করে।

বিনয়ের হাকিকত

বিনয় অন্তরের আমল। অন্তরে বিনয় থাকলে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তার নিদর্শন অবশ্যই ফুটে উঠবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামায পড়ছে এবং নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তির অন্তরে 'খুশু' থাকলে সে কিছুতেই এমনটি করত না।

এবার লক্ষ্য করে দেখুন, আমাদের অন্তরে খুশু আছে কি-না? এবং আমরা ان تخشع قلوبهم -এর মর্মের অন্তর্ভুক্ত হই কি-না? যদি আমাদের অন্তরে বিনয় থাকত তাহলে কি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রভাব প্রকাশ পেত না? কেন আমরা নিজেদের কিংবা কোন মুসলমানের কাজ করতে লজ্জিতবোধ করি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে সম্মানী কেউ ছিল না। এতদসত্ত্বেও দেখুন তাঁর অবস্থা কিরূপ ছিল?

বিনয়ের নিদর্শন

বিনয়ের বাহ্যিক নিদর্শন হল ঘাড় নীচু করে চলা। কথাবার্তা এবং লেনদেনে কঠোরতা না করা। রাগ এবং ক্রোধকে হজম করা। প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা না করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

নিজের পথ চলার মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং স্বরকে নীচু কর।

বোঝা গেল, অন্তরে বিনয়-নম্রতা থাকলে চলন-বলনে তার প্রভাব ফুটে ওঠে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/২১]

www.banglakitab.weebly.com

বিনয় সৃষ্টি করার উপায়

অন্তরে বিনয় সৃষ্টির জন্য বিনয়ীদের কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। পূর্ববর্তী বুযুর্গানেদীনের জীবনী পড়ে দেখ কেমন ছিল তাঁদের অবস্থা? তাঁদের পছন্দনীয় চাল-চলনগুলোর অনুসরণ করা চাই। ফলে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হবে। বুযুর্গানেদীনের সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্যতা প্রভাব রয়েছে। কোন কাফেরও যদি কোন আল্লাহওয়ালার রূপ ধারণ করে তার মাঝেও প্রভাব হতে পারে। ইতিহাস বলে, ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা করার জন্য যাদুকরদেরকে একত্রিত করেছিল তখন তারা মূসা (আ.)-এর পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে এসেছিল। অবশেষে হল কি? মোকাবিলার প্রথম পর্যায়েই তারা সকলে মুসলমান হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ! ফেরাউনের সাহায্যকারী যাদুকরদের উপর তোমার অনুগ্রহ হল কিন্তু তার উপর হল না কেন? আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মূসা! যাদুকররা সকলেই আপনার পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরে এসেছে। আমার বন্ধুর সাদৃশ্য গ্রহণকারীগণ এবং আমার বন্ধুর চাল-চলন অনুসরণকারীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে- এটা আমার রহমত ও দয়ার দাবী নয়। এজন্য যাদুকরদের ভাগ্যে ঈমানের অমূল্য সম্পদ জোটেছে। পক্ষান্তরে ফেরাউনের অবস্থা ছিল ভিন্ন। মূসা (আ.)-এর সাথে তার এই সাদৃশ্যের মিলও ছিল না। এজন্য তার ভাগ্যে ঈমান জোটেনি। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৮৩/৩৯]

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং সমর্থন আদায় উদ্দেশ্য। আমাদের মাঝে বিনয়ের গুণ থাকলে আমাদেরকে তার উপযোগী বেশ-ভূষাই গ্রহণ করা আবশ্যক। আর যদি উক্ত গুণ অনুপস্থিত থাকে তাহলে তা অর্জন করার জন্য তার নিদর্শন গ্রহণ করা আবশ্যক। সেই সাথে বিনয়ীদের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। -[দাওয়াতে আবদিয়্যত-৮৩/৩৯]

বিনয় কী?

বিনয় হল নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অপদার্থ এবং হীন মনে করে নম্রতা অবলম্বন করা। নিজেকে সম্মান ও মর্যাদার উপযুক্ত মনে না করা। নিজের আমিত্বকে বিলীন করে দেওয়ার চেষ্টা করা। বিনয়ের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতসমূহকে নিজের থেকে নাকচ করে দিবে। প্রকৃতপক্ষে বিনয়ের অর্থ হল আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতগুলোকে নিজের যোগ্যতার ফসল মনে করবে না বরং একমাত্র আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ মনে করবে। বিনয় হল কেউ তোমাকে

www.banglakitab.weebly.com

হীন ও তুচ্ছ মনে করলে কিংবা গালি দিয়ে অপমান করলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত না হওয়া। নিজের নফসকে বুঝানো যে, তুমি বাস্তবেই এমন। বিনয়ের চূড়ান্ত রূপ তখন প্রকাশিত হবে যখন প্রশংসা এবং নিন্দা উভয়টিই সমান মনে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তোমরা এ উদ্দেশ্যে বিনয় প্রকাশ করবে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করবে আমি সম্মান মর্যাদা দান করব। কিন্তু সম্মান ও মর্যাদা লাভের আশায় বিনয় প্রকাশ করবে না। [আনফাসে ঈসা-১/২৪৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়

লক্ষ্য করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী অবস্থা ছিল? তিনি বলেন,

اِنِّیْ اٰکُلُ کَمَا یَاْکُلُ الْعَبْدُ

আমি এমনভাবে আহার করি যেমনভাবে কোন গোলাম আহার করে।

আর গোলামের আহারে অহংকার ও গর্বের নাম গন্ধও থাকে না। হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জড়সড় হয়ে বসে খাবার খেতেন। পথ চলার সময় কারো সামনে চলতেন না; বরং এভাবে চলতেন যে, কিছু সাহাবী তাঁর আগে, কিছু বরাবর এবং কিছু শেষে থাকতেন। আজকালের রাজা-বাদশা ও নেতাদের মতো বিশেষ নিয়মে একটি গ্রুপ সামনে, একটি পিছনে থাকত না; বরং স্বাভাবিকভাবে বন্ধু-বান্ধবদের মতো অকৃত্রিমভাবে কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে চলত, কেউ পিছনে চলত।

পোশাক-পরিচ্ছদের অবস্থা এই ছিল যে, এক একটি জামায় কয়েকটি পট্টি সংযুক্ত থাকত। চটের উপর শুয়ে আরাম করতেন। নিজের কাজ নিজে করতেন। নিজে বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করে আনতেন।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বিদেশী এক দূত ভয় পেয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে দেখে ভয় পেও না। আমি এক হতদরিদ্র নারীর সন্তান, যিনি শুকনো গোশত খেতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত অবস্থাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন এবং সে আলোকে নিজেদেরকে যাচাই করুন।

ع : ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

www.banglakitab.weebly.com

সুধী! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী যেমনিভাবে অনুসরণ করতে হয়, তেমনিভাবে তাঁর কর্মও অনুসরণযোগ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা তাঁর জন্য বিশিষ্ট হওয়ার প্রমাণ পাওয়া না যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

রাসূল সা. এর মাঝে তোমদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

রাসূল সা এর বাণী যেমন উম্মতের অনুসরনের জন্য উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি তাঁর কর্মও উম্মতের অনুসরণের জন্য সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের বেশ-ভূষা ও চাল-চলন তাঁর মতই হওয়া উচিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইলম ও আমলের উপর গর্ব করার অবকাশ নেই

নিজের ইলমের উপর যদি কারো গর্ব ও অহংকার থাকে তাহলে সে শুনে রাখুক, এ পৃথিবীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি ইলম কাউকে প্রদান করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সম্বোধন করে বলেছেন,

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ

অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে যে ইলম প্রদান করেছি তা অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিতে পারি।

لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا

তারপর কেউ আপনার তত্ত্বাবধায়ক হবে না।

লক্ষ্য করুন, আয়াতে কেমন কঠোর বাণী বলা হয়েছে। এহেন কঠোর সম্বোধনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতঙ্কিত হয়ে যাওয়ার কথা। এমনকি এতে নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কথা। এজন্য পরে একটি অংশ বৃদ্ধি করে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

সে সময় একমাত্র আল্লাহর রহমতই আপনার সঙ্গ দিতে পারে। অন্য কিছু সঙ্গ দিতে পারবে না।

www.banglakitab.weebly.com

এ অংশটি বৃদ্ধি করে ক্ষান্ত করা হয়নি। কেননা, এতে আশ্বস্থ হওয়া যাচ্ছিল না যে, রহমত সঙ্গ দেয়ার বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে কি-না। তাই সামনে আরেকটি বাক্য জুড়ে দেয়া হয়েছে।

إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ আপনার 'শামেলে হাল' রয়েছে তাই বাস্তবেই রহমত আপনার সঙ্গ দিবে। আপনি এতটুকু পেরেশান হবেন না। এ বাক্য দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে আস্বস্ত হয়েছেন যে, তাঁর ইলম ছিনিয়ে নেয়া হবে না। কেবল আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরত ও শক্তি প্রকাশ করা ও বিশুদ্ধ আকীদার জন্য এমনটি বলেছেন।

ওহে আলেম সমাজ! যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই এমন কথা বলা হয়েছে সেখানে অন্যদের বেলায় কী কথা হবে? আমাদের বিবেক-বুদ্ধি শাণিত করার প্রয়োজন রয়েছে। কেউ ইলম বা আমলের উপর গর্ব করলে সেটা হবে তার নির্বুদ্ধিতা। ইলম ও আমলের কোন বিষয় এমন নেই যার উপর গর্ব করা যায়। কেননা, এসব নিজের উপার্জিত বিষয় নয়; বরং সম্পূর্ণই আল্লাহ তাআলার প্রদানকৃত। এগুলোকে নিজের মনে করা বোকামী।

অহংকার খুবই ভয়ঙ্কর ব্যধি। এটি হল 'উম্মুল আমরায' বা সকল ব্যাধির মূল। অধিকাংশ আত্মিক ব্যাধি অহংকারের সাথে সম্পৃক্ত ও তার উপর নির্ভরশীল। যেমন ক্রোধ একটি বড় ব্যধি। এটি অহংকারের কারণেই সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ক্রোধান্বিত ব্যক্তির মুখ থেকেই এ কারণটি প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন কোন কোন বদমেজাজ ব্যক্তি রাগের মুহূর্তে বলতে থাকে, তুই জানিস আমি কে?

এবার বোঝা গেল, অহংকার কি পরিমাণ মন্দ জিনিস। আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক অন্তরই এ থেকে পবিত্র পাওয়া যাবে। - [আত্ তাবলীগ-৫/১৮]

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব [রহ.] একদিন বলেন, এতদিন যাবত আমার তাকবীরে তাহরীমা ছুটেনি। একথা বলে মসজিদে গিয়ে দেখেন মুসল্লীগণ নামায পড়ে বের হচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে দিয়েছেন। - [হুসনুল আযীয-২/২১৪]

দীনের কাজ করাই মুখলিস ও মাকবুল হওয়ার প্রমাণ নয়

আল্লাহ্ তাআলা যার দ্বারা ইচ্ছা করেন দীনের কাজ নিয়ে থাকেন। যার দ্বারা দীনের কাজ নেয়া হয় সে যে আল্লাহর দরবারে মাকবুল ও প্রিয় তা নিশ্চিত বলা

www.banglakitab.weebly.com

যায় না। যেমন চামার দ্বারা কাজ করানো হয় কিন্তু এতে চামারের মর্যাদা বাড়ে না। সে আপন স্থানে চামারই থেকে যায়। আমাদের অবস্থাও অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা আমাদের দ্বারা তার বান্দাদের কিছু খেদমত নিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা সকলেই নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছি যে, আমরা কোথায় আছি। আর আল্লাহ্ তাআলার কাছে তো মর্যাদা তারই হবে যে ইলম অনুযায়ী আমল করবে। - [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-২৮৬]

বর্তমান যুগের তালিবুল ইলমদের দূরাবস্থা ও অরুচি

এখনকার তালিবুল ইলমরা এমন আচরণ করে যা দেখে এমনিতেই রাগ এসে যায়। সত্য কথা হল বর্তমানে তালিবুল ইলমই কম রয়েছে। তাই অনেক তালিবুল ইলম সবকে উস্তাদের আলোচনা খুবই অমনোযোগের সাথে শ্রবণ করে। যখন মর্ম বুঝে না আসে তখন উস্তাদের সাথে তর্ক জুড়ে দেয়। বলুন, এতে শিক্ষকের রাগ উঠবে না কেন?

লক্ষ্ণৌর একটি ঘটনা। সেখানকার কোন এক মাদরাসায় মানতেক শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব 'সদরা'র সবক হচ্ছিল। কোন এক স্থানে নোসখার ত্রুটি মনে হল। ছাত্রদের সকল নোসখাই যাচাই করা হল। তাদের মধ্যে একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমার নোসখায় কী লেখা আছে? সে গভীর মনোযোগে খুঁজেও শব্দটির সন্ধান দিতে পারছিল না। উস্তাদ রাগ হয়ে ধমক দিলে সে বলে, এইমাত্র চোখ থেকে সরে গেছে। এক্ষুণি বলছি। অনেক বিলম্বিত হলে শিক্ষক তার কাছ থেকে কিতাব নিয়ে নিজেই দেখতে চাইলেন। অবাক কাণ্ড! দেখা গেল, এটি হল 'শামসে বাযেগা' নামক মানতেকের আরেক কিতাব। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রোজই এ কিতাব নিয়ে বসো? বলল, জী, হ্যাঁ, রোজই আমি এ কিতাব নিয়ে বসি।

এবার অনুমান করুন, তালিবুল ইলমকে কী পর্যায়ের উদাসীনতা পেয়ে বসেছে। তার এতটুকু খবরও ছিল না যে, এটি কোন কিতাবের সবক হচ্ছে আর সে কী নিয়ে বসেছে।

অনুরূপভাবে এক ছাত্র ফরেগ হয়ে চলে যাওয়া ছাত্রদের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছিল, যারা ফারেগ হয়ে চলে যাচ্ছে, তারা নিতান্তই বেকুব। কেননা, চলে গেলে মাদরাসার বোডিং-এ তাদের খানা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা তো কয়েক বছর ধরে 'নূরুল আনওয়ার' পড়ছি এবং এখনও তা বোঝার চেষ্টা করছি। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৯/৫৮]

ফারেগ হওয়ার পর তালিবুল ইলমদের অবস্থা

ফারেগ হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে যাদের যোগ্যতা কম থাকে তারা তো অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা উভয়টিই ছেড়ে দেয়। তারপর কেউ যিকির-আযকার তথা পীর-মুরিদীর কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আর কেউ ওয়াজ-নসীহতের পেশা গ্রহণ করে। কারণ, এগুলোর মধ্যে রয়েছে নফস ও প্রবৃত্তির খোরাক। ওয়াজ-নসীহতে নফসের খোরাক রয়েছে শারীরিকভাবে। মানুষ বক্তার পিছে পিছে ঘুরে। তার শারীরিক এবং আর্থিক সেবা করে। উন্নত ও সুস্বাদু খাবার খেতে দেয় এবং দামি দামি গাড়িতে চড়ায়।

যেসকল ছাত্র ফারেগ হয়ে যিকির-আযকারে নিরত হয় তাদের মধ্যে আবার দু'ধরনের লোক থাকে। কিছু লোকের মাঝে ইখলাস থাকে না। তারা পার্থিব সম্পদ ও সুখ্যাতি প্রত্যাশী। আর কিছু লোকের মাঝে ইখলাস থাকে। কিন্তু এরাও বিভিন্নভাবে নফস ও প্রবৃত্তির শিকার। যাদের মধ্যে ইখলাস নেই তাদের সম্পর্কে আর কী বলব?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এরা নিজেদের ইলমী যোগ্যতার অভাবে যিকির-আযাকারে লিপ্ত হয়ে যায়। ইলমী চর্চা চিরতরে বন্ধ করে দেয়। যাদের ইলমী যোগ্যতা ভালো তারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং এটাকেই জরুরি মনে করেন। এটাই তাদের জীবনের সমগ্র কাজের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের মধ্যেও কারো উদ্দেশ্য থাকে একমাত্র বেতন-ভাতা। আর কারো উদ্দেশ্য থাকে তালীমের সওয়াব পাওয়ার সাথে সাথে বেতন-ভাতা। আর কারো উদ্দেশ্য থাকে ছাত্রদের মাঝে সুখ্যাতি ও অধ্যাপনায় প্রসিদ্ধি। অবশ্য এসবের মাঝে আল্লাহর কিছু বান্দা এমনও রয়েছে যাদের উদ্দেশ্য থাকে ইলমী তারাক্কী ও অগ্রগতি। কিন্তু এদের সংখ্যা শতের মধ্যে একজন। - [আত্ তাবলীগ-১২/৮২, ৯৯]

আত্মশুদ্ধি লাভের উপায় এবং ফারেগ হওয়ার পরের জরুরি কর্মসূচি

পড়াশোনা থেকে ফারেগ হওয়ার পর ইসলাহে নফস ও আত্মশুদ্ধি লাভ করা অপরিহার্য। জাহেরী ইলম শিক্ষার জন্য দশ বছর ব্যয় করে থাকলে বাতেনী ইলম শিক্ষার জন্য অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জন্য বছর প্রতি অন্ততঃ এক মাস ব্যয় করুন। অর্থাৎ কোন কামেল পীরের খেদমতে কমপক্ষে দশ মাস সময় যাপন করুন এবং তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করুন। আল্লাহ্ তাআলার আদত হল, সেই দশ মাসের বরকতে তিনি 'খুশু' নামক দৌলত দান করেন এবং ইলমের 'আছর' কলবে স্থায়ী করে দেন। তবে এর উপর তখনই আমল করা উচিত হবে

www.banglakitab.weebly.com

যখন পড়াশোনা থেকে ফারেগ হবেন এবং শিক্ষকগণ এদিকে মনোযোগী হওয়ার ইজাযত প্রদান করেন। আর যদি শিক্ষকগণ পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরও কিছুদিন পড়াশোনায় নিরত থাকতে বলেন তাহলে তাদের হুকুমই মানতে হবে এবং দরসিয়্যতের সাথে যথেষ্ট সম্পর্ক গড়ে না এটা পর্যন্ত এ কাজেই নিমগ্ন থাকতে হবে। যখন যথেষ্ট পরিমাণ 'মোনাসাবাত' ও সম্পর্ক গড়ে উঠবে তখন কিছুদিনের জন্য কোন কামেল বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে আত্মশুদ্ধি করাবে। তারপর আবার দরস-তাদরীসের কাজ চালু করে দিবে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/৪২]

ফারেগ হওয়ার পর তালিবুল ইলমগণ প্রকৃত আহলুল্লাহদের খেদমতে সুযোগ মতো অবস্থান করবে এবং তাদের থেকে আদব ও আখলাকের আমলী প্রশিক্ষণ লাভ করবে। তাদের সুহবত ও সাহচর্যের বরকত অর্জন করবে। মাঝেমধ্যে তাদের খেদমতে গমনাগমন করলে 'নিসবতে বাতেনা' প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তারপর মানুষের ইসলাহ ও সংশোধনের কাঠি আপনার হাতে এসে যাবে। ইনশাআল্লাহ মুসলমানগণ এ নিসবতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মিথ্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। - [তাজদীদে তালীম-৭৫]

সৎ সংশ্রব এবং পীর-মাশায়েখের খেদমতে থাকার প্রয়োজনীয়তা

'সুহবত' ও সাহচর্য ব্যতীত নিম্ন পর্যায়ের কিংবা উচ্চ পর্যায়ের কোন বিদ্যাই শেখা যায় না। এ জন্য তালিবুল ইলম এবং উলামায়ে কেরাম সকলকেই এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। আগেকার যুগে অধিকাংশ মানুষ ভালো হওয়ার প্রধান কারণই এই ছিল যে, তারা সকলে এ সুহবত লাভের প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন।

বর্তমানে শিক্ষার্জনের প্রতি কিছুটা গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার জন্য অজস্র অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হয় এবং অনেক সময়ও ব্যয় করা হয়। কিন্তু সুহবতের জন্য বছর প্রতি এক মাসও কেউ দিতে রাজি নয়।

আল্লাহর কসম করে বলি, যদি সুহবতের প্রতি সামান্যতম গুরুত্বও দেয়া হত তাহলে মুসলমানগণ সকল অকল্যাণ ও বিশৃঙ্খলা থেকে বেঁচে যেত। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন তারা অন্ততঃ ছয় মাস কোন বুযুর্গের খেদমতে ব্যয় করুন। তাঁর সামনে নিজের সকল ব্যাপার খুলে বলুন। তারপর তিনি যেভাবে বলেন তদনুযায়ী আমল করুন। তিনি কোন যিকির-শোগল নির্ধারণ করে দিলে তাতে মশগুল হয়ে যান। আর যদি তিনি যিকির-শোগল

www.banglakitab.weebly.com

থেকে বারণ করে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করতে চান তাতে নির্দ্বিধায় সাড়া দিন এবং শায়খের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি করুন। শায়খের বিভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য করুন। তিনি কোন কিছু গ্রহণ করার সময় কী আচরণ করেন এবং প্রদান করার সময় কী আচরণ করেন তা গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। এতে تخلق باخلاق الله বা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাওফীক লাভ হবে। তারপর সরাসরি আল্লাহর 'যাত' ও সত্তা থেকে বরকত লাভ হতে থাকবে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/৫৬]

কেবল পড়ালেখা করলেই কিছু হয় না, আসল জিনিস হল আত্মশুদ্ধি ও সৎসংশ্রব

আমি প্রায় সময় বলে থাকি, শুধু লেখাপড়া দিয়ে কী হবে? কারো জুতা সোজা করা ছাড়া কিছু হওয়া যায় না। আমি তো একথাও বলি যে, দীনদার মূর্খ মানুষ ঐ আলেমের চেয়ে উত্তম যার মাঝে দীনদারী নেই। আর রাসূল কারীম [সা.] এ ধরনের অশিক্ষিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ না জানার উপর গর্ব করে বলেছেন,

نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْتَسِبُ

[আমরা উম্মী জাতি, লেখালেখি ও হিসাব-নিকাশ জানি না।]

অনেক সাহাবী তো এমনও ছিলেন যারা জানতেন না যে, কয় সংখ্যা হলে একশ' হয়। তারপরও তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কী কারণ ছিল? পড়া-লেখার দিক দিয়ে তাঁরা অগ্রসর না হলেও মর্যাদায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। ওয়াইস কারনী বলুন, উমর ইবনে আব্দুল আযীয বলুন কিংবা বায়জীদ বোস্তামী বলুন; কেউ সাহাবীদের সমপর্যায়ের নন।

আসল রহস্য হল সাহাবায়ে কেরাম (রাদি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুহবত ও সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। সে সান্নিধ্যের পরশে তাঁদের দীন ও ঈমান খাঁটি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং সুহবতই হল আসল জিনিস। কোন মানুষ যত বড় শিক্ষিতই হোক না কেন যদি সে সুহবতের দৌলত থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে সে বড় ক্ষতিগ্রস্ত।

সুহবতে সালেহ এবং বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক হওয়া বড় নেয়ামত। মানুষ এর মূল্য দেয় না। আমার তো এজন্যও সম্পর্কের বিশেষ মূল্যবোধ রয়েছে যে, আমার

www.banglakitab.weebly.com

কাছে বুযুর্গদের দোয়া ছাড়া আর কিছু নেই। ইলম-আমল কিছুই নেই। যদি কিছু থাকে তাহলে একমাত্র এই একটি জিনিসই আছে। - [ইফাজাত-৫/১০৫]

বর্তমানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কারোরই এর প্রতি দৃষ্টি নেই। কোন বুযুর্গের কাছে কিছু সময় যাপন করার প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে নেই। সামান্য কিছু কিতাব পড়েই ভাবতে থাকে আমরা অনেক কিছু হয়ে গেছি। - [তরীকুল কলন্দর-৮৮]

মনে রাখবেন, যে আলেম মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়ে খানকায় না যায় অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি লাভ না করে তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো যে অজু করেই বসে থাকে এবং নামায পড়ে না। তাই বোঝা গেল, আল্লাহওয়ালাদের সুহবতে না থাকলে শুধু পড়া বা পড়ানো দ্বারা কিছু হয় না । - [ইফাজাত-৫১৫]

আমরা এমন কাউকে দেখিনি যিনি পড়ালেখায় বড় আলেম হয়েছেন কিন্তু সুহবত গ্রহণ করেননি আর মানুষ তার থেকে হেদায়েত পেয়েছে। আবার এমন অনেককে দেখেছি যারা 'শীন' এবং 'ক্বাফ' হরফ ও শুদ্ধ করে বলতে পারে না অর্থাৎ কিতাবাদির মাধ্যমে ইলম অর্জন করতে পারেনি কিন্তু সুহবতের বরকতে দীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। সুতরাং সুহবতশূন্য ইলম হল শয়তান এবং বালআম বাউরার ইলমের মত। - [তরীকুন নাজাহ-৯৬]

শুধু বই পড়লেই হয় না, সৎসংশ্রবেই দীন পাওয়া যায়

বুযুর্গদের সুহবতেই দীন পাওয়া যায়। আমি শপথ করে বলি, কিতাবপত্র দ্বারা দীন আসে না। কিতাবপত্র দ্বারা বাহ্যিক দীন অর্জন করা যেতে পারে কিন্তু হাকীকী দীন কোন আল্লাহওয়ালার জুতা সোজা করা; বরং জুতার আঘাত খাওয়া ছাড়া আসে না।

দীন কারো খোশামোদ করে না; বরং বুযুর্গদের খোশামোদ করার দ্বারা আসে। তাই যার ইচ্ছা সে যেন গ্রহণ করে আর যার ইচ্ছা না হয় সে যেন গ্রহণ না করে। আকবর এলাহাবাদী একজন ভালো কবি ছিলেন। তার কথায় অনেক জ্ঞান ও পান্ডিত্য রয়েছে। তার কবিতার একটি পংক্তি নিম্নরূপ-

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

বুযুর্গদের সুহবত ও সাহচর্যেই দীনের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিতাবাদী পড়ে হয় না। কিতাবাদী যোগ্যতা যত উঁচুই হোক না কেন, কোন কামেল পীরের সুহবত ব্যতীত 'বসীরত' ও অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হবে না। - [ইফাজাত-৬/৩৬৯]

গাছ নিজে নিজে উপযুক্ত হয় না। অনেক সময় তার ফল স্বাদহীন হয়ে থাকে। মালির পরিচর্যা না পেলে গাছের ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। মালি গাছের

www.banglakitab.weebly.com

ডালপালা কেটে-ছেঁটে না দিলে এবং কলম না তুললে ফল স্বাদের হয় না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি শায়খের খেদমতে থেকে নিজের সংশোধন করায় না; বরং কেবল কিতাবাদী পড়াকেই যথেষ্ট মনে করে তার দৃষ্টান্তও হল হুবহু গাছের মত। যতক্ষণ শায়খ তাকে সংশোধন না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে পরিশুদ্ধ হয় না; বরং বদদীন, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ চরিত্রের শিকার হয়ে যায়। - [মাকালাত-৪০৭]

'সুহবতে সালেহ' ছাড়া ইসলামী শিক্ষায় রঙ ধরে না

সুহবত দ্বারা মানুষের হৃদয়ে ইসলাম গেঁথে যায়। দীনের সম্মান ও মূল্যবোধ অন্তরে প্রোথিত থাকা হল দীনের রূহ ও প্রাণ। হৃদয়ে দীন প্রোথিত থাকা খুবই জরুরি। যদি অন্তরে এ অবস্থা না থাকে তাহলে জাহেরী নামায ও রোযা কোন কাজের হবে না। এ অবস্থা তো হল তোতা পাখীকে সূরা মুখস্থ করানোর মত। এটা কেবল তার মুখেই থাকে।

যে শিক্ষার প্রভাব হৃদয়ে পড়ে না বিপদের সময় তা কোন কাজে আসে না। দীনের মহব্বত অন্তরে প্রোথিত না করে কেউ আলেম বা হাফেজ হলেও পরিণামে আটা ডালের দাম হৃদয়ে নিয়েই সে মারা যাবে। যেমন বর্তমানে অনেক মুসলমানের অন্তর থেকে ইসলামের প্রভাব কমে যাচ্ছে।

এ অবস্থা দেখে আমি বলি, মুসলমানদের অন্তর থেকে ইসলাম বের করা হচ্ছে। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের সন্তানাদির উপর দয়া করুন এবং তাদেরকে ইসলামের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। - [তরীকুন্নাজাত-১০৯]

সৎসংশ্রব গ্রহণ করার বিধান

আমার মতে বর্তমান যুগে 'সুহবত' গ্রহণ করা ফরযে আইন। কেননা, এখন বড়ই নাজুক সময় যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার আলোকে যে জিনিসটি ঈমান সংরক্ষণের উপায় বলে সাব্যস্ত হয়েছে তা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কী সন্দেহ হতে পারে? শুরু থেকেই তো এমন জিনিসের গুরুত্ব থাকা উচিত। - [আল ইজাফাত-৪/৭১]

বর্তমানকালের বিপর্যয়ের কারণ হল সুহবতে সালেহ না থাকা

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি মানুষই মন্দকর্মের শিকার হয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ হল, আহলুল্লাদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। সুহবত ও সংশ্রব খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বর্তমানে তার প্রতি গুরুত্ব না দেয়ার কারণ হল মানুষের মাঝে পরকালের ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। অন্যথায় পরকাল ভাবনায় নিমগ্ন ব্যক্তিরা

www.banglakitab.weebly.com

কখনো তা থেকে উদাসীন হতে পারে না। আমি তো এ যুগে আল্লাহওয়ালাদের সুহবত গ্রহণ করাকে ফরযে আইন বলে থাকি। - [ইফাজাত-৪/৬৭৩]

সুহবতে সালেহ গ্রহণ না করার পরিণতি

যদি কিতাবের ইলম ও যোগ্যতায় কেউ পরিপূর্ণ হয় কিন্তু তরয়্যিত তথা বুযুর্গদের সুহবতপ্রাপ্ত না থাকে, তাহলে তার মাঝে চতুরতা ও প্রতারণার স্বভাব সৃষ্টি হয়। এভাবে যদি কিতাবের ইলম এবং সুহবত কোনটাই না থাকে তাহলেও একই অবস্থা হয়ে থাকে। মোটকথা, সুহবতবিহীন ইলম ধোঁকা ও প্রতারণা সৃষ্টি করে। - [তরীকুন্নাজাত-৯৭]

সৎসংশ্রব না থাকার কারণে এক পর্যায়ে উস্তাদবৃন্দের সাথে উপহাস ও কুরআন-হাদীসের বিকৃতি শুরু করে দেয়।

বর্তমানে শীর্ষযোগ্যতার লোকদের এ অবস্থা হয়ে গেছে যে, তারা বক্তৃতা ও লেখনীতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে এবং নিজেকে নিজের উস্তাদ ও বড়দের সমপর্যায়ের মনে করে। - [আল ইফাজাত-৪/৭০১]

কামেল পীরের আলামত

কামেল পীরের আলামতসমূহ নিম্নরূপ :

১. প্রয়োজন পরিমাণ ইলমেদীন জানা থাকা।

২. শরীয়তের উপর পরিপর্ণ আমলকারী হওয়া।

৩. নিজের যে বিষয়টি জানা নেই তা আলেমদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার অভ্যাস ও মানসিকতা থাকা।

৪. আলেমদের প্রতি অন্তরে ভীতি না থাকা।

৫. মুরীদ ও ভক্তবৃন্দকে অন্যায় কাজ থেকে বারণ করার অভ্যাস থাকা।

৬. তার সুহবতে বরকত ও প্রভাব থাকা। তার কাছে বসলে দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পাওয়া।

৭. বুযুর্গানেদীন ও আলেম-উলামা তার মজলিসে বেশি আসা-যাওয়া করা। এটা কামালের বড় আলামত। যে ব্যক্তির মাঝে উক্ত আলামতসমূহ পাওয়া যাবে সে মকবুল ও কামেল পীর। তার কাছে যাওয়া এবং তার সুহবত থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। - [দাওয়াতে আবদিয়্যাত-৫৯]

www.banglakitab.weebly.com

সুহবত কখন উপকারী হবে

সুহবত তখনই উপকারী হবে যখন পীরের কাছে নিজের অবস্থা ও রোগ-ব্যাধির কথা খুলে বর্ণনা করবে এবং তার চিকিৎসা জানতে চাইবে। নেক সুহবতের উপমা হল আতরের দোকানের মত। হয়ত সেখান থেকে আতর খরিদ করবে। না হয় দোকানের সুঘ্রাণ সেবন করে দেমাগ ও মস্তিষ্ক সুখ বোধ করবে। অনুরূপভাবে কেবল 'নেক সুহবত' দ্বারাও উপকার হাসিল করা যায়।

সুহবতের মর্ম এই নয় যে, আলেমদের মজলিসে গিয়ে গল্প-গুজব করবে এবং গোটা বিশ্বের খবরাখবর ও ঘটনাবলী আলোচনা করবে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৫/১৩১]

আহলুল্লাহদের সুহবতের বড় লাভ

আউলিয়ায়ে কেরামের সুহবতের একটি বিশেষ ফায়দা হল এর দ্বারা কলবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার দ্বারা আর ইসলাম থেকে খারেজ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিছু গুনাহ সংঘটিত হলেও ইসলামের গণ্ডি থেকে খারেজ হওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হবে না। তিবাড়িত হতে হবে না।

পক্ষান্তরে সুহবতবিহীন হাজার বছরের ইবাদত-বন্দেগীতে ঐ প্রভাব থাকে না, যা ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। শয়তান হাজার হাজার বছর ইবাদত করেছিল। তার সে ইবাদত তাকে বিতাড়ন থেকে বাঁচাতে পারেনি। নিম্নোক্ত কবিতায় এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

یک زمانے صحبت با اولیا - بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

[আল্লাহর ওলীদের এক মুহূর্তের সাহচর্য হাজার বছরের রিয়াযুক্ত ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।]

বলার অপেক্ষা রাখে না, যে জিনিস চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করে তা হাজার বছরের ঐ ইবাদতের চেয়ে উত্তম যার মধ্যে সে প্রভাব না থাকে। - [হুসনুল আযীয-২৩]

শায়খের সুহবত গ্রহণ না করে কেউ লক্ষ লক্ষবার তাসবীহ্ পাঠ করলে কোন ফায়দা হবে না। আল্লাহ তাআলার এ নিয়মই বলবৎ রয়েছে যে, শায়খের সুহবত ছাড়া শুধু যিকির যথেষ্ট ও উপকারী নয়। ফায়দা হওয়ার জন্য শায়খের সুহবত অপরিহার্য।

www.banglakitab.weebly.com

প্রথম দিকে আমার মনোভাব ছিল শায়খের কাছে থাকার তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু এখন অভিজ্ঞতার পর জানা হয়েছে যে, শায়খের কাছে থাকলে যে উপকার হয় তা দূরে থাকলে হয় না। সুহবতের মধ্যে বিশেষ প্রভাব রয়েছে। যেমন নাকি চুম্বকের মধ্যে লোহা আকর্ষণ করার প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাবের বিশেষ কোন কারণ বলা যায় না। অলির সুহবতেই অলি হওয়া যায়। যেমন খরবুজা থেকেই খরবুজার রঙ ধারণ করে। - [হুসনুল আযীয-২৩]

আলেমদের জন্য সুহবতে সালেহ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা

মনে রাখবেন, প্রচলিত ইলম ছাড়াও সুহবত উপকারী কিন্তু সুহবত ছাড়া প্রচলিত ইলম খুব কম উপকারী। এ কারণেই বর্তমানে অসংখ্য আলেম দেখা গেলেও তাদের মধ্যে যে দু'চারজন আহলুল্লাহদের সুহবত গ্রহণ করেছেন তাদেরকেই কেবল কাজে দেখা যায়। লক্ষ্য করুন, গোলাপের সংস্পর্শে থাকার দরুন মাটির মাঝেও সুঘ্রাণ এসে যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ প্রেমিকদের সংশ্রবে থাকার দ্বারাও আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয় ও দীনের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাদি.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এ সুহবতের কারণেই হয়েছে। বর্তমান কালের বড় বড় ইমাম বা ফকীহগণও সাধারণ থেকে সাধারণ সাহাবীর সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। অথচ তাঁরা তেমন বেশি শিক্ষিত ছিলেন না; বরং অধিকাংশ শাস্ত্র ও বিদ্যা তো সাহাবায়ে কেরামের পরের যুগে আবিস্কৃত হয়েছে। তাঁদের যুগে সেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অস্তিত্বই ছিল না, বর্তমানে যেগুলোর খুব ছড়াছড়ি। তাঁরা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানে লিপ্ত না হয়েই উচ্চ মর্যাদা পেয়ে গেছেন। তাঁদের সে মর্যাদার আসল রহস্য হল তাঁরা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার ও তাঁর সাহচর্যে জীবন কাটানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। - [আত্ তাবলীগ-২১/১৭৪]

'সুহবত' এর বিকল্প

যারা কোন কারণে বর্তমানে সুহবত লাভে সক্ষম হচ্ছে না তারা বুযুর্গানেদীনের মালফুজাত পড়বে এবং তাঁদের তাওয়াক্কুল, ধৈর্য, তাকওয়া ও পবিত্রতার ঘটনাবলী পড়বে কিংবা শ্রবণ করবে। এটাই তাদের জন্য সুহবতের স্থলাভিষিক্ত হবে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/৬২]

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার উপায়

অন্তরে আল্লাহর ভয় কিভাবে সৃষ্টি করবেন? কোন একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করে নির্জনে বসে নিজের নাফরমানী ও গুনাহের কথা এবং আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করুন। সেই সাথে আখেরাতের আযাব, কেয়ামত, পুলসিরাত, মীযান ও দোযখের ভয়াবহ অবস্থা কল্পনা করুন। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৪/৩৯]

বাস্তব কথা হল, আল্লাহভীতি অর্জনের জন্য এতটুকু চিন্তাও যথেষ্ট যে, আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে কী জবাব দিব। যখন এ চিন্তা সৃষ্টি হবে তখন আর কোন গুনাহ হবে না। কারণ, আল্লাহর ভয় না থাকার কারণেই সকল বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। যে পরিমাণ আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে সে পরিমাণই খারাবী ও পাপাচার বন্ধ হয়ে যাবে। যদি পরকালের ব্যাপারে আমাদেরকে এ নিশ্চয়তা ও আশ্বাস প্রদান করা হয় যে, তোমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে না, তবে কেয়ামতের ময়দানে এতটুকু অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, নালায়েক পৃথিবীতে তুমি তোমার চেয়ে ছোটদেরকে যেরূপ ভয় করতে সে পরিমাণ ভয়ও আমাকে করলে না? আর এ প্রশ্ন তখন করা হবে যখন আল্লাহ তাআলার সম্মান মর্যাদা, কর্তৃত্ব এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য বান্দার সামনে উদ্ভাসিত থাকবে। আল্লাহর কসম সেটাই হবে মরে যাওয়ার স্থান। বলুন তো, দোযখ, আত্মিক অপমান ও শারীরিক কষ্ট ছাড়াই এসব বিষয়ের সমষ্টি কি আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৫/৬২]

ছাত্র যমানায় মুরীদ হওয়া উচিত নয়

আমি ছাত্র জীবনে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.]-এর কাছে মুরীদ হওয়ার আবেদন করলে হযরত বলেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত কিতাব পড়া শেষ না হবে ততদিন পর্যন্ত এ চিন্তাকে শয়তানী চিন্তা মনে করবে। বাস্তবেই তাঁরা বড় হাকিম ও বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। কেমন আশ্চর্যজনক কথা বলে দিলেন। মানুষের অন্তর এক সময় দু'দিকে ধাবিত হতে পারে না। এজন্য আবশ্যকীয় বিষয়কে অনাবশ্যকীয় জিনিসের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। ইলমেদীন শিক্ষা করা মুরীদ হওয়ার চেয়ে বেশি জরুরি। ছাত্র জীবনে এ দিকে মনোযোগী হলে পড়াও হবে না, তাসাউফও হবে না। কেননা, ছাত্র জীবনে শায়খ কোন অজীফা প্রদান করলে তাতে মগ্ন হওয়াও জরুরি হয়ে পড়বে। আর পড়ালেখায়ও

www.banglakitab.weebly.com

মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং এতে দু'টি বিপরীতমুখী জিনিসকে একত্রিত করা অপরিহার্য হয়ে যায়। যার ফলে যিকির-আযকারের উপকার হবে না এবং নিরাশ হয়ে শায়খের প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে।

অবশ্য ছাত্র জীবনেও চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। তার জন্য মুরীদ হওয়া শর্ত নয় এবং তার জন্য এমন কোন সময় ব্যয় হয় না, যার দ্বারা পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটবে। - [আল ইফাজাত-৪/৩২৮]

ছাত্র জীবনে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়া মানে পড়ালেখাকে বরবাদ করে দেয়া। তালিবুল ইলমের জন্য মনোযোগ ও অধ্যাবসায় খুব প্রয়োজন রয়েছে। এটা শেষ হয়ে গেলে পড়ালেখাও নিঃশেষ হয়ে যায়। - [প্রাগুক্ত-৪/৩২৯]

ইলম শিক্ষা করা যেমন ফরয, ইসলাহে নফসও তেমন ফরয। আমরা আরো বিশ্বাস করি, এটা ইলম শেখার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কিন্তু তার দৃষ্টান্ত হল অজু ও নামাযের মত। অজু এবং নামায উভয়টিই ফরয এবং নামায অজুর চেয়ে বড় ফরয। কিন্তু অজু ছাড়া নামায হয় না। এমনিভাবে দরবেশীও ফরয এবং ইলম অর্জনের চেয়ে বড় ফরয। কিন্তু ইলম অর্জন করার উপর দরবেশী নির্ভরশীল। যেমন নামাযের জন্য অজু নির্ভরশীল। সুতরাং নামাযের মধ্যে অজু নির্ভরশীল হওয়ার কারণে এখানেও ইলম অর্জন করা আত্মশুদ্ধির উপর অগ্রগণ্য। - [আত্ তাবশীর-৩৬৮]

কোন তালিবে ইলম কোন শায়খের হাতে মুরীদ হলে তার কাছে তালিবে ইলম হিসেবে পড়ালেখা করা উচিত নয়। অবশ্য কিতাব ছাড়া এমনিতেই তাঁর মজলিসে বসা ও ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ করার মাঝে সমস্যা নেই। তবে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। - [আল ইফাজাত-৪/২২৯]

www.banglakitab.weebly.com

সপ্তম অধ্যায়

তালিবুল ইলম ও আলেমসমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : জরুরি সংশোধনী

পরিতাপের সাথে বলতে হয়, আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা ইলমকেই একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে এবং আমলের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। কারো কারো অবস্থা তো না বলাই ভালো। তারা ফরয নামায পর্যন্ত পড়ে না। আর কিছু লোক এমন রয়েছে যারা এ পরিমাণ প্রকাশ্য বেআমল নয়; কিন্তু নিজেদের যবানের হেফাজত করে না। কোন জায়গায় বসলে লোকজনের গীবত-শেকায়েতে মেতে উঠে। কেউ কেউ যবান হেফাজতে সচেষ্ট থাকলেও চোখের হেফাজত করে না। বেগানা নারীদের প্রতি তাকানো এবং পথে এদিক সেদিক দৃষ্টি ফিরানোর বদঅভ্যাস রয়েছে।

যারা বেশি পরিমাণে মুত্তাকী তারা যবান ও চোখের হেফাজতে সচেষ্ট হলেও কলবের হেফাজত কম করে। কলবের গুনাহ থেকে তারা খুব কমই মুক্ত থাকেন। কলবের ব্যাধি এমন সূক্ষ্ম যে, কমবেশী সকলেই তাতে আক্রান্ত। বন্ধুগণ! ইলম আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য হল আমল।

আমাদের মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল আমরা আমলের দিকে মনোযোগ দিই না। আর যদি একটু আধটু কিছু আমল করেও থাকি তাহলে সমস্যা হল সেটুকুই যথেষ্ট মনে করে নিজেকে শরীয়তের উপর পূর্ণাঙ্গ আমলকারী ও দীনদার ভাবতে থাকি। আমাদের অনেকেই আমলের প্রতি যত্নবান নই। মসজিদে নামায চলছে, অপরদিকে তারা নিজ বিছানায় ঘুমে বিভোর। কেউ কেউ জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও অলসতা করে শুয়ে থাকে। আর যদি কেউ নামাযের প্রতি যত্নবান হয়ে থাকে তাহলে দেখা যায় সে অন্যান্য আমলে যত্নবান নয় কিংবা তাকওয়া অনুযায়ী চলে না। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৩/১৬]

উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে একটি অভিযোগ

অনেক বিদ্বানদেরও অভ্যাস হল মুখে যা আসে তাই বলে দেয় কিংবা কলমের ডগায় যা আসে তাই লিখে ফেলে। কেউ এতে কষ্ট পেল কি-না এ নিয়ে তাদের

www.banglakitab.weebly.com

কোন চিন্তা নেই। আমার দ্বারা কেউ কষ্ট পেল কি-না এ নিয়ে কারো ভাবনা নেই। যা মনে চাইল তাই করে বসল। চিন্তা-ভাবনার নাম গন্ধও নেই। সম্পূর্ণ মুক্ত স্বাধীন ও বেপরোয়া। - [ইফাজাত-৪/৪৯]

ওহে তালিবুল ইলম! নিজের ইসলাহ ও সংশোধনের ফিকির করো। বেখেয়ালী খুব খারাপ জিনিস। এতে গুনাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর গুনাহ বৃদ্ধি পেলে অন্ত র অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। তারপর ভালো-মন্দের পার্থক্যজ্ঞান চলে যায়। এজন্যই সর্বদা নিজের নফসের খোঁজখবর ও নেগরানীতে লেগে থাকা উচিত। কমবখত নফস প্রত্যেককে তার বেশ-ভূষা ও রঙেই বিনাশ করে। দীনদারদেরকে দুনিয়ার মধ্যে দীনের রঙ দেখিয়ে তাতে লিপ্ত করে দেয়। সুতরাং নফসের খোঁজ-খবর নেয়া অতীব জরুরি। কাউকেই বে-ফিকির ও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। - [আল ইফাজাত-২/১১৫]

বিশেষ জনদের ব্যাপারে অভিযোগ

বড় পরিতাপের বিষয় হল, বিশেষ জনদের মাঝেও দীনি তারাক্কী ও অগ্রগতির ফিকির নেই। যারা তালীম ও শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত তারা তাতেই পরিতৃপ্ত। তারা মনে করে আমরা বড় দীনদার। কেননা, সদাসর্বদা কুরআন ও হাদীসের চর্চায় নিয়োজিত। তাদেরকে বলি, তাহলে শরীয়তে মোয়ামালাত ও মোয়াশারাতের শিক্ষা কেন দেয়া হয়েছে? আখলাক ও চরিত্র সংশোধনের গুরুত্ব কেন দিচ্ছেন না? এগুলো কি দীন নয়। এগুলোর উপর আমল করার জন্য কি মুসলমানদের ছাড়া অন্য কোন জাতির আবির্ভাব ঘটবে? - [ইকমালুর ররিজাল-৩২]

বর্তমানে অনেকের অবস্থা এই যে, ফারেগ হয়ে মুদাররিস হয়ে গেছে অথচ আজ পর্যন্ত তার জানা নেই যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ কী? মানুষ অতিরিক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়ে আছে। মূল উদ্দেশ্য ছেড়ে দিয়েছে। শুনুন! আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র পথ হল, মন্দ স্বভাব ও চরিত্রসমূহ দূর করা এবং ভালো স্বভাব সৃষ্টি করা। ইবাদতের তাওফীক হওয়া। আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীনতা দূর হওয়া। এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত থাকা। - [কামালাতে আশরাফিয়া-৭৯]

মোটকথা, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একটিই পথ রয়েছে। তাঁর মহব্বত ও আনুগত্যের সাথে শরীয়তের বিধিবিধানের সামনে নিজেকে সপেঁ দেয়া। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। – [ইফাজাত-৫/২৩২]

www.banglakitab.weebly.com

চারিত্রিক অধঃপতন

উলামায়ে কেরাম সাধারণতঃ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু তারা ইসলাহে বাতেন ও আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোযোগী হন না। অবশ্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও বড় ইবাদত। সেই সাথে আত্মশুদ্ধিরও বড় প্রয়োজন রয়েছে; বরং অধ্যায়ন ও অধ্যাপনাসহ অন্যান্য কাজগুলো সে আদেশকৃত বিষয়গুলোর জন্য করানো হয়। - [ইফাজাত-৩/২৯৫]

আমাদের অবস্থা হল আমরা নিজেরা এর প্রতি দৃষ্টি দেই না। আমি লক্ষ্য করছি, মানুষের কাছে ইলমের ফিকির রয়েছে কিন্তু আমলের ফিকির নেই। সমস্ত কিতাব শেষ পর্যন্ত পড়ার খুব গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু আমলের প্রতি সামান্যতম পরোয়াও নেই। সেই সাথে দিনরাত এমন কিছু গুনাহে লিপ্ত হয়ে আছে যে, চিন্তাও করে না, আমরা কোন গুনাহ করেছি। মনে চাইল তো কারো জিনিস অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করল। তারপর যেখানে ইচ্ছা রেখে দিল। কারো কিতাব অনুমতি ছাড়া নিল এবং এমন স্থানে ফেলে রাখল যে, মালিক তা খুঁজে খুঁজে পেরেশান। কারো সাথে কোন ভালো কাজের অঙ্গীকার করল কিন্তু তা পূর্ণ করার আদৌ চিন্তা নেই। অনুরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা বলে শেষ করা যাবে না।

এত কিছুর পরও তাদের ইলম ও মর্যাদায় কোন সংশয় জাগে না। অথচ কোন কিছু নিছক জানার মাঝে তেমন কৃতিত্ব নেই। শয়তানও তো বড় মাপের আলেম ছিল। অনেক বড়দেরকে সে প্রতারিত করে। সে তাফসীর, হাদীস ও ফেকাহ্ সব শাস্ত্রেই পাকা। যদি সে বেশি না জানে তাহলে আলেমদেরকে কিভাবে ধোঁকা দেয়। কোন ব্যক্তি কোন শাস্ত্রে পণ্ডিত হলেই তো সে তার চেয়ে কম জ্ঞানীদেরকে ধোঁকা দিতে পারে। শয়তানের মাঝে একটি ত্রুটি আছে। তাহল সে নিজের ইলম মোতাবেক আমল করে না। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ইলম আমল করার জন্য না হয় তা জাহান্নামের মাধ্যম হবে। আমরা এত গাফেল হয়ে পড়েছি যে, নিজের ইসলাহ ও সংশোধনের ফিকিরও করি না। কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ করে না কিন্তু উদাসীনতার কারণে তার দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়। এ ব্যক্তিও অভিযুক্ত। সরকারি কোন কর্মচারী যদি অমনোযোগিতার কারণে কাজ খারাপ করে তাহলে কি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না? - [হাকীকতে ইহসান]

ইবাদতে ইহসান অনুপস্থিত

মুসলমানরা তাদের ইবাদতের রূহ বের করে দিয়েছে। মনে করে বাহ্যিক উঠা-বসার দ্বারাই নামায হয়ে গেছে। বিশেষভাবে আলেমগণও চিন্তা করে না যে,

বাহ্যিক উঠা-বসা ছাড়া আরো কিছু আছে এবং তা আবশ্যকও বটে। যে কুরআনের মধ্যে قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ আছে। তাতে خٰشِعُوْنَ শব্দও আছে। صَلَاتِهِمْ শব্দ দ্বারা নামাযকে শরীয়তের কাম্য বস্তু মনে করা হলে خٰشِعُوْنَ দ্বারা খুশুকে কাম্য হওয়া মনে করা হয় না কেন?

এমনিভাবে অন্যান্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, নামাযের কেয়াম ও রুকুর মতো খুশুও গুরুত্বপূর্ণ। একটিকে আবশ্যক মনে করা এবং অপরটি অনাবশ্যক মনে করার ভুল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এ খুশু দ্বারাই ইবাদত সুন্দর হয় এবং এর দ্বারাই ইহসানের স্তর লাভ করা যায়।

যেমনিভাবে ফেকাহর কিতাবের মধ্যে কানয ও হেদায়া পড়া আবশ্যক তেমনিভাবে আবু তালিব মক্কী [রহ.]-এর কুতুল কুলব, ইমাম গাযালী [রহ.]-এর 'আরবাঈন' এবং শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর তাসাউফের কিতাবাদী পড়াও আবশ্যক।

দশ বছর জাহেরী ইলম অর্জনের জন্য ব্যয় করার পর অন্তত দশ মাস সময়ও ইসলাহে বাতেন ও আত্মশুদ্ধির জন্য ব্যয় না করা কেমন বেইনসাফীর কথা! আর আত্মশুদ্ধির পন্থা হল কোন কামেল শায়খের সুহবতে থাকা। তাঁর আখলাক, আদাত ও ইবাদত অনুধাবন করা। লক্ষ্য করো, রাগের সময় তাঁর কী অবস্থা হয়। প্রশংসা করলে তাঁর মাঝে কী প্রতিক্রিয়া হয়? - [হাকীকতে ইহসান]

সম্পদ ও পদের মোহ মারাত্মক ব্যাধি

উলামায়ে কেরাম শুধু কিতাবী ইলমকে যথেষ্ট মনে করে বসে আছে। তারা ইলম অর্জন করার পর তদনুযায়ী আমল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। অথচ ইলম দ্বারা আমলই উদ্দেশ্য। তাদের অবস্থা হল তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্র পরিশুদ্ধ রয়েছে। আত্মিক ব্যাধির মধ্যে দু'টি ব্যাধি আমার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। আমি কে এবং আমার দৃষ্টিই বা কি! স্বয়ং আল্লাহর কাছেও এ দুটি ব্যাধি খুব ঘৃণিত। একটি হল, সম্পদের লোভ। অপরটি হল, পদের লোভ। এ দু'টি ব্যাধি আলেমদেরকে বরবাদ করে দিয়েছে। মাদরাসার শিক্ষকগণ বেতনের জন্য বাদানুবাদ করে। এজন্য কোন মাদরাসার মুহতামিম তার কোন শিক্ষকের উপর আস্থা রাখতে পারেন না যে, তিনি থাকবেন কি-না? কেননা, অন্য কোথাও দু'একশ' টাকা বেশি পাওয়ার দাওয়াত পেলে তৎক্ষণাৎ পূর্বের মাদরাসা ছেড়ে নতুন মাদরাসায় চলে যায়। যদিও সেখানে দীনের খেদমত পূর্বের তুলনায় বেশি না হয় এবং পূর্বের বেতনে তার সংসার চলেও থাকে। এটা সরাসরি দীন বিক্রির শামিল। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, দীনের খেদমত নয়, বেতনই তার উদ্দেশ্য।

www.banglakitab.weebly.com

অবশ্য প্রথম জায়গার বেতন দিয়ে যদি সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে তাহলে অন্য জায়গায় বেশি বেতনে যাওয়া দোষণীয় নয়। তবে সাংসারিক অসচ্ছলতা বাস্তবিক হতে হবে। কেননা, অপচয়ের ক্ষেত্রে অসচ্ছলতা ধর্তব্য নয়। সেটা 'জরুরত' ও প্রয়োজন বলে ধর্তব্য নয়।

দ্বিতীয় ব্যাধি হল পদের মোহ। এর কারণে আলেমদের মাঝে দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকেই একটি আলাদা আলাদা দল গঠন করার ধান্ধায় আছে। -[আলফাজুল কুরআন-৬৮]

নিজের সন্তানকে ইলমেদীন শিক্ষা না দেওয়া

দুঃখ লাগে, বর্তমানে অনেককে দীনদার ও আলেম বলা হয়, কিন্তু তারা নিজেদের সন্তানাদিকে দুনিয়াবী শিক্ষালয়ে ভর্তি করে। আমার তো সুস্পষ্ট ধারণা হচ্ছে, এ ধরনের লোকেরা হয়ত এ ব্যাপারে আক্ষেপ করে যে, কেন আলেম হলাম, আমরা কেন ইংরেজী পড়লাম না। এ অবস্থাটি কী পরিমাণ ভয়ঙ্কর। তাদের অন্তরে ইলমেদীনের প্রকাশ্য অমর্যাদা পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহম করুন এবং সঠিক পথে আসার সুযোগ দিয়ে দিন। -[ইফাজাত-১২৪]

দীনের পথে সম্পদ ব্যয় না করা

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন তাদের জন্য উচিত হল নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা। বক্তা এবং আলেমগণও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরও ব্যয় করা উচিত। বেশি পরিমাণে সক্ষম না হলে স্বল্প পরিমাণে খরচ করতে হবে। আলেমদের বেশির ভাগ সদস্য এক্ষেত্রে খুব অবহেলা করে। 'আমর বিল মা'রূফ' ও সৎকাজের নির্দেশের পুরোটাই নিজের লাভের জন্য মনে করে। নিজে কমই খরচ করে।

আপনাদের জন্য উচিত হল অন্য ভাইয়ের রুটি না খেয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যয় করুন। কোন কাজের জন্য চাঁদা উত্তোলন করলে নিজেও তাতে শরিক থাকুন। অন্যকে দান করার জন্য অনুপ্রাণিত করা এবং নিজের পকেট থেকে না দেয়া খুবই খারাপ ব্যাপার। এ অবস্থায় অন্যের মাঝে 'আছর' হয় না; বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যদি নিজেরাও দান করেন তাহলে তারা বীতশ্রদ্ধ হবে না।

এখন তো জনগণ মনে করে চাঁদা ও দানের পূর্ণ ওয়াজেই মাওলানা সাহেব নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যদের কাছ থেকে উসূল করতে চায়। আলেমগণ বলতে পারেন, আমরা টাকা কোথায় পাব? আমি বলি, আপনাদের মাদরাসায় যেসব

www.banglakitab.weebly.com

দিনমজুর দুই আনা করে মাসিক চাঁদা দেয়, আপনারা তার থেকে খারাপ অবস্থানে নন। তারপরও দুই আনা না দেয়ার কী কারণ? - [মাজাহিরুল আমওয়াল]

কারো কিতাব এনে ফেরত না দেয়া আলেমদের একটি মন্দ অভ্যাস

আলেমদের একটি মন্দ অভ্যাস হল, কারো কাছ থেকে কোন কিতাব আনলে আর তা ফেরত দেওয়ার চিন্তাই করে না। কিতাব প্রদানকারী যদি অধিক ব্যস্ত মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে তার মনেও থাকে না যে, কেউ তা নিয়েছে কি-না। ফলে কয়েক মাস পর মনে করেন আমার কিতাবটি চুরি হয়ে গেছে। ঐ দিকে গ্রহীতাও নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, মালিক তো দেখছি তিাবটি চাচ্ছে না। মালিক না চাওয়ার কারণে সে নিজেকেই সেটির মালিক ভাবতে থাকে। - [আত্ তাবলীগ-২১৮]

নিজের ভুল স্বীকার না করার বদ অভ্যাস

আলেমদের মাঝে আরেকটি ব্যাধি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহল তারা নিজের ভুল স্বীকার করে না; বরং নানা তাবীল ও ব্যাখ্যা তুলে ধরে। আর এ ব্যাধিটি ছাত্র জীবনেই তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। পাঠ্য বিভিন্ন কিতাবের লেখকদের পক্ষ থেকে যেসব ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে ব্যাখ্যাকার ও টীকা রচয়িতাগণ সেগুলোর নানা তাবীল ও ব্যাখ্যা পেশ করে লেখকের প্রতি পাঠকের সুধারণা বহাল রাখার চেষ্টা করেছেন। এসব পড়ে ছাত্ররাও তাবীল ও ব্যাখ্যা করায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। অথচ ব্যাখ্যাকার ও টীকা রচয়িতাদের ভিত্তি হল বিনয়। তারা অন্যের ভুল-ত্রুটি অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাণীর সুন্দর প্রয়োগক্ষেত্র নির্ণয় করে দেন এবং নিজেদের ভুল ধরতে পারার প্রবণতাকে দুর্বল করে দেন। কিন্তু ছাত্ররা এর উল্টো সবক গ্রহণ করে নিজেই নিজের ভুল-ত্রুটির তাবীল করতে থাকে। যার ভিত্তি হল অহংকার। আর এ অহংকারের সুচিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। - [ওয়াজে তারজীহুল আখেরাহ]

বহস-মুবাহাসা ও তর্ক-বিতর্ক

বহস-মুবাহাসা ও তর্ক-বিতর্ক একটি অন্যতম গুনাহ। অর্থাৎ অবাস্তব হলেও নিজের কথা ও বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা। এ ব্যাধিটি বর্তমানে আলেম সমাজের মাঝে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবার মুখ থেকে কোন কথা বের হয়ে গেলে তা প্রাধান্য দেয়ার লড়াই শুরু হয়ে যায়। তর্ক-বিতর্ক এমনকি ঝগড়ার পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়। - [মাজাহিরুল আকওয়াল-৩৫]

www.banglakitab.weebly.com

কুদৃষ্টির ব্যাধি

চোখের অনেকগুলো গুনাহ রয়েছে। তার মধ্য থেকে এখানে একটি বিশেষ গুনাহের আলোচনা করব। সেটি হল কুদৃষ্টি। মানুষ এটাকে গুনাহই মনে করে না। অনেক মানুষ কুদৃষ্টির ব্যাধিতে আক্রান্ত। অর্থাৎ নামাহরাম বা বেগানা নারীদের প্রতি বেপরোয়াভাবে দৃষ্টি করে। এটা এমন ব্যাধি যা থেকে খুব কম লোকই পবিত্র আছে। কেননা, মানুষ সাধারণতঃ এমন গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকে যেগুলোতে লিপ্ত হলে সামাজিকভাবে অসম্মানী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর কুদৃষ্টির মধ্যে সে আশঙ্কা নেই। প্রথমতঃ অন্যেরা সে ব্যাপারে অবগত হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি অবগত হয়ও তাহলে তার নিয়তে কী ছিল এটা কে জানে? কেউ কেউ এ থেকেও বেঁচে থাকে। কেননা, কেউ দেখলে বা জানলে তার প্রতি বদ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য এ পাপ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তার অন্তরে কামভাবের ব্যাধি বিরাজমান। মজার ব্যাপার হল অন্তরে এ মারাত্মক ব্যাধি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও লোকটি নিজেকে পরহেযগার ও মুত্তাকীই ভাবে। অথচ তার চিন্তাধারা খুবই কদর্যপূর্ণ। সদা সে মনের কল্পনায় নিমগ্ন থাকে। অর্থাৎ মনে মনে কল্পনা করে সুখবোধ করে। কখনো সে গুনাহটি করার সংকল্পও করে ফেলে। অর্থাৎ সুযোগ পেয়ে গেলে আর সে গুনাহ থেকে বিরত থাকবে না; বরং তাতে লিপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তা পরিহার করা বেজায় কঠিন হয়ে যায়। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/৭৭]

কুদৃষ্টি থেকে স্বল্প সংখ্যক মানুষই বেঁচে আছে

আমাদের জন্য নিজেদের অবস্থা যাচাই করা উচিত যে, এ গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের মাঝে কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে। আমি লক্ষ্য করি, হয়ত হাজারে একজন এ পাপ থেকে বেঁচে আছে। এছাড়া ব্যাপকভাবে মুসলমান এতে লিপ্ত রয়েছে এবং তাকে খুবই সাধারণ বিষয় মনে করে। যুবকরা তো সেটি অনুভব করতে পারে কিন্তু যাদের কামভাব দুর্বল হয়ে গেছে তারা তো অনুভবও করতে পারে না। তারা মনে করে আমাদের তো কামভাবই নেই। এজন্য কোন সমস্যা নেই। মোটকথা তারা এ ব্যাধির কথা আঁচও করতে পারে না। - [প্রাগুক্ত-২/২১, ৫/৭৭]

অধিকাংশ পরহেযগারদের মাঝে এ ব্যাধির বীজ রয়েছে। তারা অনেক সময় ধোঁকায় পড়ে যান। কেননা, তারা অনেক সময় তাদের প্রকৃতিতে কামভাবের চেতনা অনুভব করেন না। এ থেকে মনে করেন, আমাদের দৃষ্টিতে কামভাব নেই। কিন্তু অতি সত্তর তা প্রকাশিত হয়ে যায়। এজন্য সূচনাতেই সতর্কতা আবশ্যক। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/১১৯]

www.banglakitab.weebly.com

তালিবুল ইলমদের একটি ত্রুটি হল তারা শ্মশ্রুবিহীন সুন্দর বালকদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও তাদের সাথে ওঠাবসা করা থেকে বেঁচে থাকে না। অথচ এটা তাকওয়ার জন্য বিষাক্ত সর্প পর্যায়ের। পরকালীন কঠিন জবাবদিহিতা তো রয়েছেই, দুনিয়অতেও এর দ্বারা আলেমদের মারাত্মক দুর্নাম হয়। ইলমেদীন অর্জনকারীদেরকে এ বিষয়ে খুব বেশি সতর্ক থাকা উচিত। [আত্ তাবলীগ-২/৩৯]

কুদৃষ্টির ব্যাধি খুব গোপনীয় থাকে

পরিতাপের কথা, মানুষ কুদৃষ্টিকে এত সাধারণ মনে করে যেন তা হালাল। অথচ পাপকে হালাল মনে করা কুফরী। কোন নারী কিংবা শ্মশ্রুবিহীন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ভাবতে থাকে যেন কোন সুন্দর স্থান কিংবা ফুলের প্রতি তাকাল। এটি এমন গুনাহ্ যা থেকে বৃদ্ধরা পর্যন্ত বাঁচতে পারে না। কুকর্ম থেকে তো নিরাপদ থাকা যায়। কেননা, সে পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়। প্রথমতঃ যার সাথে করা হবে সেও তো সম্মত হতে হবে। অর্থকড়িও থাকতে হবে। সেই সাথে লজ্জা-শরমও বাঁধ না সাধতে হবে। মোটকথা তার জন্য অনেক শর্ত এবং অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কখনো অন্যে জেনে ফেলার ভয় থাকে। কেউ কঠিন রোগ-ব্যাধির আশঙ্কা করে। কারো শারীরিক গঠন ও রূপ বধা হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু প্রতিবন্ধকতা বেশি তাই অভিজাত মানুষ বিশেষভাবে দীনদার শ্রেণীর মানুষ তাতে খুব কমই লিপ্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে চোখের গুনাহের মধ্যে তেমন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা, তাতে অর্থকড়ির প্রয়োজন নেই, বদনাম হওয়ারও ভয় নেই। কেননা, নিয়তের খবর তো একমাত্র আল্লাহই জানেন। কারো প্রতি কুদৃষ্টি দেয়ার পরও আলেম, কারী ও হাফেজ সাহেবদের মর্যাদাগত কোন পরিবর্তন আসে না। কেননা, এ গুনাহের খবর কেউ জানে না। গুনাহ্ করার পরও সুনাম সুখ্যাতি বহাল থাকে। কুদৃষ্টির সাথে বালকদেরকে আদর-সোহাগ করে আর লোকে ভাবে তিনি ছোটদেরকে খুব স্নেহ করেন। যখন চোখের গুনাহ্ সম্পর্কেই কেউ অবগত হয় না তো দিলের গুনাহ্ সম্পর্কে কিভাবে অবগতি লাভ করবে। আর যারা ব্যাপারটি আঁচ করতে সক্ষম হন তারা এমন ধৈর্যশীল যে, কারো নিকট প্রকাশ করেন না।

হযরত উসমান (রাদি.)-এর নিকট একজন লোক এলো। আসার পথে সে কারো প্রতি কুদৃষ্টি করেছিল। হযরত উসমান (রাদি.) তাকে একান্তে ডেকে বিষয়টি বলেননি; বরং সাধারণভাবে সম্বোধন করে বললেন, مَابَالُ قَوْمٍ يَتَرَشَّحُ الزِّنَا مِنْ اَعْيُنِهِمْ অর্থাৎ মানুষের কী অবস্থা হল যে, তাদের চোখ থেকে যিনা টপকে পড়ছে। এটা

এমন পদ্ধতি যাতে কেউ লজ্জিত ও অপমানিত হয় না কিন্তু অপরাধী অবশ্যই বুঝে ফেলে। - [দাওয়াতে আবিদয্যত-৫/৫১]

মোটকথা, যারা ব্যাপারটি জানতে পারেন তারা কাউকে লজ্জা দেয় না। আর যারা লজ্জা দেয় তারা তো বিষয়টি জানে না। এজন্য কুদৃষ্টির গুনাহ সাধারণতঃ গোপনীয় থাকে এবং নির্দ্বিধায় অহরহ তাতে লিপ্ত হয়। চুরি, ব্যাভিচারসহ অন্যান্য গুনাহ করার জন্য তো শক্তিসামর্থ্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এতে তার প্রয়োজন নেই। এজন্য বুড়োরাও তাতে লিপ্ত। এক দীনদার বৃদ্ধ আমার কাছে নিজের হালত বর্ণনা করে বলল, আমি বালকদের প্রতি কুদৃষ্টির ব্যাধিতে আক্রান্ত। অন্য একজন বৃদ্ধ ছিল যিনি মহিলাদের প্রতি কুদৃষ্টির ব্যাধিতে আক্রান্ত। - [প্রাগুক্ত-৫/৭৪]

কুদৃষ্টিও ব্যাভিচার এবং জঘন্য অপরাধ

চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ পাপটি আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই অপ্রিয়। হাদীস শরীফে এসেছে,

أَنَا غَيُوْرٌ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ وَمِنْ غَيْرَتِهٖ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

আমি অনেক ‘গায়রতমান্দ’ ও আত্মমর্যাদাশীল। আর আল্লাহ তাআলা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আত্মমর্যাদাবান। এ গায়রত ও আত্মমর্যাদার কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীল ও নির্লজ্জ বিষয়কে হারাম করে দিয়েছেন।

পরনারীকে চোখে দেখা, হাত দিয়ে ধরা, পা দিয়ে সে উদ্দেশে হেঁটে যাওয়া সবই অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ সবগুলোকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনা ও ব্যাভিচার বলে আখ্যা দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ الخ- চোখদ্বয়ও যিনায় লিপ্ত হয়। আর চোখের যিনা হল দেখা। কানও যিনা করে। কানের যিনা হল শ্রবণ করা। মুখও যিনা করে। তার যিনা হল বলা। হাত যিনা করে। তার যিনা হল স্পর্শ করা। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/৮৫]

বর্তমানে লোকজনের মধ্যে উক্ত ব্যাধি ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হচ্ছে। কেউ তো মূল গুনাহেই লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর কেউ তার আনুসঙ্গিক বিষয়ে লিপ্ত। অর্থাৎ বেগানা নারী কিংবা শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

اَللِّسَانُ يَزْنِيْ وَزِنَاهُ النُّطْقُ وَالْقَلْبُ يَتَمَنّٰى وَيَشْتَهِيْ

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ যবান যিনা করে। তার যিনা হল উচ্চারণ করা। অন্তরও কামনা ও কামভাব পোষণ করে। এতে হাত দিয়ে স্পর্শ করা কুদৃষ্টিতে তাকানো সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এমনকি চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কোন সুন্দর বালক কিংবা বালিকার সাথে কথা বলাও যিনা এবং লাওয়াতাতের শামিল। আর অন্তরের যিনা হল কল্পনা করা। যার দ্বারা স্বাদ অর্জিত হয়। যিনার মধ্যে যেমন তফসিল রয়েছে তেমনি লাওয়াতাতের মধ্যেও তফসিল রয়েছে। আর এটা বড়ই পরিতাপ ও দুঃখের কথা যে, মহিলাদের প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও মানুষ বালকদের প্রতি ধাবিত হয়। আর তার প্রধান কারণ হল, মহিলাদের সাথে মেলামেশা করলে বদনামের ভয় রয়েছে। অধিকন্তু মহিলা সহজে পাওয়াও কঠিন। পক্ষান্তরে ছেলেদের সাথে মেলামেশা করলে বেশি দুর্নামের ভয়ও নেই এবং সহজে পাওয়াও যায়। বিশেষভাবে দেখা এবং কল্পনা করা তো তার চেয়েও সহজ। কেননা, এ ব্যাপারে কেউ অবগত হয় না। অথচ এসবই হচ্ছে কুকর্মের শামিল। - [তাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/১১৯]

অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি

এ কর্মটি মন্দ বা ঘৃণিত হওয়াটা বিবেক এবং শরীয়ত উভয় দিক থেকেই প্রমাণিত। সুস্থমস্তিষ্ক তা কোন ভাবেই সমর্থন দেয় না। অসৎচরিত্রের মানুষ ছাড়া কেউ এ কাজে পা বাড়াতে পারে না।

সমকামিতা ও সহবাসের মধ্যে পার্থক্য হল নারীর সাথে কামচরিতার্থ করার পর পরস্পরে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং নারীর মনে পুরুষের ইজ্জত ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নারী অনুভব করে লোকটি শক্তিশালী পুরুষ, দুর্বল নয়। আর বালকদের সাথে কামচিরতার্থ করার সঙ্গে সঙ্গে একে অপরের দৃষ্টিতে লজ্জিত ও ধিকৃত হয়ে পড়ে। যার সাথে মন্দ কর্মটি করা হয় তার মনে এমন শত্রুতাবোধ বদ্ধমূল হয় যে, সে লোকটির চেহারা দেখতেও অসন্তুষ্ট থাকে। - [দীন ও দুনিয়া-২৭৫]

শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি খুবই মন্দ স্বভাবের লোকেরা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষ এর নাম রেখেছে ভালোবাসা। ভালোবাসা কিছুতেই পবিত্র নয়। এহেন অপবিত্র ও অসৎচরিত্রদের মরে যাওয়াই ভালো। - [হুসনুল আযীয-২/৮৯]

কুদৃষ্টি হারাম কেন

অনেক লোক এমন রয়েছে যারা সমকামিতা থেকে পবিত্র কিন্তু তাদের মধ্যেও অধিকাংশ কুদৃষ্টির ব্যাধিতে আক্রান্ত। অথচ হাদীস থেকে জানা গেছে যে, চোখ

www.banglakitab.weebly.com

দ্বারাও যিনা হয়ে থাকে। সুতরাং বালকদের প্রতি কামভাবের সাথে তাকানোও হারাম। এতে অনেক স্বল্প সংখ্যক মানুষই সতর্কতা অবলম্বন করে। অথচ কুদৃষ্টি কুকর্মের ভূমিকা। আর ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি হল- مقدمة الحرام حرام হারাম কাজের পূর্বকাজগুলোও হারাম। সুতরাং কুদৃষ্টিও হারাম। অতএব, চোখের হেফাজত খুবই জরুরি বিষয়। - [দীন ও দুনিয়া-২৭২]

কুদৃষ্টির কুফল ও শাস্তি

কাশফের অধিকারী বুযুর্গানেদীন লিখেছেন, কুদৃষ্টির ফলে চোখে এমন একটি অন্ধকার সৃষ্টি হয় যা সামান্য বসীরতসম্পন্ন বুযুর্গরাই দেখে বুঝে ফেলেন যে, লোকটির চোখ পবিত্র নয়। বয়স, সৌন্দর্য ও চেহারা-সুরতে সমপর্যায়ের দু'জন লোক। পার্থক্য শুধু এই যে, একজন পাপী অপরজন মুত্তাকী। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, একজনের চোখে এক ধরনের অন্ধকার রয়েছে। বুযুর্গানেদীন কাউকে লক্ষ্য করে বলেন না; বরং গোপন রাখেন। -[দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/৭৮]

আমি একবার স্বপ্নে দাজ্জালকে দেখতে পাই। তার সাথে অনেক মহিলা, গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। এজন্য আমি তাকে খুব ভয় পাচ্ছিলাম। যাদের মাঝে সৌন্দর্য পূজা ও কুদৃষ্টির রোগ রয়েছে তারা দাজ্জালের সঙ্গী হবে। [মাজীদুল মাজীদ-৬৮]

এ সমকামিতা খুবই পূরনো ব্যাধি। এটি সর্বপ্রথম হযরত লূত (আ.)-এর জাতির মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল। শয়তান তাদেরকে এ পথে পরিচালিত করেছিল।

আফসোস লাগে, আল্লাহ তাআলা অনেককে সময় সুযোগ দান করেছেন দীনের কাজ করার। কিন্তু বেশিরভাগ এমন মানুষই বঞ্চিত হয়েছে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/১২৫]

জনৈক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ তাআলা যাকে নিজ দরবার থেকে বের করে দিতে চান তাকে বালকদের প্রেমে নিপতিত করে দেন। এটি খুবই ক্ষতিকর জিনিস। হযরত আবুল কাশেম কুশাইরী [রহ.] বলেন,

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْس

অর্থাৎ দৃষ্টি হল শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর। -[দাওয়াতে আবিদিয়্যত-৫/৭৮]

জনৈক বুযুর্গের উক্তি

জনৈক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ তাআলা যাকে নিজের দরবার থেকে বিতাড়িত করতে চান তাকে সুন্দর বালকদের প্রেমে নিপতিত করে দেন। মহব্বত যদিও

www.banglakitab.weebly.com

এক্তিয়ারভুক্ত বস্তু নয়, কিন্তু তার উপকরণগুলো এক্তিয়ারভুক্ত। অর্থাৎ দৃষ্টি দেওয়া ও উঠা-বসা ইত্যাদি। সারকথা হল, আল্লাহ্ তাআলা যাকে নিজ দরবার থেকে বিতাড়িত করতে চান তাকে বালকদের প্রতি কুদৃষ্টি ও তাদের সাথে মেলামেশা করার কাজে লিপ্ত করেদেন। আর এর কাজগুলো ঐচ্ছিক। যার পরিণতি হল আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়ন। اعاذنا الله -(দীন ও দুনিয়া- ২৭২)

কুদৃষ্টির ফলে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা

হাদীসে এসেছে, اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ অর্থাৎ দৃষ্টি শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে অন্যতম তীর। দৃষ্টিপাতের দ্বারা অন্তরে এক প্রকার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলে সে আগুন থেমে যায়। দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার মাঝে অবশ্যই কষ্ট রয়েছে কিন্তু এতে অন্তরের আগুন থেমে থাকে, জ্বলে উঠে না। এক পর্যায়ে তা নিভে যায়। আর দৃষ্টি ফিরিয়ে না রাখলে সে আগুন প্রজ্বলিত হতে হতে মৃত্যুও এসে যেতে পারে। কেননা, চাহিদা পূরণ না হলে বারবার দৃষ্টিপাতের ইচ্ছা জাগে। তারপরও উদ্দেশ্য পূরণ না হলে আরো চাহিদা সৃষ্টি হয়। এ ধারা বন্ধ হয় না। মোটকথা, দৃষ্টিপাতের ক্ষতি শেষ হয় না। আর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার কষ্ট কিছুক্ষণ পর শেষ হয়ে যায়। দু'চারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে পারেন। তখন অনুধাবন করতে পারবেন যে, দৃষ্টি করার মাঝে যে কষ্ট হয় তা ফিরানোর মাঝে কিছুতেই হয় না। দৃষ্টি ফিরানোর কষ্টের চেয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপনের কষ্ট অনেক বেশি। - (মাফাসিদে গুনাহ-১৭২)

কানপুরে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, যৌবনকালে একবার আমি লাক্ষ্ণৌর এক নৃত্যানুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে এক নর্তকীর প্রতি চোখ পড়ল। চোখ পড়ার সাথে সাথে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। তার প্রতি সীমাহীন আসক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হল। যার ফলে আমি স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে তার ফিকিরে পড়ে গেলাম। - (আত্ তাহযীর, বারাকাতে রমযান-৩২)

শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত ইবনুল কায়্যিম [রহ.] একটি ঘটনা লিখেছেন। জনৈক প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ থেকে নিরাশ হয়ে বিরহ বেদনায় মারা যাওয়ার উপক্রম হল। তখন কোন এক ব্যক্তি গিয়ে তার প্রেমাস্পদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিল যে, তোমার প্রেমিক বেচারা তো মরে যাচ্ছে। দয়া করে যদি তুমি তাকে

www.banglakitab.weebly.com

একটিবার দেখতে আসতে তাহলে তার জীবনটুকু বেঁচে যেত। সংবাদদাতার কথায় সে সম্মত হল এবং তাকে দেখার জন্য তার বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। ইত্যবসরে কেউ প্রেমিককে খবর দিল যে, তোমার প্রেমাস্পদ আসছে। একথা শোনামাত্রই তার শরীরে প্রাণচঞ্চলতা ফিরে এলো এবং সে উঠে বসে পড়ল। ওদিকে পথে আসতে আসতে প্রেমাস্পদের মনে কিছুটা আত্মমর্যাদা জেগে উঠল এবং দুর্নামের আশঙ্কায় সে ফিরে গেল। এ সংবাদও কেউ গিয়ে প্রেমিকের কানে পৌছে দিল। দুঃসংবাদ শ্রবণ করতেই প্রেমিক বসা থেকে পড়ে গেল এবং মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন তাকে কালিমার তালকীন দেয়া হলে সে তা না পড়ে কিছু কুফরী কালিমা বলতে লাগল-

رِضَاكَ اَشْهٰى اِلٰى فُؤَادِىْ * مِنْ رَّحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيْلِ

[অর্থাৎ ওহে আমার মাহবুব! স্রষ্টার দয়ার তুলনায় তোমার সন্তুষ্টিই আমি বেশি কামনা করি।]

অবশেষে এ অবস্থাতেই তার প্রাণপাখি বেরিয়ে গেল।

লক্ষ্য করুন, কী বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় ঘটনা। বেচারার প্রাণও গেল, ঈমানও গেল। এ করুণ পরিণতির মূলে রয়েছে চোখের খারাবী। এখন বলুন তো, কারো প্রতি দৃষ্টি করার মাঝে কষ্ট বেশি, নাকি দৃষ্টি ফিরানোর মাঝে বেশি। কোথাও এ সংবাদ জানা যায়নি যে, দৃষ্টি ফিরানোর কারণে কেউ মারা গেছে। এতে অবশ্যই কষ্ট রয়েছে। কিন্তু সেটা সহজ। মানুষ বলে থাকে নজর হেফাযত করা যায় না। এটা ভুল কথা। নিঃসন্দেহে দৃষ্টি ঐচ্ছিক কাজ। - (মাফাসিদে গুনাহ-১৭২)

একটি মর্মন্তুদ ঘটনা

এক বুযুর্গ পবিত্র কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। তার একটি চক্ষু কানা ছিল। তিনি তাওয়াফ করছিলেন আর বলছিলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। কেউ জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার! আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বললেন, আমি একটি বালিকার প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য থেকে একটি চপেটাঘাত লেগে আমার একটি চোখ কানা হয়ে যায়। আমি ভয় পাচ্ছি সেটির যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/৯১]

www.banglakitab.weebly.com

হযরত জুনাইদ বাগদাদী [রহ.] কোথাও যাচ্ছিলেন। সে পথে তার সামনে দিয়ে একটি খ্রিস্টান বালক আসছিল। জনৈক মুরীদ তাকে দেখে বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল, আল্লাহ তাআলা এই সুন্দর চেহারাটিও জাহান্নামে জ্বালাবেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী [রহ.] বললেন, তুমি বালকটির প্রতি কুদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছো। অচিরেই তুমি এর স্বাদ অনুভব করবে। সত্যিই এ কুদৃষ্টির ফলে সে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ভুলে গিয়েছিল। -(দাওয়াতে আবদিয়্যত-৮/৭৭)

প্লেগ বা মহামারির ভিন্ন একটি হেতু রয়েছে। যদিও অনেক কথা বলা উচিত নয়, তবুও কেউ শুনে হয়ত তার অবস্থা শোধরে নিবে এ আশায় এখানে প্রকাশ করছি। তিন/চার বছর পূর্বে থানাভবন ও তার আশপাশ এলাকায় প্লেগ দেখা দিয়েছিল। প্লেগ দেখা দেয়ার পূর্বে কোন এক গভীর রাতে আমি বসেছিলাম। আমার কলবে তখন এ আয়াতটি ভেসে উঠল-

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-

আমরা এ জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব। কারণ, তারা পাপাচার করছিল। [আনকাবূত :৩৪]

আমি এ আয়াতের উপর ওয়াজও করেছি। কিন্তু লোকজন এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। অবশেষে এলাকায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। মোটকথা, এ প্লেগের পিছনে একটি কারণ লূত সম্প্রদায়ের অপকর্মটিও ছিল। বর্তমানে মানুষের মাঝে এ ব্যাধিটি ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৮/৯১]

বৈধ ও অবৈধ দৃষ্টির মাপকাঠি

অনেকে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আছে। তারা বলে, অন্তরে যেমন কোন ফুল কিংবা সুন্দর কাপড় দেখার ইচ্ছা জাগে তেমনিভাবে কোন সুন্দর চেহারা দেখার বাসনাও সৃষ্টি হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে শয়তানের ধোঁকা।

মনে রাখবে, আকর্ষণের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। ফুলের প্রতি যেমন আকর্ষণ হয়, মানুষের প্রতি সেরূপ হয় না। সুন্দর কাপড় দেখে কখনো সেটি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতে মনে চায় না। কিন্তু মানুষকে দেখলে এমনটি মনে জাগে।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি ধোঁকা রয়েছে। কেউ কেউ বলে থাকে, নিজের সন্তানকে দেখে যেমন বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয় অনুরূপভাবে অন্যের সন্তান দেখেও আমাদের একই ইচ্ছা জাগে।

www.banglakitab.weebly.com

ভাইসব! পরিষ্কার কথা, নিজের ছেলে এবং অপরের ছেলের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। নিজের ছেলেকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরার ধরণ ভিন্ন। তাতে কিছুতেই কামভাবের মিশ্রণ ঘটে না। আর অন্যের ছেলের প্রতি ভিন্ন ধরণের আকর্ষণ থাকে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার পর মনে আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা জাগে। প্রেমাস্পদের বিরহ ব্যথা আর নিজ সন্তানের বিরহ ব্যথা ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ছেলেদের প্রতি আসক্তি ও কামভাব পোষণ করা তো বিষাক্ত সর্পের মত। কুরআন-হাদীসে তা হারাম বলা হয়েছে। -(দাওয়াতে আবদিয়্যত-৮/১১৮)

সচ্চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং তা অর্জনের পন্থা

ভালো করে বুঝে রাখুন, চরিত্র পূতঃপবিত্র হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তা অর্জনের জন্য ঐসব পন্থাই অবলম্বন করতে হবে যা শরীয়ত নির্ধারণ করেছে। আর সেসব উপায়গুলো মানুষের এক্তিয়ারভুক্ত জিনিস। যেমন দৃষ্টি হেফাজত করে চলা। এটা মানুষের সামর্থ্য বহির্ভূত জিনিস নয়। অবশ্য তাতে কিছু কষ্ট হবে কিন্তু সে কষ্ট চোখ হেফাজত না করে কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কষ্ট থেকে অনেক কম।

মোটকথা, দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া কষ্টকর হলেও এটা মানব ক্ষমতার গণ্ডিতে রয়েছে। নিজ চেষ্টা ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সামান্য কষ্ট সহ্য করতে পারলে শয়তান চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় না। প্রতিটি গুনাহের ক্ষেত্রে শয়তানের ক্ষমতা কতটুকু? শুধু আহ্বান করা ও প্ররোচণা দেয়া পর্যন্তই শয়তানের ক্ষমতার দাপট রয়েছে। বড় শয়তান তো আপনার ভেতর বিদ্যমান। অর্থাৎ নফসের চাহিদা তো শয়তানের প্ররোচণা থেকেও মারাত্মক। সুতরাং নফসকে দমন করুন।

এ পর্যন্ত দু'টি ভূমিকা দেয়া হয়েছে। একটি হল, গুনাহের মূল কারণ নফসের চাহিদা। আর শয়তানের ভূমিকা হল প্ররোচণা ও সুড়সুড়ি দেয়া। সে আমাদের দ্বারা জোরপূর্বক কোন্ কাজ করাতে পারে না। এমনটি হবে না যে, আমরা ইচ্ছা করব না আর কাজ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ভূমিকাটি হল, নফসের চাহিদার পরের কারণটি হল, আমাদের ইচ্ছা। সুতরাং যেহেতু নফসের চাহিদায় গুনাহ হয়ে থাকে তাই নফসের চাহিদা দমন করা ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। আর এটা খুব জটিল বিষয়।

www.banglakitab.weebly.com

এর জন্য সহজ তদবির ও উপায় হল প্রথমে দেখতে হবে নফসের মাঝে গুনাহের চাহিদা কেন সৃষ্টি হয়। তার কারণ হল পাপের মাঝে নফস স্বাদ উপভোগ করে থাকে। সে স্বাদটি পাপীর সামনেও স্পষ্ট থাকে। কিন্তু যে কোন পাপের পরিণতিতে যে শাস্তি নিহিত রয়েছে তা তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয় না। সেটি হল আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের আযাব। এটাকে অন্যভাবে বললে এরূপ বলা যায় যে, গুনাহের ইচ্ছা করার সময় গুনাহগারের সামনে গুনাহের স্বাদটি জাগ্রত থাকে কিন্তু আল্লাহ স্মরণ জাগ্রত থাকে না। যদি আল্লাহকেও দেখতে পেত অর্থাৎ আল্লাহর কথাও স্মরণ হত তাহলে কখনও তার মনে গুনাহের ইচ্ছা ও চাহিদা সৃষ্টি হত না। - (মাফাসিদে গুনাহ-১৭৬)

কামভাব থেকে সংযমী হওয়া ভারি মুশকিল ব্যাপার। কেননা, কামভাব পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর কোন যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। অবশ্য কারো রূহানী যন্ত্রণা অনুভূত হতে পারে। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই অল্প। সাধারণ অবস্থা হল, কামভাব পূর্ণ হওয়ার পর তাতে এ ধরণের স্বাদ এসে যায়। কামভাবের আগুন আগের চেয়েও অধিক উত্তপ্ত হয়ে যায়। যদিও ক্ষণিকের জন্য কিছুটা শান্ত থাকে। - [দীন ও দুনিয়া-২৬৭]

বলাৎকার ও পায়ুকামিতার সূচনা যেভাবে হয়

এ নাপাক কর্মটির প্রচলন সর্বপ্রথম লূত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে। তাদের আগে কোন জাতি এ কর্মে লিপ্ত হয়নি। তাদেরকে সতর্ক করে হযরত লূত (আ.) বলেছিলেন-

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা কি এমন অশ্লীল ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হও যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।

যদিও কোন কোন প্রাণীর ব্যাপারে বলা হয় যে, সর্বপ্রথম তাদের মাঝে এ কর্মটি সংঘটিত হয়েছে কিন্তু ইতিহাসের কিতাব থেকে জানা যায় যে, এ মন্দ কর্মটি লূত সম্প্রদায়ও নিজেরা উদ্ভাবন করেনি; বরং শয়তান তাদেরকে শিখিয়েছে। এ কর্মটি এমন জঘন্য ও গর্হিত যে, মানুষের নফস اَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ মন্দকর্মের প্ররোচণাকারী হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে ধাবিত হয় না; বরং অভিশপ্ত শয়তান লূত সম্প্রদায়কে সেদিকে ধাবিত করেছে।

www.banglakitab.weebly.com

কিতাবাদিতে সে ঘটনার বিবরণ এসেছে এভাবে-

শয়তান একটি সুদর্শন বালকের আকৃতি ধারণ করে প্রতিদিন জনৈক লোকের বাগানে ঢুকে আঙ্গুর ছিড়ে খেয়ে ফেলত। বাগানের মালিক তাকে যতই ধমকাতো ও মারতো সে বিরত থাকত না। প্রতিদিনই সে আঙ্গুর খেয়ে ফেলত। একদিন মালিক বলল, হতভাগা তুই এভাবে আমার বাগানের পিছু নিয়েছিস কেন? তুই বাগানের সব গাছ নষ্ট করে দিচ্ছিস। তুই আমার কাছ থেকে কিছু পয়সা-কড়ি নিয়ে নে এবং আমার বাগানে আসা ছেড়ে দে। বালকরূপী শয়তান বলল, আমি এভাবে ফিরে যাব না। যদি তুমি আসলেই চাও যে, আমি তোমার বাগান নষ্ট করব না তাহলে আমার কথা মতো কাজ করতে হবে। লোকটি বলল, তোমার কী কথা? শয়তান তাকে উক্ত অপকর্মটি শিক্ষা দিয়ে বলল, আমার সাথে তুমি এ কাজ করলে আমি তোমার বাগানে আসা ছেড়ে দিব। প্রথমবার তো সে নিজের বাগান রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়ে সে অপকর্মটি করেছিল কিন্তু তাতে স্বাদ পেয়ে বসে। এবার বালককে খোসামোদ করে বলল, তুমি প্রতিদিন এসো এবং তোমার যত আঙ্গুর খেতে মন চায় খেয়ো। এক পর্যায়ে সে অন্যান্য লোককেও এ বিষয়টি জানাল এবং তারাও এ অপকর্মে লিপ্ত হল। এতে পাপকর্মটির ব্যাপক প্রচলন হল। প্রতিদিন অনেক লোকের সমাগম হতে লাগল। একদিন শয়তান অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন বাগানে এসে বালকরূপী শয়তানকে না পেয়ে তারা গাঁয়ের অন্যান্য বালকদের সাথে এ কুকর্ম করতে শুরু করল। এ কাজটি আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই অপছন্দ হল। তাই হযরত লূত (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন আপনার কওমকে উক্ত পাপকর্ম থেকে বারণ করুন, অন্যথায় কঠিন আযাব আসবে। আল্লাহর নবী তাদেরকে অনেক বোঝালেন কিন্তু তারা বিরত হল না। অবশেষে আসমান থেকে আযাব নাযিল হল এবং সকলে ধ্বংস হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলা লূত সম্প্রদায়ের উপর যে কঠিন আযাব নাযিল করেছিলেন তা সকলেরই জানা আছে যে, তার তুলনা মেলা ভার। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এ কর্মটি কত জঘন্য। কেননা, কুফরী কর্মটিতে সকল কাফের শরিক থাকার পরও আযাবের ধরণ ভিন্ন হওয়াটা বাহ্যত কর্মের বৈশিষ্ট্যের কারণেই ছিল। -(আল কামাল ফিদ্দীন-২৬৮)

বালকদের প্রতি কামাসক্ত হওয়ার জঘন্যতা ও কুফল

পুরুষদের প্রতি কামাসক্ত হওয়া মহিলাদের প্রতি আস হওয়ার চেয়ে বেশি জঘন্য। কেননা, মহিলাদের ক্ষেত্রে মাহরামদের সাথে কামাসক্তি কম ঘটে

www.banglakitab.weebly.com

থাকে। বেশির ভাগ নামাহরামদের সাথে তা ঘটে থাকে। নামাহরাম নারী কোন না কোন সময় তোমার জন্য হালাল হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কুমারি ও অবিবাহিতা হলে সে সময়ই প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ করতে পারো। আর কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে ইদ্দতের পর তাকে বিবাহ করতে পারো। মোটকথা তাতে বৈধতার অবকাশ আছেই। কখনো সে অবকাশটি খুইব ক্ষীণ হলেও বালকদের ক্ষেত্রে কোনরূপেই বৈধ হওয়ার সুযোগ নেই।

এমন অনেক গুনাহ রয়েছে যেগুলো জান্নাতে যাওয়ার পর গুনাহ থাকবে না। যেমন মদ্দ পান করা দুনিয়াতে গুনাহ কিন্তু জান্নাতে গুনাহ থাকবে না। জান্নাতে মদ পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে পুরুষের প্রতি কামাসক্ত হওয়া এতই জঘন্য কর্ম যা জান্নাতেও সংঘটিত হবে না। সুতরাং এটি ব্যাভিচার ও মদপান অপেক্ষাও জঘন্য। এমনকি মদের মধ্যে অবৈধতার কারণ হল তা নেশাদার হওয়া। যদি কোনভাবে মদের নেশা দূর হয়ে যায়, যেমন সির্কা হয়ে গেলে সেটি পান করা হালাল হয়ে যায়। কিন্তু বালকের প্রতি কামাসক্ত হওয়া সত্তাগতভাবেই মন্দ। এটি কোনভাবেই বৈধ হওয়ার অবকাশ নেই।

ভালোভাবে বুঝে রাখুন, এ অভিশপ্ত কর্মের পরিণতিতে বাতেনী আযাবে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর কারণে কলব ও আত্মা বিকৃত হয়ে যায়। সেই সাথে বাহ্যিক বিপদাপদও আপতিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে এ থেকে নাজাত দান করুন। আমীন॥ -(আল্ কামাল ফিদ্দীন-২৭৪)

বালকদের প্রতি কামাসক্তি ব্যাপক হওয়ার কতিপয় কারণ

বালকদের প্রতি কামাসক্ত হওয়া মহিলাদের চেয়েও জঘন্য অপরাধ। বর্তমানে এ ব্যধি ব্যাপকতা লাভ করছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. মহিলাদের মাঝে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জা বেশি হওয়ার কারণে তাদের কাছে অবৈধ প্রস্তাব পেশ করতে অনেক পাটখড় পোড়াতে হয়। পক্ষান্তরে বালকদের মাঝে লজ্জা কম থাকার কারণে অনেকটা সহজ।

২. মহিলাদেরকে গুরুত্বের সাথে হেফাজত ও সংরক্ষণ করা হয়। তাদের কাছে অনায়াসে পৌঁছা যায় না। কেউ পৌঁছে গেলেও অতিদ্রুত তার লজ্জিত হওয়া অবধারিত। আর সাধারণতঃ বালকদের হেফাজত করা হয় না। তাদের সাথে কারো পর্দা নেই।

www.banglakitab.weebly.com

৩. বালকদের ক্ষেত্রে বদনাম কম হয়। বালকদের মাথায় আদর-সোহাগ করে হাত বুলানো যায় এবং কামভাব নিয়েও হাত বুলানো যায়। কেউ কোন বালককে আদর-সোহাগ করলে লোকে বলবে শিশুদের প্রতি তার অনেক স্নেহ-মমতা রয়েছে। কামভাবের কথা কে জানে। উপরে বর্ণিত কারণসমূহের সুবাদে বর্তমানে বালকদের সাথে কামভাব চরিতার্থ করার বিষয়টি অনেক বেড়ে গেছে। - (দীন ও দুনিয়া-২৬৮)

এটা ইশ্‌ক নয়, ফিস্‌ক ; মহব্বত নয়, শাহ্ওয়াত

কিছুতেই আমার বুঝে ধরে না যে, বালকদের প্রতি কারো ভালোবাসা হয়ে থাকে। বর্তমানকালের মানুষ ফিসক তথা গুনাহের নাম দিয়েছে ইশ্‌ক ও ভালোবাসা। যদি হাজারে দু'একজনের ইশ্‌ক হয়েও থাকে তাহলে তাকে সে ইশকের জন্য ভর্ৎসনা করা হবে না। কিন্তু ইশক পরবর্তী সংঘটিত কর্মের জন্য ভর্ৎসনা করা হবে। কেননা, ইশ্‌ক এক্তিয়ারভুক্ত ও ঐচ্ছিক না হলেও এর কারণে সংঘটিত কর্মগুলো অবশ্যই ঐচ্ছিক। এমনকি কল্পনা করা এবং স্বাদ উপভোগ করাও ঐচ্ছিক ও এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। এগুলো পরিহার করা ওয়াজিব। আর অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, এ অবস্থায় প্রিয় ব্যক্তি থেকে দূরত্ব বজায় রাখার মাঝে উপকার বেশি। দূরে থাকার দ্বারা ধীরে ধীরে এ ব্যাধির উত্তাপ শীতল হতে থাকে। এক্ষেত্রে সকল মুসলমানকে বিশেষভাবে সালেক তথা আত্মশুদ্ধির পথে চর্চাকারীদের খুব বেশি সতর্ক থাকা উচিত। - [আল্ কামাল ফিদ্দীন-২৭২]

'লাওয়াতাত' শব্দের ব্যবহার সঠিক নয়

এ কর্মটি খুবই জঘন্য। যে কেউ এতে লিপ্ত হয় সে তো দুর্নামের শিকার হয়েই থাকে। তার চেয়ে বড় জুলুমের কথা হল যে নবীর উম্মত এ পাপকর্মটির সূচনা করেছে বর্তমানে কর্মটিকে যে নবীর প্রতি শাব্দিক নিসবত ও সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে। যে কোন নবীর প্রতি সম্বন্ধিত নাম ধারণ করা গর্বের বিষয় হলেও হযরত লূত (আ.)-এর নামের প্রতি সম্বন্ধ করে কাউকে লূতী বললে কেউ মর্যাদা মনে না করে অপমান বোধ করে। তার মূলে রয়েছে শব্দটির অপপ্রয়োগ। মূলতঃ لوطي (লূতী) শব্দটির শেষের ى (ইয়া) বর্ণটি নিসবত ও সম্বন্ধসূচক। আর লূত হল বিশিষ্ট নবীর নাম। সুতরাং লূতী শব্দটি মুহাম্মদী, ইবরাহীমী, মূসাভী, ঈসায়ী, ইউসুফী ইত্যাদি সম্বন্ধসূচক নামের পর্যায়ভুক্ত। যদি হযরত লূত (আ.)-

এর উম্মত এ পাপকর্মটি না করত তাহলে আজ লূতী শব্দটিও গৌরবের কারণ হত। যেমন অন্যান্য নবীদের প্রতি সম্বন্ধ করা গৌরবের কারণ। কিন্তু হতভাগা উম্মত নিজেদের নবীকে পর্যন্ত বদনাম করে ছেড়েছে।

এ জঘন্য কর্মটির ক্ষেত্রে 'লাওয়াতাত' শব্দের ব্যবহার আমার দৃষ্টিতে খুবই অপছন্দনীয়। কেননা, শব্দটি হযরত লূত (আ.)-এর নাম থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এহেন নোংরা একটি কর্মের নাম নবীর নাম থেকে উদ্ভাবন করা খুবই বেমানান। যে এ শব্দটি উদ্ভাবন করেছে সে নবীর প্রতি খুবই জুলুম করেছে। আমার মতে এ শব্দটি আরবী ভাষায় অবৈধ দখলদার। আরবী সাহিত্যিকগণের কথা ও লেখায় এ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। আরবীতে এ কর্মটির জন্য اتيان في الدبر (পায়ুপথে গমন করা) শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া আরো যে কোন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু লাওয়াতাত শব্দটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। আমার মতে اغلام শব্দটিও নতুন আবিস্কৃত। বিশুদ্ধ আরবীতে তার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। এসব হল পরবর্তীদের আবিস্কৃত। - (আল্ কামাল ফিদ্দীন-২৭১)

'শাহ্ওয়াত' ও রিপুর নানা রূপ

মজাদার খাবার এবং গল্পগুজবের নেশা

একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে, শাহ্ওয়াত ও রিপু কেবল নারী এবং বালকদের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সুস্বাদু খাবার-খাদ্য খাওয়ার ধান্ধায় থাকা এবং দামি ও সুন্দর পোশাক পরার ফিকিরে থাকাও রিপু। এমনিভাবে অনর্থক কথাবার্তা ও গল্পগুজবের অভ্যস্ত হওয়াও একপ্রকার রিপু। এসব রিপু থেকে নফসকে বিরত রাখাও সবর ও ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে মানুষের মাঝে কথাবার্তা ও আড্ডা জমানোর ব্যাধি বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাজ থেকে একটু অবসর হলেই আড্ডা জমিয়ে অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যায়। আমি কেবল জনসাধারণের কথাই বলছি না; বরং উলামা-মাশায়েখের মাঝেও এ ব্যাধি ব্যাপকভাবে রয়েছে। আমি তাদেরকেও আড্ডা ও গল্পের আসর জমাতে নিষেধ করছি।

www.banglakitab.weebly.com

এশা পরবর্তী মজলিস

কোন কোন শায়খের দরবারে এশার পরও মজলিস হয়ে থাকে। তাতে শুধু শুধু ঘুম নষ্ট হয়ে থাকে। এভাবে মজলিস করে দীর্ঘ রাত জাগ্রত থেকে শায়খের আমলে কোন ব্যাঘাত না হলেও শ্রোতাদের সকলের অবস্থা সমান নয় বিধায় তাদের মধ্যে কারো কারো ফজর নামাযই ছুটে যায়। কারো নামায নষ্ট না হলেও বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা বললে কলবে অন্ধকার পয়দা হয়। এটাই অনেক বড় ক্ষতি। এ আলোচনা দ্বারা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, নারী-পুরুষের প্রতি কামাসক্ত হওয়া, দামি খাবার ও পেশাকের নেশা এবং গল্পগুজবের আগ্রহ ইত্যাদি সবই রিপুর অন্তর্ভুক্ত। আর রিপুর দমনও সবর ও ধৈর্যের শামিল।

রিপু দমন করা কঠিন ব্যাপার হলেও মানুষ সংকল্প করে ফেললে তা সহজ হয়ে যায়। এমনকি এক পর্যায়ে তা জটিলও থাকে না। - (দীন ও দুনিয়া-২৮১)

কুদৃষ্টির ব্যাধি যেভাবে সৃষ্টি হয়

এ ব্যাধি প্রথমে যৌবনকালে সৃষ্টি হয়। সব গুনাহেরই এ অবস্থা। প্রথমে যৌবনের তাড়নায় করা হয়। তারপর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যেমন হুক্কা পান মূলত চিকিৎসা হিসেবে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা নেশা ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

যুবক ও বৃদ্ধ উভয়েই কুদৃষ্টির ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য হল যুবক নিজের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য কারো কাছে ব্যাক্ত করে থাকে আর বৃদ্ধ লজ্জাশরমের কারণে কাউকে বলতেও পারে না। গোপন থাকার কারণে তাতে সব সময় নিপতিত হয়। - (দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/৭৫)

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায়

শয়তান প্রথমে ভালো নিয়তে দেখায়। কয়েকদিন পর মহব্বত গভীর হয়ে যায় এবং দৃষ্টি নাপাক করে দেয়। তাই সম্পর্কই না রাখা উচিত। আর সম্পর্ক গড়ে উঠে দৃষ্টি থেকে। সুতরাং দৃষ্টি করাই বর্জন করে দাও। সম্ভবতঃ হাদীস শরীফে এসেছে-

اَلنَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيسَ

অর্থাৎ শয়তানের হাতিয়ারের মধ্যে অন্যতম হাতিয়ার হল দৃষ্টি।

www.banglakitab.weebly.com

এ দৃষ্টি এমন জিনিস যার 'আছর' ও প্রভাব পড়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত টের পাওয়া যায় না যে, সম্পর্ক ও ভালোবাসা হয়ে গেছে। যখন প্রিয় মানুষটি পৃথক হয়ে যায় তখন অন্তরে জ্বলন সৃষ্টি হয়। তখন অনুভূত হয় যে, ভালোবাসা গড়ে উঠেছে। আর এ জ্বলন ও উত্তাপ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে আল্লাহর মহব্বত সে পরিমাণ হ্রাস পায় এবং আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হতে থাকেন। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/১২৬]

কুদৃষ্টি বর্জনের সহজ চিকিৎসা

এ অনর্থক কাজটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে স্বল্প সাহসী লোকদের পক্ষে বর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, হিম্মত ও সৎসাহস করা গেলে বর্জন করা সম্ভব। কেননা, কোন কোন গুনাহ এমন রয়েছে যেগুলোতে কোন ধরনের 'মজবুরী' ও অপারগতাও থাকে। যেমন দরিদ্র ব্যক্তির সুদ গ্রহণ। এতে বাহ্যিক মজবুরী থাকতে পারে। হতে পারে তার কোন কাজ আটকে থাকবে। কিন্তু কুদৃষ্টি ও অবৈধ প্রেম থেকে বিরত থাকার মাঝে তো কোন ধরনের মজবুরী নেই। এটা করার উপর কোন কাজ নির্ভর করে না। এতে কেবল সামান্য হিম্মতের প্রয়োজন। এতে বড়জোর নফসের কিছু কষ্ট হবে। তা বর্জন করা হিম্মত ও সৎসাহসের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য অনেক সহজ। সাহসীরা তো আল্লাহর পথে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়েছে। এমন অনেক সৎসাহসীর ঘটনা শুনেছি, যারা গোটা জীবনের আফিম খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছেন। - (দাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/১২)

আরেকটি চিকিৎসা

কোন সুন্দর চেহারা দেখে অন্তরে মন্দ চিন্তা এলে তৎক্ষণাৎ মজলিসে উপস্থিত কোন কদাকার চেহারার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করবে। উপস্থিত কোন বিশ্রী আকৃতির লোক না থাকলে অনুপস্থিত কারো চেহারা কল্পনা করবে। এটা খুবই ফলপ্রসূ চিকিৎসা। এমন কোন স্থূল ও কদাকার মানুষের কল্পনা করবে, যার পেট সামনের দিকে উঁচু হয়ে আছে, ঠোঁট মোটা, নাক বোচা এবং নাক থেকে শ্লেষ্মা বের হচ্ছে এবং সেখানে মশা-মাছি উড়ছে। এভাবে কল্পনা করার দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মন্দ চিন্তাটি দূর হয়ে যাবে।

জনৈক মুরীদকে কুদৃষ্টির চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে লিখেন, কল্পনা কর যে, মরার পর এ সুন্দর মানুষটির কী অবস্থা হবে। শরীর পচে গলে নষ্ট হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

পেট ফেটে যাবে। পোকামাকড় সৃষ্টি হবে। মোটকথা এক অদ্ভুত ও বিশ্রী অবস্থা হবে। এ অবস্থায় যদি কেউ প্রেমিককে বলে তাকে কোলে তুলে আদর করো তখন সে হাজারবার লা-হাওলা পড়তে পড়তে পালিয়ে যাবে। -(হুসনুল আযীয-১/২৮)

ইমাম আবু হানিফা [রহ.]-এর তাকওয়া এবং বালকদের থেকে সতর্কতা

ইমাম আযম আবু হানিফা [রহ.]-এর চেয়ে পবিত্র মানুষ বর্তমানে কেউ নেই। তাঁর তাকওয়া ও বুযুর্গী লক্ষ্যণীয়। তিনি ইমাম আহমদ [রহ.]-কে প্রথম দর্শনেই যখন লক্ষ্য করলেন যে, তার মুখে দাড়ি গজায়নি তখন তাকে নির্দেশ দিলেন যে, দাড়ি না উঠা পর্যন্ত পশ্চাতে ফিরে বসবে। উভয়জনই মুত্তাকী। তারপরও কী পরিমাণ সতর্কতা। অনেক দিন পর ঘটনাক্রমে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রতি ইমাম আবু হানিফা [রহ.]-এর নজর পড়ল। বিস্ময়ের সাথে শুধালেন, তোমার মুখে দেখছি দাড়ি গজিয়েছে! এবার বলুন, ইমাম আবু হানিফা [রহ.]-এর মতো ব্যক্তির সতর্কতার অবস্থা যদি এই হয় তাহলে আজ আমরা কারা, যারা নিজেদের নফসের উপর এতমিনান ও আশ্বস্ত হয়ে বসে আছি! -(দাওয়াতে আবদিয়্যাত-১/২৮)

হযরত থানভী [রহ.]-এর সতর্কতা

(হযরত থানভী রহ. বলেন,) আমি যে কামরায় বসে লেখালেখি করি সেখানে কোন অল্পবয়সী বালকের প্রবেশ নিষেধ ছিল। লোকজনকে বলে দেয়া ছিল কেউ যেন কোন বালককে আমার কামরায় কোন ব্যাপারে না পাঠায়। কেননা, নফসের উপর আমার ভরসা নেই। আমার এ সতর্কতার ফলে খানকায় অবস্থানকারী সকলের মাঝে এর প্রভাব পড়েছিল। সকলেই বালকদের থেকে পরহেয করে চলতেন। - (মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৪৬২)

ইশকে মাজাযী ও অবৈধ ভালোবাসা খুব জটিল ব্যাধি। এ ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আমি কসম করে বলি, এ ব্যাপারে আমি নিজের উপরও ভরসা করতে পারি না। আমি বড় কেউ নই। কিন্তু যারা আমাকে বড় মনে করে আমার সাথে ভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখে তাদের জন্য এটা বড় শিক্ষণীয় বিষয় যে, যাকে আমরা বড় মনে করি তার অবস্থাই যদি এই হয়, তাহলে আমাদেরকে তো আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। - (হুসনুল আযীয-২৮)

www.banglakitab.weebly.com

দাড়িহীন বালকদের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা হামদ-না'ত ও গজল শ্রবণ করা

অনুরূপভাবে আজনবী ও নামাহরাম নারী কিংবা দাড়িহীন বালকদের কণ্ঠে গজল শোনাও একপ্রকার মন্দকর্ম। এমনকি কোন বালকের আওয়াজ শ্রবণের নফসে মন্দ ভাবনা এলে তার কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শোনাও জায়েয হবে না।

অনেক মানুষ বালকদেরকে হামদ-না'ত ও ইসলামী গজল মুখস্থ করিয়ে থাকে। এটাও জায়েয নেই। ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, যদি কোন দাড়িহীন বালকের চেহারা আকর্ষণীয় হয়, যার প্রতি মানুষের কুদৃষ্টি হতে পারে তার ইমামতিও মাকরূহ। ইমাম হয়ে তো সে আল্লাহর কালামই পড়বে। তারপরও ফুকাহায়ে কিরাম বিনা প্রয়োজনে তাকে ইমাম বানানোরও অনুমতি দেন না।

অনেক বক্তা মহিলাদের জলসায় সুরেলা কণ্ঠে কবিতা পড়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ দীনি স্বার্থের পরিপন্থী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফরে জনৈক গোলামকে মহিলাদের সামনে কবিতা পড়তে বারণ করে বলেছেন-

رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ

সে যুগে যেখানে সকলের উপর তাকওয়া প্রবল ছিল তখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরেলাকণ্ঠে মহিলাদের সামনে কবিতা পড়ার অনুমতি দেননি, আজকাল কিভাবে জায়েয হতে পারে। আর যদি আবৃত্তিকারী মহিলা কিংবা বালক হয় তাহলে তো বলাই বাহুল্য। – (দাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/১২৬)

ইলম ও অহংকার এবং আলেম ও অহংকারী

অহংকার হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাধি। এটি আলেমদের ভাগে পড়েছে, মূর্খদের মাঝে এমন বড় ব্যাধি কমই পাওয়া যায়। আলেমদের যেমন মর্যাদা বেশি, তাদের মাঝে সৃষ্ট ব্যাধিও জটিল। কেউ যথার্থই বলেছে, آفة العلم الخيلاء ইলমের বিপদ হল অহংকার। একথাটির দু'টি মর্ম হতে পারে। প্রথমটি হল, ইলম থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়টি হল, অহংকার ইলম অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক। যে কোন অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন, ফল এই দাঁড়াবে যে, অহংকার ইলমের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। সুতরাং যার কলবে অহংকার থাকবে তার কলবে ইলমের নূর থাকতে পারে না।

www.banglakitab.weebly.com

যেসব আলেম অহংকারের ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের চেয়ে মূর্খরাই ভালো আছে। কেননা, তাদের মাঝে এত বড় ব্যাধি নেই। আর যে ইলমের সাথে অহংকারের মিশ্রণ রয়েছে তার চেয়ে ঐ মূর্খতাই শ্রেয় যার মাঝে অহংকার নেই।

এ আলোচনা শুনে হয়ত কেউ বলতে পারে, মাওলানা সাহেব দেখছি ইলমের বদনাম করছেন। অথচ ইলম সর্বাবস্থায় ভালো জিনিস। ইলমই হলো এমন জ্যোতি যার আলোকে ভালো-মন্দ পার্থক্য করা যায়।

আমি বলি, চশমা ব্যবহার করা হয় চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। কিন্তু চশমা দ্বারা উপকার তখনই সাধিত হয় যখন তা নিয়ম মতো ব্যবহার করা হবে। তা না করে যদি কেউ চশমা কানে ঝুলিয়ে রাখে তাতে কোন উপকার নেই। অথবা যদি চশমার আয়নায় রঙ কিংবা চুনার প্রলেপ মেখে দেয় তাহলে তা কী কাজ দেবে। এমন চশমা থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। কেননা, সেটি তো চোখের অবশিষ্ট জ্যোতিটুকুও নষ্ট করে ফেলবে। সেই সাথে অযথা একটি বোঝা বহন করার কষ্ট সহ্য করতে হবে।

ইলমেরও একই অবস্থা। ইলমকে যদি তার নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ তার দ্বারা নিজের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তা খুবই উপকারী বস্তু এবং আদ্যোপান্ত আলো আর আলো। যদি তার দ্বারা উক্ত কাজ না নেয়া হয়; বরং অন্যের সাথে তর্কে জিতা এবং বড় হওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে নিষ্ফল ও ক্ষতিকর। সুতরাং একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ইলম সব অবস্থায় ভালো জিনিস নয়; বরং কখনো কখনো সেটি নিন্দারও যোগ্য।

আমি সত্যিই বলি, অনেক অশিক্ষিত লোক শিক্ষিত লোকের চেয়ে ভালো। অশিক্ষিতদের মনে কখনো এ ভাবনা আসে না যে, আমরা অন্যের তুলনায় ভালো। পক্ষান্তরে বিদ্বানদের মাথা সর্বদা এ ভাবনায় টইটুম্বুর থাকে যে, আমরা অন্যের তুলনায় ভালো। মূর্খদের সামান্য হলেও নিজেদের দোষত্রুটির অনুভূতি আছে। তারা জানে যে, আমরা মূর্খ। আর বিদ্বানরা এতটুকু প্রজ্ঞার অধিকারী নন। তাদের কাছে এটা ধরা পড়ে না যে, আমাদের মাঝে অহংকার, হিংসা, আত্মপুলক ইত্যাদি ব্যাধি রয়েছে। তাহলে বলা যায়, মূর্খরা ক্ষীণদৃষ্টির অধিকারী হলেও বিদ্বানরা অন্ধ হবে নিশ্চিত। - (আস্‌সাওকু লি আহলিশ্‌ শাওকি)

www.banglakitab.weebly.com

অহংকারই ধ্বংস ও পতনের মূল

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا

অর্থাৎ কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে।

এ আয়াতের আলোকে কুফরকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলা হবে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থাৎ অহংকারীদের ঠিকানা কতই না মন্দ।

উক্ত আয়াতের আলোকে অহংকারকে এ মন্দ পরিণামের কারণ বলা হবে। উভয় আয়াতে অপরাধী একই দলভুক্ত। অর্থাৎ এ দলটির জাহান্নামে যাওয়ার দু'টি কারণ বর্ণিত হয়েছে। তা হল কুফর ও অহংকার। লক্ষ্য করুন, উভয়টি একই জিনিস। অর্থাৎ একটি বিষয়ের দু'টি নাম। যেমন বাঘকে اسد এবং ليث উভয় শব্দে বোঝানো হয়। অথবা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। প্রতিটি বিষয়ই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। তাহলে বুঝতে হবে উভয়টির মাঝে কী সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে বুঝুন যে, উভয়টি একটি বিষয় বোঝায় না। কেননা, কুফর ও অহংকারকে কেউ সমার্থবোধক বলেনি। আভিধানিক দৃষ্টিকোণে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তাহলে বলা হবে উভয়টি জাহান্নামে প্রবেশের আলাদা আলাদা কারণ। কিন্তু উভয়টি স্বতন্ত্র কারণ নয়; বরং একটি হল কারণ অপরটি কারণের কারণ।

আরেকটু খুলে বলছি। এখানে দু'ধরনের কারণ রয়েছে। একটি কারণ অপরটি কারণের কারণ। কুফর এবং অহংকার দু'টোকেই জাহান্নামে প্রবেশের কারণ বলা গেলেও মূলত কুফর হল নিকটতম কারণ। আর অহংকার দূরবর্তী কারণ। অর্থাৎ অহংকার কুফরীর কারণ আর কুফর জাহান্নামের কারণ। এ কারণেই কুরআন কারীমের কোথাও অহংকারকে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ বলা হয়েছে আবার কোথাও কুফরকে কারণ বলা হয়েছে।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, বাস্তবেই কুফর এবং অহঙ্কারের মধ্যে অহংকারই হল মূল। আর কুফর হল তার পরিণাম বা শাখা। এটি কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে বিধায় এ ক্ষেত্রে فبئس مثوى المتكبرين বলা সম্পূর্ণ যথার্থ হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

সার কথা হল, কেউ এ কারণে কুফরী করে না যে, তার সামনে সত্য অস্পষ্ট। সত্য তো অস্পষ্ট থাকার বিষয়ই নয়। সত্য অবশ্যই উদ্ভাসিত হয়ে যায়। কিন্তু বাধা হয়ে দাড়ায় লজ্জা। লজ্জার কারণেই কুফরী করে বসে। আর লজ্জাই হল অহংকার। সুতরাং অহংকার কারণ সাব্যস্ত হল কুফরীর। এখন অহংকার এবং কুফরীর মধ্যকার সম্পর্ক জানা হল। সারকথা, অহংকার কুফরীর কারণ। আর কুফরী জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। সুতরাং অহংকারও জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হল। কিন্তু এটি মাধ্যম হয়ে অন্য কারণের কারণ হয়েছে।

এ আলোচনার ভিত্তিতে সকল আকীদা বিশ্বাস ও আখলাক-চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, গবেষণায় জানা গেছে আকীদা এবং আখলাকের সকল খারাবী ও বির্যয় অহংকার থেকেই সৃষ্টি হয়। এ অহংকারই সকল মন্দ স্বভাবের মূল। আর অহংকারের পরিণতি বলা হয়েছে জাহান্নামে প্রবেশ। সুতরাং এতে সকল ভ্রান্ত আকীদা ও মন্দ চরিত্রের কথা এসে গেছে।

অহংকার হৃদয়ের ভেতর ছাইবেষ্টিত অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মতো লুকিয়ে আছে। এ অপেক্ষায় থাকবে না যে, যখন তা প্রকাশিত হয় আগুন প্রজ্বলিত হবে তখন নিভিয়ে ফেলব। কারণ আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলে তা কারো নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে না। সব কিছুই সে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত আগুনের চেয়ে নিভু নিভু কয়লার প্রতি বেশি নজর রাখুন। কেননা, আগুনের দিকে সকলেই নজর রাখে এবং আগুন দেখলে মানুষ সাবধান হয়ে যায়। কিন্তু নিভু নিভু কয়লার প্রতি দৃষ্টি কম দেয়া হয় এবং সে ভেতরে ভেতরে নিজের কাজ করেই যায়। - (আস্ সাওকু লি আহ্‌লিশ্ শাওক)

আলেমদের জন্য ভয়ানক বিপদ

মাওলানা রুমী [রহ.] বলেন,

علت ابلیس انا خیر بداست * ایں مرض در نفس ہر مخلوق ہست

কবিতায় انا خیر (আমি উত্তম) কাজ দ্বারা শয়তানের انا خیر منه [আমি তার আদমের চেয়ে উত্তম] উক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাকে যখন হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার নির্দেশ করা হয় তখন সে বলেছিল, আমি কিভাবে আদমকে সেজদা করব। আমি তো তার চেয়ে উত্তম। বস্তুত, তার অন্তর অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ছিল। নিজেকে সে অনেক বড় মনে করত। যার

www.banglakitab.weebly.com

পরিণামে কুফরীর দুর্ভাগ্য চিরসঙ্গী হয়ে যায়। সে আল্লাহর হুকুমের অস্বীকার করেছে এবং চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত এবং জাহান্নামী হয়ে গেছে।

মাওলানা রুমী [রহ.] এ ঘটনা বর্ণনা করে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, ইবলিশের ঘটনা শুনে তোমরা হেসো না; বরং নিজেদের অন্তর যাচাই করো। কেননা, অভিশপ্ত হওয়ার উপাদান তোমাদের অন্তরেও বিরাজমান। পার্থক্য এইটুকু যে, সেখানে ঘর্ষণ লেগে আগুন জ্বলে উঠেছে আর তোমাদের অন্তরে এখনও ঘর্ষণ লাগেনি। দিয়াশলাই প্রস্তুত। ঘর্ষণ লাগতে দেরি। পাশে একটি কেরশিন তেলের ড্রামও বিদ্যমান। সুতরাং যেখানে দিয়াশলাই রয়েছে সেখানে সবসময় আশঙ্কা থাকে, কখন জানি বারুদে ঘর্ষণ লেগে যায় এবং তেলের ড্রামে আগুন লেগে সব বাড়িঘর ভস্ম হয়ে যায়।

মাওলানা রুমী [রহ.] সতর্ক করছেন যে, তোমরা কখনো বেখবর ও চিন্তিন্ত থেকো না। কেননা, তোমাদের ভেতরও একটি তেলের ড্রাম রয়েছে। আর সেটি হল নফস। যা সদা পাপ প্রবণ। অগ্নিশিখা পড়া মাত্রই তা জ্বলে উঠবে। এজন্য অহংকার থাকাবস্থায় কেউ কিছুতেই নিরাপদ ও আশ্বস্ত হতে পারে না। আশ্চর্যের কথা হল এটি সর্বাধিক ভয়ঙ্কর জিনিস হওয়ার পরও এর চিকিৎসা করা হয় না। ভালো ভালো নামাযী ও পরহেযগার লোক এমন রয়েছে, লোকজন যাদেরকে খুব সমীহ ও ভক্তি করে। তাদের অন্তরও অহঙ্কারে টইটুম্বুর। অথচ তারা এটিকে কোন গুনাহই মনে করে না। সাধারণ থেকে সাধারণ গুনাহ থেকে বিরত থাকে অথচ অহংকারের মতো বড় গুনাহের কোন পরোয়া করে না।

তার কারণ হল, মানুষ কেবল জাহেরী আমলগুলোকে দীন মনে করে এবং বাতেনী আমলগুলোকে দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তাই কেউ সুন্নতী লেবাস পরে এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়েই নিজেকে যুগের শিবলী ভাবতে থাকে। চাই আপাদমস্তক আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হোক না কেন। এ ব্যাধি এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, কেউ তা থেকে মুক্ত নয়। বিশেষভাবে আলেম সমাজ তাতে ব্যাপকহারে লিপ্ত। তবে আল্লাহ তাআলা যাকে হেফাযত করেছেন। - (প্রাগুক্ত)

সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতা

আমাদের আমলের অবস্থা খুবই নিম্নে পৌঁছে গেছে। মৌলভী সাহেব অহঙ্কারের বশে কাউকে আগে সালাম করে না। আমার নিজের অবস্থাই বলি, রাস্তায় যদি এমন মুসলমানের মুখোমুখী হই যিনি প্রচলিত অর্থে আলেম নন, তাহলে আগে সালাম দেয়ার হিম্মত হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

আলেমদের প্রতি অভিযোগ করে বলি, আমরা নিজেদেরকে বড় মনে করি। তাই জনসাধারণকে সালাম দিতে আমরা লজ্জিতবোধ করি। এমনকি অন্যের সালামের অপেক্ষায় থাকি। আমরা জনগণকে হেয় জ্ঞান করি। অথচ তাদের সাথে দয়ার আচরণ করা উচিত ছিল।

বলুন তো, একজন সুস্থ ব্যক্তি কোন রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করলে তার সাথে কীরূপ আচরণ করা উচিত? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার সাথে সদয় আচরণ করা উচিত। এমনিভাবে আলেমগণেরও উচিত হল জনগণের প্রতি দয়া-মমতার আচরণ করা। কেননা, এটিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ। (আল্ আবদুর রাব্বানী-৭৬)

সুপ্ত অহংকার

এই যে আগে সালাম না দেয়ার প্রবণতা এর উৎস হল, নিজেকে বড় মনে করা। অনেকে রাস্তায় মাথা কাত ও নীচু করে চলে। ভাবখানা দেখে মনে হয় বড় মাপের কোন বিনয়ী লোক হেঁটে যাচ্ছে। অথচ অন্তরের অবস্থা তার বিপরীত। তার অন্তরের কথা হল এ বিনয়পূর্ণ চাল-চলন দেখে লোকজনের দৃষ্টি আমার প্রতি ধাবিত হবে। এটি একটি সূক্ষ্ম অহংকার। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব [রহ.] বলেন, কিছু কিছু অহংকার বিনয়ের আকৃতিতে প্রকাশ পায়। কোন কোন বিনয় প্রকাশকারী এমন রয়েছে যারা কোন সভায় পৌছে পিছনে বসে। মানুষ তো তাকে চিনে কিংবা তার বেশভূষা দেখে বুঝতে পারে যে, তিনি কোন আলেম বা সম্মানী ব্যক্তি হবেন। তাই তারা তাকে সামনে কিংবা মঞ্চে যাওয়ার জন্য অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করে বলে, হযরত! আপনি এখানে কোথায় বসলেন! আপনি তো আমাদের লজ্জিত করছেন। এটা আপনার বসার জায়গা নয়। আপনাকে আল্লাহ বড় সম্মান দিয়েছেন। মেহেরবানি করে মঞ্চের শোভা বৃদ্ধি করুন। - (আস্‌সাওকু লি আহলিশ্ শাওক)

আসল রোগ ও তার চিকিৎসা

কারো গায়ে রোগ আছে কি-না তা আলামত ও নিদর্শন দেখে জানা যায়। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে আমরা কেন প্রথমে সালাম করি না? আমাদের মন কেন আগে সালাম দিতে চায় না? এটা কি আমাদের অন্তরে নিজেকে বড় মনে করার রোগ থাকার আলামত নয়? যদি নিজেকে বড় মনে না করতাম তাহলে আগে সালাম দিতে সংকোচবোধ হয় কেন? আলামত দ্বারা যখন বোঝা গেল যে, রোগ রয়েছে,

www.banglakitab.weebly.com

আর রোগও হল সাংঘাতিক ধরনের তাহলে চিকিৎসা থেকে বিরত থাকার কী কারণ। কিসের ভিত্তিতে আপনি নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবেন? এটা রোগের তান্ডব। এ রোগের চিকিৎসা খুবই জরুরি। চিকিৎসা ও সংশোধনের পন্থা হল, এ চিন্তা কর যে, তুমি যদি নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হয়ে থাক, যার কারণে আগে সালাম করতে সংকোচবোধ কর তাহলে কোন বিষয়ে তুমি বড়। বড় হওয়া এবং ছোট হওয়ার তো মাপকাঠি রয়েছে। বড়ছোট হওয়ার মাপকাঠি যদি ইলম হয় তাহলে মনে রেখো, ইলম সরাসরি উদিষ্ট বস্তু নয়; বরং ইলম হল আমলের মাধ্যম। সুতরাং তোমরা যখন অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখনকার আমল হল সালাম করা। যদি তোমরা সালাম না কর তাহলে তোমাদের ইলম নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। কেননা, তোমাদের ইলম তোমাদের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। তোমাদের ইলম যখন বেকার প্রমাণিত হল তখন তা ফযীলত ও মর্যাদার বস্তুও রইল না। সুতরাং তোমরা জনগণের চেয়ে বড় প্রমাণিত হলে না; বরং তাদের তুলনায় নীচু হলে।

আর যদি বড়ছোট হওয়ার মাপকাঠি ধরা হয় সম্পদ এবং তোমাদের কাছে তাদের তুলনায় ধন-সম্পদ বেশিও হয় তবুও তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, ধন-সম্পদের বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের মাধ্যম হল ব্যবসা। ব্যবসা যদিও অর্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে কিন্তু সেখানে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। আর সুসম্পর্ক বাড়ানোর উত্তম একটি উপায় হল সালাম। এ হিসেবেও আগে সালাম দেয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে।

মোটকথা মানুষ যদি নিজের ইসলাহ ও সংশোধনের চিন্তায় বিভোর থাকে তাহলে যে কোন উপায়ে নফস থেকে অহংকার বিদূরীত করতে পারে। এসব কথা হল বুদ্ধিমান্ এবং আমলকারীদের জন্য। অন্যথায় তর্কবিতর্ক ও পর্যালোচনার তো বিরাট সুযোগ রয়েছে। - (প্রাগুক্ত)

যুক্তিতে মুক্তি নেই : জনৈক তালিবুল ইলমের ঘটনা

এক তালিবুল ইলম কোন পথে যাচ্ছিল। সামনে পড়ল এক সাধারণ লোক। তালিবুল ইলম লোকটিকে সালাম দিল না। আলেমসমাজে যা সাধারণতঃ ঘটে থাকে। লোকটি তালিবুল ইলমের হাত ধরে বলল, আপনি কি আগে সালাম দেয়ার ফযীলত পড়েননি? তালিবুল ইলম জবাব দিল, হ্যাঁ, পড়েছি। কিন্তু নিয়ম হল ছোট বড়কে সালাম দিবে। আপনি হলেন মূর্খ আর আমি হলাম আলেম। এ হিসেবে আমি বড় আর আপনি ছোট। তাই সালাম দেয়া আপনারই উচিত ছিল।

উভয়ের মাঝে কথাবার্তা অনেক দূর পর্যন্ত গড়াল। এক পর্যায়ে লোকটি তালিবুল ইলমের হাত ধরে তার শিক্ষকের কাছে নিয়ে চলল। শিক্ষকের কাছে নালিশ দিয়ে সমগ্র ঘটনা বললেন। শিক্ষক ছাত্রটিকে বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। ছোটরাই বড়কে সালাম করবে। কিন্তু তোমার বুঝতে হবে যে, ছোটবড় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্ত ধর্তব্য নয়। তুমি আলেম দেখেই বড় হবে না। এ লোকটি আল্লাহর দৃষ্টিতে বড় হতে পারেন। শিক্ষক সঠিক কথা বললেন এবং ছাত্রকে সঠিক শিক্ষা দিলেন। কিন্তু ছাত্রের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্যণীয়। ছাত্র শিক্ষকের কাছে নিবেদন করল, হুজুর, আপনি যা বলেছেন তা সঠিক। কিন্তু এ কথাটি এ মূর্খেরও তো বোঝা উচিত। হতে পারে আল্লাহর কাছে আমি বড় হব। সুতরাং তাকেই আগে সালাম দেওয়া উচিত ছিল। দেখলেন তো কী বিস্ময়কর জবাব! মূর্খের কথা বাদ দিলাম, নিজের শিক্ষককেই চুপ করিয়ে দিল।

সারকথা, তর্কবিতর্ক ও পর্যালোচনার সমূহ অবকাশ রয়েছে। আর প্রত্যেক কথারই জবাব রয়েছে। কিন্তু সব জবাব কাজের নয় এবং এ পদ্ধতি উপকারীরও নয়। এ পদ্ধতি পার্থিব কোন ব্যাপারে গ্রহণ করে দেখুন তা কী কাজ দেয়। যেমন খাবার রান্না শিখার জন্য কাউকে গুরু মানা হল। তিনি বললেন, ঝোলের মধ্যে এ পরিমাণ মসলা, লবণ ও পানি দাও। আপনি তার কথা না মেনে আপনার বুদ্ধিমত্তা খাটাতে লাগলেন। বললেন, এ পরিমাণ মসলা, লবণ ও পানি দিতে হবে তার প্রমাণ কী? যে পরিমাণ পানি দেয়া হয়েছে লবণও সে পরিমাণ দেয়া হবে না কেন? এহেন তর্কবিতর্কে কোন লাভ নেই। এভাবে রান্না করা হলে খাবারের যে কী অবস্থা হবে তা বলাই বাহুল্য। শিক্ষক আপনার কথার সামনে নিরুত্তর হয়ে গেলেই আপনি সঠিক পথের পথিক নন। এ ধরনের কথা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না। এসব যুক্তিতর্ক দিয়ে কাজ হবে না; বরং উত্তম পন্থা হল শিক্ষকের বাতানো কথাকে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করা এবং যুক্তিতর্ক পরিহার করা। তাহলে দেখবে কত সহজে খাবার রান্না শিল্পটি আয়ত্তে এসে যায় এবং খাবারও কত সুস্বাদু হয়। কাজের মানুষ তর্কে জড়ায় না বরং তার একমাত্র দৃষ্টি থাকে কাজের প্রতি। - (প্রাগুক্ত)

নিজেকে বড় এবং অপরকে ছোট মনে করা

প্রতিটি মানুষের মাঝে কিছু ভালোগুণ এবং কিছু মন্দগুণ থাকে। কারো মাঝে একটি দোষ থাকলে আমার মাঝে অসংখ্য দোষ থাকতে পারে। আবার একটি দোষই এমন থাকতে পারে যা অন্যের অসংখ্য দোষের চেয়ে মারাত্মক। তাহলে

www.banglakitab.weebly.com

আমরা কিভাবে অন্যকে ছোট মনে করতে পারি? কিভাবে অন্যকে ছোট মনে করে আগে সালাম দিতে লজ্জিতবোধ করি।

নিজের গুণ দেখা এবং অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ করার প্রবণতা

আমরা অন্যকে নিজের চেয়ে খাটো প্রমাণিত করার জন্য তার কোন না কোন দোষ খুঁজে বেড়াই এবং তার মধ্যে ভালো কোন গুণ থাকলে তাতে দৃষ্টি দেই না। সঠিক পন্থা হল, নিজের দোষত্রুটি এবং অন্যের গুণ ও যোগ্যতার প্রতি নজর রাখা। নিজের মধ্যে হাজারো গুণ থাকলেও সেদিকে লক্ষ্য না করা; বরং একটি দোষ থাকলে সেদিকেই নজর করা। অন্যের মাঝে হাজারো দোষ থাকলেও তা না দেখা; বরং একটি গুণ থাকলে সেটিই দেখা। এর ফল এই হবে যে, সর্বদা নিজেকে অন্যের তুলনায় ছোট ও হীন ভাবতে পারবে। তাকে আগে সালাম করতে পারবে। অহংকার তোমার ধারে কাছেও আসতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তোমার মাঝে যে একটি দোষ ছিল সেটিও একদিন দূর হয়ে যাবে এবং তুমি আপাদমস্তক ভালো মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। এবার বলো, নিজের দোষ দেখা ভালো, না অন্যের দোষ খোঁজা ভালো? অন্যের দোষ দেখলে নিজের দোষ সম্পর্কে উদাসীনতা আসে এবং অন্যের দোষটিও এক সময় নিজের মধ্যে এসে যায়। ফলে আপাদমস্তক দোষে জর্জরিত হয়ে যাবে। বুদ্ধিমানদের জন্য এর মাঝে সঠিক সরল পথ উন্মুক্ত রয়েছে। বিতর্ককারীদের কথার কোন জবাব নেই। কেননা, এ যুক্তিগুলো সেও পেশ করে থাকে। বস্তুত, কারো মাঝে নিজেকে সংশোধন করার সদিচ্ছা না থাকলে কোনভাবেই বোঝানো সম্ভব নয়। বক্রতার এ স্বভাব সকলের মাঝেই কমবেশি আছে। আলেমরাও এ থেকে মুক্ত নয়; বরং অন্যদের তুলনায় তাদের মাঝে এটা প্রকট। - [আস্সাওকু লি আহ্লিশ্ শাওক]

অন্যের কাঁধে দোষ চাপানো

নিজেকে বাদ দিয়ে কেবল অন্যকে দোষী বলা উচিত নয়। এটা কোন উপকারী পদ্ধতি নয়। কারো কাঁধে দোষ চাপিয়ে দেয়ার মাঝে কী লাভ? এতে কি তার আত্মার সংশোধন হয়ে গেল? এটাতো এমন হল যে, কেউ বলল, তোমার মুখে কালো দাগ পড়ে আছে। লোকটি নিজের মুখের কালো দাগ দূর করার চিন্তা না করে বলতে লাগল, তোমার নাকটিও তো বাঁকা। এবার লক্ষ্য করো, বাস্তবেই যদি লোকটির মুখে কালো দাগ থাকে এবং অপবাদটি অমূলক না হয় তবুও চিন্তা করে দেখো, এর দ্বারা তোমার কী লাভ হল।

www.banglakitab.weebly.com

যে ব্যক্তি নিজের নফসকে সংশোধন করতে চায় সে যেন অন্যকে দোষী বনানোর পথে না এগোয়। বাস্তবেই কারো মাঝে কোন দোষ থাকলে সে ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে নিজের নফসকে তাপ দিয়ে লাভ কী? এ অবস্থায় স্বীয় নফসের তরবিয়ত হবে না; বরং একটি খারাবী বৃদ্ধি করা হবে। ফল এই হবে যে, আগে তো সে ব্যক্তির তুলনায় কোন বিষয়ে অগ্রসর ছিল কিন্তু এখন যখন নিজের নফসকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করল নিঃসন্দেহে তার থেকে নীচে নেমে গেল। অন্যকে দোষী মনে করার এ পরিণতি হল।

এবার বলুন, উপরে বর্ণিত পন্থাটি সঠিক প্রমাণিত হল নাকি, নিম্নে বর্ণিত পন্থাটি তথা প্রত্যকের ব্যাপারে যাচাই করে কথা বলা এবং দোষারোপ ও অপবাদ থেকে বিরত থাকা। কোন বিষয়ে কারো অবনতি প্রত্যক্ষ করলে চিন্তা করবে আমার মাঝেও এমন কোন ব্যাপার আছে কিনা যে ক্ষেত্রে আমি তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের। কেননা, প্রত্যেকেরই কিছু ভালোগুণ থাকে এবং কিছু মন্দ ব্যাপার থাকে। যদি তার মধ্যে একটি খারাবী থাকে তাহলে আমার মধ্যে দশটি খারাবী থাকতে পারে। কিংবা এমন একটি খারাবী থাকতে পারে যা তার খারাবীর চেয়ে জঘন্য। এরপরও কিভাবে আমরা অন্যকে খাটো ও তুচ্ছ মনে করতে পারি।

[আস্সাওকু লি আহলিশ্ শাওক]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মর্যাদাপ্রীতি

বড় পরিতাপের কথা বর্তমানকালে আলেমগণ ইলম হাসিল করা সত্ত্বেও জনসাধারণের মাঝে মর্যাদা ও যশখ্যাতির প্রত্যাশী। এ কারণেই অনেক সময় তারা জনগণের মনতুষ্টির জন্য এমন কাজ করে বসেন যা করার জন্য তাদের অন্তর প্রস্তুত নয়। কেউ কেউ মনে করে অমুক জায়গায় থাকলে জনগণের মধ্যে আমার খ্যাতি ছড়াবে না। তাই সে স্থান ছেড়ে এমন জায়গায় চলে যায় যেখানে মর্যাদা পাওয়া যাবে।

কারো কারো অবস্থা হল বাজারে কিংবা অন্য কোথাও যাওয়ার সময় দু'চারজন সঙ্গে নিয়ে যায়। একা একা চলা তাদের ভালো লাগে না। সে সামনে হাঁটবে আর বাকীরা পিছনে হাঁটবে, এতেই তারা মর্যাদা খুঁজে পায়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কিরূপ ছিল? পথে তাঁর সাথে কোন

www.banglakitab.weebly.com

সাহাবী থাকলে তাদের কাউকে সামনে এবং কাউকে পেছনে চলতে বলতেন। তিনি নিজে সামনে চলতেন না।

অনুরূপভাবে কোন মজলিসে গেলে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন। তাঁর বসার জন্য ভিন্ন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত না। বাইরে থেকে আগত কেউ বুঝতে পারত না যে, জলসায় মুহাম্মদ কোন লোকটি।

বর্তমানে লোকজনের ব্যাধি হল তারা নিজে বড় সাজতে চায়। কেউ কেউ প্রথমে এ চেষ্টা না করলেও জনগণের সালাম, মুসাফাহা ও হাত-পা চুম্বন ইত্যাদি দেখে এক পর্যায়ে ধোঁকায় পড়ে যায়। ভাবতে থাকে, আমি একটা কিছু হয়ে গেছি। অন্যথায় লোকজন এত ভক্তি করে কেন। তখন তার মনে নিজের দোষক্রটির চিন্তা থাকে না। অথচ নিজের দোষ সম্পর্কে সকলেই অন্যের তুলনায় বেশি অবগত। কিন্তু মূর্খদের সম্মান-ভক্তি দেখে ভাবতে থাকে বাস্তবিকই আমি এসবের যোগ্য। এক সময় নিজের দোষক্রটিগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। -[আত্ তাবলীগ-২১/১৫২]

আলেমের জন্য বড় ফেতনা

জামে' সগীর গ্রন্থে একটি মারফু হাদীস চোখে পড়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আলেমের জন্য এটা বড় ফেতনা যে, সে কামনা করবে লোকজন আমার কাছে এসে বসুক। বুযুর্গানেদীন 'হুব্বে জাহ্' ও সম্মানপ্রীতির ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে বড় বড় মুজাহাদা ও সাধনা করেছেন।

এ পরিমাণ মর্যাদা অর্জন করা জায়েয যতটুকু হলে মানুষের জুলুম থেকে বাঁচা যায়। তার চেয়ে বেশি হলে সেটি দীনের জন্য ক্ষতিকর। এ কারণেই হাদীস শরীফে দোয়া শেখানো হয়েছে এভাবে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا

হে আল্লাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ এবং লোকজনের চোখে বড় বানিয়ে দিন।

বস্তুত, এ দোয়ার মধ্যে মান-মর্যাদা কামনা করা হয়েছে। মর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস শরীফে শুধু দোয়া করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

তা হাসিল করার ব্যাপারে কোন তদবির ও পন্থা বলা হয়নি। যা দ্বারা বোঝা যায় মর্যাদা একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত বস্তু। তদবির করে তা হাসিল হয় না।

নিজের ইসলাহ্ না করে অন্যের চিন্তায় বিভোর থাকা

এ পর্যায়ে আরেকটি রোগের কথা বর্ণনা করছি। যা মূলতঃ সমালোচনা ও দোষ অন্বেষনের একটি শাখা এবং যে রোগে অনেক বিদ্বানরাও আক্রান্ত রয়েছে। এ কাজটি ভালো মনে করা হয় বিধায় তার ক্ষতিকর দিকটি ধরা পড়ে না। তা হল নিজের ইসলাহ্ ও সংশোধনের কথা ভুলে গিয়ে অন্যের সংশোধনের চিন্তায় বিভোর হওয়া। বাহ্যত এটি একটি ভালো কাজ মনে হয়। কিন্তু এতে শয়তানের বড় ধোঁকা রয়েছে। এখন আমি ঐসব লোককে সম্বোধন করে বলছি, যারা অন্যের সংশোধণ করার যোগ্য নয়। ইসলাহ্ ও সংশোধন কর্মটি সরাসরি ভালো কাজ এবং শরীয়তের নির্দেশিত বিষয়। তাই বলে তা সকলের কাজ নয়। যে প্রথমে নিজেকে সংশোধন করেছে সেই অন্যকে সংশোধন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

যোগ্যতা ছাড়া এ কাজে আত্মনিয়োগ করাটা ইসলাহ্ নয়; বরং তা দোষ অন্বেষণ। যার সারকথা হল, অনেকে গীবত-শেকায়েত ও দোষচর্চা থেকে বিরত থাকতে চায়। শয়তান নানা ফন্দি এঁটে তাদেরকে সে কাজে লিপ্ত করতে চায়। কোনভাবে কারো দোষচর্চায় নিমগ্ন করতে না পারলে মনের ভেতর প্ররোচনা দিয়ে থাকে যে, অন্যের সংশোধন করো। এই চানক্যচালে অন্যের দোষক্রুটি অন্বেষণের অভ্যাস হয়ে যায় এবং মনে মনে আশ্বস্তিবোধ করে যে, আমি তো কারো দোষ অন্বেষণ করছি না; বরং সংশোধনের চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছি। যেখানেই বসার সুযোগ হয় সেসব দোষক্রুটির আলোচনা শুরু হয়ে যায়। গীবতের কোন দিকই বাকী থাকে না। অবশ্য অন্তরকে প্রবোধ দেয়া এবং নিজের সাধুতা জিইয়ে রাখার জন্য বলে থাকে, আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন বা ক্ষমা করুন। তাকে দেখে খুবই দয়া হয়; কিন্তু তার মাঝে এই এই দোষ রয়েছে। আমরা গীবত করার উদ্দেশ্যে বলছি না; বরং তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে বিধায় তার মধ্যে এসব দোষ দেখে দয়া হয়। আল্লাহ্ তাকে এসব খারাবী থেকে হেফাযত করুন।

সুবহানাল্লাহ! বড় হিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাব। আপাদমস্তক তার গোশত ভক্ষণ করলে, জনসম্মুখে তাকে লাঞ্ছিত করলে আর কিনা একটি কথা বলে সাধু হয়ে গেলে। বন্ধুগণ! এসবই হচ্ছে শয়তানের চানক্য চাল। এতে আপনাদের দু'টি ক্ষতি হচ্ছে। একটি হল নিজের ইসলাহ থেকে বঞ্চিত থাকা। অপরটি হচ্ছে গীবত শেকায়েতের গুনাহে লিপ্ত হওয়া।

www.banglakitab.weebly.com

সংশোধন করার পদ্ধতি ও কল্যাণকামিতার দাবি

আপনার কোন সন্তান উচ্ছৃঙ্খল হলে, অসৎ কর্মে লিপ্ত হলে কিংবা আপনাকে বিরক্ত করলে আপনি তার দোষক্রটির কথা সর্বত্র বলে বেড়াবেন না। এমনকি লোকজন তার দোষক্রটি আলোচনা করলে আপনি মনে মনে দুঃখ পাবেন এবং সন্তানের দোষক্রটি কারো সামনে প্রকাশিত না হওয়ার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তাকে নিরিবিলি ডেকে দরদের সাথে বুঝিয়ে বলবেন, বাবা, ওসব কাজ ছেড়ে দিয়ে ভালো হয়ে যাও। এ পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে আপনি যত্রতত্র তার বদনাম করবেন, এটা কিছুতেই হতে পারে না। আপনি যার দোষচর্চা করছেন যদি তাকে সংশোধন করা আপনার উদ্দেশ্য হয় তাহলে জনসম্মুখে তাকে লাঞ্ছিত করে লাভ কী? তাকে নিজের ছেলের মতো একান্তে ডেকে বোঝান। আমি বাস্তবিক বলছি, দশ জাগায় জনসম্মুখে তার দোষক্রটির আলোচনা করলে যে লাভ এবং ফল হবে এক জায়গায় একান্তে বোঝালে তারচেয়ে বেশি ফল হবে। মনে রাখবেন, যদি তাকে গোপনে বোঝানোর সৎসাহস না থাকে এবং জনসম্মুখে বলে বেড়াতে স্বাদ অনুভূত হয় তাহলে মনে করতে হবে এটা শয়তানের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা, যা বিষ মেশানো মিষ্টির মতো কাজ করে।

অবসর ও স্বচ্ছল মানুষের ব্যাধি

সমালোচনা করা এবং দোষক্রটি অন্বেষণ করার ব্যাধিটি আমাদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা যাকেই সামান্য অর্থবিত্ত দান করেন সেই এ ব্যাধিতে বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়ে যান। রোজি-রোজগারের দিক দিয়ে চিন্তামুক্ত থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে অবসর। করার মতো কোন কাজ নেই। উচিত তো ছিল এ অবসর সময়ে আল্লাহ তাআলার যিকির করা। সেটা তো করেই না। তাই রাত দিনের পুরো সময় অন্যের সমালোচনা আর দোষচর্চা করেই কাটায়। এ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। কয়েকজন একত্রে বসে রাজ্যের অশ্লীল এবং বাজে কথার চর্চা করতে থাকে। কিছু দীনদার অবসর লোককেও এ ধরনের সমালোচনায় নিমগ্ন দেখা যায়। সাধারণ মানুষের চেয়ে এদের সংখ্যাই বেশি। কারণ, সাধারণ মানুষ নানা খেলাধুলায় মগ্ন হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময় সমালোচনা থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু দীনদার মানুষ খেলাধুলাকে নিজের শানের পরিপন্থী মনে করেন। তাই আড্ডা এবং সমালোচনায় এদের সিংহভাগ সময় ব্যয় হয়।

www.banglakitab.weebly.com

অন্যের নয়, নিজের দোষ দেখুন

অবাক লাগে, বুদ্ধিমান এবং দীনদার ব্যক্তিবর্গও অন্যের দোষক্রটির আলোচনা করতে থাকেন। অপরের দোষক্রটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় অথচ নিজের দোষের প্রতি নজর নেই। সবাইকে কেবল অন্যের দোষ বর্ণনা করতেই দেখা যায়। এমন কাউকে দেখা যায় না, যে নিজের বদ আমল ও দোষের কথা প্রকাশ করে। অথচ এটা খুবই জরুরি ছিল। আমরা এমন, অন্যেরা তেমন এসব কথা আমাদের দিবানিশির অযিফায় পরিণত হয়েছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী [রহ.] উপমা দিয়ে বলেন, মনে করো তোমার সর্বাঙ্গে সাপবিচ্ছু জড়ানো। আরেকজনের গায়ে মশামাছি বসা। তার গায়ে মশামাছি বসার কারণে তুমি নিন্দা করছ। অথচ নিজের গায়ের সাপবিচ্ছুর ব্যাপারে বেখবর।

অপর একজন বুযুর্গ বলেন, আমরা নিজেদের চোখের কাড়িকাঠ পর্যন্ত দেখি না, কিন্তু অন্যের চোখের ধূলিকণার কথা সমালোচনা করি। অথচ উভয়টিই স্বতন্ত্র গুনাহ। কেননা, নিজের দোষ না দেখা যেমন গুনাহ, তেমনি বিনা প্রয়োজনে অন্যের দোষক্রটি দেখাও গুনাহ। বিনা প্রয়োজনের মর্ম হল তাতে শরয়ী কোন প্রয়োজন না থাকা। যেসব কাজ শরীয়তের দৃষ্টিকোণে আবশ্যকীয় এবং উপকারী না সেগুলোই অহেতুক বলে বিবেচিত। হাদীস শরীফে এগুলো পরিহার করার নির্দেশ এসেছে। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-২/৯৮]

আমাদের দিবারাত্রি মজলিস ও আলাপচারিতায় অন্যের যেসব দোষক্রটি আলোচিত হয় তাতে তাদের দুর্নাম করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। সমালোচকগণ প্রথমত গীবতের গুনাহে লিপ্ত, দ্বিতীয়ত অহেতুক কর্মে নিমগ্ন।

আচ্ছা বলুন তো! দোষচর্চা এবং সমালোচনার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় দোষ দূর করা এবং সংশোধন করা তাহলে কেন তার ফল পাওয়া যায়নি? কেউ কি কখনো সমালোচিত ব্যক্তিকে খুব স্নেহের সাথে একান্তে ডেকে তার দোষগুলো সম্পর্কে অবগত করেছেন? যদি না করে থাকেন তাহলে কি জনসম্মুখে তার দোষ বলে বেড়ানোকে কখনো সংশোধন বলা হবে? কিছুতেই নয়। হযরত রাবেয়া বসরী [রহ.] তো শয়তানকেও মন্দ বলতেন না। তিনি বলতেন, যতটুকু সময় এ অহেতুক কর্মে নষ্ট করা হবে ততটুকু সময় যদি বন্ধুর যিকিরে নিমগ্ন থাকি তাহলে অনেক অনেক লাভ রয়েছে। -[(দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/১২]

www.banglakitab.weebly.com

অন্যের দোষ অন্বেষণের বিধান এবং বৈধতার ক্ষেত্র

উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মত হল, কারো দোষ বা গুনাহের কথা শুনে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা জায়েয। অনেক ক্ষেত্রে তো দোষ অন্বেষণ করা হারাম। সংক্ষিপ্ত কথা হল, যে ক্ষেত্রে কারো দোষের তদন্ত না করলে শরীয়তের কোন ওয়াজিব ছুটে যায় সেক্ষেত্রে তা ওয়াজিব। যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কোন প্রজার মুরতাদ ও ধর্মান্তরিত হওয়ার সংবাদ পেলেন। এমতাবস্থায় বিষয়টি তদন্ত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে তার উপর ওয়াজিব। কারণ, কেউ মুরতাদ হলে তাকে তওবা করানো প্রয়োজন। যদি তওবা না করে তাহলে শরয়ী আইন মতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া আবশ্যক। এ দুটি কাজের যে কোন একটি কাজের জন্য তার মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি তদন্তের প্রয়োজন ছিল। তদন্ত না করলে ওয়াজিব ছুটে যেত।

আর যেখানে তদন্ত না করলে কোন ওয়াজিব ছুটার সম্ভাবনা নেই কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু অন্য কারোর ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে সেখানে তদন্ত করা জায়েয। যেমন কেউ শুনেছে অমুক ব্যক্তি তাকে মারবে তখন সেটা তদন্ত করা জায়েয। আর যদি তদন্ত করার দ্বারা নিজের কোন ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য না হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট তা অপছন্দনীয় হয় তাহলে তদন্ত করা হারাম। যেমন কেউ শুনতে পেল অমুক ব্যক্তি মদ পান করে। এটা তদন্ত না করলে নিজের কোন ক্ষতি নেই। আর তদন্ত করলে লোকটি লজ্জিত হবে। -[বয়ানুল কুরআন-১১/৪৩]

হাল-অবস্থা তদন্ত করা ও দোষ অন্বেষণ করার অধিকার যার রয়েছে

আল্লাহ তাআলা যার হাতে মানুষের ইসলাহও সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তার প্রয়োজন ও অধিকার রয়েছে কারো হাল-অবস্থা যাচাই করা। কেননা, অবস্থা না জেনে সংশোধন ও সতর্ক করা সম্ভব নয়। যেমন প্রশাসক প্রজাদের অবস্থা তদন্ত ও যাচাই না করলে অপরাধীদের শায়েস্তা করতে পারবে না। তবে তাকেও এমন সব বিষয়ে তদন্ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যে ব্যাপারে তদন্ত না করলে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা রয়েছে। যেসব বিষয় এমন নয় সে ব্যাপারে প্রশাসনের এ তদন্ত করার অনুমতি নেই।

অনুরূপভাবে কেউ কারো 'নেগরান' ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেও তার জন্য অবস্থা যাচাই ও তদন্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, এ ছাড়া সংশোধন করা সম্ভব হবে না। যেমন, স্বামীর জন্য স্ত্রীর অবস্থা যাচাই ও তদন্ত করার অনুমতি

www.banglakitab.weebly.com

রয়েছে। এমনিভাবে জাতির 'মুসলিহ' বা সংশোধনকারী ও পথ প্রদর্শকদের জন্যও সম্মিলিতভাবে জনগণের অবস্থা যাচাই ও তদন্ত করার অধিকার রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় ওয়াজ-নসিহত ও উপদেশ দেয়া সম্ভব হবে না। তবে পীর-মুর্শিদেরও ঐসব বিষয়েই তদন্ত করার অনুমতি রয়েছে যেগুলো মুরীদের সংশোধন করার প্রয়োজন হয়। সেই সাথে তদন্তটিও সংশোধনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় করার উদ্দেশ্যে তদন্ত করার অনুমতি নেই। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ নিয়তের উপরই আমলের ভিত্তি। - (দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/৯২)

লুকিয়ে কথা শোনা কিংবা ঘুমের ভান ধরে কথা শোনা ইত্যাদি সবই দোষ অন্বেষণের শামিল। হ্যাঁ, কারো থেকে ক্ষতির আশঙ্কা হলে কিংবা কোন মুসলমানকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য থাকলে চক্রান্তকারী ও জালেমের অবস্থা যাচাই ও তদন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

গীবত : একটি ব্যাপক ব্যাধি

সম্ভবত তালিবুল ইলমদের অপেক্ষা বেশি কেউ এ ব্যাধিতে আক্রান্ত নয়। এ পাপ খুবই জঘন্য। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا গীবত ও পরনিন্দা যিনার চেয়েও জঘন্য। গীবত দু'ধরনের মানুষের করা হয়।

১. মন্দ মানুষকে মন্দ বলা। ২. ভালো মানুষকে মন্দ বলা। সাধারণ জগণ তাদেরই মন্দ বলে ও দোষচর্চা করে থাকে যারা বাস্তবেই খারাপ আর আমরা এমন লোকদেরকে মন্দ বলি যারা খুবই পরহেযগার মুত্তাকী ও বড় আলেম। তালিবুল ইলমদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, অমুকে কী পারে? অমুকের মাঝে এ দোষ রয়েছে। যদিও কিছু 'ফাযেল' (আলেম) এমনও রয়েছে যারা 'ফযূল' থেকে নির্গত এবং যাদের গীবত করা ক্ষেত্রবিশেষ বৈধও আছে। মূলতঃ এরা আল্লাহর বান্দাদের গোমরা করছে। কিন্তু উচিত হল এদের গীবত থেকেও নিজের যবানকে হেফাযত করা। কেননা, গীবতের অভ্যাস হয়ে গেলে ভালো-মন্দ যাচাই করার সুযোগ হয় না। সীমারেখা ঠিক থাকে না। কারো ব্যাপারে সামান্যতম অসন্তুষ্টি থাকলেও তার ব্যাপারে গীবত শুরু হয়ে যায়।

যারা আলেম কিংবা নেতা গোছের নয় তাদের সাথে গীবতের সম্পর্ক কম। পক্ষান্তরে যারা আলেম, পীর ও নেতা গোছরে তাদের সাথে গীবতের সম্পর্কটা অনেক বেশি। গীবত করা বা শ্রবণ করা উভয়টি তাদের দ্বারা বেশি হয়ে থাকে। হাজার হাজার মানুষ তাদের দরবারে আসা-যাওয়া করে। প্রত্যেকেই তাদের

—১৫

www.banglakitab.weebly.com

কাছে এ 'তুহফা'টুকু নিয়ে হাজির হয় এবং তিনি সানন্দে কবুলও করেন। অবশ্য যারা বুদ্ধিমান তারা এসব লোকদের সংশোধন ও চিকিৎসা করে থাকেন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী [রহ.]-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বলতে লাগল, অমুকে আপনার ব্যাপারে এই এই বলা বলে। হযরত বললেন, সে তো আমার অগোচরে পর্দার আড়ালে বলেছে কিন্তু তুমি তার চেয়ে নির্লজ্জ হয়ে আমার মুখের সামনে বয়ান করছো। - [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/১০০]

গীবতের বিধান

গীবত বলা হয় কারো অগোচরে তার এমন দোষ বর্ণনা করা যা তার সামনে বললে সে দুঃখ পাবে। যদিও সেটি বাস্তবই হোক না কেন। যদি বাস্তব না হয় তাহলে তো সেটি অপবাদ বলে গণ্য হবে। গীবত করা কবীরা গুনাহ। তবে যে দোষের বর্ণনা দ্বারা সামান্য দুঃখ হয় তা সগীরা হতে পারে। যেমন কারো বাড়ী অথবা গাড়ীর বদনাম করা। আর যার সামনে গীবত করা হয় তিনি যদি গীবতকারীকে বারণ করতে সক্ষম হন তাহলে তার গীবত শ্রবণ বলারই নামান্তর। শিশু, পাগল এবং চুক্তিবদ্ধ কাফেরের গীবত করাও হারাম। কেননা, তাদেরকে কষ্ট দেয়াও হারাম। আর হারবী কাফেরকে কষ্ট দেয়া যেহেতু জায়েয সেহেতু তার গীবত করাও জায়েয। তবে সময় নষ্ট হওয়ার কারণে এটিও মাকরূহ বলে বিবেচিত হবে।

গীবত কখনো কর্মেও প্রকাশ পায়। যেমন কেউ কোন লেংড়া ব্যক্তির ঢংয়ে হেটে দেখাল যার দ্বারা তাকে হেয় করা হল।

যদি শরীয়তসম্মত কোন প্রয়োজনে কারো দোষ বলতে হয় তাহলে সেটি হারামের মধ্যে গণ্য হবে না। যেমন কোন জালেম ও অত্যাচারীর গীবত করা এমন ব্যক্তির সামনে যিনি তার জুলুম প্রতিহত করতে সক্ষম। অথবা ফাতাওয়া জিজ্ঞাসাকারী বাস্তব অবস্থা বলতে গিয়ে কারো অবস্থা বলল। আর বাধ্য না হওয়া সত্ত্বেও গীবত শ্রবণ করা গীবত করারই শামিল। -(বয়ানুল কুরআন-১১/৪৭)

চোগলখোরী : গীবতের একটি শাখা

গীবতের একটি শাখা হল চোগলখোরী। চোগলখোরী বলা হয় কারো কোন অভিযোগ মিশ্রিত কথা অন্যের কাছে পৌঁছানো। গীবত তো হল সাধারণ যে কোন দোষ অন্যের কাছে বর্ণনা করা। আর চোগলখোরী এমন গীবতকে বলা হয়

www.banglakitab.weebly.com

যাতে অভিযোগ যুক্ত থাকে। যা শ্রবণ করা মাত্রই শ্রোতার মনে অবশ্যই ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং সে বহুগুণ বেশি প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়। ফলে দু'জনের মাঝে লড়াই বেধে যায়। চিন্তা করলে বোঝা যায়, চোগলখোরীও সাধারণতঃ ভিত্তিহীনই হয়ে থাকে। যারা চোগলখোরী শ্রবণ করে তাদের প্রতি বিস্ময় জাগে। কেননা, চোগলখোর কেবল একপক্ষের দোষ বর্ণনা করে না; বরং উভয়ের কাছে উভয়ের দোষ তুলে ধরে। আমি বলি, এই চোগলখোরী তথা অন্যের অভিযোগকে যদি সত্যি মনে করো তাহলে তোমার দোষক্রটিও সত্যি মনে করা উচিত। কিন্তু কেউ এটা করে না। অন্যের অভিযোগটি কিছুটা সত্য মনে করে। উচিত তো ছিল নিজের দোষটিও কিছুটা সত্য মনে করবে। মোটকথা, চোগলখোরী করা এবং চোগলখোরীকে বিশ্বাস করা উভয়টিই নির্বুদ্ধিতা। এ ব্যাধি থেকে বেশি পরিমাণে বেঁচে থাকা উচিত। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৭/৬১]

অহেতুক রচনা ও কলমের গীবত

ভালো করে খেয়াল করুন, মুখের যে বিধান কলমেরও একই বিধান। মুখে মিথ্যা বলা এবং গীবত করা যেমনিভাবে নাজায়েয তেমনিভাবে কলমের মাধ্যমেও নাজায়েয। মুখে বললে যেমন গুনাহ হবে কলমে লিখলেও তেমন গুনাহ হবে। মুখের মতো কলমও অন্তরের মুখপাত্র। যে কথা মুখে বলা নিষেধ তা কলমে লিখা কেন নিষেধ হবে না; বরং কলমের গুনাহ মুখের গুনাহের চেয়ে মারাত্মক। কেননা, মুখের কথার স্থায়িত্ব নেই এবং তার প্রভাব সীমিত। অর্থাৎ যতদূর আওয়াজ পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত প্রভাব ফেলে। কেউ মুখে গীবত করলে মজলিসে যে কয়জন শ্রোতা হবে ততজনকেই কেবল গুনাহগার বানানোর সবব হল। পক্ষান্তরে কলমের আওয়াজ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সবখানে পৌঁছে যায়। যত মানুষ যতদিন সে গুনাহে লিপ্ত হবে সকলের গুনাহের কারণ সেই লেখক হবে। হাজার হাজার মানুষের সামনে কাউকে লজ্জিত করা হবে। কাউকে গোপনে জুতা মারা আর হাজার হাজার জনতার সামনে মারার মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। কলমচর্চাকারীরা মনে করে কলমে সবকিছুই লেখা বৈধ। যেমনটি কবিরাও মনে করে থাকে। অথচ তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। -(দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৭/৫৩)

ইমাম গাযালী [রহ.] লিখেছেন, কারো বাড়িগাড়ি, ছেলেমেয়ে কিংবা তারসাথে সম্পৃক্ত অন্য কোন বস্তুর দোষ বলাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। আজকাল সচেতন ও বুদ্ধিমান লোকেরাও গীবতের ব্যাপারে উদাসীন। কোথাও সামান্য আড্ডা ও বৈঠক বসলে আর কোন কথাই নেই।

(হযরত থানভী রহ. বলেন,) আমার অভিজ্ঞতা হল, এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হল জনগণ থেকে পৃথক থাকা। লোকজনের সাথে উঠা-বসা হলে গীবতের গুনাহ সামান্য পরিমাণ হলেও আমলনামায় উঠবে। আমি গবেষণা করে বলছি, এ পাপের মূল কারণ হল বেকার ও অলস সময় কাটানো। গোলটেবিল বৈঠকের মতো বসাও গীবতের শামিল। কেননা, এ বৈঠক গীবত থেকে মুক্ত থাকে না। মানুষ এ বৈঠকের নাম দিয়েছে মনের প্রফুল্লতা ও চিত্তবিনোদন। এতে দীন ও দুনিয়ার কোন কল্যাণকর কাজ হয় না। হাসিতামাশা ও গীবতই তার মূল। এ ছাড়া আর কোন কাজ সেখানে হয় না। গীবত ছাড়া আর যা কথা হয় তাও অহেতুক বিষয়। অমুকের বাগানের আম সুস্বাদু, এ সময় বৃষ্টি ভালো হচ্ছে, বাগানে সৌন্দর্য ফিরে আসছে, খোলায় অমুকে হেরেছে, অমুকে জিতেছে ইত্যাদি আলোচনায় দীন-দুনিয়ার কী উপকার রয়েছে? অনর্থক কথাগুলোও মন্দ এবং ঘৃণিত কথার পর্যায়ভুক্ত। এ কথাগুলো বন্দুকের গুলির মত। শুনে রাখুন, মুখ এবং জিহ্বা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। তাই আমরা তার মূল্য দেই না। যখন তা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে তখন মূল্য বুঝে আসবে। তখন মনে চাইবে হায় আরেকবার সুযোগ পেলে দু'চারবার আল্লাহ আল্লাহ যিকির করাতম। - (প্রাগুক্ত)

অনর্থক কথা ও পরনিন্দার ক্ষতি

বর্তমানকালের অবস্থা খুবই নাজুক। সামান্য কথায় লোকজন উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি বিনা কারণেও ক্ষেপে যায়। কারো নিন্দা ও দোষচর্চা করা হলে কোনভাবে এ খবর তার কাছে পৌঁছাবেই। আর তার কাছে পৌঁছার পর সেও অবশ্যই তোমার ব্যাপারে মন্দ কিছু বলবে এবং সে খবরও তোমার কাছে পৌঁছবে। এতে পরস্পরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একে অন্যের দুশমন হয়ে থাকে। অথচ এ যুদ্ধংদেহী অবস্থার মূলে একটি মাত্র কথা। ইচ্ছা করলে সে কথাটি হজমও করা যেত। কেউ আপনার দুর্নমা করলে যদি আপনি সংযমের পরিচয় দেন তাহলে আপনার মান-সম্মানের তেমন কী ঘাটতি হয়ে যেত। - (দাওয়াতে আবদিয়্যত-২/৯৫)

আমাদের মধ্যকার অনৈক্য দূর করার লক্ষ্যে বর্তমানে খুব জোরেশোরে কাজ করা হচ্ছে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার খুব মেহনত হচ্ছে। সভা-সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। আবেগময় বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। অথচ অনৈক্যের মূল বস্তু তথা যবান বন্ধ করার চিন্তা কেউ করছে না।

www.banglakitab.weebly.com

বন্ধুগণ! আমি সত্যিই বলি, অনৈক্যের সবচেয়ে বড় কারণ হল আমাদের অসংযত যবান। আমরা তার লাগাম ছেড়ে দিয়েছি। যা ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা বলে ফেলছি। এ যবান বিরতিহীন গতিতে চলে। তার কোন ক্লান্তি নেই। হাত, পা, মাথা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় হলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মুখের কোন ক্লান্তি নেই। তাই তো হাদীস শরীফে এসেছে, সকাল বেলা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে তোষামোদ করে বলে, তুমি ঠিক থাকবে। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। তুমি ঠিক না থাকলে আমরাও খারাপ হয়ে যাব। -(প্রাগুক্ত-১২/৯৭)

বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা

পরিশ্রমী লোকদের শারীরিক সুস্থতা খুবই ভালো থাকে। তাই তো পল্লীগায়ের মানুষের দৈহিক গঠন মজবুত এবং রোগ-ব্যাধি মুক্ত থাকে। তারা শীত কিংবা গ্রীষ্মের কোন পরোয়া করে না। আর শহরের অবস্থাও দেখ। শহুরে সমাজে অলস থাকা ও বিলাসিতাকে গৌরবের বিষয় মনে করা হয়। শহরের মসজিদের মুয়াযযিনও নাযুক ও সংবেদনশীল মেজায লালন করে। আযান দেয়ার জন্য বাইরে যেতেও তাদের কষ্ট হয়। আল্লাহ না করুক শহরের মানুষ কোন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়ে গেলে কী করবে? এটা কেবল আমার কথা নয়। সকলেই জানে, আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা ভালো জিনিস নয়; বরং পরিশ্রম ভালো জিনিস। কিন্তু বর্তমানকালের নিয়ম-নীতি পাল্টে গেছে। কেউ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক নয়। রেওয়াজ ও নিয়ম তো আপনার এক্তিয়ারভুক্ত জিনিস। তাই কষ্ট ও পরিশ্রম না করার এ রেওয়াজ বদলে ফেলুন। -(দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৭/৫১)

দীনের কাজে না হলেও দুনিয়ার বৈধ কাজে হলেও পরিশ্রম করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে অলস ও বেকার পড়ে থাকবেন না। আল্লাহর কসম, আমি সত্য বলছি, হিন্দুদের মাঝেও এ অবস্থা নেই। তারা ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও পার্থিব কোন একটি কাজে অবশ্যই মগ্ন থাকে। বেকার ও অবসর বসে থাকে না। আর আমাদের সমাজে অবসর থাকা, বিলাসিতা করা এবং অহেতুক গল্পগুজবে লিপ্ত থাকাই গৌরবের বিষয় মনে করা হয়। কোন কাজ শুরু করলে যতক্ষণ মাঝখানে কারো গীবত না হবে ততক্ষণ তা পরিপূর্ণ হবে না। আবার কেউ গীবত শেকায়েত করে না কিন্তু রোম-রাশিয়া, ইরান-ইরাক ইত্যাদি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। পত্রিকা পড়ছে আর দেদারসে যুদ্ধ সম্পর্কে নিজের মতামত বিতরণ করছে। অথচ রাশিয়া, আমেরিকা তোমাকে জিজ্ঞাসাও করে না। তোমার

www.banglakitab.weebly.com

মন্তব্য ও প্রস্তাব সেখান পর্যন্ত পৌঁছবেও না। এসবই হচ্ছে অহেতুক কর্ম। এদের মধ্যে যাদের একটু-আধটু লেখালেখির অভ্যাস রয়েছে তারা সত্যমিথ্যা কোন ঘটনা শোনামাত্রই একটি রচনা ও মন্তব্যপত্র লিখে ফেলে। তারপর পৌঁছে দেয় কোন পত্রিকায়। কিংবা কারো সাথে কোন ব্যাপারে বনিবনা হল না। তো তাকে ঘায়েল করার জন্য কুৎসামূলক লেখা লিখে ছাপিয়ে দিল। কতখানি সত্য আর কতখানি মিথ্যা পরিবেশিত হচ্ছে কিংবা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি রয়েছে কি-না তার কোন পরোয়া নেই। লাগামহীনভাবে সত্যমিথ্যার জগাখিচুড়ী বানিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করে মনের জিদ প্রশমিত করল। -(দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৭/৫১)

নির্বোধ আলেমের অহেতুক গবেষণা

কিছু কিছু নির্বোধের অভ্যাস হল গোটা সময় অহেতুক কাজে নষ্ট করা। যেমন অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকে, জনাব, হযরত মুয়াবিয়া (রাদি.) সম্পর্কে আপনার কী তাহকীক? বেকুবকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, হযরত মুয়াবিয়া (রাদি.)-এর অবস্থা দিয়ে তোমার কী হবে, তুমি তোমার অবস্থা ঠিক করো।

মাওলানা নাঈম লাখনভীর কাছে এক রঙমিস্ত্রী এসে জানতে চাইল হযরত মুয়াবিয়া (রাদি.)-এর ব্যাপারে আপনার মতামত কী? মাওলানা তাকে বললেন, মিয়া নিজের কাজে যাও এবং কাপড়ে রঙ দিতে থাক। তোমাকে হযরত মুয়াবিয়া (রাদি.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলে দিও আমি তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি কিন্তু কেউ আমাকে বলেনি। আরেক ব্যক্তি এক মাওলানা সাহেবকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল যে, তারা মু'মিন ছিলেন কি-না? মাওলানা সাহেব বললেন, তুমি জান, নামাযের ফরয কয়টি? বলল, না, জানি না। মাওলানা সাহেব বললেন, আশ্চর্যের কথা, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তার খবর নেই, অথচ সে কিনা এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামাতার ঈমানের খবর নিতে। যে সম্পর্কে আমাদেরকে কেয়ামতের দিন নিঃসন্দেহে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আর না দুনিয়ার কোন ব্যাপার তা জানার উপর নির্ভর করছে। এসব বাদ দিয়ে নিজের ভালোমন্দের চিন্তা করা উচিত। অন্যদের ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। - (দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/৯০)

www.banglakitab.weebly.com

বেশি কথা বলার ক্ষতি

বেশি কথা বলার মাঝে বুযুর্গদের দৃষ্টিতে যে ক্ষতিটি ধরা পড়েছে, তাহল এর দ্বারা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন ব্যাপার। প্রত্যক্ষ বাস্তবতা হল যারা বেশি কথা বলে তারা মিথ্যা এবং পরনিন্দায় অবশ্যই লিপ্ত হয়। ঘন ঘন কথা বলার কারণে যবানের গুনাহ থেকে বাঁচার তদবির তথা প্রতিটি কথা ভেবে-চিন্তে বলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কেউ মিথ্যা ও পরনিন্দার গুনাহ থেকে রক্ষা পেলেও একটি ক্ষতি থেকে কোনভাবেই রক্ষা পাবে না। সেটি হল এই যে, অধিক কথা বলার দ্বারা অন্তর মরে যায়। তাতে অন্তরে অন্ধকার এবং রূঢ়তা সৃষ্টি হয়। আর এটি এমন বিপদ যা সৃষ্টি হওয়ার পর যে কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কলব জীবিত থাকার উপর যাবতীয় ইবাদত ও নেক আমল নির্ভর করে। কলবের নূর থেকেই সকল নেক কাজের তৌফিক হয়ে থাকে এবং সকল নাফরমানী ও বদ আমল কলবের অন্ধকার থেকেই হয়। কাজেই কলবে জীবন ও নূর না থাকলে এবং রূঢ়তা ও অন্ধকার সৃষ্টি হলে সে ব্যক্তি সবধরনের গুনাহ্ ও পাপ কাজের যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং বোঝা গেল, যাদের অধিক কথা বলার অভ্যাস তারা অল্প দিনই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। তারপর গুনাহের দিকেই ধাবিত হতে থাকে। - (আত্ তাবলীগ-২২/৬৩)

অধিক ভোজনের ক্ষতি

অধিক ভোজন নানা গুনাহের কারণ হওয়া ছাড়াও তাতে অনেক ক্ষতি রয়েছে। কেউ হিম্মত করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলেও অন্যান্য ক্ষতিতে অবশ্যই নিপতিত হবে। অধিক ভোজনের কারণে ঘুম বেশি আসে। কম ভোজনের কারণে ঘুম কম আসে। উদরপূর্তি করে খাবার খেলে চোখ পূর্তি করে ঘুম আসে। পক্ষান্তরে কিছুটা ক্ষুধাসহকারে ঘুমালে রাতে দু'তিনবার এমনিতেই চোখ খুলে যায়। কেননা, ঘুমের কারণে সামান্য যা খেয়েছিল তা দ্রুত হজম হয়ে যায়। তারপর যখন কোমরের সাথে পেট লেগে যায় তখন এক পাশে ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব হয় না; বরং বারবার পাশ বদলাতে হয়। এতে কয়েকবার চোখ খুলে যায়। আর গভীর রজনীতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মুসলমান হলে ঘুম না আসা পর্যন্ত মুখে আল্লাহর যিকির চলতে থাকবে। ভাববে, ভোর হতে তো অনেক দেরী। তাই সময়টা বেকার নষ্ট করে লাভ কী? কিছু যিকির আযাকার করে কাটিয়ে দিই। সুতরাং বোঝা গেল, স্বল্পভোজনকারী নেক আমলের বেশি তৌফিক পায়। আর অধিক ভোজনকারীর পক্ষে তো ফজরের সময় জাগ্রত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য তার নেক আমলের তৌফিক কম হয়ে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

যদি ঘটনাক্রমে কোন রাতে অধিকভোজনকারীর চোখ খুলেও যায় তবু খাবারের কারণে সৃষ্ট অলসতার কারণে চৌকি থেকে নামার হিম্মত হয় না। আর যদি ভাগ্যক্রমে উঠে অজু করে নামায কিংবা যিকির আযকারে লেগে যায় কিছুক্ষণ পর ফের ঘুমের প্রভাব ক্রিয়াশীল হবে এবং সেজদায় পড়ে কিংবা বসে বসে ঘাড় কাত করে ঘুমাতে থাকবে।

অধিক ভোজনের পার্থিব ক্ষতি

অধিক ভোজনের মধ্যে দীনি ক্ষতির পাশাপাশি দুনিয়াবী ক্ষতিও রয়েছে। কেননা, বেশি খেলে পয়সাও বেশি ব্যয় হয়। এক ব্যক্তি প্রতি বেলা দশ রুটি খায় আরেকজন খায় চার রুটি। উভয়ের খাবারে অর্ধেক খরচ পার্থক্য হবে। এছাড়াও অধিক ভোজন করলে খাবার ভালোভাবে হজম হয় না। ফলে নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে। তো চিকিৎসা করাতেও অনেক পয়সা ব্যয় হয়ে যায়। আর স্বল্প ভোজনকারীর খাবার পেটে ভালোভাবে হজম হয়। শরীর সুস্থ থাকে। ঔষধপত্রে পয়সাও নষ্ট হয় না।

হযরত শেখ সা'দী [রহ.] লিখেছেন, এক খ্রিস্টান রাজা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একজন ডাক্তার প্রেরণ করল মদীনাবাসীর চিকিৎসা করার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক্তারকে এ বলে ফেরত পাঠালেন যে, আমরা ক্ষুধা না পেলে আহার করি না এবং ক্ষুধা থাকতেই খাবার ছেড়ে দিই। এজন্য আমাদের ডাক্তারের প্রয়োজন নেই।

বাস্তবেই এ নিয়মের উপর আমল করে দেখুন, সকল রোগব্যাধি পালিয়ে যাবে। কখনো ঘটনাক্রমে রোগ হলে ভিন্ন কথা। কিন্তু রোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

বর্তমানকালের মানুষের অভ্যাস হল আহারের ক্ষেত্রে ক্ষুধা লাগার অপেক্ষা করে না। অনেক সময় এ ভেবে খেয়ে ফেলে যে, দেরি করে খেলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাই গরম গরম খেয়ে ফেলা উচিত। আমি বলি, এখন খেলে গরম খাওয়া যাবে কিন্তু আহারকারী ঠান্ডা হয়ে যাবে। কেননা, ক্ষুধা ছাড়া খেলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কমে যায়। পাকস্থলিতে দুই খাবার অনুপ্রবেশ করে। প্রথম খাবার হজম না হতেই দ্বিতীয় খাবার পৌঁছে। ফলে পাকস্থলির উপর অতিরিক্ত চাপ অনুভূত হয়। ফলে পেটে অসুখ হয়। শিশুদেরকে জোর করে খাওয়ানো আরো বেশি খারাপ বিষয়। শিশুরা তো স্বাভাবিকভাবেই খাবারের প্রতি লোভী থাকে। যদি শিশু কখনো খেতে অস্বীকার করে তাহলে

www.banglakitab.weebly.com

বুঝতে হবে হয় তো সে বেশি খেয়ে ফেলেছে অথবা কোন রোগের কারণে খেতে চাচ্ছে না। - (আত্ তাবলীগ-২৩/৫২)

অধিক নিদ্রার ক্ষতি

অধিক নিদ্রার কারণে নির্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি পায়। চিন্তা করার শক্তি লোপ পায়। আর চিন্তা শক্তি লোপ পেলে দীন এবং দুনিয়া উভয়টির কাজেই সমস্যা দেখা দেয়। ব্যবস্থাপনার কাজে বিঘ্ন ঘটে। অধিক নিদ্রায় অভ্যস্ত ব্যক্তির ভাগ্যে সময়ানুবর্তিতা নসীব হয় না। প্রতিদিন ভাবে আজ ভোরে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে অমুক কাজটি করে ফেলব। কিন্তু ঘুম থেকে সময়মতো জাগতে পারে না। ফলে ঐ কাজটি অন্য কাজের সময় করতে হয় এবং অন্য কাজটি পরের দিন করতে হয়। পরের দিন ইচ্ছা করে আজ দুপুরে এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে যাব এবং কিছু কাজ করব। সেখানে আড়াই ঘণ্টা পরে চোখ মেলল। এভাবে সকল কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রতিদিনই এমন ঘটনা ঘটতে থাকে। এজন্য বলি, এমন ব্যক্তির জীবনে কখনো শৃঙ্খলা আসবে না। আর বিশৃঙ্খলা অনেক অকল্যাণের মূল। এতে দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধিত হয়।

এছাড়াও ঘুমের মধ্যে যে পরিমাণ সময় ব্যয় হবে তাতেও দীন-দুনিয়ার কোন কাজ হবে না। পুরো সময় বেকার চলে যায়। যে পরিমাণ ঘুম শরীরের চাহিদা ছিল (৬ ঘণ্টা) তাতো প্রয়োজনে ব্যয় হয়েছে। অবশিষ্ট সময়টুকু অপচয় হল। এমন ব্যক্তিরা অসময়ে কিংবা একেবারে শেষ সময়ে নামায পড়ে থাকে। বিশেষভাবে এশা এবং ফজর নামায। আর তাহাজ্জুদের কথা তো বলাই বাহুল্য। - (আত্ তাবলীগ-২২/৬২)

মানুষের সাথে অতিমাত্রার সংসর্গ এবং বন্ধুত্বের ক্ষতি

মানুষের সাথে বেশি সংসর্গ ও মেলামেশার ক্ষতির মধ্যে একটি হল, যে পরিমাণ সময় তাতে ব্যয় হয় ততক্ষণ সে কোন কাজ কর্ম থেকে বেকার থাকে। দীনের কোন কাজ তার তৌফিকে হয় না। আর মুলমানের সাথে সাক্ষাৎ করলে যে সওয়াবের কথা বলা হয়েছে তা তো প্রয়োজন পরিমাণ সাক্ষাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে দশ পনের মিনিটেই তার আদর-আপ্যায়ন থেকে অবসর হওয়া যায়। এর জন্য ঘণ্টারপর ঘণ্টা সময় ব্যয় করলে সময় নষ্ট করা হবে।

www.banglakitab.weebly.com

আরেকটি ক্ষতি হল, বেশি মেলামেশার কারণে নিজের আমল ও কাজকর্ম করা যায় না। কোন কাজ নিয়ে বসলেন। হঠাৎ কারো আগমন ঘটল। সে কাজটি আর হবে না। এবার কথাবার্তা ও আলাপচারিতায় অনেক সময় পার হয়ে যাবে। এতে কাজের স্তুপ লেগে যায়। এমন ব্যক্তি সদা পেরেশান থাকে। পূর্বে বলে এসেছি, বিশৃঙ্খলা দীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। আরেকটি বিষয় হল, মেলামেশার মাঝে নিশ্চুপ থাকা কঠিন। বিনা কারণেই কথা বলতে হয় এবং গীবত শেকায়েতে লিপ্ত হতে হয়।

আরো একটি ক্ষতি হল, বেশি মেলামেশার কারণে অনেকের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে নিজের বহু গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। তারপর এ বন্ধুরা তাদের অন্যান্য বন্ধুদের কাছেও তা প্রকাশ করে দেয়। কেননা, তাদের প্রতিও তার তেমন ভরসা ও আস্থা রয়েছে যেমনটি তাদের প্রতি তোমার ছিল। অনেক সময় তাদের মধ্য হতে কেউ তোমার দুশমন হয়ে যাবে এবং তোমার গোপন বিষয়গুলো জেনে তোমাকে ক্ষতি করার চেষ্টা চালাবে। কখনো কখনো সরাসরি নিজের বন্ধুই বদলে যায়। আর মিত্র যখন শত্রু হয় তখন সে অন্যসব শত্রুদের চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে। তাই তো আরবী প্রবাদে রয়েছে- اِتَّقِ شَرَّ مَنْ اَحْسَنْتَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ তুমি যার উপকার করেছ তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাক।

বর্তমানে এসব অসম্ভব কিছু নয়। বর্তমানে অধিকাংশ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্বার্থের জন্য হয়ে থাকে। স্বার্থ পূরণ হতে থাকলে বন্ধুত্ব অটুট থাকে। যেদিন স্বার্থে ঘাটতি হবে সেদিন থেকেই শুরু হবে দুশমনি। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যার প্রতি পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কোনদিন বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করবে না সেও স্বার্থের ঘাটতি অবলোকন করে পুরোপুরি বদলে গেছে। শুধু কি বদলে গেছে, শত্রুর চেয়েও জঘন্য শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

শত্রুতার কারণে কেবল পার্থিব ক্ষতি তো রয়েছেই, সাথে সাথে দীনি ক্ষতিও রয়েছে। কেননা, পিছনে শত্রু লেগে থাকলে মানসিক স্থিরতা থাকে না। আর মানসিক স্থিরতা সকল কাজের মূল। দীনের কোন কাজ তো মানসিক স্থিরতা ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হতেই পারে না। আমি বলি, মনে স্বস্তি না থাকলে দুনিয়ার কোন কাজও হয় না। এখন বোঝা গেল তো মানুষের সাথে মেলামেশা কত বড় ক্ষতিকর বিষয়।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী [রহ.] অসীয়ত করে গেছেন যে, বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা কোনটাই সৃষ্টি করবে না; বরং সকলের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক

www.banglakitab.weebly.com

রাখবে। কেননা, শত্রুতা ও বন্ধুত্ব উভয়টিই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে। - (আত্ তাবলীগ-২২/৬২)

ছাত্রদের সাধারণ ভুল

অধিকাংশ তালিবুল ইলমের অভ্যাস হল তারা মসজিদ কিংবা মাদরাসার পথে বসে থাকে। অনেকে তো ঘুমিয়েও পড়ে। অথচ এটা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। হাদীস শরীফে ঈমানের শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে বলা হয়েছে- ادناها اماطة الاذي। অর্থাৎ সর্বনিম্ন শাখা হল মানুষের চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। যারা পথ বন্ধ করে বসে বা ঘুমায় তারা নিজেরাই কষ্টদায়ক হয়ে গেল। অথচ সকল মুজাহাদা ও আত্মশুদ্ধির মূল উদ্দেশ্য হল মাখলুককে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, সকল মন্দ স্বভাবের পরিণামই হল মানুষকে কষ্ট দেয়া। যেমন অহংকার, ক্রোধ, হিংসা, রিয়া, ধোঁকা, পরনিন্দা, হারাম ভক্ষণ, অশ্লীল কথা বলা ইত্যাদি দ্বারা মানুষের কষ্ট হয়ে থাকে।

সবেচেয় বেশি পরিতাপ জাগে এ ব্যাপারে যে, আলেমগণ কেবল কিতাব পড়িয়ে দেয়াকেই নিজেদের দায়িত্ব মনে করে বসে আছেন। ছাত্রদের আমল-আখলাক পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তা নেই; বরং নিজে ছাত্রদের সাথে অনুচিৎ আচরণ করে বসে। ফলে আজীবন তাদের সংশোধনের আশা করা সুদুর পরাহত হয়ে যায়। - (দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৪/৫৭)

www.banglakitab.weebly.com

পরিচ্ছেদ

ছাত্রদের বিপর্যয় ও অনাগ্রহ প্রসঙ্গ

মাদরাসায় এমন ছাত্রও রয়েছে যারা নামকাওয়াস্তে সবকে হাজির হয়ে থাকে এবং ভিতরে ভিতরে সরকারি মাদরাসার দাখিল, আলিম ও ফাযিলের সনদ অর্জন করতে ব্যাস্ত থাকে। যাতে সরকারি চাকরিতে যোগদান করতে পারে। এদেরকে কি আদৌ তালিবুল ইলম বলা যাবে? কিছুতেই নয়। - (কান্দে দেওবন্দ-১৯)

বর্তমান ছাত্রদের মাঝে আরেকটি রোগ দেখা দিয়েছে। তারা কিতাব শেষ করাকেই মূল কাজ মনে করে। তাও আবার কিতাবের ইবারত না পড়ে কেবল শুনে শুনে হলেও। এখন তো কোন কোন ছাত্রের ব্যাপারে শোনা যায় যে, সে সবকে হাজির থাকা সত্ত্বেও বলতে পারে না যে, কোথায় সবক হচ্ছে এবং কী আলোচনা চলছে। - (ইত্তেবাউল মুনীব-২১)

অকৃতকার্য ছাত্র

কথিত তালিবুল ইলমদের একটি দল এমনও রয়েছে যারা কিছু না করেই আলেমের খাতায় নাম লিখাতে চায়। এজন্য তারা একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। সেটি হল এই, বছরের শুরুতে মাদরাসার কোন জামাতে ভর্তি হয়ে যায়। দশ বারো দিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। আবার আসে আবার চলে যায়। এভাবে ঘুরেফিরে বছর শেষ হয়। সারা বছর সবকে উপস্থিত ছাত্রদের সাথে তাদেরও বছর শেষ হয়। এভাবে একদিন পড়ালেখা থেকে অবসর গ্রহণ করে। মনে রাখবে, এটা ইলম অর্জনের পথ নয়। এভাবে ইলম আসে না। - (মাওয়ায়েজে হাসানা-৩৯)

তালিবুল ইলমদের মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন রয়েছে

শুধু কিতাব পড়লেই হবে না; বরং মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনার সাথে অধ্যয়ন করতে হবে। আর অন্যদের সাথে মেলামেশা করলে মনোযোগ সৃষ্টি হবে না। এর জন্য প্রয়োজন হল নিরিবিলি ও নির্জনতা। যারা সদাসর্বদা সংসর্গ ও গল্পগুজবে মেতে থাকে তাদের অন্তর নূরশূন্য হয়ে যায়। ইলমের জন্য অধ্যবসায় ও একাগ্রতার খুবই প্রয়োজন। একাগ্রতার দ্বারাই বেশি ইলম লাভ করা যায়। - (আত্ তাবলীগ-২৩/১২৫, মাজাহিরুল আমাল-২৯)

www.banglakitab.weebly.com

অহেতুক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার প্রয়োজনীয়তা

অনর্থক কথা ও কাজে লিপ্ত হলে মানুষের অনুভব ও বুঝশক্তি বিকৃত হয়ে যায়। ফলে জরুরি কাজ করার তৌফিক হয় না। এটা খুবই স্পষ্ট বিষয়। মনে চাইলে অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেখতে পার। মেলামেশা, কথাবার্তা, ঘুরাঘুরি কমিয়ে দাও এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, দেখবে বুদ্ধি ও বিবেকের মাঝে আপনা আপনি নূর সৃষ্টি হয়ে গেছে।

যারা সর্বদা বকবক করে তাদের বুদ্ধি ও বিবেক নষ্ট হয়ে যায়। গুনাহ করলে এবং নজরের হেফাযত না করলে ইন্দ্রিয়শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে বিবেক নষ্ট হয়ে যায়। - (হুসনুল আযীয-১/২০৩)

যে ব্যক্তি অহেতুক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ করার সুযোগ হয় না। এটা অভিজ্ঞতার কথা। অনর্থক কথা ও কাজের একই বিধান। এতে কলবে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। নূরানিয়্যত বিদায় নেয়। এ অবস্থাটিকেই হাদীসে অন্তরের মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যার সারকথা হল, কলবে একটি নূর থাকে। অহেতুক ও গুনাহের কাজের দ্বারা তা দুর্বল হয়ে যায়। - (আল ইজাফাত-৪/৩৭)

অনর্থক কথা ও কাজের একটি ক্ষতি হল এতে অন্তরের নূর নিভে যায় এবং সেখানে রূঢ়তা সৃষ্টি হয়। - (দাওয়াউল গাফলাহ-৩৫)

এমনকি বিনা প্রয়োজনে কাউকে 'কোথায় যাও' জিজ্ঞাসা করলেও কলবে অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং কলব মরে যায়। কারো যদি অনুভূতিই না থাকে তাহলে তার কোন চিকিৎসা নেই। - (আল্ ইজাফত-৩/৩৬৪)

মানুষের মাঝে পরকালের ভাবনা জাগ্রত থাকলে সে কখনো অনর্থক কথা ও কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা তার প্রতি চোখ তুলেও দেখত না। - (হুসনুল আযীয)

আড়াল থেকে উস্তাদের কথা শ্রবণ করা মন্দ স্বভাব

এক তালিবুল ইলম অন্য তালিবুল ইলমকে উস্তাদের কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে পাঠাল। ঐদিকে সে গোপনে সমাধান শ্রবণের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। ঘটনাক্রমে আমার নজরে ধরা পড়লে আমি কাছে ডেকে ধমকালাম যে, চোরের মতো লুকিয়ে শ্রবণ করছ কেন? তোমাকে ভেতরে যেতে কেউ নিষেধ করেছে? ভেতরে যেতে লজ্জা হলে প্রেরিত ছাত্রের কাছ থেকেই শুনে নিতে। এভাবে আড়াল থেকে কেন শুনছ? মনে রেখ, এভাবে কারো কথা শ্রবণ করা গুনাহ। হতে পারে তিনি তার সাথে এমন কিছূ কথা বলবেন যা অন্যের কাছে গোপন করতে চান। - (আদাবে মুআশারাত)

www.banglakitab.weebly.com

01917-993555

ছাত্রদের প্রতি কিছু হেদায়াত

১. তালিবুল ইলম ও তালিবে হক উভয়ের জন্যই মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে মেলামেশা বিষধর সর্পের মতো ক্ষতিকর। - (মালফুযাতে খিবরত-৩/১৬)

২. তালিবুল ইলমদের মাঝে দু'টি রোগ বেশি পাওয়া যায়। (১) মর্যাদাপ্রীতি ও (২) প্রবৃত্তি। এ দু'টি রোগ থেকে খুব কম ছাত্রকে মুক্ত পাওয়া যায়। এ দু'টি ব্যাধি দীনকে ধ্বংস করে দেয়। - (হুসনুল আযীয-৩/৪৫৮)

৩. কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না এবং শত্রুতাও সৃষ্টি করবে না।

৪. আক্ষেপ জাগে, বর্তমানে ছাত্ররা মুহতামিমের কাজেও মাথা ঘামায়। এটা নাকি স্বাধীনতা! আসলে মানুষের রুচিই বদলে গেছে। এমনভাবে বদলেছে যে, হৈচৈ ও অকল্যাণকে জীবন মনে করছে আর নীরবতা ও নির্জনতাকে মৃত্যু মনে করছে। অর্থাৎ তাদের ধারণা, সে আবার কেমন জীবন যার মাঝে চঞ্চলতা নেই। আর চঞ্চলতা ও স্পন্দন আসবে এভাবেই। তারা চঞ্চলতা না থাকাকে যেমন জীবনের পরিপন্থী মনে করে তেমনিভাবে নিয়মতান্ত্রিক চঞ্চলতাকেও জীবনের পরিপন্থী মনে করে। তারা নিয়মবহির্ভূত চঞ্চলতাকেই জীবন আখ্যা দিয়েছে।

৫. কেউ কেউ মসজিদের পাখা এবং লোটা ইত্যাদি নিজের কামরায় নিয়ে যায় এবং এটাকে খুবই মামুলি ব্যাপার মনে করে। অথচ এটা খুবই মারাত্মক অন্যায়। এ আচরণটি তালিবুল ইলমদের মাঝে বেশি পাওয়া যায়। বলো দেখি, এ ধরনের লেখাপড়া করে কী লাভ হবে? - (আল ফাসলু লিল ওয়াসলি-২৯৬)

৬. দীনের কেন্দ্রভূমি মাদরাসায় থেকেও দীন না এলে পড়ালেখা করে লাভ কী? এ ধরনের পড়ালেখা দ্বারা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা ছাড়ানো ছাড়া আর কী হবে? - (আল ইফাজাত-১৬/২১৭)

ছাত্রদের ভুল ধারণা

অনেক ছাত্র মনে করে, এখন তো আমাদের ইলম অর্জন করার সময়। এখন আমল করার কোন প্রয়োজন নেই। পড়ালেখা থেকে অবসর হলে আমল করব। এটি সরাসরি শয়তানের ধোঁকা। - (হুকুকুল ইলম-২৩)

আলেমদের মাঝে নিজেদের ইসলাহ ও সংশোধনের চিন্তা নেই। ফলে ইলমের স্থানে 'জাহল' মূর্খতা জেকে বসেছে। মাদরাসায় গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকের অবস্থা

www.banglakitab.weebly.com

পর্যবেক্ষণ করুন। তাহলে দেখা যাবে তাদের মাঝে ইলমের কী রঙ বাকি আছে। শরীয়তের বিধান ও মানবতা কোনটিই নেই। মনে করে মাওলানা হওয়ার পর সব কছু ঠিক হয়ে যাবে।

ওরে বোকা! মাওলানা হওয়ার পর তো আরো খারাপ হবে। অবস্থার আরো অবনিত ঘটবে। এখন ছাত্র জীবনে তো উস্তাদের তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে কিছুটা সোজা আছো, আগামীতে নিজের মুরুব্বী নিজে হলে কী অবস্থা হবে। তখন কেউ তোমাকে শোধরে দিবে না। সংশোধন হওয়ার সময় এখনই। সুতরাং এখনই শোধরে যাও। - (আল্ ইফাজাত-৪/২৪)

শয়তানের ধোঁকা এবং আলেমদের দুর্নাম হওয়ার কারণ

কিছু কিছু তালিবুল ইলমের ধারণা হল, এখন তো আমরা পড়ালেখায় মগ্ন। পড়ালেখা শেষ হলে আমল করব। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। যে গুনাহটি তুমি এখন বর্জন করতে পারছ না এবং যে আমলটি এখন করতে পারছ না আগামীতে স্বাধীন জীবনে তা কিভাবে পালন করবে; বরং এখন আমল করা অনেক সহজ। যতই দিন যাবে নফসের ভিতর ততই মন্দ স্বভাব বদ্ধমূল হয়ে যাবে। জনসাধারণ আলেমদের যেসব দুর্নাম করে তা এই বদ আমলীর কারণে।

আর আমল দ্বারা কেবল নামায, রোযা এবং প্রচুর পরিমাণ নফল ইবাদত উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহর মেহেরবানিতে আপনারা তো এগুলো করেই থাকেন। এজন্য এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি না; বরং আমার কথার উদ্দেশ্য হল আখলাক-চরিত্র সংশোধন করার বিষয়ে। অহংকার, বিদ্বেষ, পরনিন্দাসহ কলব ও চোখের সকল গুনাহ পরিহার করুন। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আল্লাহর মহব্বত ও ভয় অর্জন করুন। দীন ও দীনের সাথে মহব্বত সৃষ্টি করুন। যাদের দ্বারা আপনাদের উপকার হয় তাদের কথা মেনে চলুন। তাদের খেদমত করুন। লোভ-লালসা কাছেও ভিড়তে দিবেন না।

লোভ-লালসার কারণে দুনিয়াদারের দৃষ্টিতে আপনারা অপমানিত হবেন। এজন্য যেখানে লোভ-লালসার সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকে কিছুতেই সেখানে যাবেন না। নিজের জীবন কষ্টে কাটলেও সে পথে অগ্রসর হবেন না। সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকুন। - (আল্ ইফাজাত-৩/৫২)

ছোট মাদরাসা থেকে বের হয়ে বড় মাদরাসায় গমনকারী স্বাধীন ও দুষ্ট ছাত্রদের প্রসঙ্গে কিছু কথা

যেসব ছাত্র একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কারো তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তারা বড় মাদরাসায় গমন করে স্বাধীনতা পেয়ে গেলে বেসামাল হয়ে যায়। কেননা,

www.banglakitab.weebly.com

প্রাকৃতিক নিয়ম হল কোন শক্তি একটি সময় আবদ্ধ থাকার পর স্বাধীনতা পেলে একেবারে উপচে পড়ে। তার সংশোধনের দু'টি পন্থা রয়েছে।

১. সে স্বাধীনতাকে সংযত করা। যা বিবেকের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। বুদ্ধিমানদের মনে রাখা উচিত, নফসকে বন্দী করা, তাকে স্বাধীনতা না দেয়া এবং তাতে স্থিরতা পয়দা করা খুবই জরুরি বিষয়। এমনটি করা না হলে মানুষ এবং পশুর মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। নিজের নফসকে সংযত রাখতে পারার মাঝেই বীরত্ব রয়েছে। যারা নফসের কাছে হার মানে তাদের মাথায় আকল বুদ্ধি নেই। তাদের নির্বুদ্ধিতা একেবারে খোলামেলা বিষয়। তাই তাদের উচিত হল বড়দের তত্ত্বাবধানে থাকা। এছাড়া তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

বেকুব এবং স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য কারো অধীনে থেকে কাজ করাই মঙ্গলজনক। যেমন ছোট শিশুকে যদি মা-বাবার অধীনে না রাখা হয় তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য। কেননা, সে নিজের ভালোমন্দ সম্পর্কে কিছু জানে না। সুতরাং নির্বোধদের জন্য কারো অধীনতা গ্রহণ করার মাঝেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং এতেই তার সুরক্ষা হবে। - (আত্ তাওয়াসী বিল হাক-২২)

ছাত্র জীবনে শিক্ষকদের অনুগত হয়ে থাকাই শ্রেয়। অর্থাৎ ছাত্রের মাঝে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা ও স্বাধীনচেতা মনোভাব থাকা অনুচিত; বরং তার জন্য শিক্ষক ও বড়দের অনুগত থাকাই কল্যাণকর। কেননা, যে বড়দের না মেনে আত্মনির্ভর হয়ে পড়ে সে শয়তান নির্ভর হয়ে পড়ে। - [আল্ ইফাজাত-৩২৬]

আলেম ও তালিবে ইলমদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

আলেমদেরকে আরেকটি বিষয়ে নসিহত করতে চাই। যার মাথার উপর বড়দের ছায়া রয়েছে তার উচিত হল নিজেকে প্রসিদ্ধ করার চেষ্টা না করা। যদ্দুর সম্ভব নিজেকে গুপ্ত রাখবে। অজ্ঞাত ও অখ্যাত থাকাই ভালো। বড় ও প্রসিদ্ধ হওয়া খুবই বিপদজনক। প্রসিদ্ধ হলে পার্থিব বিপদাপদের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই ছোট ও অখ্যাত থাকাই নিরাপদ। দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই নিরাপদ। আর যার কোন মুরুব্বী নেই তার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি বলে দিচ্ছি এবং সেটি ভালো হওয়ার ব্যাপারে কসম খেতে পারি। সেটি হল, ছোটদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া। ইনশাআল্লাহ ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পাবে। -(দাওয়াত ও তাবলীগ-৩৫৪)

কোন ডাক্তার অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন সে নিজের চিকিৎসা করতে পারেন না; বরং অন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হন, তেমনিভাবে আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখরাও নিজেদের নফসের মাঝে কোন ব্যাধির অনুভব করলে বড়দের

www.banglakitab.weebly.com

শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যদি বড় কেউ না থাকে তাহলে ছোটদের কাছেই নিজের অবস্থা বর্ণনা করে পরামর্শ চাওয়া উচিত। আশা করা যায় এতে সঠিক অবস্থা ফুটে উঠবে। - (মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৩০৩)

আলেমদের চার কাজ

এ মুহূর্তে দীনি তা'লীম ও খেদমতের কয়েকটি দিক আমার যেহেনে এসেছে। মোটামুটিভাবে সেগুলো হল চারটি। ওয়াজ, শিক্ষকতা, বিশেষ বিশেষ স্থানে সৎকাজের আদেশ ও লেখালেখি। আলেমদেরকে উক্ত চারটি শাখায় খেদমত করা উচিত।

ছাত্রদের সামনে শিক্ষক হয়ে বসবে, জনসাধারণের সামনে ওয়ায়েজ হিসেবে, বিশেষক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। বিশেষ ক্ষেত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে মহলে নিজের প্রভাব থাকবে সেখানে বিশেষভাবে উপদেশ দিবে। কারণ, সবক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ প্রদান উপকারী হয় না। অনেক সময় জনসাধারণের মাঝে সৎকাজের আদেশ প্রদানের কারণে বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। যা সবাই সহ্য করতে পারে না। কেউ সহ্য করতে পারলে তিনি সৎকাজের আদেশ দিবেন। তবে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা ও ক্রোধভাব প্রকাশ করবে না; বরং নম্রতা ও কোমলতার সাথে নসিহত করবে। এরপরও বিরোধিতা হলে ধৈর্য ধারণ করবে। ধৈর্য ধারণ করতে না পারলে বিশেষ পদ্ধতির এ সৎকাজের আদেশ দিবে না; বরং সাধারণ নসিহতকেই যথেষ্ট মনে করবে।

চতুর্থ কাজ হল লেখালেখি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে আলেমদের কলম ধরা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, সকলেই লেখক এবং ওয়ায়েজ হয়ে যাবে; বরং প্রয়োজন অনুসারে আলেমদের মধ্যে কিছু লেখক এবং বক্তাও থাকা উচিত। কেননা, এগুলো হল ফরযে কেফায়া।

সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণ লোক থাকা উচিত। যদি কোন অঞ্চলে প্রয়োজন পরিমাণ ওয়ায়েজ থাকে তাহলে অন্যান্য আলেমদের উপর ওয়াজ করা ওয়াজিব নয়। তাদেরকে শিক্ষকতায় লিপ্ত হওয়া জায়েয। যদি ওয়াজ করার মতো কেউ না থাকে তাহলে কোন আলেমকে শুধু শিক্ষক হয়ে পড়ে থাকা জায়েয নেই; বরং প্রয়োজনের সময় তাকেও ওয়াজ করতে হবে। - (হুকুক ও ফারাইজ-১১৪)

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াজের মধ্যে বিশেষ প্রভাব রয়েছে। ওয়াজ দ্বারা জনসাধারণের বেশি ইসলাহ হয়ে থাকে। সেই সাথে জনসাধারণের সাথে আলেমদের সম্পর্কও গড়ে উঠে।

মোটকথা, লেখালেখির উপকরিতা ব্যাপক নয়। এমনিভাবে দরস-তাদরীস ও শিক্ষাদানের উপকারিতাও ব্যাপক নয়। একটি বিশেষ শ্রেণী পর্যন্ত তার উপকারিতা সীমাবদ্ধ থাকে। সবচেয়ে ব্যাপক উপকারিতা হল ওয়াজের মাঝে। এক ঘণ্টায় পাঁচ ছয় হাজার মানুষ উপকৃত হতে পারে। সুতরাং প্রমাণিত হল ওয়াজের উপকারিতা ব্যাপক, পরিপূর্ণ ও সহজ। এজন্য আলেমদের উচিত জনগণের মাঝে ওয়াজ-নসিহত করা। - (হুকুক ও ফারাইজ-১১৫)

মাদ্রাসায় না পড়ালেও কিছু দীনি কাজ অবশ্যই করা উচিত

একটি সবক মনে রাখুন, ইলমকে আল্লাহর মহা নেয়ামত মনে করে অর্জন করতে হবে এবং তাতে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য ও স্বার্থ না থাকতে হবে। ফারেগ হওয়ার পর সে মহা নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। তার হেফাজত ও সংরক্ষণ করতে হবে। কিছুতেই তা নষ্ট হতে দেয়া যাবে না।

বর্তমানকালের ছাত্রদের ইলম অর্জন করার সময় কোন নিয়ত থাকে না এবং পড়ালেখায়ও কোন মনোযোগ থাকে না। ফারেগ হওয়ার পর কেউ তো তাকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে ফেলে। আর কেউ ইলমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে। কেউ হেকিম বনে যায় কেউ বা ব্যবসায়ী হয়ে যায়। কেউ কারিগর বনে যায়।

আমি কোনটি হতে নিষেধ করি না। যে যে পেশা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তা গ্রহণ করো। কিন্তু ইলমের সাথেও সম্পর্ক রেখো। তাহলে ইলমের উপকার অন্যের কাছে পৌঁছতে থাকবে। তার পদ্ধতি হল সম্ভব হলে কোথাও পড়াবে। অথবা ওয়াজ-নসিহত করবে। বর্তমানকালের আলেমগণ ওয়াজের ময়দান ছেড়ে দিয়েছে বিধায় মূর্খরা তা দখল করে ফেলেছে। এ দু'টির কোনটিই সম্ভব না হলে কমপক্ষে মুতালা ও অধ্যয়ন করতে থাকবে। যাতে ইলম ভুলে না যাও।

ঘটনাক্রমে যদি ইলমেদীন কারো জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গণ্য হয়েই যায় তবুও ওয়াজকে আয়ের উৎস বানাবে না; বরং কোন কিতাব রচনা করবে কিংবা শিক্ষকতায় লিপ্ত হবে এবং এর মাধ্যমে উপার্জন করবে। -(আশরাফুল উলূম-১১৫)

www.banglakitab.weebly.com

অষ্টম অধ্যায়

প্রসঙ্গ : আত্ম-মর্যাদা ও অমুখাপেক্ষিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলেমদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা

অধিকাংশ ধনী ও সম্পদশালীগণ আলেমদেরকে মূল্যহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে। তবে যারা আলেমদের সান্নিধ্য অর্জনের গৌরব লাভ করেছেন, তারা নয়। এতদসত্ত্বেও অনেক আলেম ধনীদের দুয়ারে ধন্না দেয়। এটা আমার আত্মমর্যাদায় খুবই আঘাত হানে। কবি বলেন :

بِئْسَ الْمَطَاعِمُ حِيْنَ الذُّلِّ تَكْسِبُهَا * فَالْقَدْرُ مُنْتَصِبٌ وَالْقَدْرُ مَخْفُوْضٌ

ঐ সুস্বাদু মূল্যবান খাবার থেকে নিজের নুন-ভাত উত্তম, যার মাঝে যিল্লতি ও অপমান রয়েছে। [হুসনুল আযীয : ১/৫০৮]

জনৈক জজ সাহেব পুরানকালের বেশভূষা ধারণ করে এক জায়গায় গেলেন। উদ্দেশ্য হল তিনি সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এক নেতার বাড়ি গেলেন। নেতা সাহেব তাকে দূর থেকে আসতে দেখেই ঘরের ভেতর চলে গেলেন। জজ সাহেব দারোয়ানের মাধ্যমে বলে পাঠালেন যে, আমি অমুক, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। পরিচয় জানার পর নেতা সাহেব ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেন এবং ওযরখাহী করে বলতে লাগলেন যে, আপনার গায়ে ইয়া বড় আলখেল্লা দেখে আমি মনে করেছিলাম কোন মৌলভী সাহেব বুঝি চাঁদা চাইতে আসছেন।

এই হল আলেমদের সম্পর্কে সাধারণ জগণের ধারণা ও মনোভাব। [দাওয়াতে আবদিয়্যত : ১০১]

সাধারণ জনগণের কাছে যে সকল আলেমের অল্পবিস্তর প্রভাব রয়েছে সেটা হল, তাদের প্রতি তাদের বুযুর্গী ও দরবেশী মনোভাবের কারণে। নিছক আলেম হওয়ার কারণে কোন আলেমের প্রভাব নেই। যাকে শুধুমাত্র আলেম মনে করা হয় তাকে সাধারণ জনগণ অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান না করাটা হল ভাগ্য। আর কোন আলেমকে বুযুর্গ মনে না করা সত্ত্বেও যদি তার সম্মান ও প্রভাব থাকে তাহলে তা ভিন্ন কারণে। হয়ত তিনি দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে সামাজিক বা আর্থিক দিক দিয়ে প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠিত। আর মানুষ সাধারণতঃ মর্যাদাবান ও প্রভাবশালীদের

www.banglakitab.weebly.com

সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে চায়। মোটকথা, শুধুমাত্র আলেম হওয়ার কারণে সমাজে কারো কোন প্রভাব নেই। বুযুর্গী কিংবা পদের কারণে কিছু প্রভাব রয়েছে। যদি শুধু আলেম হওয়ার কারণে কারো প্রভাব থাকত তাহলে তালেবুল ইলম ও মাদরাসার ছাত্রদেরও অনেক প্রভাব হওয়ার কথা ছিল। কারণ, তারাও তো আলেম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদেরকে কী বলব, আমার অন্তরেও তো একই অবস্থা বিরাজমান। এ থেকে বোঝা গেল, শুধু ইলমের কারণে সমাজে আলেমদের মর্যাদা নেই। মর্যাদা কিছু থাকলে তা অন্য কারণে। -[ঐ : ৫/৪৯]

তালিবুল ইলম ও আলেম সমাজের মর্যাদা যে পথে

তোমরা সর্বদা চেষ্টা করবে কিভাবে মাদরাসাকে দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণরূপে তুলে ধরা যায়। মাদরাসা ও মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব প্রমাণিত হলে মাদরাসার ছাত্র ও আলেমদের গুরুত্ব প্রমাণিত হবে। নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিজেদের মাঝে 'বেনিয়াযী' ও অমুখাপেক্ষিতার গুণ সৃষ্টি করতে হবে। কেননা, অমুখাপেক্ষিতার মাঝেই আলেমদের সম্মান নিহিত রয়েছে। জুব্বা ও শেরওয়ানির দ্বারা মর্যাদা আসে না, মর্যাদা আসে অমুখাপেক্ষিতার দ্বারা। বর্তমান সময়ে খাবার আনার জন্য ছাত্রদেরকে ধনীদের বাড়িতে প্রেরণ করা উচিত নয়। কেননা, এতে ছাত্ররা জনসাধারণের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যায়। ছাত্রদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে হবে। মাদরাসার ছাত্রদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়াবাসী তাদের সন্তানকে আলেম বানাতে আগ্রহী হবে। [আনফাসে ঈসা : ১/২৮৮]

সম্মানের ভিত্তি

সম্মানের ভিত্তি হল অমুখাপেক্ষিতা আর অপমানের ভিত্তি হল মুখাপেক্ষিতা। এতে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশভূষার কোন হাত নেই। যদি কারো বস্ত্র পুরনো ও জীর্ণশীর্ণ হয় এবং সে এক খণ্ড ভূমির অধিকারীও না হয় তবু সে সম্মানী। আর যদি পোশাকে আভিজাত্য থাকে এবং অর্থ-সম্পদে প্রাচুর্যতা থাকে কিন্তু নজর এদিকে থাকে যে, এ মোকাদ্দমায় কিছু যদি পাওয়া যায়, অমুক মোকাদ্দমায় যদি কিছু পেয়ে যাই; তাহলে বুঝতে হবে এ ধরনের ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে অসম্মানী ও অপমানিত। [হুকুকুল ইলম, তাজদীদে তালীম : ২৪]

অনাড়ম্বর ও জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র এবং জুতার কারণে আলেমদের অসম্মান হয় না। তারা তো এসবের পরোয়া করবেন না; বরং আল্লাহর উদ্দেশ্যে অমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন। একজন ছেঁড়া বস্ত্র পরিধানকারী মুত্তাকী আলেমের সম্মান

www.banglakitab.weebly.com

মুসলমানদের মাঝে না হওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে জাঁকজমকপূর্ণ পরিধেয়ের অধিকারী কেউ যতই মার্জিত ভঙ্গিতে ভিক্ষা করবে তার জন্য অপমান অপরিহার্য। বিশেষভাবে যদি তা হয় নিছক নিজের ব্যাপারে। মোটকথা, মানুষের কাছে হাত পাতার মাঝে অপমান অবধারিত।

আমি আলেমদের উদ্দেশ্যে বলি, যদি খাবারের কিছু না পাও, তাহলে কারো কাছে হাত না পেতে মজদুরী করে খাও। কারো কাছে হাত পাতার চেয়ে ঘরের কোণে না খেয়ে মরে যাওয়া উত্তম। আল্লাহর শোকর, সাত মহাদেশের রাজত্বও আমার কাছে মূল্যহীন মনে হয়। আমি উপবাস যাপন করে ঘরের কোণে মরে যেতে প্রস্তুত কিন্তু কারো সামনে নিজের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতে পছন্দ করি না। কাপড় না থাকলে ছেঁড়া বা পট্টি লাগানো কাপড় পরব কিন্তু ধনীদের দ্বারে ধন্না দিব না। মরে গেলেও কারো কাছে কিছু চাইব না। ধ্যান করুন, আলেমগণ যদি আসলেই আল্লাহ তাআলার কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাহলে কি তিনি তাদেরকে ভুলে থাকবেন? [আত্ তাবলীগ, সংখ্যা-১, পৃ. ১৬৮]

আলেমগণ মানুষের কাছে হাত প্রসারিত করার কারণে তাদের নজরে হেয় হয়ে গেছেন। এজন্যই ধনীরা তাদের সন্তানকে মাদরাসায় পড়াতে চান না। অনেকে তো পরিষ্কার বলে ফেলেন, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ফকির বানাতে চাই না। [প্রাগুক্ত]

কারো করুণার পাত্র হবে না

আমার মন চায় কারো কাছ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ নিব না। বস্তুত, মানুষ যখন নিজেকে জাহির করতে চায় তখনই তাকে কারো কাছে নত হতে হয়। আর যখন নিজেকে জাহির করতে না চায়, তখন ছোট হওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না। তাই বিনা প্রয়োজনে কারো অনুগ্রহ গ্রহণ না করা উচিত। অনুগ্রহ নিলে অবশ্যই অনুগ্রহ করতে হয়। আমাদের আকাবিরগণেরও মূলনীতি এটাই ছিল। ছোট বড় কারো কাছ থেকে বিনা কারণে অনুগ্রহ নিতেন না। [হুসনুল আযীয : ৪/১৭২]

আলেমসমাজের জন্য অমুখাপেক্ষিতার প্রয়োজনীয়তা

ওহে আলেমসমাজ! খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো! দুনিয়াদারগণ দুনিয়া পেয়ে তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে। তোমরাও দীন ও ইলম নিয়ে তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করে বলছি, যদি আলেমসমাজ দুনিয়াদারদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় তাহলে

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 'গায়েব' থেকে মদদ করবেন এবং যে দুনিয়াদারগণ এখন তাদেরকে অপমানিত মনে করছে তারাই তখন তাদেরকে সম্মানিত ভাবতে শুরু করবে। তারাই আলেমদের মুখাপেক্ষী হবে। কেননা, প্রতিটি মুসলমানের মানবীয় চাহিদা অনুপাতে যে পরিমাণ পার্থিব অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন, মুসলমান হিসেবে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি দীনের প্রয়োজন। চাই সে আলেম হোক, মূর্খ হোক, ধনী হোক, গরিব হোক। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আলেমদের কাছে প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া অবশ্যই রয়েছে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারদের কাছে দীন একেবারেই নেই। তাই জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে তারা আলেমদের মুখাপেক্ষী। যদি কেউ বলে, আমার দীনের প্রয়োজন নেই, তাহলে সে মুসলমানই নয়। একটি সময় এমনও আসবে যখন দুনিয়াদারগণ আলেমদের কাছে ধন্না দিবে। সুতরাং আলেমদের উচিত হল পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষিতার 'শান' অর্জন করা এবং আল্লাহর দীন নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

আমাদের সবচেয়ে বড় ক্রটি হল আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছি না। যদি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাহলে দুনিয়ার কারোই পরোয়া থাকবে না।

কিছু কিছু আলেম এমন কাজ করে যাদের কারণে দুনিয়াদাররা সরাসরি ইলমের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ কিছু কিছু আলেম ধনীদের কাছে যাতায়াত এ পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে যে, ধনীদের কথায় তারা ওঠেবসে। তাদের কথায় হ্যাঁ, হ্যাঁ করে। এদেরকে দেখে দুনিয়াদাররা ভাবে, সকল আলেমই বুঝি এমন। [দাওয়াতে আবদিয়্যত : ৫/১৪৭]

ইলমের জন্য অমুখাপেক্ষিতা কেন অপরিহার্য

ইলমের জন্য অমুখাপেক্ষিতা অপরিহার্য হওয়ার কারণ হল ইলম হচ্ছে 'কামাল' বা পূর্ণতা। আর কামালের বৈশিষ্ট্যই হল অমুখাপেক্ষিতা। লক্ষ্য করুন, সাধারণ একজন কামার তার শিল্পে পাকা হলে কী পরিমাণ অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। ইলমের মাঝে কি সেই তুচ্ছ শিল্পের সমান প্রভাবও নেই? অবশ্যই রয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, যার মাঝে অমুখাপেক্ষিতা নেই তার 'কামাল' ও যোগ্যতার মাঝেই ক্রটি রয়েছে। যাদেরকে আপনি আলেম বলে থাকেন তারা তো দু'চারটি উর্দু-ফার্সি পুস্তিকা মুখস্থ করে বক্তৃতা করে বেড়ায়। তাদের গায়ে ইলমের কোন হাওয়াই লাগেনি। তারা নিজেদেরকে আলেমদের লেবাসে জাহির করে। [প্রাগুক্ত : ৫/১৪৯]

অমুখাপেক্ষিতা লোক দেখানোর জন্য হলেও উপকারী

ধনীদের সাথে আলেমদের অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন দীনের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা না থাকার কারণে জনসাধারণের মাঝে আলেমদের কথার না কোন প্রভাব থাকে, না তারা আলেমদের কাছ থেকে কোন উপকার হাসিল করতে পারে। কেননা, তারা আলেমদেরকে নিজেদের মুখাপেক্ষী ভাবে। এজন্য যদি কারো অন্তরে ইখলাস না থাকে, কেবল রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য হলেও অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করে; তাও উপকারহীন নয়। কেননা, রিয়ার কারণে যদিও সে উক্ত আমলটির সাওয়াব পাবে না কিন্তু এ আমলটি দীনের মর্যাদার মাধ্যম হয়েছে। দীনের মর্যাদা দানের সওয়াবটি তার আমলনামায় লেখা হবে। কেননা, বিনা নিয়তে কিংবা অসৎ নিয়তে কোন নেক কাজের মাধ্যম হওয়ার প্রতিদান রয়েছে। মূল আমলের সওয়াব না মিললেও মাধ্যম হওয়ার সওয়াব অবশ্যই মিলবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, কেউ কোন ফলের গাছ রোপণ করল। বড় হয়ে ফল ধরার পর যদি কোন প্রাণী সে গাছের ফল খায় তাহলে রোপণকারী সওয়াব পাবে। অথচ জানা কথা, গাছ লাগানোর সময় তার এ নিয়ত ছিল না যে, প্রাণীরা এখন থেকে ফল খাবে; বরং অনেকে এর বিপরীত নিয়ত করে থাকে। এ নিয়ত করে যে, কোন প্রাণী ফল খেতে এলে তাড়িয়ে দেয়া হবে, প্রহার করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু এ লোকটি বৃক্ষ রোপণ করার দ্বারা প্রাণীদের উপকার পৌছানোর মাধ্যম হয়েছে তাই এই মাধ্যম হওয়ার সওয়াব সে পাবে। এমনিভাবে লোক দেখানোর নিয়তে অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শনকারীর আমলনামায়ও দীনের মর্যাদা দানের প্রতিদান পৌছবে। কেননা, সে এ ব্যাপারে মাধ্যম হয়েছে। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত : ৩১৫]

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলেমদের শান

আলেমদের শান তো এমন হওয়া উচিত যে, তারা নিজেদের দরিদ্রতার উপর আনন্দিত ও গর্বিত হবে এবং কোন দুনিয়াদারের সামনে হাত প্রসারিত করবে না। এমনকি অভাবের কথা মুখেও আনবে না। আলেমদের তো দুনিয়া এবং দুনিয়াদারদের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করা উচিত। [আল্ ইফাজাত : ২/৮০]

জনগণের অনুগামী হয়ে থাকবে না

আলেমগণ জনসাধারণ ও মূর্খদের অনুগামী হয়ে না থাকা উচিত। এতে তাদের অন্তর থেকে দীনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আজকাল যেসব জনসাধারণের দুঃসাহস বেড়ে গেছে, তারা আলেমদেরকে তুচ্ছ মনে করে। এর জন্য আলেমরাই দায়ী। আলেমদের দুর্বল মনোভাবের কারণেই ওরা দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করে। [আল্ কাউলুল জালীল : ৮৩]

সাধারণ দাওয়াতে আলেমদের অংশগ্রহণ না করা উচিত

আল্লামা শামী [রহ.] লিখেছেন, আলেম ও ফকীহগণ কারো দাওয়াতে যাবেন না। তার কারণ হল, বর্তমানে এসব দাওয়াতে অপমান ও লাঞ্ছনা রয়েছে। বস্তুত, ফকীহগণ আসল অবস্থা অনুধাবন করেন। এমনিভাবে আলেম ও মুফতী সাহেবগণ কারো মামলার সাক্ষীও হবেন না। তার কারণ হল, সকল মুসলমানের সাথে তাদের এক ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত। আর সাক্ষ্য দিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। [আল্ ইফাজাত : ২/১১৪]

আলেমদের প্রতি জরুরি সতর্কবাণী

অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আলেমদেরকে অনেক বেশি সতর্ক ও সংযমী হওয়া উচিত। বর্তমানে এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল করা হয় না। এব্যাপারে খুবই অসতর্কতা চলছে। এর ক্ষতি খুবই প্রকট। এতে দীনের খুব অবমূল্যায়ন ও অমর্যাদা হয়। আপনি যতই ইখলাসের নিয়তে ধনীদের প্রতি মনোযোগী হোন না কেন, তারা ধারণা করবে আপনার বুঝি কোন স্বার্থ রয়েছে। পক্ষান্তরে গরিবদের প্রতি মনোযোগী হোন, একটু মিষ্টি কথা বলুন; এতে তারা গলে যাবে, আপনার জন্য নিবেদিত হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

দীনের মূল্যবোধ সংরক্ষণ করার স্বার্থে আপনি নিজের পক্ষ থেকে উপযাচক হয়ে কখনো ধনীদের সাথে সম্পর্ক গড়বেন না। হ্যাঁ, তারা উপযাচক হয়ে সম্পর্ক গড়তে এলে আপনি নিরাশ করবেন না। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী [রহ.] বলতেন, যখন কোন ধনী তোমার কাছে দীনের জন্য এলো তখন আর সে ধনী থাকেনি; বরং উত্তম ধনী হয়ে গেছে। তাই দুনিয়াদার ভেবে তার কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে না। [হুসনুল আযীয : ১/২৬২]

ধনীদের কাছে নিছক ধনী হওয়ার কারণে আলেমগণ নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ করবেন না। অবশ্য যদি তাদের সাথে অন্য কোন সম্পর্ক থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। [আল্ কাউলুল জালীল : ৮৩]

আমীর-উমারাদেরকে তোষামোদ করা এবং তাদের সাথে ওঠা-বসা করার পরিণতি

কিছু কিছু আলেম ধনী ও আমীর-উমারাদের স্বার্থে দীনধর্মের মাঝে অনেক অবকাশ বের করে থাকে। এজন্য হাদীস শরীফে ঐসব আলেমের অনেক নিন্দা করা হয়েছে যারা আমীর-উমারাদের মাঝে ডুবে থাকে। তার পরিণতি এই হয় যে, তারা সত্য ও সঠিক মাসআলা প্রকাশ করতে দ্বিধা করে। হক কথা ও সঠিক মাসআলা বললে তো পোলাউ কোর্মা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন দরবারে সুস্পষ্ট কথা বলার আশা খুবই ক্ষীণ; বরং আমীর-উমারাগণ কোন নাজায়েয বিষয়ে প্রশ্ন করলে 'তাবিল' করে জায়েয বলে দিবে। সাধারণতঃ বড়লোকের দরবারে শতরঞ্জ তথা দাবা খেলা চলে। দরবারি আলেমগণ তাবিল করে সেটি জায়েয বলে দিবে। উদাহরণত বলে ফেলবে, শাফেয়ী মাযহাবে এ খেলা জায়েয আছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী [রহ.]-এর মাযহাবে যেসব শর্তের ভিত্তিতে জায়েয বলা হয়েছে সেগুলোর নাম পর্যন্ত নিবে না। মোটকথা, আমীর-উমারাদের সাহচর্যে এই কুফল রয়েছে। এ জন্যই হাদীস শরীফে এসেছে :

اَلْعُلَمَاءُ اُمَنَاءُ الدِّيْنِ مَالَمْ يُخَالِطُوا الْاُمَرَاءَ فَاِذَا خَالَطُوا الْاُمَرَاءَ

فَهُمْ لُصُوْصُ الدِّيْنِ فَاحْذَرُوْهُمْ

আলেমগণ হলো দীনের আমানতদার যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমীর এবং ধনীদের সাথে মেলামেশা না করবে। যখন তারা আমীর এবং

www.banglakitab.weebly.com

ধনীদের সাথে মেলামেশা করবে তখন তারা হবে দীনের ডাকাত।
তখন তাদের থেকে লোকজনকে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে।

সুতরাং লক্ষ্য করুন, আমীর ও ধনীদের দরবারে যাতায়াতকারী আলেমদের কেমন দুরাবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর দরবারি আলেমগণ হক কথা না বলার কারণ হল মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে লোভ-লালসা প্রবল। তাই আমীর ও ধনীদের দরবারে হক কথা বলার পথে এ লোভই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বোঝা গেল, লোভ-লালসার কারণেই এসব খারাবী ও বিপর্যয় ঘটে।

এতে আলেমদের পার্থিব ক্ষতিও রয়েছে। আমীর ও ধনীদের অন্তরে তাদের মর্যাদা একেবারেই থাকে না। তারাও বোঝে যে, আলেমরা আমাদের খাতিরেই এভাবে ফতোয়া দিচ্ছে। বস্তুত, আমীর-উমারাগণ আলেমদেরকে একটি ছায়া হিসেবে ব্যবহার করে। নতুবা প্রকৃত স্বরূপ তারাও অনুধাবন করে। তাহলে বলুন, এই যদি হয় আলেমদের অবস্থা, তাহলে তাদের দ্বারা মানুষের সংশোধনের কী আশা করা যায়। দুনিয়াদার বিশেষ করে ধনবানরা দীন এবং আলেম সমাজকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। সুতরাং আলেম সমাজের পক্ষে কিছুতেই কাউকে তোষামোদ করা উচিত নয়। তাদের কথায় হ্যাঁ, হ্যাঁ না বলা উচিত। এতে অনেক বড় হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। [মালফুজাতে হাকীমুল উম্মত : ২/৯]

ধনীদের সাথে ওঠাবসা লাঞ্ছনা বয়ে আনে

কিছু কিছু আলেম এ উদ্দেশ্যে ধনীদের সাথে ওঠাবসা করে যে, মানুষের মাঝে তাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অথচ সাধারণ মুসলমানগণ তাদেরকে আলেমসমাজের জন্য কলঙ্ক মনে করেন। বাস্তবেই আলেমদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা হল দীনের খেদমত করা, ধনীদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা এবং গরিবদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। আলেম সমাজ ধনীদের দরবারে যাতায়াত করলে তাদের দৃষ্টিতেও অপমানিত হবে। তারা মনে করবে, আলেমগণ তোষামোদ করার জন্য আমাদের সাথে মিলিত হয়। এতে ধনী-গরিব উভয়ের উপরই মন্দ প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ দীনের তাহকীক এবং মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে আস্থা চলে যায়। তখন আলেমদের ওয়াজ-নসিহত ও ফতোয়ার উপর আস্থা থাকবে না। জনগণ মনে করবে, আলেম সাহেব হয়ত বা দুনিয়াদারদের বা আমীর-উমারাদেরকে খুশি করার জন্য এমনটি বলছে বা করছে।

কোন কোন আলেম ধনীদের কাছ থেকে উপঢৌকন পাওয়ার আশায় তাদের কাছে যাতায়াত করে। ফলে কখনো তাদের স্বার্থ রক্ষা করে মাসআলা বলে

www.banglakitab.weebly.com

তাদেরকে খুশি করে। কিন্তু মনে রাখবেন, এ ধরনের আলেমরা অল্প দিনের মধ্যেই তাদের চোখ থেকে পড়ে যায়। অবশেষে এ আলেমদের উপর ধারণা করে তারা গোটা আলেমসমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। বাকিদেরকেও তাদের মতোই তোষামোদকারী মনে করে। [তাজদীদে তালীম ও তাবলীগ : ৪৯, ৫২]

ধনীদেরকে তোষামোদ করার ব্যাপারে এক মৌলভী সাহেবকে উপদেশ

জনৈক ধনী ব্যক্তি কলকাতা থেকে দেওবন্দ এসেছেন। দেওবন্দ থেকে এক মৌলভী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে থানাভবন হাজির হয়েছেন। মৌলভী সাহেব সে ব্যক্তির অগোচরে হযরত থানবী [রহ.]-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, আমার সাথে যিনি এসেছেন তিনি ধন-সম্পদের দিক থেকে খুব বড় মানুষ। কলকাতার মুসলমানদের মাঝে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। হযরতের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ করতে চান। যদি হযরতের অনুমতি হয় এবং কোন সময় নির্ধারণ করে দেন তাহলে আমি তাকে জানিয়ে দিব। হযরত বললেন, তার সাথে যখন কথাবার্তা হবে তখন তাকে অবশ্যই পরামর্শ দেয়া হবে। কিন্তু তার পূর্বে আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই। আপনি তার সাথে আসার কী প্রয়োজন ছিল? তিনি কলকাতা থেকে একা দেওবন্দ আসতে পারলেন, সেখান থেকে একা থানাভবন আসতে অসুবিধা কী ছিল? আমি আলেমদের জন্য এমনটি পছন্দ করি না। দুনিয়াদারগণ বিশেষভাবে সম্পদশালীগণ আলেম এবং দীনদারগণকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। এজন্য আলেমদের জন্য কিছুতেই তাদের তোষামোদ করা উচিত নয়। আপনি তার সাথে আসার কারণে আমাকে তাকেও কিছু ছাড় দিতে হবে। আপনি তার সাথে না এলে সময় ও প্রেক্ষাপটের উপযোগী ও কল্যাণকর আচরণই তার সাথে করা হত। ভবিষ্যতে এসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। আমি আপনাকে যে পরামর্শ দিচ্ছি তাতে বড় কল্যাণ ও হেকমত নিহিত রয়েছে। তিনি বললেন, সেটি আমি বুঝেছি। ইনশাআল্লাহ আগামীতে এমনটি হবে না। মেহেরবানি করে আমার নির্বুদ্ধিতা ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। হযরত বললেন, আল্লাহর মেহেরবানিতে আপনি তো স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোক নন; বরং চিন্তাভাবনা না করার কারণে এমনটি হয়েছে। যদি কোন কাজ করার পূর্বে তাতে চিন্তাভাবনা করা হয় তাহলে ভুলত্রুটি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হলেও বিরল। আর চিন্তাভাবনা না করলে অধিকহারে ভুলত্রুটি প্রকাশ পায়। [আল্ ইজাফাত : ২/৮]

www.banglakitab.weebly.com

আমীর-উমারাদের সাথে ওঠাবসা করার দ্বারা দীনের ক্ষেত্রে অবহেলার মানসিকতা সৃষ্টি হয়

আলেমগণ যতই ধনী ও নেতৃবর্গের সান্নিধ্য গ্রহণ করবেন ততই তাদের মাঝে দীনের ব্যাপারে অবহেলা সৃষ্টি হবে। এক পর্যায়ে তার প্রভাব অন্তর ছাড়িয়ে মুখে এসে যাবে। অর্থাৎ প্রথমে অন্তরে অন্তরে হকের মূল্যবোধ এবং বাতিলের প্রতি ঘৃণা হ্রাস পায়। তারপর এক পর্যায়ে মুখেও সত্য প্রকাশের হিম্মত কমে যায় এবং বাতিলের প্রচার সহজ ও মামুলি বিষয় মনে হতে থাকে। এতে আমীর-উমরাদেরও দুঃসাহস বেড়ে যায়। তখন তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও চাহিদা মতো ফতোয়া চাইতে থাকে। [তাজদীদে তালীম ও তাবলীগ : ৫২]

এ পর্যায়ে আসার পর তাদের কলব বিকৃত হয়ে পড়ে এবং সত্য অনুধাবনের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। তারপর এদের সংশোধনের কোন আশাই করা যায় না। তখন তারা উম্মতে মুহাম্মদির জন্য ইবলিসের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। এসব আলেমের উপস্থিতিতে শয়তান অবসরে গমন করলেও অসম্ভবের কিছু নেই। আমি নিজ চোখে এমন দুনিয়াঅন্বেষণী আলেম দেখেছি, যিনি এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি সুরত বের করে আপন শাশুড়ীকে বিবাহ করার ফতোয়া লিখে দিয়েছেন। হাদীস শরীফে এহেন 'মসখে কলব' বা অন্তর বিকৃতির কথাই বলা হয়েছে। এসব বিপর্যয় তখনই দেখা দেয় যখন ধনী ও আমীর-উমারাদের থেকে কিছু বাগানোর উদ্দেশ্যে তাদের নিকট যাতায়াত করা হবে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ সব আলেম যারা আমীর-উমারাদের দরবারে যাতায়াত করে। [তাজদীদে তালীম : ৫৩]

ধনীদের সাথে সম্পর্ক রাখার পদ্ধতি ও শর্ত

যদি ধনী কিংবা নেতৃস্থানীয় লোকেরা আগ্রহী হয়ে হাজির হয় অথবা কোন প্রয়োজনে নিজে আলেমদেরকে দাওয়াত করে তাহলে এ চুক্তি সাপেক্ষে যাওয়া যেত পারে যে, আমরা স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তাই বলব এবং কোন প্রকার হাদিয়া গ্রহণ করব না। তাহলে এ ধরনের সম্পর্ক দীনের হেফাযতের স্বার্থেই হবে। কেননা, আলেমগণ যদি এভাবেও তাদের সাথে না মিশেন তাহলে তাদের কাছে দীন পৌঁছবে কী করে। তবে মনে রাখতে হবে, এ ধরনের মেলামেশা ফরযে আইন নয় যে, সকলের উপর আবশ্যক; বরং এটা ফরযে কেফায়া বলে গণ্য হবে এবং এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য এমন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি

www.banglakitab.weebly.com

সুদৃঢ় অন্তর ও মানসিকভাবে ধনাঢ্যতার অধিকারী হবেন। অন্যথায় দুর্বলমনাদের জন্য ধনীদের সাহচর্য থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকাই নিরাপদ হবে। তাবলীগ ও দীনি দাওয়াতের জন্য অন্যরা কিংবা বই-পুস্তকই যথেষ্ট হবে। [তাজদীদে তালীম : ৫৪]

যদি আমীর-উমারাদের কাছে যাতায়াতের দ্বারা তাদের 'ইসলাহ' ও সংশোধন হয় এবং তাদেরকে দীনি মাসাইল বলার সুযোগ হয় বিশেষভাবে যখন তারা উপস্থিত হওয়ার আকাঙ্খা রাখেন, কিন্তু সময় সুযোগের অভাবে আসতে পারেন না, তাহলে তাদের কাছে যাতায়াত ক্ষতিকর হবে না এবং তা অপমানকরও হবে না। তবে পূর্বাপর অবস্থা থেকে জানা থাকতে হবে যে, সেখানে গিয়ে স্বাধীনভাবে হক কথা প্রকাশ করা যাবে কিনা। আর এ অবস্থায় যদি তিনি কোন 'খেদমত' করেন তাহলে তা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

তবে আমার পরামর্শ হল কিছুতেই হাদিয়া গ্রহণ না করা; বরং যাওয়ার পূর্বে কড়া শর্ত করে যাওয়া যে, কিছু দেয়ানেয়া চলবে না। এমতাবস্থায় ধনীরা আলেমদেরকে নিজেদের অনুগামী বানানোর কোন সাহাসও করবে না। উল্টো তারাই অনুগামী হতে বাধ্য হবে। আর যদি ধনীরা নিজেরাই আসে তাহলে সময় ও সাক্ষাৎ দিতে কোন অসুবিধা নেই; বরং তা সরাসরি কাম্য। এমতাবস্থায় খুব আখলাক ও সদাচারের সাথে কথা বলা। তবে অমুখাপেক্ষিতার ভাব অবশ্যই বহাল রাখতে হবে। [তাজদীদে তালীম : ৫০]

ধনীদের সাথে সম্পর্ক রাখা নিষেধ নয়; বরং তোষামোদ করা নিষেধ

আমি ধনীদের সাথে সম্পর্ক রাখতে বারণ করি না; বরং তাদেরকে তোষামোদ করতে বারণ করি। এ কাজ থেকে আলেমদেরকে বিশেষভাবে বিরত থাকতে হবে। যাতে দীন এবং দীনদারদের প্রতি অবজ্ঞা না হয়। [ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ : ২/৪১৬]

আমীর ও প্রশাসনিক লোকদের সাথে সাক্ষাতের সময় তাদের আদব রক্ষা করা আবশ্যক

আমি ব্যক্তিগতভাবে তো ধনী ও প্রশাসনিক লোকদের সাথে সম্পর্ক ও সখ্যতা বৃদ্ধি করার বিরোধী। বিশেষভাবে আলেমদের জন্য। এটা তাদের শানের খেলাফ। তাদের শান তো হল নিরিবিলি ও নির্জনতা অবলম্বন করা। কিন্তু যদি কোন কারণে সাক্ষাৎ করতে হয় তাহলে আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করেই করতে হবে। তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং বাহুল্যভাষণকে নফসের দুষ্টুমি

www.banglakitab.weebly.com

হিসেবে গণ্য করি। কারো সাথে অসদাচরণ কোন কাজে আসে না; বরং এতে নফসের অংশই বেশি থাকে। নফস মনে করে, আমরা এমন পদস্থ ব্যক্তিদের সামনেও বিনীত হই না। মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে হাকেম ও প্রশাসক বানিয়েছেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে নত না হলে অস্বাভাবিকভাবে নত হতে হবে। [হুসনুল আযীয : ৪/১৯১]

অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বৈধ নয়

আমীর-উমারাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তাদেরকে তুচ্ছ এবং নিজেকে পবিত্র মনে করবে না; বরং তাদেরকে দুনিয়া ও মূর্খতার ফাঁদে আক্রান্ত মনে করে তাদের প্রতি সদয় হবে এবং তাদের পরিশুদ্ধির জন্য দোয়া করবে। আর নিজেদেরকে দীনের দিক থেকে দুর্বল রোগী মনে করে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। যেমনিভাবে দুর্বলচিত্তের লোকদেরকে সংক্রামক ব্যধিগ্রস্তদের থেকে দূরে রাখা হয়। এতে সংক্রামক ব্যধিগ্রস্থের প্রতি রাগ করা হয় না; বরং তার প্রতি সদয় আচরণ করা হয়।

কেউ কেউ দুনিয়াদারদেরকে ভর্ৎসনা করে। এমনকি সাক্ষাতের জন্য আসতেও বারণ করে থাকে। যদিও এটা অহংকারীদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা জাগাতিক চিকিৎসা, শরয়ী চিকিৎসা নয়। এ ধরনের আচরণ সম্পূর্ণভাবে শরীয়তপরিপন্থী। কেউ কেউ এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ধনীদের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে চায়। যাতে মানুষ তাকে বড্ড বুযুর্গ মনে করে। আসলে এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে রিয়াকার বলা উচিত। আর কেউ কেউ তো বাস্ত বেই নিজেকে পবিত্র এবং অন্যদেরকে পাপী জ্ঞান করে। তাই তাদেরকে ঘৃণা করে। এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে অহংকারী বলা যথার্থ হবে। [হুসনুল আযীয : ২/৪৩]

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছাত্রদেরকে অমুখাপেক্ষিতার শিক্ষা প্রদান করো

হযরত বলেন, আজ এক ভদ্রলোক এসে বললেন, ছাত্রদের কোন প্রয়োজন থাকলে আমাকে অবগত করবেন। হযরত তার জবাবে বলেন, ছাত্রদের প্রয়োজন আল্লাহর মেহেরবানি ও দয়ায় পূরণ হয়েই যায়। অন্যত্র হযরত বলেন, তালিবে ইলমদের প্রয়োজন তাদের সামনে প্রকাশ করা হলে আমি লজ্জিতবোধ করি। কারো কাছে তালিবে ইলমদের প্রয়োজন তুলে ধরার সময় মনে এ কথা আসে যে, তারা যেন বাদশার মতো থাকতে পারে। তাদের মধ্যে অমুখাপেক্ষিতার শান পয়দা হোক। অন্যরাও যেন তাদের অমুখাপেক্ষিতা থেকে সবক গ্রহণ করতে পারে। [হুসনুল আযীয : ২/২১২]

তালিবে ইলমদেরকে আপমান ও দুর্নাম থেকে রক্ষা করা চাই

আমি কানপুর থাকাবস্থায় সে মাদরাসার সকল ছাত্রকে এক জায়গায় দাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমি নিজ কানে কিছু কিছু লোককে বলতে শুনেছি, আল্লাহ মঙ্গল করুন, মৌলভীর দল কার বাড়িতে জানি হামলা করতে যাচ্ছে। হযরত বলেন, সেদিন থেকেই ছাত্রদেরকে কারো বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। [হুসনুল আযীয : ২/৪৩]

তালিবে ইলমদেরকে দাওয়াত খেতে কারো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া অনুচিত

যেসব জায়গায় মাদরাসার ছাত্রদেরকে মানুষ হেয় জ্ঞান করে সেখানে কারো বাড়িতে খাবার আনতে যাওয়া বা খেতে যাওয়া দৃষ্টিকটু। এতে আলেমদের অপমান হয়। সেই সাথে এতে একটি চারিত্রিক স্খলনও ঘটে। তাহল অন্যের বাড়িতে খাবার আনতে যাওয়ার দ্বারা অন্যের কাছে কিছু চাওয়ার দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়। এ ইতস্ততবোধ লজ্জার একটি বড় অংশ। যা মানুষকে অপমানকর চাওয়া থেকে বারণ করে। কারো মাঝে এটা না থাকলে সে সুযোগ পেলেই নির্দ্বিধায় মানুষের সামনে হাত পেতে বসবে। যেন জীবনের তরে তার একটি সহজাত গুণ নষ্ট হয়ে গেল। অনুরূপভাবে ছাত্রদেরকে দাওয়াতেও না পাঠানো উচিত। কেউ খাওয়াতে চাইলে মাদরাসায় এনে খাওয়াবে। এতে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তাদের মধ্যে অমুখাপেক্ষিতা, সৎসাহস ও লজ্জাবোধ সৃষ্টি হবে। জনগণের উপর এর ভালো প্রভাব পড়বে।

www.banglakitab.weebly.com

পূর্বযুগের বুযুর্গরা ছাত্রদের জন্য এ বিষয়টির অনুমতি দিতেন। কেননা, তখন দুনিয়াদারগণ আলেমদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করত না; বরং তারা তাদের ঘরে মাদরাসার ছাত্রদের আগমনকে বরকতের বিষয় মনে করত। বর্তমানে জনগণের অবস্থা ও চিন্তাধারা পাল্টে গেছে। এজন্য এ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। আর শরীয়তের মূলনীতি হল, যে বস্তুর মধ্যে উপকার এবং অপকার উভয়টা থাকে তা পরিহার করা আবশ্যক হয়ে যায়। অবশ্য যদি কোথাও অপমানিত হওয়ার অবস্থা না থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। [হুকুকুল ইলম : ৮৯]

অনুরূপভাবে ছাত্রদেরকে চাঁদা কালেকশন করার জন্য পাঠানো অনুচিত। এতেও সে প্রভাব পড়বে, যা দাওয়াত খেতে গেলে বা খাবার আনতে গেলে পড়ে।

ছাত্রদেরকে দাওয়াতে প্রেরণের ক্ষেত্রে হযরত থানভী [রহ.]-এর আমল

তালিবে ইলমদেরকে আমি কারো বাড়িতে যেতে দেই না। কেউ যদি খাবার মাদরাসায় পৌছে দেয়ার শর্তে দাওয়াত করে তাহলে গ্রহণ করা হয়। অন্যথায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাওয়াত খাওয়ার মাঝে তালিবে ইলমদের অপমান হয়। যদি কেউ সম্মানের সাথে মাদরাসায় খাবার দিয়ে যায় তাহলে তা ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। আজকালের মানুষ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই কেবল ছাত্রদেরকে আহার করাতে আগ্রহী হয়। অন্যথায় তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে না। তার কারণ হল জনগণ ছাত্রদেরকে বেকার ও সমাজের বোঝা মনে করে। আমাদের ছাত্ররা গরিব হতে পারে কিন্তু অবহেলিত নয়। এ কারণেই আমি আমার মাদরাসায় নিয়ম করে রেখেছি যে, ছাত্ররা কারো বাড়িতে খাবারের জন্য যাবে না। কেউ খাওয়াতে চাইলে পাঠিয়ে দিবে। আইন করে নিষেধ করার কারণ হল, জনগণ তালিবে ইলমদেরকে তুচ্ছ ও হেয় মনে করে। এ বিষয়টিই খুব আফসোস লাগে যে, ছাত্রদের কী অপরাধ! তারা তো হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরী। বলুন, এই কী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা! আসলে আমাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মূল্যবোধ নেই। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা নেই, তাই তাঁর নায়েব ও উত্তরসূরীদেরও মর্যাদা নেই। জনগণ তো তালিবে ইলমদেরকে তুচ্ছ মনে করে অথচ আমরা তাদেরকে বাদশা মনে করি। বলুন তো, তালিবে ইলমদের অপরাধ কী? তারা তো সেই কাজ করছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ অঞ্জাম দেয়ার প্রতিদান কি এসব অবজ্ঞা! আল্লাহর কসম করে বলি, আমার 'গায়রত' ও আত্মর্যাদায় বিষয়টি খুবই আঘাত হানে।

www.banglakitab.weebly.com

আমার সবচেয়ে বেশি আফসোস হয় কিছু আলেমদের প্রতি। তারা নিজ হাতে নিজেদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করছে। মিরাঠে একবার খুবই অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে। জনৈক জমিদার ছাত্রদেরকে দাওয়াত করল। ক'জন ছাত্র যাবে তাও নির্ধারণ করে দিল। কিন্তু নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি ছাত্র হাজির হল। লোকটির সম্পদে প্রাচুর্যতা থাকলেও মনে প্রাচুর্যতা ছিল না। মন ছিল সীমাহীন সংকীর্ণ। এখানেও সংকীর্ণ মনেরই পরিচয় দিল। নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি ছাত্র দেখে সে সকলকে ফিরিয়ে দিল। আচ্ছা ভালোই করল। ছাত্ররা নিজেদের কৃতকর্মের সাজা পেল। ছাত্রদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার কারণে মহল্লাবাসী লোকটিকে ভর্ৎসনা করতে লাগল যে, এটা তুমি কী কাজ করলে? জনগণের বকাঝকা খেয়ে ছাত্রদেরকে সে আবার ডেকে পাঠালো। নির্লজ্জতার বিভৎস চিত্র লক্ষ্য করুন! ছাত্ররা পুনরায় চলে এলো। পানিতে ডুবে মরা উচিত। বেইজ্জতের সাথে পোলাও বিরিয়ানী খাওয়ার চেয়ে ইজ্জতের সাথে শুকনো রুটি খাওয়া অনেক গুণ উত্তম। [হুসনুল আযীয : ১/৩৭৫]

যারা ছাত্রদেরকে কিছু দিতে চান আমি তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনারা ছাত্রদেরকে কিছু দিতে হলে সম্মানের সঙ্গে দিবেন। তারা আপনাদের মেহমান। ধরুন, আপনার কোন মেহমান যদি মসজিদে এসে অবস্থান করে এবং খাওয়ার সময় ঘরে যেতে সম্মত না হয় তাহলে আপনি কী করবেন? তাকে কি বলবেন যে, আমার বাড়ি গিয়ে খাবার নিয়ে আসুন, নাকি আপনি নিজে বাড়ি থেকে খাবার এনে খাওয়াবেন? তাহলে বলুন তো ছাত্ররাও তো মেহমান। তাদের সাথে এমন আচরণ করা হয় না কেন? [দাওয়াতে আবদিয়্যত : ৭/৬১]

যথাযথ সম্মানপূর্বক দাওয়াত দেয়া হলে যেতে অসুবিধা নেই

কানপুর মাদরাসায় ছাত্রদেরকে দাওয়াতের জন্য কারো বাড়িতে যেতে নিষেধ করার পর লোকজন আমাদেরকে খুব অহংকারী বলতে শুরু করল। আমি বলি, অহংকারী মনে করলে কিছু করার নেই। জনগণ যেহেতু তালিবে ইলমদেরকে তুচ্ছ মনে করে তাই বাধ্য হয়ে আমাদের এমনটি করতেই হয়েছে। তবে কেউ যদি যথাযথ সম্মান দেখায় তাহলে সেখানে যেতে কোন সমস্যা নেই। [দাওয়াত ও তাবলীগ : ৩৭০]

www.banglakitab.weebly.com

ছাত্রদেরকে দাওয়াতের জন্য নিজ আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেও না পাঠানো উচিত

এক ব্যক্তি আবেদন করল, হযরত! আজ আমার বাড়িতে ছাত্রদের দাওয়াত। তাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন। হযরত বললেন, ছাত্ররা কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাবে না। তোমার খাওয়াতে মনে চাইলে এখানে নিয়ে এসো। আমি ছাত্রদেরকে কোথাও যেতে দিই না। একবার আমার ভাইয়ের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল। তিনি ছাত্রদেরকে বাড়িতে যেয়ে খেতে বলেছিলেন। আমি অনুমতি দিইনি। অথচ ভাই সাহেব খুবই সতর্ক ও বুঝমান ছিলেন। ছাত্রদেরকে সম্মান করেই খাওয়াতেন। তারপরও আমি ভাই সাহেবকে বললাম, আজ আপনার ঘরে গেলে কাল অন্যরাও দাবি জানাবেন। তিনি কিছুক্ষণ পর বললেন, ঠিক আছে, আমি এখানে খাবার নিয়ে আসছি। হযরত অন্য একজনের মাধ্যমে তাকে বোঝালেন যে, আপনি তো এখন বাধ্য হয়ে সম্মত হচ্ছেন। অন্যথায় আপনার বাসনা এটাই যে, ছাত্ররা আপনার বাড়িতে গিয়েই খেয়ে আসুক। আর যে দাওয়াতে বাধ্য-বাধকতা থাকে তাও কবুল করা হয় না। এখন থাক। রমযানের পর যদি আপনি এভাবে খাওয়াতে সম্মত হন তাহলে কবুল করা হবে।

তালিবে ইলমদেরকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে। এ কারণে আমি তাদেরকে কারো বাড়িতে যেতে দিই না। কিন্তু কী বলব, তারা আল্লাহর পথে লেগে আছে এটাই কি তাদের অপরাধ!! وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا [কালিমাতুল হক : ৪০]

প্রথম দিকে এখানকার লোকজন বলেছিল, আমরা ছাত্রদের খাবার দিব। আমি বলেছি, যেভাবে মেহমানদের কাছে শিন্নি পাঠিয়ে থাক সেভাবে পাঠালে কবুল করা হবে। যেহেতু আবেদন তাদের পক্ষ থেকে হয়েছিল তাই আমাদের শর্ত আরোপ করার অধিকার ছিল। যদি আবেদন আমাদের পক্ষ থেকে হত তাহলে তাদের শর্ত দেয়ার অধিকার থাকত। [প্রাগুক্ত : ৪৫]

হযরত ইমাম মালেক [রহ.]-এর অমুখাপেক্ষিতা

বাদশা হারুন রশিদ একবার ইমাম মালেক [রহ.]-এর কাছে রাজমহলে এসে শাহজাদাদেরকে হাদীস পড়িয়ে যাওয়ার আবেদন করলেন। তিনি জবাবে বললেন, আপনার খান্দান থেকেই ইলমেদীনের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে আর কিনা আপনিই তার অমর্যাদা করতে চান? হারুন রশিদ বললেন, ঠিক আছে, শাহজাদারা আপনার কাছে গিয়েই পড়বে তবে তাদেরকে সাধারণ ছাত্রদের থেকে আলাদা করে পড়াবেন। হারুন রশিদ ভেবেছিলেন শাহজাদারা পৃথকভাবে

www.banglakitab.weebly.com

পড়লে তার প্রভাব ও মর্যাদা বহাল থাকবে। তাই শাহজাদাদের সাথে কাউকে না বসানোর অনুরোধ জানালেন। ইমাম মালেক [রহ.] বললেন, এটাও সম্ভব নয়। অগত্যা শাহজাদারা ইমাম সাহেবের নিকট হাজির হয়ে সাধারণ ছাত্রদের সাথে বসেই হাদীসের দরস গ্রহণ করেছেন। সে সময়ের বাদশাও এমন বিনয়ী ছিলেন যে, একজন আলেমের জবাবকে মেনে নিয়েছেন। বর্তমান সময়ের আলেমদেরও উচিত নিজেদেরকে অপমানিত না করা। নিজেদের মর্যাদা নিজেরাই অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। আবার অনেক বেশি দূরু দুরুও করবে না। এতে দুনিয়াদাররা একেবারে 'মাহরুম' হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেউ দীনি উপকার লাভ করার মানসে আলেমদেরকে যথাযথ সম্মানের সাথে আহ্বান করলে যাওয়াই উচিত। [দাওয়াতে আবদিয়ত : ১১/৬৭]

হযরত সুলাইম চিশতী [রহ.]-এর অমুখাপেক্ষিতা

হযরত সুলাইম চিশতী [রহ.]-এর ঘটনা। তিনি একবার পা ছড়িয়ে বসেছিলেন; এমতাবস্থায় সে সময়কার বাদশা তার উজিরদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন; বাদশাকে দেখে তাঁর মাঝে কোন ভাবান্তর নেই। আগের মতই বসে রইলেন। একটু নড়াচড়া করেও বসলেন না। উজিরের কাছে তার এভাবে বসাটি পছন্দ হল না। তাই বলল, হযরত! এভাবে পা ছড়িয়ে বসা কখন থেকে শিখেছেন? বললেন, যখন থেকে হাত ছড়ানো ভুলেছি। উজির বলল, বাদশা তো হলেন কুরআনে বর্ণিত أُولِى الأَمْرِ বা দায়িত্বশীলদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তার সম্মান করা উচিত। বললেন, বাদশা তোমাদের জন্য 'উলিল আমর' গণ্য হবেন কিন্তু তিনি আমার গোলামের গোলাম। উজির বলল, এটা কিভাবে? বললেন, খাহেশাতে নফস বা প্রবৃত্তি আমার গোলাম। আর বাদশা হলেন প্রবৃত্তির গোলাম। সুতরাং তিনি আমার গোলামের গোলাম। [দাওয়াতে আবদিয়্যত : ১০/৮৩]

মাওলানা ইসমাঈল শহীদ [রহ.]-এর ঘটনা

মাওলানা ইসমাঈল শহীদ [রহ.] একবার লাক্ষ্ণৌ গমন করলেন। সেখানে এক শাহজাদা এসে মাটি চুম্বন করে সালাম করল। তিনি তার সালামের জবাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করলেন। বলুন তো, হযরত এমনটি কেন করলেন ? বর্তমানে তো সাধারণ কোন জমিদারপুত্র মুরীদ হলেও পীর সাহেব তার তোষামোদে মজে যান। আসলে সেসব মনীষীদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মহব্বত ও মর্যাদা ছিল না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত : ১০/৮৩]

www.banglakitab.weebly.com

এক বুযুর্গের অমুখাপেক্ষিতা

এক বুযুর্গের নিকট কোন বাদশা গেলেন। খাদেমরা দরজায় পাহারা ছিল। বাদশা ভেতরে প্রবেশরে অনুমতি চাইলেন। খাদেম অনুমতি দিল না। বলল, শায়খকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। সেখান থেকে অনুমতি হলে আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দিব। বাদশা তো কখনো এ ধরনের বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হননি। তাই বিষয়টি তার খুবই অপছন্দ হল এবং শায়খকে লক্ষ্য করে বললেন :

در بیش را دربان نباشد

দরবেশের দরজায় প্রহরী থাকা উচিত নয়।

বাদশার কথা শুনে তার দম্ভ-অহংকারের জবাবে শায়খ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন :

بباید تا سگ دنیا نیاید

প্রহরী থাকা উচিত, যাতে দুনিয়ার কুকুররা না আসতে পারে।

বস্তুত, এ অমুখাপেক্ষিতা ও পরোয়াহীনতার কারণ হল দুনিয়ার লোভ-লালসা বিসর্জন দেয়া। অন্তরে লোভ-লালসা না থাকলে ইচ্ছামতো হক কথা বলা যায়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত : ১০/৮৩]

হযরত কাসেম নানুতবী [রহ.]-এর অমুখাপেক্ষিতা

একবার তিনি রামপুর গেলে সেখানকার নবাব সাহেব জানতে পেরে হযরতকে দাওয়াত করলেন। হযরত গেলেন না। কৌশল হিসেবে বলে দিলেন, আমরা গ্রাম্য লোক। রাজ দরবারের নিয়ম-নীতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আমরা অনবগত। জানা নেই সেখানে গেলে আবার কোন বেআদবি হয়ে যায়। নবাব সাহেব জবাব দিলেন, আপনি সকল আদব ও শিষ্টাচারের উর্ধ্বে। আপনি তাশরিফ আনুন। আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। হযরত জবাব দিলেন, আশ্চর্যের কথা! সাক্ষাতের আগ্রহ আপনার, আর আসব আমি!

উল্লেখ্য, এমন অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও একবার রেওড়ের ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানাননি। কেননা, তার সাথে সাক্ষাৎ করার মাঝে দীনি কল্যাণ নিহিত ছিল। [হুসনুল আযীয : ৪/১৭৩]

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.]-এর অমুখাপেক্ষিতা

একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.]-এর কাছে কেউ (তৎকালীন) দু'শ টাকা মূল্যের একটি 'কটি' পাঠাল। তিনি সেটি রেখে দিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

একদিন জনৈক নবাব সাহেব হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি সেটি তাকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা আমার কাজে আসবে না; বরং আপনার কাজে আসবে।

মাওলানা গাঙ্গুহী [রহ.] এভাবে চলতেন না যে, নবাব বা ধনীদের সামনে মাথা নত করতে হবে; বরং এমন আচরণ করতেন যে, উল্টো তারাই মাথা নীচু করতে বাধ্য হত। কখনো তিনি এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন যে, দেখে কোন নবাব বা গভর্নর মনে হত। ধনীদের হাজার টাকার হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। আবার গরিবদের কাছ থেকে এক দু'টাকাও সাদরে গ্রহণ করতেন।

একবার এক বাদশা সম্ভবত দশ হাজার টাকা উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। হযরত এ বলে তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন যে, প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মতো পয়সা আমার কাছে বিদ্যমান আছে। আমি এত পয়সা দিয়ে কি করব?

একদিকে ধনীদের সাথে তাঁর এহেন আচরণ ছিল, কিন্তু গরিবদের থেকে এক দু'টাকাও গ্রহণ করতেন। [আত্ তাবলীগ : ১৫/১০৯]

হাকীমুল উম্মত থানভী [রহ.]-এর অমুখাপেক্ষিতা

জনৈক ধনী ব্যক্তি মাদরাসার জন্য দু'শ টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠাল এবং তাতে লেখা ছিল আমার ইচ্ছা হল আমি আপনাকে এখানে দাওয়াত দিব। মানিঅর্ডারের কুপনে এ কথাটি লেখা না থাকলে আমি সে টাকা গ্রহণ করতাম। তাকে লিখলাম, যেহেতু টাকা পাঠানোর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য হল এতে প্রভাবিত হয়ে আপনার আবেদন কবুল করব তাই টাকাগুলো গ্রহণ না করে ডাকঘরে রেখে দিলাম। পরবর্তীতে এ চিঠির উত্তরে যদি উপরোক্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায় তাহলে নিয়ে নিব। অন্যথায় ফেরত পাঠিয়ে দিব। অবশেষে তার চিঠি এলো। তিনি লিখেছেন, আমার বেআদবি হয়ে গেছে। আমি আপনার কাছে দাওয়াতের আবেদন করছি না।

হযরত বলেন, কারো দয়ার নীচে থেকে মাদরাসার জন্য অনুদান গ্রহণ করতে আমার মন সায় দেয় না। [আত্ তাবলীগ : ১৫/১১০]

একবার আমার কিছু ভূষির প্রয়োজন হল। আমার ভাইয়ের নিকট ভূষি ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি জমিদার ছিলেন। অনেক চাকর-বাকর তার বাড়িতে কাজ করত। আমি তার কাছ থেকে সামান্য ভূষিও গ্রহণ করিনি। কেউ এর হেতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলেছি, এটি শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ। তার কায়-কারবার

www.banglakitab.weebly.com

চাকর-বাকরদের হাতে সম্পাদিত হয়। আমার কারণে দু'টি ক্ষতি হবে : প্রথমত, তাদের জন্য খেয়ানত ও আত্মসাৎ করার সুযোগ মিলে যাবে। দ্বিতীয়ত, তিনি তাদের কাছ থেকে সম্পদের হিসাব নিতে ব্যর্থ হবেন। কেননা, তারা এটাকে একটি ভালো সুযোগ হিসেবে ধরে বলবে, অনেক জিনিসপত্র আপনার ভাইয়ের বাড়িতে চলে যায়। [মাযীদুল মাজীদ : ৭১]

আমার ভাই একবার আমাকে বলল, আমি আপনার দেখদমতের জন্য কিছু বরাদ্দ দিতে চাই। আমি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বললাম, এতে কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে। প্রথমতঃ সব সময় আমাকে তারিখ গুণতে হবে এবং মনে মনে কল্পনা জাগবে যে, আজ আসবে, কাল আসবে। দ্বিতীয়ত, আপনি আমার জন্য মাসিক কোন ভাতা নির্ধারণ করলেন। কিন্তু কখনো এমন পরিস্থিতিও আসতে পারে যে, সে অংশটুকুও আপনার প্রয়োজন পড়বে। যেমন ধরুন, কোন জায়গা খরিদ করতে হল। তখন এক সাথে অনেকগুলো অর্থ সংগ্রহ করার চাপ পড়বে। এমতাবস্থায় আমার জন্য বরাদ্দকৃত অংশটুকু দিতে মনে চাপ সৃষ্টি হবে। মনে জাগবে, এ মুহূর্তে এ পয়সাগুলো ওখানে না গেলে কাজটি সহজে সম্পন্ন হত। ভাই বলল, আপনি তো অন্যের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করে থাকেন। আমি বললাম, অবশ্যই গ্রহণ করি। কিন্তু তা নির্ধারিত থাকে না। আমারও অপেক্ষা করতে হয় না এবং তার উপরও চাপ সৃষ্টি হয় না। চাইলে আপনিও সেভাবে দিতে পারেন। অবশ্যই আমি তা গ্রহণ করব। তারপর থেকে সে কালেভদ্রে বিশ/ত্রিশ/পঞ্চাশ রুপি প্রদান করত এবং আমি তা গ্রহণ করে নিতাম। [মাযীদুল মাজীদ : ৭১]

[হযরত থানভী রহ.-এর এক ভাই ছিলেন মিয়া মাজহার। তার একটি সওয়ারী ছিল। হযরত বলেন :] কখনো কখনো আমি মিয়া মাজহারের সওয়ারী ব্যবহার করতাম। কিন্তু আমি তার ভাড়া দিয়ে দিতাম। মিয়া মাজহার ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানাত। আমি বললতাম, না ভাই ভাড়া নেয়া চাই। অন্যথায় আমার এবং তোমার উভয়েরই ক্ষতি রয়েছে। আমার ক্ষতি হল, প্রয়োজনের সময় চাইতে সঙ্কোচ লাগবে। আর তোমার ক্ষতি হল, যদি ঐ সময় সেটি তোমারও প্রয়োজন থাকে তাহলে অন্য আরেকটি সওয়ারী ভাড়া নিতে হবে। নিজের সওয়ারী থাকতে ভাড়া দেয়া মনে চাপ হবে। আর যদি ভাড়া পেয়ে যাও তাহলে চাপ হবে না। [প্রাগুক্ত]

www.banglakitab.weebly.com

নবম অধ্যায়

প্রসঙ্গ : আলেমসমাজের সংরক্ষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলেমসমাজ এবং তালিবুল ইলমগণ রাজনীতিতে কেন আসেন না

আজ এ মর্মে চিন্তাভাবনা চলছে যে, আলেমদেরকে রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। শুনে রেখো, ময়দানে আসার পরিণতি এই হবে যে, কামরাও হাত ছাড়া হবে আর ময়দানও হাতে আসবে না। যারা আলেমদেরকে মাঠে নামাতে চান তাদের কাছে ময়দানে নামার কোন শর্ত কিংবা সীমারেখা নেই। তাদের মুখে এও শোনা যায় যে, এখন মাসআলা বলার সময় নয়; বরং কাজের সময়। সুতরাং কাজ করা চাই। [আল্ ইফাজাত : ১/১৩]

খুবই পরিতাপের বিষয় হল, কেউ কেউ তো আরো অগ্রস হয়ে ইলমের পথে সাধনাকে অনর্থক বলে বক্তব্য দেয়। জানি না, তারা এ সবক কোথা থেকে গ্রহণ করেছে। ইউরোপেও তো এহেন প্রথা নেই। সেখানেও তো এ ধরনের আন্দোলন ও রাজনীতি রয়েছে। কিন্তু যারা ইলমের সাধনায় লেগে আছে তাদেরকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় না। তাই বলি, হুঁশের সাথে কাজ করতে হবে। এমনিই তো আবেগ দ্বারা কোন কাজ হয় না। যদি হয়ও তার স্থায়িত্ব খুবই সামান্য সময় হয়ে থাকে। [আল ইফাজাত-১/৯৯]

যদি সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে উন্নতি করা সম্ভব হয় তাহলে এমন উন্নতি হবে যেমনটি ফেরাউন করেছিল। এমন উন্নতি দিয়ে একজন মুসলমানের কী হবে? এটাকে মুসলমানদের জন্য উন্নতি বলা বেমানান। এটাকে কাফেরদের উন্নতি বলা যেতে পারে। এমন উন্নতির মাঝে মুসলমানদের জন্য কোন গৌরব নেই। মুসলমানদের গৌরব তো এমন উন্নতির মাঝে নিহিত রয়েছে যেখানে সীমারেখা ও মূলনীতি রক্ষা করা হয়। [মালফুজাতে হাকীমুল উম্মত-২/১৫]

কেউ কেউ বলে থাকে, এখন কামরায় বসে থাকার সময় নয়; বরং ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার সময়। কিন্তু আমি বলি, উসূল ও নীতিমালা পরিপন্থী পদ্ধতিতে কাজ করলে কামরাও যাবে, ময়দানও যাবে। না এদিক হবে, না সেদিক হবে। শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন করে যদি সফলতা এসেও যায়, তাহলে এটাই একজন মুসলিমের জন্য বড় ব্যর্থতা। [মালফুজাতে হাকীমুল উম্মত-২/১৪]

www.banglakitab.weebly.com

আমি রাজনীতির বিরোধী নই

আমি আলেমদের রাজনীতির মাঠে অবতীর্ণ হওয়ার একেবারে বিরোধী নই; বরং আমার কথা হল, সবার জন্য ময়দানে আসা জায়েয নেই। ভালোভাবে ইলম অর্জন করারপর কারো ময়দানে আসার আগ্রহ থাকলে আসবে। কিন্তু কিছু লোক মাদরাসা ও খানকায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা উচিত। দীনি কিতাবের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া যাদের কোন ব্যস্ততা থাকবে না। কেননা, অভিজ্ঞতা বলে, অধ্যাবসায় ছাড়া কিতাব বোঝা ও ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা পরিপূর্ণ হয় না। এখন যেসব আলেম রাজনীতিতে নেমেছেন তাদের অধিকাংশেরই কিতাবী যোগ্যতা শূন্যের কোঠায়। আর যদি কারো মাঝে সে যোগ্যতা থেকে থাকে তাহলে তা কামরায় নির্জনবাসের বরকতেই অর্জিত হয়েছে। তারা একটা দীর্ঘ সময় কামরায় সাধনা করেই যোগ্যতা অর্জন করেছেন অথচ তারাই এখন সেই কামরাকেই বন্ধ করতে তৎপর। যার পরিণতি এই হবে যে, কিছু দিনের মধ্যেই কুরআন হাদীস ও ফিকহ অনুধাবনকারীগণ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবেন।

পৃথিবীতে যদি আলেম-উলামার উপস্থিতি কামনা করেন তাহলে সকল আলেমকে ময়দানে নামানোর চিন্তা পরিহার করুন। কিছু আলেম ময়দানে তৎপরতা চালাবেন, কিছু মুনাজারা করবেন আর কিছু দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করবেন। [আততাবলীগ-২/১৭]

একটি জামাত তো এমন হবে যারা সব কিছু হতে পৃথক হয়ে কুরআন-হাদীস, ফিকহ ও আবশ্যকীয় দীনি তালীম প্রদান করবেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া তাদের আর কিছু না করা উচিত। এর ব্যতিক্রম হলে কিছুতেই যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম তৈরি হবে না। সুতরাং খেদমতের মাঝে সুষম বণ্টন খুবই জরুরি। সকল বুদ্ধিজীবি এবং সভ্য ও উন্নত জাতি কর্মবণ্টনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এরপরও কেন কতিপয় বন্ধু আমাদের সকলকে একটিমাত্র কাজে নিরত হতে বাধ্য করতে চান। সুতরাং আলেমগণ কাজ করেন না বলে অভিযোগ তোলা অবান্তর। আলহামদুল্লিাহ! আলেমগণ তাদের মূল দায়িত্ব ঠিকই পালন করছেন। আপনারা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যাবেন না। [আত তাবলীগ-১২/১৭১]

আলেমদের কাজ

আমি বলি, আলেমগণ তাদের দায়িত্ব তথা কুরআন-হাদীসের মর্ম উদ্ধার করা, শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করা ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপেই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এর বেশি কিছু তাদের দায়িত্ব নয়। এখন বলুন, আলেমগণ এসব কাজ থেকে কখনো পিছু হটেছেন? [আত্ তাবলীগ-১৫/২৫০]

www.banglakitab.weebly.com

সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মর্ম

কেউ কেউ আলেমদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে কাজ করার পরামর্শ বিতরণ করে থাকেন। কেননা, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে শক্তি সৃষ্টি হয়। আমি বলি, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মর্মই বুঝেননি। সকলে কাজ করার মর্ম এই নয় যে, সকলে এক কাজেই লেগে থাকবে; বরং কাজ বণ্টন করে নিবে। যেমন একটি গৃহের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে হলে কর্মপদ্ধতি কী হবে? রাজমিস্ত্রী ইট গাঁথবে, কাঠমিস্ত্রী করাত ও হাতুড়ি দিয়ে কাঠের কাজ করবে আর শ্রমিকগণ তাদের সাহায্য করবে। এটাই হল গৃহ নির্মাণের পদ্ধতি। আমি জিজ্ঞাসা করি, সকলে মিলেই যদি ইট গাঁথতে লেগে যায়, কিংবা কাঠের কাজে লেগে যায় কিংবা সকলে মাটি খননে লেগে যায়, তাহলে কি গৃহ নির্মাণ সম্ভব হবে? নির্দ্বিধায় বলবেন, হবে না। অনুরূপভাবে দীনি ব্যাপারেও কর্মবণ্টন হওয়া উচিত। আলেমগণ তাদের কাজ করবেন এবং রাজনীতিবিদগণ তাদের কাজ করবেন। এভাবে উভয়ের কাজ এক হয়ে যাবে। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মর্ম হল রাজনীতিবিদগণ মাঠে-ময়দানে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করবেন আর আলেমসমাজ শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচার-প্রসারের কাজ করবেন। এভাবে প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন। [আত্ তাবলীগ-১৫/২৪২]

কর্মবণ্টন

প্রত্যেক জাতির জন্য কর্মবণ্টন জরুরি। এ ছাড়া কাজ চলবে না। সভ্য সমাজ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত। তাই তো যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনী, অফিসার, কেরানী, চিকিৎসক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক যায়। সকলে মিলে যুদ্ধের কাজ আঞ্জাম দেয়। সব জায়গায় কর্মবণ্টন জরুরি মনে করা হয়। শুধু আলেমদের ক্ষেত্রেই তা জরুরি মনে করা হয় না। আলেমদের স্কন্ধে দেশের সকল কাজ চাপিয়ে দেয়া হয়। তারা কুরআন-হাদীস ও ফিকহের ইলম অর্জন করবেন, মানুষকে শেখাবেন, ফতুয়া দিবেন, ওয়াজ করবেন, মাদরাসায় দরস দিবেন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং রাজনীতিবিদদের সাথে ঝাণ্ডা নিয়ে ময়দানেও শরিক হবেন। সব কাজ আলেমদের। অন্যদের ছুট্টি। তাদের কোন কাজ নেই।

রাজনীতিকদের ব্যাপারে আমাদের অভিযোগ নেই যে, তারা জাতীয় রাজনীতির দায়িত্ব কেন নিয়েছেন; বরং আমাদের অভিযোগ হল তারা কেন ঐ কাজে দখল দিতে শুরু করেছেন যেটি আলেমদের ছিল। সেটি হল শরীয়তের বিধি-বিধানের

www.banglakitab.weebly.com

সমাধান দেয়া। এটা এখন রাজনীতিকগণই করে ফেলেন। অথচ তাদের উচিত ছিল জাতীয় উন্নতিকল্পে যে কোন সিদ্ধান্ত নিবেন তার শরয়ী সমাধান আলেমদের থেকে জেনে নিবেন। আলেমগণ ফতুয়া দেয়ার পর তা বাস্তবায়ন করবেন। রাজনীতিকগণ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করবেন আর আলেমগণ শরীয়তের বিধান বলে দিবেন। এমনটি হবে না যে, আলেমগণও রাজনীতিকদের সাথে ময়দানে নেমে যাবেন। তাহলে শরীয়ত নিয়ে গবেষণা করবেন কারা এবং ভবিষ্যতে গবেষক তৈরি হবে কিভাবে?

এজন্য কর্মবন্টন খুবই আবশ্যকীয় বিষয়। জাতীয় উন্নতির পথে নানা উপায় নিয়ে ভাববেন রাজনীতিকগণ। ভাবার পর নিজেদের মতামত অনুযায়ী বৈধাবৈধের সিদ্ধান্ত দিবেন না; বরং আলেমদের কাছে জেনে নিবেন। কেবল অনুবাদ পড়েই মাসআলা বলা যায় না। আলেমদের কাছ থেকে জেনে নিতে হয়। [আত্ তাবলীগ-১/১৪]

রাজনীতি এবং আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ

আমার মতে তালিবুল ইলমদের জন্য কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনুমতি না হওয়া উচিত। ভবিষ্যতের জন্য এতে মারাত্মক ক্ষতি রয়েছে। যা এখন অনুভূত হচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন একটি দল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে নিরত না থাকলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার কর্মী কোত্থেকে পয়দা হবে? যারা পড়ালেখা থেকে অবসর হয়েছো তোমরা যা ইচ্ছা তা-ই হও বা যা করতে মনে চায় তা-ই কর। কিন্তু ছাত্রদেরকে তাদের কাজে লিপ্ত থাকতে দাও। যাতে ভবিষ্যতে দীনের আহকাম বলার মতো লোকের ধারা বহাল থাকে। তোমরা কি মনে করো ভবিষ্যতে দীনের প্রয়োজন থাকবে না। যেমন কিনা কেউ কেউ এখনই বলছেন, এটা মাসআলা বর্ণনার সময় নয়, কাজ করার সময়। তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আপনারা যে এখন নেতা হয়ে আন্দোলন করছেন তাতো পড়ালেখার বদৌলতেই হয়েছেন। আর এখন বনে যাওয়ার পর পড়ালেখার মূলোৎপাটন করছেন। [আল ইফাজাত-১/১৩]

রাজনৈতিক সংগঠনের সভা-সমিতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের অনুমতি কিছুতেই দেয়া উচিত নয়। এতে সাংঘাতিক বিপদ রয়েছে। বলুন তো, এ কাজের জন্য কি তালেবুল ইলমরাই রয়েছে। অন্যান্য মুসলমানগণ কোন্ কাজের জন্য। তাদেরকে এ কাজে ব্যবহার করুন। [আল ইফাজাত-১/৯৯]

আলেমগণ কেন রাজনীতিতে আসেন না

যদি তোমরা কামনা কর যে, আলেমগণ আরেকটু অগ্রসর হয়ে মাঠের রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুক এবং তোমাদের রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলেও শরিক হোক, তাহলে মনে রেখো, সেটা তাদের কাজ নয় এবং এ ব্যাপারে তোমরা তাদেরকে বাধ্য করার অধিকার রাখ না। তোমরা আলেমদেরকে কী মনে করো? তাঁরা যেসব কাজ করেন তার গুরুত্ব কতটুকু জানো? ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কোন এলাকায় যদি কেবল একজন আলেম থাকেন, আর জেহাদ শুরু হয়ে যায়, তখন সে আলেমের পক্ষে জেহাদে শরিক হওয়া জায়েয নয়। কেননা, উলামায়ে কেরাম সকলে শহীদ হলে দীনের যিম্মদারী কে পালন করবে? এজন্য আমাদের হাজী (ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী) সাহেব আলেমদেরকে হিজরত করতে বারণ করতেন। বলতেন, যদি তোমরা হিন্দুস্তান ছেড়ে চলে যাও তাহলে এখানে দীনের কী অবস্থা হবে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এটা লক্ষ্য করেন না যে, স্বয়ং ফুকাহায়ে কেরাম আলেমদেরকে রাজনীতিতে আসতে নিষেধ করেছেন। আসলে তাদের কাজই হল অপবাদ ও অভিযোগ দেয়া। মুসলমানদের উপর যে কোন বিপদ আসে সর্বপ্রথম সে ব্যাপারে আলেমদেরকে অপবাদ দেয়া হয়। সব কিছুর দায়ভার তাঁদের উপর চাপিয়ে সকলে দায়মুক্ত হয়ে যায়। [আত্ তাবলীগ-১৫/২৪১]

আলেমদের যেটা দায়িত্ব তাঁরা সেটাই পালন করবেন। এর বাইরে কিছু আশা করা উচিত নয়। আলেমদের থেকে অন্যসব কাজের আশা করার উপমা এমন, কোন ব্যক্তি হাকীম মাহমুদ খানের কাছে গিয়ে ছেঁড়া জুতা সেলাই করার নিয়ম জানতে চাওয়া যেমন। তিনি সাফ বলে দিবেন, রাস্তার কিনারে মুচি বসে আছে, তাকে জিজ্ঞাসা কর। এটা আমার কাজ নয়, মুচির কাজ। হুবহু একই অবস্থা এখানে। আলেমদের কাছে মাসআলা-মাসাইল জিজ্ঞাসা করো। দুনিয়া অর্জনের ফন্দিসমূহ তারা কী জানেন? [মালফুজাতে হাকীমুল উম্মত-২/১৫]

'সিয়াসাত' ও প্রশাসনের দু'টি ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ হল 'আহকামে শরীয়াহ'। এটি নিঃসন্দেহে শরীয়তের অংশ। কোন আলেম এ সম্পর্কে অনবগত নন। ফিকহের কিতাবসমূহে 'কিতাবুস্ সিয়ার' নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। মাদরাসাসমূহে নিয়মিত যার পঠন-পাঠন অব্যাহত রয়েছে।

আর দ্বিতীয় ভাগটি হল, তার অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশলী ব্যবস্থাপনা। যা প্রতি যুগেই পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এটি শরীয়তের অংশ নয়। আর আলেমগণও এ ব্যাপারে

www.banglakitab.weebly.com

পারদর্শী হওয়া আবশ্যক নয়। তাঁদের পারদর্শিতার অন্যান্য ক্ষেত্র রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা পারদর্শিতা অর্জন করবেন।

উপরে যে বলা হল, রাজনীতি বা প্রশাসনের দ্বিতীয় ভাগটি শরীয়তের অংশ নয়, এর অর্থ এই নয় যে, এটি শরীয়তের উর্ধ্বে এবং প্রশাসনিক লোকদেরকে শরীয়ত মেনে চলতে হবে না বা শরীয়তের আলেমদের শরণাপন্ন হতে হবে না। দুনিয়াতে এমন কোন কাজ ও মতামত এমন নেই যার বৈধ অবৈধতার বিধান শরীয়ত থেকে জানার প্রয়োজন নেই। সেটা সরাসরি শরীয়ত না হওয়া শরীয়তের অনুগামী না হওয়াকে আবশ্যক করে না।

আলেমগণ রাজনীতিতে না যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের প্রমাণ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ الخ

কুরআন কারীমের এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন নবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা নবীর কাছে এ আবেদন করেনি যে, আপনি আমাদের বাদশা হয়ে যান। এটা না করে তারা অন্য কাউকে বাদশা নিযুক্ত করে দেয়ার আবেদন করল। নবীকে যদি যথেষ্ট মনে করত তাহলে বাদশার আবেদন কেন করল। যদি বলা হয় যে, নবীকে যথেষ্ট মনে না করে বনী ইসরাঈল ভুল করেছে, তাহলে বলব, নবী তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে কেন বললেন না যে, আমিই তো যথেষ্ট। অধিকন্তু তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নবী একজনকে বাদশা নিযুক্ত করার ব্যবস্থা শুরু করে দিলেন। আর যদি কেউ দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে বলে ওঠে যে, এটা নবীর পক্ষে ভুল হয়ে গেছে, তাহলে বলব, আল্লাহ তাআলা কেন নবীর এ ভুলের উপর সতর্ক করলেন না; বরং আল্লাহর কাছে আবেদন জানানো হলে তিনি তা কোনরূপ অস্বীকৃতি ছাড়াই কবুল করে নিলেন। এ থেকে পরিস্কার বুঝে আসে যে, প্রত্যেক নবীর জন্যও প্রশাসনিক কাজে পারদর্শী হওয়া অপরিহার্য নয়। সুতরাং যেখানে নবীর জন্য আবশ্যক নয়, সেখানে আলেমদের ব্যাপারে আর কী বলব।

বরং মুফাসসিরগণের বর্ণনার আলোকে জানা যায় যে, বনি ইসরাঈলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বেশিরভাগ সুন্নত ও রীতি এমনই ছিল যে, সেখানকার প্রশাসনিক ব্যাপারগুলো বাদশাগণ পরিচালনা করতেন। আর বাদশাগণ নবীদের পরামর্শ ও নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তাফসীরে মাজহারীতে ابعث لنا ملكا -এর ব্যাখ্যায় এমনটিই লেখা রয়েছে। [আল্ বাদায়ে-২৫]

আলেমদের পৃথক রাজনীতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা

যদি কখনো রাজনৈতিক এমন দলের অস্তিত্ব না থাকে যারা আলেমদের কাছ থেকে শরয়ী আহকাম জেনে আমল করে, যেমন নাকি বর্তমানে এমন দলের ছড়াছড়ি, তখন আলেমগণ এমন দল সৃষ্টি হওয়ার অপেক্ষা করবে না; বরং নিজেদের মধ্য হতে এমন দল গঠন করবে, যারা রাজনীতি ও শরীয়তের সমন্বিত হবে। অন্যথায় দুনিয়ার সেবাদাসগণ দীনি উদ্দেশ্যগুলোকে ধ্বংস করে দিবে। তবে মনে রাখবেন, এ বিধান কেবল সামাজিক রাজনীতির সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনোপকরণের মধ্যে যত ফরযে কেফায়া রয়েছে যেমন ব্যবসা, চাষাবাদ, চিকিৎসা সবগুলোর ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য।

অবশ্য যে জিনিসের ক্ষতির দিকটা দীনের মাঝে নিকটবর্তী। অর্থাৎ যেখানে দীনি প্রতিনিধি না থাকার কারণে মানুষের দীনি ক্ষতি অত্যাসন্ন সেখানে ইসলাহ ও সংশোধনের নিয়তে অনুপ্রবেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যাবতীয় বিপর্যয়ের সংশোধনের জন্য দল গঠন করার পূর্বশর্ত হল সামর্থ্য। এটি একটি সার্বিক গবেষণা। [ইফাদাতে আশরাফিয়া দর মাসায়েলে সিয়াসিয়া-৯১]

আলেমদের রাজনৈতিক দলের রূপরেখা

উপরের আলোচনায় কিছু কিছু অবস্থায় আলেমদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে তাতে বর্তমানকালের কতিপয় আলেমের উদ্ভাবিত পন্থাকে বোঝানো হয়নি। তাদের এ পন্থায় দীনের কোন ফায়দা নেই; বরং শরীয়তের নীতিমালা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তার একটি পদ্ধতি রয়েছে, যা উপকারী হওয়ার প্রবল আশা রয়েছে। সে পদ্ধতিটি এক প্রিয় ছাত্রের লেখায় দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উপকারী মনে হওয়ায় এখানে তা হুবহু তুলে ধরছি।

"বর্তমানে একটি পদ্ধতি উপকারী হতে পারে। তা এই যে, রাজনৈতিক দল ভিন্ন থাকবে এবং ধর্মীয় দল ভিন্ন থাকবে। ধর্মীয় দলটি তাদের মূল কাজ তথা তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলটিরও তত্ত্বাবধান করবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলটি যেন সরকারের কাছে মুসলমানদের অধিকার দাবি করার ক্ষেত্রে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ না করে। তাদেরকে উপকারী পরামর্শ প্রদান করবে। আর যেহেতু বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলের লোকেরা ধর্মীয় ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করে কাজ করতে অভ্যস্ত নয়, তাই এজন্য আলেমদের দায়িত্ব ছিল তাদের কাছে গিয়ে উত্তম পন্থায় তাবলীগ করা। যদি আলেমগণ নিজেদের মূল দায়িত্ব তথা তাবলীগ চালু রাখতেন তাহলে তাদের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি বহুগুণ বেড়ে যেত। সেই সাথে তাবলীগের সওয়াবও বৃদ্ধি পেত।

www.banglakitab.weebly.com

বর্তমানকালের প্রচলিত পদ্ধতিতে আলেমগণ নেতা হিসেবে রাজনৈতিক দলে যোগদান করা আমার দৃষ্টিতে মারাত্মক ক্ষতিকর মনে হচ্ছে। এটা না করে যদি যদি তারা তাবলীগ করে করে নেতৃবৃন্দকে সংশোধন করতেন এবং তাদেরকে উপকারী পরামর্শ প্রদান করতেন তাহলে শরয়ীপন্থায় মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের পথ উন্মুক্ত হত। সেই সাথে আলেমদের মর্যাদা ও ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পেত। [আল বাদায়ে-২৮]

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আলেমসমাজ

হয়ত কেউ বলবেন, আলেমগণ নিজেরা রাজনীতিতে জড়িত হয়ে কাজ করেন না এবং অন্যদেরকেও কাজ করার সুযোগ দেন না; বরং তাদের সমালোচনা করেন। এ সংশয়ের নিরসনকল্পে আমি মিরাঠের একটি জলসায় আলোচনা করেছিলাম যে, আমরা স্বীকার করি রাজনৈতিক বিষয়াদিতে এ লাল টুপিওয়ালারা আমাদের ইমাম। আর ইমামের ভুল হলে মুক্তাদীদের জন্য লোকমা দেয়া আবশ্যক হয়ে যায়। অন্যথায় সকলের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং ইমামের উচিত হল নামাযের পূর্বেই আমাদের কাছে এসে কুরআন শুদ্ধ করে নেয়া। অন্যথায় ভুল করলে আমরা নামাযেই লোকমা দিয়ে বসব। ভুলের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করব। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, আপনারা যদি বলকানের চাঁদা সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মুসলমানগণ কুরবানী না দিয়ে সে পয়সা দিয়ে উক্ত চাঁদা পরিশোধ করবে তাহলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব। অথবা যদি আপনারা ফরমান জারি করেন যে, যাকাতের টাকা কাউকে মালিক না বানিয়েই আমাদের কাছে প্রেরণ করুন তাহলে আমরা তার বিরোধিতা করব। আপনাদের উচিত হল আমাদের সাথে মিলে কাজ করা। আর মিলে কাজ করার অর্থ এই নয় যে, একটি কাজই সকলে মিলে করব; বরং সকলে মিলে কাজ করার অর্থ হল, দেশের স্বার্থে একজন একেকটি জরুরি কাজ আঞ্জাম দিবে। যেমন ঘর নির্মাণের সময় কাঠমিস্ত্রী, কামার এবং রাজমিস্ত্রী সকলে মিলে কাজ করে। তারা সকলে একই কাজ করে না; বরং একজন কাঠের কাজ করে, আরেকজন লোহার কাজ করে, আরেকজন করে ইটের কাজ। এভাবে একটি ঘর সম্মিলিত চেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে নির্মিত হয়।

অনুরূপভাবে এখানেও মিলে কাজ করার অর্থ এই নয় যে, আলেমগণও ঝান্ডা হাতে নিয়ে ময়দানে লম্ফঝম্প করবেন; বরং পদ্ধতি এই হবে যে, ঝাণ্ডা লাল টুপিওয়ালারাই হাতে নিবে। কিন্তু যে কোন কাজ করলে কিংবা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চাইলে তা প্রকাশ করার পূর্বেই আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিবে যে,

www.banglakitab.weebly.com

এটি শরীয়তের পরিপন্থী কি-না। এখন সম্ভবত আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, আমরা নেতৃবৃন্দকে কাজ করতে বারণ করি কি-না। তবে এককভাবে কোন কাজ করতে অবশ্যই বারণ করি। যদি তারা আমাদের কাছে কুরআন-হাদীস জিজ্ঞাসা করে 'ইমামতি' করে তাহলে আমরা তাদের 'মুক্তাদী' হতে প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু কুরআন ভুল পড়ে ইমামতি করলে নিঃসন্দেহে আমরা নিজেরাও তাদের পিছনে নামায পড়ব না এবং অন্যদেরকেও পড়তে নিষেধ করব; বরং তাদের নামায নষ্ট হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে দিব।

আমি কসম করে বলি, আলেমগণ যেসব কাজ করেন তা তোমরা করতে পারবে না। অর্থাৎ শরীয়তের বিধিবিধান গবেষণা করার কাজ তোমাদের দ্বারা হবে না। আর তোমরা যে কাজ কর তা আলেমগণও করতে সক্ষম। এমনকি তোমাদের চেয়ে ভালোভাবে করতে সক্ষম। যেসব আলেম ঝাণ্ডা নিয়ে ময়দানে নেমেছেন তারা তোমাদের চেয়ে কোন দিকে কম নন; বরং তোমাদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। যদিও দু'একজন ছাড়া অধিকাংশই এভাবে নিজেদের ইলমী যোগ্যতা খুইয়ে দিয়েছে। [আত্ তাবলীগ, আসবাবুল ফিতনা-৫/১৬৭]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলেমদের ব্যাপারে নানা অভিযোগের জবাব

আলেমগণ সাধারণতঃ লোভী এবং সংকীর্ণমনা হয়ে থাকেন

জনৈক আলেম জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত বর্তমানে আলেমদের মাঝে লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর কারণ কী? বললেন, সকলের কথা তো বলনি; বরং অধিকাংশের কথা বলেছ। তার বিশেষ একটি কারণ হল, মাদরাসায় সাধারণতঃ ঐ সমস্ত লোকই পড়েতে আসে যারা পূর্ব থেকেই দরিদ্র এবং লোভী থাকে। পড়ালেখার পরও তাদের পূর্বের অভ্যাসই বহাল থাকে। স্বভাব থেকে এটি যায় না। যদি উঁচু বংশের লোক, ধনী ও নবাবরা তাদের সন্তানকে মাদরাসায় পড়াত এবং তারা দীনের দাওয়াত দিত তাহলে দেখা যেত কী প্রভাব পড়ে।

আমি যখন ঢাকা গিয়েছিলাম তখন সেখানকার এক মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল আমাকে তার মাদরাসায় দাওয়াত করলেন। তখন তিনি আমার কাছে এই সংশয়টিই তুলে ধরেছিলেন যে, অধিকাংশ আলেমদের মাঝে এ ব্যাধি রয়েছে। আমি বললাম, তার মূল কারণ হল ছাত্র নির্বাচনের ত্রুটি। সাধারণতঃ গরিব ও অসচ্ছল পরিবারের সন্তানরাই মাদরাসায় পড়ে। তাদের মন-মানসিকতা তেমনই

www.banglakitab.weebly.com

হবে। যদি ধনীদের সন্তানরা ইলমেদীন অর্জন করত তাহলে তাদের মন-মানসিকতা তেমনই হত। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, হযরত! আজ আমার ঈমানের হেফাজত হয়েছে। অন্যাথায় আমার ঈমান আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল। আমি মনে করছিলাম এটি ইলমেদীনের প্রভাব কি-না। আমি বললাম, আপনি তওবা করুন। ইলমেদীন কি আদতেই এমন বস্তু?

আমি বললাম, ধনীদের সন্তানগুলো ইংরেজীর প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যথায় তারা যদি ইংরেজী না পড়ত তাহলে তাদের স্বভাব-চরিত্র এ অবস্থার তুলনায় আরো উন্নত হত। আর গরিবদের সন্তানরা ইলমেদীন শিখার কারণে কিছুটা সভ্য হয়েছে। যদি মাদরাসায় না পড়ত তাহলে তাদের স্বভাব-চরিত্র বর্তমান অবস্থার চেয়ে আরো বেশি মন্দ হত।

আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, গরিবদের সন্তানাদি যেমন খারাপ হওয়ার কথা ছিল আরবী পড়ার কারণে তেমন খারাপ হয়নি। আর ধনীদের সন্তানাদি যেমন ভালো হওয়ার কথা ছিল ইংরেজীর কারণে তেমন ভালো থাকেনি। আর এটা ছাত্র নির্বাচনের ভুল। অভিজ্ঞতায় অহরহ দেখা যাচ্ছে, কোন ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি নির্বোধ মেধাহীন ও বিশ্রী হয়ে থাকে তাকে এনে মাদরাসায় ভর্তি করে দেয়। আর বুদ্ধিমান মেধাবী ও সুদর্শন সন্তানকে ইংরেজী পড়ার জন্য স্কুলে ভর্তি করে দেয়। এ কথাবার্তার পর প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলতে লাগলেন, বাস্তবিকই আপনি সত্য বলেছেন। আমি মাদরাসার ছাত্র রেজিস্টার তদন্ত করে দেখলাম প্রায় আড়াইশত ছাত্র রয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই হল গ্রামের এবং অসচ্ছল পরিবারের। আমি বললাম, এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন যে, এমন লোকদের মাঝে উঁচু মানসিকতা ও নির্মোহতা কিভাবে সৃষ্টি হবে? [আল্ ইফাজাত-২/৪৪৪]

কতিপয় আলেমের সংকীর্ণ মানসিকতা এবং মন্দ স্বভাবসম্পন্ন হওয়ার কারণ

উন্নত মানসিকতা, সচ্চরিত্র ইত্যাদি যত ভালো গুণ রয়েছে তা উঁচু বংশের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ উঁচু বংশের লোকদের মাঝে এ ধরনের ভালো স্বভাব বিদ্যমান থাকে। চাই তারা মাদরাসায় পড়ুক বা স্কুলে পড়ুক। আর যাদের বংশ উঁচু নয় তাদের মধ্যে এসব ভালোগুণ অনুপস্থিত থাকে। যদিও তারা ইংরেজী পড়ায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করুক না কেন; বরং বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেছে যে, নিচু বংশের লোকেরা মাদরাসায় দীন শিক্ষা করার

www.banglakitab.weebly.com

দ্বারা তাদের চরিত্র কমেবেশি বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর যদি তারা মাদরাসায় না পড়ে কেবল স্কুলে পড়ত তাহলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যেত।

মাদরাসা শিক্ষা এবং স্কুল শিক্ষার যে প্রভাব রয়েছে তার পরিপূর্ণ তুলনা তখনই সম্ভব যখন একই পরিবারের সমস্বভাবের দু'জন ছেলের মধ্যে একজনকে মাদরাসায় এবং অপরজনকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হবে। দশ বছর পর উভয়কে তুলনা করে দেখুন কার চরিত্র কেমন হয়। আর যদি সূচনাতেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈষম্যপূর্ণ আচরণ হয় অর্থাৎ মাদরাসার জন্য নিম্নশ্রেণীর এবং স্কুলের জন্য উঁচুমানের, তাহলে দীনি শিক্ষা তার মাঝে কতটুকু প্রভাব ফেলবে এবং তার নিচুতা কতটুকু ঘুচাবে। যদি উঁচু বংশের কাউকে মাদরাসায় দেয়াও হয় তাহলে এমন একটিকে বেছে দিবে যার মেধা নিতান্তই কম। তাই তো বলি, দীনি শিক্ষার জন্য যদি কেবল নিম্নশ্রেণী ও মেধাহীনদেরকেই বাছাই করা হয়, তাহলে তাদের থেকে উন্নত মানসিকতার আশা কিভাবে করা যায়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/৫৩]

(হযরত বলেন,) অযোগ্যরা ইলম শেখার কারণে সমাজে এসব বিপর্যয় হচ্ছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ হল লোভী। আর কখনো তা এ কারণে হয় যে, ধনী ও উঁচু বংশের লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে দীনি ইলম শিক্ষা দেয়া ছেড়ে দিয়েছে। গরিবরাই ইলমেদীন শিখছে। তারা কোত্থেকে উন্নতমনা হবে। সুতরাং এটাকে নির্বাচনের ত্রুটিই বরতে হবে। [আল্ ইফাজাত-২/৮০]

অপর দিকে আমরা নানাভাবে দীনের অমর্যাদা করে রেখেছি। মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন কম নির্ধারণ করা হয়। মৃত ব্যক্তিদের ঈসালে সওয়াবের খাবার থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের জন্য কাফনের অতিরিক্ত কাপড়, মুর্দারের গায়ের পুরনো কাপড় ও জায়নামায ইত্যাদি বরাদ্দ করে রাখা হয়। চার দিনা, দশ দিনা ও চল্লিশা ইত্যাদি খাবারই তাদের ভাগ্য মনে করা হয়। আর এ জন্যই তাদের নিয়ত ও চিন্তাধারা বিকৃত হয়ে যায়। লোভ-লালসা সৃষ্টি হয়। সে কারো ভালো অবস্থাতে এতটুকু খুশি হয় না যতটুকু খুশি হয় কেউ মৃত্যুবরণ করলে। এটা তাদের একার দোষ নয়। সমাজের লোকদেরও দোষ রয়েছে। তারা তাদেরকে এমন সংকীর্ণ করে রাখার কারণেই তাদের মানসিকতা বিকৃত হয়ে গেছে। [আত্ তাবলীগ, -১০/৭০]

ইলমেদীন শেখার জন্য প্রখর মেধার প্রয়োজন

বর্তমানে ছাত্র নির্বাচনে ভুল মাপকাঠির অনুসরণ করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি নির্বোধ ও মেধাহীন ছেলেটিকে মাদরাসায় পড়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

—১৮

www.banglakitab.weebly.com

অথচ দুনিয়া কামানোর জন্য অনেক উঁচুমাপের মেধার প্রয়োজন নেই। দুনিয়ার কাজ তো হল আটাপেষার চাক্কি ঘোরানোর মত। যার সামান্যতম জানাশোনা আছে সেও এ কাজ ভালোভাবেই সম্পাদন করতে পারে। এ কাজে তেমন বেশি মেধার প্রয়োজন হয় না।

পক্ষান্তরে ইলমের জন্য অনেক মেধা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। তাই তো এর জন্য নবীদেরকে বাছাই করা হয়েছিল। এবার চিন্তা করুন, এ ইলমের জন্য কেমন হৃদয় নির্বাচিত হয়েছিল? আপনাদের জানা আছে নবী-রাসূল কেমন হয়ে থাকেন। পার্থিব জ্ঞান-বুদ্ধিতেও তাঁদের সমপরিমাণ কেউ হতে পারেনি। নবীগণকে সর্বদিকের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাহলে যে কাজ নবীদের প্রতিনিধিত্ব বলে বিবেচিত তার জন্যও তো তেমন পরিপূর্ণ বিবেক ও মেধার প্রয়োজন। এখন বলুন, সন্তান নির্বাচন কোন নীতির আলোকে হওয়া উচিত ছিল। অথচ আজ ভুল নীতিতে চলার কারণে মানুষ মনে করে মাদরাসায় পড়ার পর ছেলেটি আয় উপার্জনের যোগ্য হবে না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত, জরুরাতুল উলামা-১১/৮৯]

সন্তান নির্বাচনে বর্তমানকালের চিন্তাধারা

আজকাল প্রথমতঃ ধনী ও উচ্চ বংশীয়রা নিজেদের সন্তানকে মাদরাসায় পড়ান না। আর দু'চারজন যারাই পড়ান তাদের সন্তান নির্বাচনের মাপকাঠি ভুল। সন্তানদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বোকা ও মেধাহীন তাকেই মাদরাসায় দেয়া হয়। আর বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছেলেদেরকে স্কুল-কলেজে দেয়া হয়। বন্ধু-বান্ধবদের কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার সন্তানেরা কী পড়াশোনা করে, তখন সর্বপ্রথম স্কুল-কলেজে পড়ুয়াদের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, ও বি.এ পড়ে, ও ইন্টারমিডিয়েট পড়ে। সকলের শেষে বলে আর ও পড়ে মাদরাসায়। তাও এভাবে বলে যে, ও একটু মোল্লা টাইপের ও মেধাহীন, তাই ওকে মাদরাসায় দিয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ! আপনি দীনের খুব সম্মান দিলেন। বলুন তো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের কি এই মর্যাদা! আল্লাহর কালামের এই মূল্য! আল্লাহ এবং রাসূলের ইলম কি এমন নির্বোধরা অনুধাবন করতে পারবে, যাদেরকে আপনারা বাছাই করছেন? এ বৈষম্যপূর্ণ নির্বাচনের অশুভ ফলেই আজ আলেমদের মধ্যে ঐ জিনিস পাওয়া যায় না, যা তাঁদের মধ্যে হওয়া উচিত ছিল। মানুষ বলে থাকে, এ যুগে রাযী ও গাজালী সৃষ্টি হয় না। আমি বলি, তোমরা এ অপবাদ কাদেরকে দিচ্ছ? এ মেধাহীন নির্বোধদেরকে কে রাযী ও গাজালী বানাবে? মেধাবী সন্তানদেরকে মাদরাসায় পড়িয়ে দেখ রাযী ও গাজালী পয়দা হয় কি-না।

www.banglakitab.weebly.com

এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার ভাতিজা কী পড়ে? আমি বললাম, আরবী পড়ে, যাতে দীনের খেদমত করতে পারে। সে বলল, দেওবন্দ মাদরাসায় প্রতি বছর দেড়শত ছাত্র আলেম হচ্ছে। তারাই তো দীনের খেদমতের জন্য যথেষ্ট। আপনি ভাতিজাকে স্কুলে কেন পড়ান না। এতে সে দুনিয়াবী উন্নতি হাসিল করত। আমি তাকে বললাম, দীনের খাদেম ও সেবক হওয়া যদি অপকারী বিষয় হয় তাহলে দেওবন্দের দেড়শত ছাত্রের জন্য কেন তা পছন্দ করা হবে; বরং সেখানে গিয়ে এ পরামর্শ প্রদান করুন যে, মাদরাসার আরবী পড়া ছেড়ে দিয়ে সকলে ইংরেজী পড়ায় লিপ্ত হয়ে যাও। কেননা, তারাও তো দেশের সন্তান। আর যদি দীনের খাদেম হওয়া কোন উপকারী বিষয় হয়ে থাকে তাহলে আমার ভাতিজার জন্য তা পছন্দ করব না কেন। আমার জবাব শুনে সে চুপ হয়ে গেল। তারপর বললাম, আফসোসের কথা হল, দেওবন্দের ছাত্ররা এমন মর্যাদাহীন যে, আপনি তাদের কাজকে বেকার মনে করছেন। তাদেরকে এসব তুচ্ছ কাজের জন্য নির্ধারণ করলেন আর আপনার সন্তানরা এতই প্রিয় ও সম্মানিত যে, তাদের জন্য ডেপুটি কালেক্টরী পছন্দ করলেন। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১১/৫৭]

ইলমেদীন অর্জন করার মূল দায়িত্ব ধনীদের

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে পার্থিব সচ্ছলতা দান করেছেন, যাদের চাকরির প্রয়োজন নেই, আয়-রোজগারের চিন্তা নেই; তাদের দায়িত্ব হল পণ্ডিত আলেম হওয়া। কেননা, বর্তমানে যারা ইলম অর্জন করছেন তাদেরকে অতি দ্রুত পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের চিন্তায় পেয়ে বসে। এজন্য তারা পরিপূর্ণ গভীরে পৌঁছতে পারেন না। আফসোসের কথা হল, যাদের সুযোগ রয়েছে এবং গোটা জীবন ইলমের ময়দানে পড়ে থাকা যাদের জন্য সহজ তারাই সবচেয়ে বেশি অমনোযোগী। অথচ তাদের উচিত ছিল আল্লাহ তাআলা যেহেতু সুযোগ সুবিধা দান করেছেন তাই নিশ্চিন্ত মনে দীনের খেদমতে নিরত থাকা এবং গোটা জীবন এ পথে কাটিয়ে দেয়া। তখন দেখা যেত দুনিয়াতে কেমন বড় বড় আলেম তৈরি হচ্ছে।

আমি সত্যি বলছি, ইলমের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আলেমগণ এমন স্বাদ অনুভব করেন যা থেকে তাঁরা কখনো তৃপ্ত হন না। বস্তুত, এটা হল আল্লাহ তাআলার পথ। অতিক্রম করলে কেবল সামনেই অগ্রসর হওয়া যায়। পরিতাপের বিষয় হল ধনী শ্রেণীটাই ইলম থেকে বেশি অমনোযোগী। অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া এটাই ছিল যে, তারা নিরিবিলি ইলমে

www.banglakitab.weebly.com

দীনে গভীরতা অর্জনের পথে সাধনা করবে এবং নিজেদের সন্তানদেরকেও ইলম শেখাবে।

সন্তানের যাকাত

সম্পদের মতো সন্তানের মধ্যেও যাকাত রয়েছে। সুতরাং সন্তানেরও যাকাত প্রদান করুন। তবে এখানে চল্লিশের সংখ্যা নেই। আপনারা হয়ত যাকাতের কথা শুনে খুশি হয়েছেন যে, যখন চল্লিশজন সন্তান হবে তখন যাকাতস্বরূপ একজনকে মাদরাসায় দিব। না, এক্ষেত্রে তেমন বিধান নয়; বরং এক্ষেত্রে দু'জন সন্তানের মধ্যে একজনকে ইলমেদীন শিক্ষা করার জন্য নির্ধারণ করুন। তবে খুবই বিনীতভাবে আবেদন করছি আল্লাহর ওয়াস্তে নির্বোধ ও মেধাহীন সন্তানদেরকে ইলম শেখার জন্য বাছাই করবেন না। [আত্ তাবলীগ, তা'লীমুত্ তা'লীম-২১/১৮৩]

আলেমগণ কিভাবে ধনী হবেন

অনেকে নিজের সন্তানকে এ জন্য মাদরাসায় পড়ান না যে, আলেমগণ গরিব হয়ে থাকেন। আমি বলি, তার কারণ হল গরিবরাই ইলমেদীন শিখে থাকে। যদি ধনীদের সন্তানেরা ইলমেদীন পড়তে শুরু করত তাহলে আলেমগণ ধনী হতে শুরু করতেন। সুতরাং তোমরা সে ব্যবস্থা কেন করছ না। তারপর আরেকটি কথা হল, তোমাদের ধনীদের উচিত হল আলেমদের দিয়ে ওয়াজ করানো, তাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা। এতে করে ধনীদের সাথে আলেমদের সম্পর্ক হবে। অন্যথায় কেবল গরিবদের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক রয়ে যাবে। [তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ-২৪]

আলেমগণ সম্মানিত এবং মর্যাদাবান হওয়ার পদ্ধতি

ভালোভাবে বোঝা উচিত, যেসব কাজ সম্মানিত শ্রেণীদের হাতে সম্পাদিত হয় সাধারণ দৃষ্টিতে সেটিকে সম্মানি মনে করা হয়। এজন্য গরিবদের তুলনায় ধনীদের দায়িত্ব হল তারা তাদের সন্তানদেরকে দীনের খেদমতের জন্য ওয়াক্ফ করে দেয়া। এতেও আবার মেধাবী ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সন্তানকে নির্বাচন করবেন। যারা মক্তব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাতির কল্যাণকামিতার দাবিও করেন তারা মক্তব-মাদরাসায় নিজেদের সন্তানকে ভর্তি করেন না। নিজের সন্তানের জন্য তো ডেপুটি কালেক্টরী ও বেরিস্টারী ইত্যাদি পছন্দ করেন,

www.banglakitab.weebly.com

আর আলেম হওয়ার জন্য পছন্দ করেন সমাজের নিচুশ্রেণীর লোকদেরকে। তার কারণ হল, তাদের দৃষ্টিতে মাদরাসার পড়ালেখা হীন ও তুচ্ছ কাজ। এটাকে তুচ্ছ মনে করেই তারা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে থাকেন।

গভীরভাবে চিন্তা করুন, যে কাজের জন্য গরিবদেরকে নির্বাচন করা হয় তার মূল্যবোধ তাদের কাছে এবং সমাজের কাছে কী রূপ হবে। যদি এ কাজ জরুরি এবং মার্যাদাপূর্ণ হত এবং তার বন্দোবস্ত করা সমাজের কল্যাণকামিতা হত তাহলে এ মার্যাদার জন্য নিজের সন্তানাদিকে কেন নির্ধারণ করেন না। [তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ-২৪]

এ অপবাদের জন্য সম্মানিতশ্রেণীই বেশি দায়ী। কারণ, ইলমেদীন অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের বিমুখতার কারণেই নিম্নশ্রেণীর লোকদের সংখ্যা বেশি। যাদেরকে দেখে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সকলে এমনটা ধারণা করে থাকে। অথচ উচ্চ বংশীয় লোকেরা যদি তাদের সন্তানকে ইলমেদীন শিক্ষা দিতেন, তাহলে অনেক আলেম দেখা যেত এবং উঁচু বংশীয় হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে উন্নত আখলাক-চরিত্রের ঝলক দেখা যেত। আর যখন অধিকাংশ আলেমকে এমন মহৎ চরিত্রে দেখা যেত তখন সাধারণতঃ আলেমদেরকে আখলাক-চরিত্রের প্রতীক মনে করা হত এবং ইলমেদীনের প্রতি মন্দ ধারণা বিদূরিত হয়ে যেত। [তাজদীদে তা'লীম-৩৩]

এ যুগেও রাযী ও গাজালী রয়েছে

এ যুগেও ইমাম রাযী ও গাজালী রয়েছে এবং তাঁরা সব যুগেই পয়দা হন। একটি কথা বলি, বাহ্যিকভাবে বেআদবি মনে হলেও বস্তুত, বেআদবি নয়। আল্লাহর মেহেরবানিতে ইমাম গাজালী ও রাযী [রহ.]-এর চেয়েও উত্তম ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছেন। ইমাম গাজালী ও রাযী [রহ.]-এর লেখনীও আমাদের হাতে রয়েছে এবং এ সময়ের কিছু কিছু বুযুর্গের লেখনীও রয়েছে। তুলনা করে দেখুন, কারটা কেমন। মনে রাখবেন, নবুওয়ত খতম হয়েছে কিন্তু বেলায়েত খতম হয়নি। [আল্ ইফাজাত-২/৪৪৫]

আল্লাহর কসম করে বলি, এ যুগেও রাযী ও গাজালী হওয়া সম্ভব। হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী এবং কুতবুল ইরশাদ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.] কি গাজালী ও রাযী থেকে কম ছিলেন? আল্লাহর কসম করে বলি, কিছু কিছু গবেষণায় তাঁরা তাঁদের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন। [আত্ তাবলীগ-২১/১৮৪]

www.banglakitab.weebly.com

আলেমের সামনে ইংরেজী পড়ুয়াদের অবস্থান

বস্তুত, আলেমদের সামনে ইংরেজী পড়ুয়াদের ধুলা সমপরিমাণও মূল্য নেই। ইংরেজী পড়ুয়ারা استحالة - استبعاد - مثال - نظير - امتناع - تعذر ইত্যাদি পরিভাষার মধ্যে নিজেদের পরিভাষা ও ভাষায়ও পার্থক্য করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু আলেমগণ এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম এবং প্রত্যেকটির হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে অবগত। আমি আরো একটু আগে বেড়ে বলতে চাই, যারা এম.এ পাশ করেছেন কিন্তু আরবীতে যোগ্যতা নেই, তাদের থেকে যোগ্যতায় সে আরবী পড়ুয়া ভালো হবে যে ইন্টার পাশও করেনি। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১১/৭০]

আরবী কিতাবাদি পড়লে যোগ্যতায় উত্তরণ ঘটে এবং এ যোগ্যতা দ্বারা ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। কারণ, আরবী ইলম দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৯২]

আমাদেরকে উপহাস করলে আমরাও....

যারা মাদরাসায় পড়ুয়াদেরকে হেয় মনে করে এবং বলে বেড়ায় যে, এরা জীবন নষ্ট করছে, এ পড়া দ্বারা পার্থিব কোন অগ্রগতি হচ্ছে না; তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলি, ইংরেজী পড়ুয়াদেরকেই চাকরির জন্য বেশি ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। অনেক বি.এ, এম.এ পাশকে দেখেছি, কেউ তাদেরকে জিজ্ঞাসাও করে না। আল্লাহর রহমতে মাদরাসা পড়ুয়াদের এ পালাটি আসে না। লক্ষ্য করুন, আযান শেখা হল সবচেয়ে ক্ষুদ্র একটি বিদ্যা। যদি কেউ এই ক্ষুদ্র বিদ্যাটিও শিখতে পারে তাহলে তার চাকরির অভাব হয় না। নিয়মিত দুই কিংবা তিন বেলা খাবারেরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। এক কলেজের ছাত্র বি.এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে লজ্জায় অভিমানে রেলগাড়ির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। মানুষ বলে থাকে, কলেজে পড়ুয়ারা মাদরাসায় পড়ুয়াদেরকে তুচ্ছ মনে করে। আমি বলি, তোমরাও তাদেরকে উপহাস শুরু করে দাও। এটি হযরত নূহ (আ.)-এর সুন্নত। তিনি বলেছিলেন :

إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

তোমরা আমাদের সাথে বিদ্রূপ করলে আমরাও তোমাদের সাথে তেমনই বিদ্রূপ করব।

আমার ভাতিজার কথা। ছোট বেলায় এক পুলিশ অফিসারের সাথে তার দেখা হয়। সে তখন মাদরাসায় পড়ে এবং তার মাথা মুণ্ডানো ছিল। এটা আমার নিয়ম ছিল। আমি বালকদের মাথা মুণ্ডিয়ে দিতাম। অফিসার তাকে বলল, কী ব্যাপার, যারাই মাদরাসায় পড়ে তারা কেন মাথা মুণ্ডায়? সে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে জবাব দিল, কী ব্যাপার যারাই ইংরেজী পড়ে তারা কেন দাড়ি মুণ্ডায়? এ জবাব শুনে অফিসার সাহেব চুপ হয়ে যায়। [মালহুজাতে জাদীদ-৭]

www.banglakitab.weebly.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলেমদের প্রতি আপত্তি ও তার জবাব

আজ পার্থিব উন্নতি লাভ না করাকে হীনমন্যতা ও কাপুরুষতা আখ্যা দেয়া হচ্ছে অথচ বাস্তবে এটাই ছিল অল্পেতুষ্টি। স্বভাব-চরিত্রে অহংকার ও পদমর্যাদার প্রতি লোভ না থাকা এবং আচার আচরণে অনাড়ম্বরতা ও সরলতা গ্রহণ করাকে অপমানজনক মনে করা হচ্ছে। অপচয় ও অনর্থক ব্যয় থেকে বিরত থাকাকে কৃপণতা আখ্যা দেয়া হচ্ছে।

আমরা মানি, অধিকাংশ আলেমের মাঝে উক্ত বিষয়গুলো রয়েছে। কিন্তু এগুলো ভালো স্বভাব, না মন্দ স্বভাব। মুসলমান হিসেবে এর সমাধানের জন্য কুরআন এবং হাদীস যথেষ্ট। কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের বাণীতে চিন্তা করলে জানা যাবে, আলেমদের মাঝে বিদ্যমান গুণগুলো উত্তম ও প্রশংসনীয়। বিরুদ্ধবাদীরা সেগুলোকে মন্দগুণ বলে আখ্যা দিয়ে আলেমদের ব্যাপারে অভিযোগ করা শুরু করেছে।

আর যদি কোন আলেমের মাঝে মন্দ স্বভাবের কিছু পাওয়াও যায় তাহলে কি এটা ইলমেদীনের প্রভাবে নাকি অন্য কিছুর প্রভাবে? এর সমাধানও খুব সহজ। কারণ, অভিজ্ঞতা বলে, উক্ত মন্দ স্বভাব সকল আলেমের মাঝে পাওয়া যায় না। যদি ইলমেদীনের প্রভাব হত তাহলে সকলের মাঝেই পাওয়া যেত। সুতরাং জোর দিয়েই বলতে পারি, এটা অন্য কোন জিনিসের প্রভাব। আমার গবেষণা মতে তা বংশ ও সাহচর্যের ত্রুটি। অর্থাৎ কেউ কেউ বংশীয়ভাবে নিচু প্রকৃতির হওয়ার পর যদি ভালো কারো সান্নিধ্য লাভ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে নিছক ইলম যথেষ্ট হবে না; বরং তার মধ্যে বংশীয় নিচুতা প্রকাশ হতে থাকবে। কিন্তু কথা হল কেবল এসকল নিচু বংশীয় আলেমদের বাদ দিয়ে ভালো বংশীয় সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কিংবা সাহচর্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ আলেমদের দিকে কেন লক্ষ্য করা হয় না। [তাজদীদে তা'লীম-৩২]

আলেমদের জীর্ণশীর্ণ বেশভূষা ও অনাড়ম্বর চালচলন কি অপমানকর

সাধারণত, আলেমদের বেশভূষা ও চালচলন সাদাসিধা হয়ে থাকে। তাদের পোশাক কখনো ইস্ত্রী করা ছাড়া, কখনো তালিযুক্ত এবং কখনো বোতাম উন্মুক্ত দেখা যায়। এতে তাঁদের প্রতি হেয় ও তুচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়। এটা অবান্তর ধারণা। বস্তুত, এটি তাদের বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। আলেমগণ হলেন জাতীয়

www.banglakitab.weebly.com

ইঞ্জিনের ড্রাইভার। ড্রাইভারদের সাবান মেখে গোসল করা এবং শরীর থেকে কয়লা ঝাড়ার অবসর কোথায়। এগ্রিমেন্ট এবং সেকেন্ড ক্লাসের বিলাসী যাত্রীরা যদি এ আপত্তি জুড়ে দেয় যে, আমরা ড্রাইভারের উসীলায় বিলেত পৌঁছি এবং সেখান থেকে বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসি তাই তাকেও আমাদের মতো পরিপাটি ও মূল্যবান পোশাকে আচ্ছাদিত হতে হবে, তাহলে এটা মূর্খতা ছাড়া আর কী বলা হবে। [তাজদীদে তা'লীম-৩৪]

মর্যাদা এবং অমর্যাদার মাপকাঠি

বস্তুত, মর্যাদার মাপকাঠি হল অমুখাপেক্ষিতা আর অমার্যদার মাপকাঠি হল মুখাপেক্ষিতা। এতে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশভূষার কোন হাত নেই। অমুখাপেক্ষিতা থাকার পর পোশাক-পরিচ্ছদ পুরনো হলেও এবং অর্থ-সম্পদ না থাকলেও সে সম্মানী। আর পোশাক-পরিচ্ছদ নবাবদের মতো হলে এবং হাজার হাজার টাকা মাসিক বেতন হলেও যদি অমুখাপেক্ষিতা না থাকে তাহলে সে নিতান্তই অসম্মানী। [তাজদীদে তা'লীম-৩৪]

সুতরাং বলতে হয়, আলেমদের এহেন চালচলন ও বেশভূষা একমাত্র বিনয়ের কারণেই। তাঁরা যে নিজেদেরকে বড় ভাবেন না এবং জাহির করতে চান না, এটা তার প্রমাণ বহন করে। আর কখনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার কারণেও এমনটি হয়ে থাকে। কারণ, প্রকৃতিগত ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় হল যারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন তারা বিশ্রাম করা এবং পেট ভরে খাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পান না। যেমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সময়মতো খাওয়ার কথাও স্মরণ থাকে না। কয়েকদিন পর্যন্ত কাপড় বদলানোর সময়ও পান না। বলুন, এটা কি তাদের জন্য অপমান? কিছুতেই নয়; বরং চূড়ান্ত সম্মান। কারণ, তারা নিজেদের দায়িত্ব গুরুত্বসহকারে আঞ্জাম দিচ্ছেন। [হুকুকুল ইলম-৩০]

আলেমদের প্রতি অভদ্রতার আপত্তি ও তার জবাব

এমন একটি সংশয়ও হতে পারে যে, আলেমদের মাঝে ভদ্রতা ও সামাজিকতা কম হয়ে থাকে। এর জবাবে বলি, প্রথমে ভদ্রতা ও অভদ্রতার কোন মাপকাঠি নির্ধারিত হওয়া উচিত। বর্তমানে ভদ্রতা ও সভ্যতার মাপকাঠি বানানো হয়েছে ইউরোপের প্রথা ও অপসংস্কৃতিকে। এ মাপকাঠি যে সঠিক তার কী দলিল রয়েছে। বলুন তো, ইউরোপের কোন রীতিনীতি কি সভ্যতা ও ভদ্রতা বহির্ভূত

www.banglakitab.weebly.com

নেই। বস্তুত, মাপকাঠি হওয়ার যোগ্যতা রাখে কেবল দু'টি জিনিস। ১. সুস্থ বিবেক। ২. বিশুদ্ধ ধর্ম। সুস্থ বিবেককে মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হলে আরেকটি মাপকাঠির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, মানুষের বিবেকে তারতম্য রয়েছে। তারমধ্যে কার বিবেক সুস্থ, এটা আগে নির্ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্মই মাপকাঠি হতে পারে। আর বিশুদ্ধ ধর্ম এবং আল্লাহর মনোনীত দীন যখন ভদ্রতার মাপকাঠি নির্ধারিত হল তখন অসভ্যতা ও অভদ্রতার মাপকাঠিও হবে একমাত্র দীন। এবার লক্ষ্য করুন, দীনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড আলেমদের মাঝে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়, নাকি অন্যদের মাঝে? তখন বোঝা যাবে অভদ্র বলার অধিক উপযুক্ত কারা। আর যদি বাস্তবেই কোন আলেমের মধ্যে ভদ্রতাবিরোধী কোন আচরণ পাওয়া যায় তাহলে তার কারণ ইলম নয়; বরং প্রশিক্ষণ ও সাহচর্যের অভাব। [হুকুকুল ইলম-৩০]

আলেমদের প্রতি কৃপণতার অভিযোগ ও তার জবাব

কিছু আলেম এবং তালেবুল ইলমকে দেখা যায় তারা চিঠির ব্যবহৃত খামটিকে উল্টিয়ে আঁঠার সাহায্যে জোড়া দিয়ে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করে। মানুষ এটাকে কৃপণতা মনে করে। অথচ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। যদিও এ পর্যায়ের রক্ষণশীলতা আবশ্যক নয়, কিন্তু এটা প্রশংসনীয় ও উত্তম হওয়ার মাঝে কোন সন্দেহ নেই। সভ্য জাতির প্রশংসা করতে যেয়ে বলা হয়, তারা কোন জিনিস অহেতুক নষ্ট করে না। এমনকি পুরাতন ছেঁড়া কাপড় দিয়েও কাগজ তৈরি করতে আমি নিজেও দেখেছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এটাকে তো প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হল কিন্তু তার সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যগুলোকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হল। এটা বড়ই জুলুম ও অবিচার। অনেক আলেম এমন রয়েছেন যারা হিসাব করে টাকা পয়সা ব্যয় করেন, চিন্তা ভাবনা ছাড়া ব্যয় করেন না। সব কিছু অল্প অল্প ব্যয় করেন। ফলে মানুষ তাদেরকে কৃপণ ও কঞ্জুস বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু যারা আলেমদের এ মিতব্যয়কে কৃপণতা মনে করে তারা এ ছন্দের প্রতিকৃতি-

حَفِظْتَ شَيْأً وَغَابَتْ عَنْكَ اَشْيَاءُ

তুমি একটি বস্তু যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করলে অথচ অনেক
বস্তুই তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। [হুকুকুল ইলম-২৫]

www.banglakitab.weebly.com

লেনদেনে আলেমদের অসতর্কতা প্রসঙ্গে

কোন কোন আলেম লেনদেনে অসতর্ক ও অস্বচ্ছ হয়ে থাকেন। অন্যের পাওনা দিতে তালবাহানা করেন। কারো কিতাব নিয়ে ফেরত দেন না। কিংবা অসাবধানতার কারণে নষ্ট করে ফেলেন। এর জবাব হল, এসব কাজ ইলমের স্বভাববিরোধী। এ ধরনের ব্যক্তিরা আমাদের দৃষ্টিতে আলেমদের দলভুক্ত নয়। [হুকুকুল ইলম-২৭]

বুদ্ধি স্বল্পতার অভিযোগ ও জবাব

একটি অভিযোগ করা হয় যে, তালেবে ইলমদের আকল-বুদ্ধি কম হয়ে থাকে। তারা মুয়ামালাত ও লেনদেন সম্পর্কে অজ্ঞ। পার্থিব অনেক ব্যাপারেই বেখবর। মুয়ামালাত ও লেনদেন সম্পর্কীয় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে বুঝতে সক্ষম হয় না। কোন ব্যবস্থাপনা কাজের দায়িত্ব দেয়া হলে তা সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পারে না।

এ সংশয় ও অভিযোগটি চিন্তা-ভাবনা করে করা হয়নি। অভিযোগকারীরা বিবেক এবং অভিজ্ঞতাকে এক জিনিস মনে করেছে। অথচ উভয়টির মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যদি কোন বড়মাপের বিদ্বান এটা না জানেন যে, অমুক কারখানার অমুক নম্বর জুতাটির দাম কত, তাহলে কি এতটুকু অজ্ঞতার কারণে তাকে বেকুব ও নির্বোধ বলে দিবেন? যদি কেউ এতটুকু অজ্ঞতার কারণে কাউকে বেকুব বলে ফেলে, তাহলে সে নিজেই বেকুব। এমনিভাবে যেসব ব্যাপারে আলেমগণের সংশ্লিষ্টতা কম কিংবা একেবারেই সংশ্লিষ্টতা নেই, সে ব্যাপারে তাদের জানা-শোনা কম থাকবে কিংবা একেবারেই থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। আলেমগণ যদি দুনিয়ার কোন ব্যাপারে মনোযোগী হন তাহলে সেটি এমন নিপুণতার সাথে সম্পাদন করেন, বড় বড় অভিজ্ঞজনরাও যা করতে হিমশিম খেয়ে যান। [হুকুকুল ইলম-৫৪]

আলেমগণ নির্লজ্জ হন না

আলেমগণ ফিকহের কিছু লজ্জাকর মাসআলা বোঝার স্বার্থে খোলামেলা আলোচনা করে থাকেন বা পুস্তকে লিখে থাকেন। এ কারণে কেউ কেউ তাদেরকে নির্লজ্জ বলতে চায়। অথচ মেডিকেল কলেজে মেয়েদেরকে যে পরিমাণ পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতার শিকার হয়ে স্বাস্থ্যবিদ্যার অনুশীলন করতে হয় এখানে তার দশভাগের এক ভাগ নির্লজ্জতাও নেই। এখানে তো শুধু শব্দ বলা

www.banglakitab.weebly.com

হয়, আর ওখানে প্রাকটিক্যালী দেখানো হয়। আশ্চর্যের কথা হল, যেটা প্রকৃত নির্লজ্জতা তা নিয়ে আপত্তি নেই, আর যা প্রকৃত নির্লজ্জতা নয় তা নিয়েই যত আপত্তি।

আরেকটি জবাব হল, আপত্তিকারীগণ যদি ঐ মাসআলাগুলো চর্চার দ্বারা দীন বোঝা ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করেন, তাহলে প্রথমে তা প্রমাণ করা হবে। আর যদি সেটিকে দীন মনে করেন এবং দীন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তাহলে তাদের কাছে আবেদন হল, এ পদ্ধতি ছাড়া দীন সংরক্ষণের আর কোন পদ্ধতি থাকলে বলুন, আমরা সেটি গ্রহণ করব। [হুকুকুল ইলম-৪১}

আলেমদের পরস্পর মতানৈক্য প্রসঙ্গে

অনেকেই আপত্তি করেন, অনেক মাসআলায় আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। যার কারণে মানুষ অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হয়। কার কথা অনুযায়ী আমল করবে, কারটা সঠিক, তা ঠাহর করতে পারে না। এর জবাবে বলি, ডাক্তারদের মাঝে কি কোন রোগের চিকিৎসা নিয়ে মতবিরোধ হয় না? ডাক্তারদের মতবিরোধ দেখে কি কেউ তার রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখে? কেউ কি একথা বলে যে, ডাক্তারদের মাঝে মতবিরোধ বিধায় চিকিৎসারই প্রয়োজন নেই?

না, না, কেউ এমনটি বলে না কিংবা করে না; বরং লক্ষ্য করা হয় যে, কোন ডাক্তার বেশি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। কার হাতে বেশি রোগী সুস্থ হয়ে থাকে। এমনটি তদন্ত করার পর রোগীকে সে ডাক্তারের হাতে সোপর্দ করা হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষ যে বিষয়টি আবশ্যক মনে করে তাতে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখে হতাশ হয় না। [তাজদীদে তা'লীম-৩৯]

আলেমদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ

একটি আপত্তি করা হয়, আলেমদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ প্রবল। যদি এ আপত্তি সকল আলেমের ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে করা হয়, তাহলে বাস্তবতাই তা অস্বীকার করবে। আর যদি কারো কারো ক্ষেত্রে বলা হয়, তাহলে এ ব্যাপারে আমরাও একমত। তবে এর কারণ ইলম নয়; বরং সঠিক তরবিয়ত ও সাহচর্যের অভাব।

আমি বলি, কেউ যদি জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে নিজের সন্তানকে ডাক্তার বানাতে চায়, তাহলে কি শহরের ডাক্তারদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে, নাকি সিদ্ধান্ত বহাল রেখে কামনা করে যে, আমার সন্ত

www.banglakitab.weebly.com

নের চরিত্র যেন অন্যদের মতো না হয়। অনুরূপভাবে ইলমেদীন অর্জন করতে হবে। সাথে সাথে চরিত্রও সংশোধন করতে হবে। [হুকুকুল ইলম-৪৬]

আলেম হয়েও বেআমল হওয়া

কেউ আলেম হয়েও বেআমল হলে সে নিজের জন্য এবং অন্যান্য স্বল্পবুদ্ধির মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এমন আলেমের উপমা হল ঐ ডাক্তারের মত, যে রোগীকে কুপথ্য ও ক্ষতিকর খাবার থেকে বারণ করলেও নিজে তা থেকে বিরত থাকেন না। বলুন তো, তার বিরত না থাকার দরুন কি রোগীকে দেয়া তার দক্ষতাপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র উপকারহীন প্রমাণিত হবে? এ অবস্থায় কি তার কাছে চিকিৎসা চাওয়া যাবে না? তিনি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ডাক্তার হলে উপকারী প্রেসক্রিপশনই প্রদান করবেন। এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, কোন আলেম যদি হিংসা-বিদ্বেষের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, মাসআলা বলার ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি সঠিকটাই বলবেন। [হুকুকুল ইলম-৪১]

www.banglakitab.weebly.com

দশম অধ্যায়

মাদরাসার সভা ও অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে

মাদরাসায় দস্তারবন্দী ও পাগড়ি প্রদানের বার্ষিক সভার প্রমাণ এবং ফযীলত

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি জামাত থাকা আবশ্যক যারা সৎকাজের প্রতি আহ্বান করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে।

এ আয়াতে সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং আহ্বান জানানোর নির্দেশ রয়েছে। আর কুরআন কারীমের পঠন-পাঠন নিঃসন্দেহে সৎকাজ। সুতরাং কুরআন কারীম শেখা ও শেখানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করাও আবশ্যক সাব্যস্ত হল। আর উদ্বুদ্ধকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হল, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা, সেবা-যত্ন ও ইজ্জত-সম্মান করা। আরেকটি পদ্ধতি বুযুর্গানেদীন উদ্ভাবন করেছেন। সেটি হল, কুরআনের হিফজ সমাপনকারীদের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেয়া। এতে সমাপনকারী এবং তাদের অভিভাবকদের মন আনন্দে ভরে যায়। ফলে এটি অন্যদের জন্য কুরআন পড়ার প্রতি আগ্রহের উপায় হয়ে যায়। সুতরাং এ কাজটি সুন্নত পরিপন্থী নয়। কেননা, সৎকাজের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দানের জন্য কুরআন হাদীসে নির্দেশ এসেছে। আর দস্তারবন্দীও উদ্বুদ্ধকরণের অন্যতম উপায়। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তো এটিও কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত হল।

মোটকথা, দস্তারবন্দী অনুষ্ঠান দ্বারা অন্যান্য ছাত্রদের মাঝেও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তারা মনে করে আমরা যদি কুরআন কারীম ভালোভাবে মুখস্থ করি তাহলে আমাদের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেয়া হবে। সেই সাথে ছাত্রদের পিতা-

www.banglakitab.weebly.com

মাতাগণও উৎসাহবোধ করেন। ছাত্রদের মাঝে বুঝ হয়ে থাকলে তারা ভাববে, এখন আমাদেরকে বড় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন থেকে আমাদেরকে তাকওয়া ও তাহারাত অনুযায়ী চলতে হবে। সারকথা, কুরআন থেকেই দস্তারবন্দী ও পাগড়ি প্রদানের প্রমাণ ও ফযীলত জানা গেল।

হাদীসের আলোকে

এখন হাদীস থেকেও পাগড়ি প্রদানের প্রমাণ পেশ করছি। একটি হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে কুরআন পড়ে কেয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন মুকুট পরানো হবে যার আলোর সামনে চাঁদ-সূর্যও ম্লান হয়ে যাবে। এ হাদীসটি 'সিহাহ্ সিত্তায়' বর্ণিত হয়েছে। যদিও হাদীসে হাফেজের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন মর্যাদার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি; বরং তার পিতা-মাতার মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যখন হাফেজের উসীলায় তার পিতা-মাতা এহেন মর্যাদার অধিকারী হবেন, তার মর্যাদা আরো বেশি হবে নিঃসন্দেহে।

এ হাদীসের আলোকে বোঝা গেল, কুরআনের সাথে মুকুটের সম্পর্ক রয়েছে। আর পাগড়িও মুকুটের সমতুল্য। সুতরাং হাদীস থেকে পরোক্ষভাবে পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠান ভালো কাজ হওয়া প্রমাণিত হল।

তাবারানী শরীফের একটি বর্ণনা এ বিষয়ে খুবই সুস্পষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে কোন অঞ্চলের হাকেম নিযুক্ত করতেন তখন নিজের মুবারক হাতে তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিতেন। বলা বাহুল্য, হাফেজ এবং আলেমগণও সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তি হওয়ার কারণে হাকেমের সমতুল্য। শিক্ষা সমাপনের সনদের সাথে দস্তারবন্দীও এ হাদীসের অনুকূলে। কিন্তু এ হাদীসের সনদের অবস্থা সম্পর্কে আমার জানার অভাব থাকায় আমি এটি সর্বশেষ উল্লেখ করলাম। যদি এ হাদীসটি শুদ্ধ হয় তাহলে তো তা পাগড়ি প্রদান কর্মটি মকবুল ও গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সুস্পষ্ট। আর যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে পূর্বের দলিলটিও দাবি প্রমাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। মোটকথা, এ আমলটি সুন্নতের পরিপন্থী নয়। [আত্ তাবলীগ-২১/২৪৫]

শরীয়তের দৃষ্টিতে মাদরাসার প্রচলিত জলসার কিছু মন্দ দিক

গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং অভিজ্ঞতা সাক্ষী, মাদরাসায় প্রচলিত জলসাগুলোর আয়োজনের পেছনে দু'টি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ১. চাঁদা আদায়। ২. নিজেদের

www.banglakitab.weebly.com

কার্যক্রমের প্রচার। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, মাদরাসার সুনাম-সুখ্যাতি। যার সার নির্যাস হল, মর্যাদা ও সম্পদের মোহ। আর এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের বহু জায়গায় নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মর্যাদা ও সম্পদ দীনের জন্য হলে দোষণীয় নয়, কিন্তু কথা হল, এসব জলসায় এ বিষয়গুলো দীনের জন্য করা হয়, না-কি দুনিয়ার জন্য। নফস তো তাবীল করে দীনের উদ্দেশ্যই প্রমাণ করবে কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রতিটি উদ্দেশ্যের একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা নিয়তের শুদ্ধাশুদ্ধি জানা যায়। যতদূর জানা গেছে, এসব জলসাতে দুনিয়া অন্বেষণের নিদর্শনই প্রবল মনে হয়। যার সারকথা হল, যদি দীন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টিপরিপন্থী কোন কিছু অবলম্বন করা হত না। আর যেহেতু এসব বিষয় অবলম্বন করা হয়, তাই পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে এতে দুনিয়াই উদ্দেশ্য। তার মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে নমুনাস্বরূপ তুলে ধরা হল–

১. প্রত্যেকে নিজেদের মাদরাসাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাস্তব অবস্থার চেয়ে বেশি জাহির করে। যার সারকথা হল, মিথ্যা এবং ধোঁকা।

২. ছাত্র সংখ্যা বেশি দেখাতে গিয়ে অযোগ্যদেরকে যোগ্য হিসেবে দেখানো হয়।

৩. কার্যবিবরণী ও প্রতিবেদনে নিজেদের প্রশংসা ও নিজেদের কাজের প্রাধান্যতা, সৌন্দর্য ও আধিক্যতা প্রদর্শন করা হয়। এ কারণে শিক্ষার মানের তুলনায় পরিমাণের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে কিতাবসমূহ ভালোভাবে না বুঝিয়ে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে হলেও খতম করা হয়। এতে ছাত্ররা বুঝল কি বুঝল না, এর কোন তোয়াক্কা করা হয় না। এসবই হল সুখ্যাতি ও সম্পদপ্রীতির আলামত।

৪. শরীয়তের বিধান মতে 'রিয়া' (লোকদেখানোর জন্য আমল) হারাম। মাদরাসার জলসাগুলোতে দানকারীদের অধিকাংশের অন্তরে 'রিয়া' থাকে। আর রিয়ার মাধ্যম হওয়াও গুনাহ।

৫. কেউ মাদরাসার কোন ব্যাপারে অভিযোগ করলে তা সঠিক হলেও কিছুতেই স্বীকার করা হয় না। উপরন্তু অভিযোগকারীকে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হয়। অথচ মনে মনে তা সঠিক জেনেই এমনটি করা হয়। যা অহংকারের আলামত। হাদীসে এটিকে بطر الحق বলা হয়েছে।

৬. নিজেদের মাদরাসার পাশে যদি কোন মাদরাসা গড়ে উঠে এবং বাস্তবেই তার সার্বিক মান ভালো হয়, তাহলে সেটি চোখের কাঁটা হয়ে যায় এবং মনে মনে

www.banglakitab.weebly.com

সেটির ধ্বংস ও অবনতি কামনা করা হয়। অথচ পাশে আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে এ কথা ভেবে খুশি হওয়ার কথা ছিল যে, মাশাআল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় দীনের কাজ হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, নিছক এ জন্য বিরোধিতা করা হয় যাতে তাদের সুখ্যাতি না হয়ে যায় এবং নিজেদের ভাগে কম না পড়ে।

৭. সাধারণত, এ ধরনের জলসায় অপচয় হয়ে থাকে। যাদেরকে দাওয়াত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই তাদের এবং তাদের খাদেম ও বন্ধুবান্ধবদের ভাড়ায় অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যায়। অনেক সময় মাদরাসার পক্ষ থেকে খানাপিনার ইন্তেজাম করতে হয়। সেখানেও রীতিমত লৌকিকতা করতে হয়। সেই সঙ্গে মেহমান ব্যতীত অমেহমানদেরকেও খাওয়াতে হয়। আর প্রবল সম্ভাবনা হল, এক্ষেত্রে দাতাদের পক্ষ থেকে অনুমতি নেয়া হয় না। আর পরোক্ষ অনুমতির দাবী করাও অসম্ভব। কারণ, দাতাগণ নিজেরাও এসব খাতে ভিন্নভাবে ব্যয় করে থাকেন।

৮. কোন কোন জায়গায় এ ধরনের মাহফিল ও অনুষ্ঠান মসজিদে হয়ে থাকে এবং মসজিদের সাথে সাধারণ বৈঠকখানার মতো আচরণ করা হয়। হৈচৈ, শোরগোল, দুনিয়াবী আলাপ-আলোচনা, অশ্লীল ও আপত্তিজনক কবিতা পাঠসহ অনেক গর্হিত কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে।

৯. চাঁদা সংগ্রহের বেলায় শরীয়তের মূলনীতির তোয়াক্কা করা হয় না। কারণ, শরীয়তের হুকুম হল :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ

[কারো মনসন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ ব্যবহার করা বৈধ নয়।]

অথচ চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করে এমন সব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় যার দ্বারা শ্রোতাবৃন্দের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি হয়। সে প্রভাবটি চাপ কিংবা লজ্জার কারণেও হতে পারে। দাতাদেরকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয় আর জানা কথা, সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা শূন্য পকেটে আসতে সঙ্কোচ ও অপমানবোধ করেন। [ইমদাদুল ফাতওয়া-৪/৬৬]

মাদরাসা নির্বাচনে ছাত্রদেরকে ভুল পরামর্শ দেয়া দীনের ক্ষতি করা

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ দীনের একটি ক্ষতি সাধনকর্মে লিপ্ত রয়েছেন। সেটি হল, কোন তালেবুল ইলম কারো কাছে যদি পরামর্শ চায় যে, আমি কোন

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসায় পড়লে ভালো হয়, তাহলে প্রত্যেক মাদরাসার কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ নিজেদের মাদরাসার পরামর্শই দিয়ে থাকেন। যদিও তাদের জানা থাকে যে, এ ছাত্রটি অন্য মাদরাসায় পড়লে বেশি উপকৃত হবে। পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, আজকাল আলেমগণও ভুল পরামর্শ দিতে শুরু করে দিয়েছেন। অথচ পূর্বেকার যুগে কাফেররাও ভুল পরামর্শ দিতে দ্বিধা করত। [আত্ তাবলীগ-১৪, খাইরুল ইরশাদ-১২৯]

মসজিদ হল আমলের স্থান। আর মাদরাসা হল ইলম অর্জনের স্থান। যেভাবে একাধিক মসজিদ হওয়ার মাঝে কোন অসুবিধা নেই, তেমনি মাদরাসাও একাধিক হওয়ার মাঝে কোন সমস্যা না হওয়া উচিত। কিন্তু পরিস্থিতি এই গড়িয়েছে যে, মাদরাসা একাধিক হলে মানুষের মনে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। এমনটি হওয়া উচিত নয়; বরং এমন পরিস্থিতিতে আনন্দিত হওয়া উচিত যে, দীনের কাজে আরো অনেক লোক আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু যেহেতু মাদরাসাগুলোর মধ্যে আত্মিক ব্যাধির প্রাবল্যতা বিরাজ করছে তাই মাদরাসার আধিক্যতা দ্বারা অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। [আল্ কালামুল হাসান-৫৪]

www.banglakitab.weebly.com

একাদশ অধ্যায়

চাঁদা সংগ্রহ প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি চাঁদা সংগ্রহ অভিযানের বিরোধী নই

আমি চাঁদা কালেকশনের বিরোধী নই। তবে তার সংগ্রহের প্রচলিত পদ্ধতির বিরোধী। আমার মতে চাঁদা কালেকশনের পদ্ধতি হল, এ কাজ আলেমদের দিয়ে না করিয়ে ধনীদের মাধ্যমে করানো। কেননা, ধনীরা নিজেরাও চাঁদা দিয়ে থাকে। তাই তারা চাঁদা সংগ্রহ করতে গেলে কোন আপত্তি ওঠে না। আর আলেমগণ যেহেতু নিজেরা চাঁদা দেন না এজন্য সন্দেহ জাগতে পারে যে, সম্ভবত নিজের খাওয়ার জন্য কালেকশন করছেন। [কালিমাতুল হক-৪৬]

চাঁদার বৈধতা এবং প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الخ

> অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা কল্যাণের পথে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের নির্দেশ করবে....।

আয়াতের আলোকে চাঁদা সংগ্রহের জন্য উৎসাহ প্রদানে কোন সমস্যা নেই। কেননা, দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণ আবশ্যকীয় বিষয়। আর সেটি পঠন-পাঠন ছাড়া সম্ভব নয়। আর বর্তমানে তা আর্থিক সাহায্য প্রদান ছাড়া চলা অসম্ভব। সুতরাং সাহায্য দেয়া সৎকাজের পূর্বশর্ত হওয়ার কারণে তা সৎকাজ বলে সাব্যস্ত হল; বরং আবশ্যকীয় কাজের ভূমিকা হওয়ার কারণে তাও আবশ্যকীয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৫/১২২]

চাঁদা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে যথেষ্ট সমাধান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

www.banglakitab.weebly.com

هَاأَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ الخ

লক্ষ্য করুন, কুরআন কারীম মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতে নিষেধ করছে কিন্তু দান করার প্রতি আহ্বান ও উৎসাহ প্রদানকে প্রমাণিত করছে। সেই সাথে দান করার প্রতি আহ্বান করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করার ব্যাপারে নিন্দা করা হচ্ছে। ইরশাদ হয়েছে : وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ যারা কৃপণতা করে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে। আরো ইরশাদ হয়েছে: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ الخ আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতি সৃষ্টি করে দিবেন, যারা তোমাদের মতো কৃপণ ও অলস হবে না।

দেখুন, দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে কৃপণতা করার জন্য কী পরিমাণ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। [তেজারতে আখেরাত-৬৫]

সাধারণ জনগণের পক্ষে মাদরাসায় দান করা আবশ্যক

মনে রাখবেন, দীনের খেদমত করা মানে মুসলিম জাতির খেদমত করা। কেননা, দীন সকল মুসলমানের সম্মিলিত জিনিস। যার খেদমত করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। এ দায়িত্বটি আলেমগণ আপনাদের পক্ষ থেকে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। যদি কুরআন-হাদীস থেকে বিষয়টি বুঝে না আসে তাহলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আদর্শ থেকে বোঝার চেষ্টা করুন। কেননা, বর্তমান সময়ে ভিন্ন জাতির অনুসরণ করা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, অন্যান্য জাতি নিজেদের ধর্মীয় জামাতের সেবা করাকে খুবই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। তারা মনে করে, ধর্মীয় ব্যক্তিরা গোটা জাতির পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। তাই তো খ্রিস্টানরা মিশনারী ও ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠীর খেদমত করে এবং হিন্দুরা পুরোহিতদের সেবা করে। সকলে নিজের কাজ মনে করেই তাতে কিছু না কিছু অংশগ্রহণ করে থাকে।

পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এক্ষেত্রে অন্যদেরও অনুসরণ করে না। মুক্তমনে চাঁদা প্রদানে অংশ নেয় না। অনেকের অবস্থা তো এমন যে, কেউ চাঁদা চাইলে মহাজন সাহেব একথা বলে চলে যান যে, আমি একটু ঘর থেকে আসছি। তাপর চাঁদা আদায়কারী যতক্ষণ বসে থাকার সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ আর ঘর থেকে বের হন না। [আত্ তাবলীগ-১/১৫০]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসায় কেন সাহায্য করতে হবে

লক্ষ্য করুন, একটি জমিনে কয়েকজন অংশীদার। একজন আট আনার মালিক, দ্বিতীয় জন চার আনার মালিক, তৃতীয় জন তিন আনার মালিক এবং চতুর্থ জন এক আনার মালিক। এখন যদি কোন সন্ত্রাসী এসে সে জমিটি জবরদখল করে নেয়, তাহলে কি এক আনার মালিক চুপচাপ বসে থাকবে? কিছুতেই নয়। এ থেকে বোঝা গেলো যে, যৌথ জিনিসের হেফাজত করা সকল শরিকদের উপর আবশ্যক। এমনিভাবে কুরআন কারীম হল সকল মুসলমানের যৌথ সম্পদ। এজন্য তার সংরক্ষণও সকলকে করতে হবে। আর যদি কেউ মালিকানা দাবী না করেন, তাহলে তা লিখে দিন। আমরা তা প্রচার করে দিব। তারপর আর কেউ আপনাদের কাছে কুরআন হেফাজতের কাজে অংশগ্রহণের কথা বলে চাঁদা তোলতে যাবে না। আর যদি এতে সম্মত না হন, তাহলে প্রমাণিত হল যে, আপনারও দায়িত্ব রয়েছে এবং অন্যদেরও অধিকার রয়েছে কুরআন হেফাজতের কাজে আপনাকে শামিল করতে বাধ্য করার। সেটা অর্থ দিয়ে হোক বা অন্য যে কোন উপায়ে হোক। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৮৮]

সকল মুসলমানের জন্য দীনদার হওয়া আবশ্যক। আর জীবিকা উপার্জন ও আয়রোজগারও যেহেতু আবশ্যক তাই ভাগাভাগি করে কাজ করতে হবে। কিছু লোক এ কাজে নিরত হওয়া উচিত আর কিছু লোক নিছক জাতির সেবক হওয়া উচিত। কেননা, সকলেই যদি আয়রোজগারের কাজে লেগে যায় তাহলে দীনের কাজ সামনে অগ্রসর হবে না।

যেমন আইন বিদ্যার কথাই বলি। যদি কেউ তা না শিখে তাহলে সকল চাকরি-বাকরি বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিভাবে দীনের কাজেও যদি কেউ লেগে না থাকে তাহলে তা বন্ধ হতে বাধ্য। সুতরাং একটি দল এমন থাকা আবশ্যক যারা একমাত্র দীনের খেদমত ও হেফাজতে নিয়োজিত থাকবে। তারা এ কাজ ছাড়া অন্য কিছু করবে না। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৭৯]

মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার শরয়ী প্রমাণ

ফুকাহায়ে কেরামের মতে 'হক্কে ইহতিবাস'-এর বিনিময় রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি কারো সেবায় নিজেকে আটকে রাখে এবং এ কারণে সে তার জীবিকার ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়, তাহলে তার জীবিকার ব্যবস্থা করা ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যার সেবা ও উপকারের জন্য সে তার সময়কে বরাদ্দ করে রেখেছে। এর প্রসিদ্ধ যে উদাহরণটি ফুকাহায়ে কেরাম দিয়ে থাকেন তাহল, কাজী ও

বিচারকের ভাতা। যেহেতু বিচারক সাধারণ মুসলমানের জন্য বিচারকার্য আঞ্জাম দেয়ার স্বার্থে নিজেকে আটকে রেখেছেন এজন্য তার ভরণ-পোষণ সাধারণ মুসলমানের উপর ওয়াজিব। যার পদ্ধতি হল, বাইতুল মাল থেকে প্রদান করা হবে। কেননা, বাইতুল মাল মূলতঃ সাধারণ মুসলমানের কাছ থেকে সংগ্রহকৃত তহবিল। ঠিক এ কারণেই ফকীহগণ স্ত্রীর ভরণপোষণকে স্বামীর উপর আবশ্যক করেছেন। কেননা, স্ত্রী স্বামীর সেবার জন্য নিজেকে রুদ্ধ করে ফেলেছে।

অনুরূপভাবে তালেবুল ইলম, উলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ জাতির দীনি সেবায় নিজেদেরকে রুদ্ধ করে ফেলেছেন। কেননা, দীনি ইলমে পাণ্ডিত্য লাভ করা সকল মুসলমানের উপর ফরযে কিফায়া। তাদের সকলের পক্ষ থেকে আলেমগণ তা আঞ্জাম দিচ্ছেন। যেহেতু এ কাজটি সকলের উপর আবশ্যক ছিল তাই এ কাজ সম্পাদনকারীদের ভরণ-পোষণ গোটা জতির উপর ওয়াজিব হবে। যতদিন পর্যন্ত 'বাইতুল মাল' থেকে প্রদানের ব্যবস্থা ছিল ততদিন পর্যন্ত সেখান থেকে প্রদান করা হত। তখন এটাই ছিল সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে আদায় করার পদ্ধতি। এখন যেহেতু বাইতুল মাল নেই তাই তার পদ্ধতি কেবল এটাই যে, মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে তাদের প্রয়োজন মোতাবেক ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবেন। [ইসলাহে ইনকিলাব-২/১৯২]

মুসলিম জনসাধারণ মাদরাসার সাহায্য না করার পরিণতি

যেহেতু মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সেবা করা মুসলিম জাতির উপর আবশ্যক তাই এতে অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করলে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে। [প্রাগুক্ত]

মনে রাখতে হবে, তোমরা যদি আলেম সমাজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করো, অধিকন্তু সকলে তাদের বিরোধিতা করো এবং সাহায্য করা বন্ধ করে দাও তবুও এ দলটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আলেমগণ খেয়েই থাকবেন। যদি বলো কোত্থেকে কিভাবে খাবেন? তাহলে শোনো, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

هَاأَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الخ

অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি আহ্বান করা হয় কিন্তু তোমরা কৃপণতা করো। আর এ কৃপণতা করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো। কেননা, আল্লাহ তাআলা তো হলেন অমুখাপেক্ষী আর তোমরা মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করো তাহলে আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com

তাআলা তোমাদের স্থলে অন্য কোন জতি সৃষ্টি করবেন, যারা দীনের খেদমত করবে।

এখন যদি কারো সংশয় জাগে যে, অন্য জাতি কোথা থেকে সৃষ্টি হবে? তার জবাবে বলি, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিধারা প্রতিনিয়ত চালু আছে। দ্বিতীয় জবাব হল, বর্তমানে মুসলমানরা ইসলামী আদর্শ ও বিধিবিধান থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর অমুসলিমরা ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এটাই তার পূর্বাভাস। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এ ধরনের মুসলমানগণ ইসলাম থেকে বের হয়ে পড়বে এবং অমুসলিমরা ইসলামে প্রবেশ করবে। যদি মুসলমানরা এমন দুর্দিন দেখতে না চায়, তাহলে যেন দীনের সেবায় নিমগ্ন হয়ে যায়। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৬/৮৪]

মানুষের কাছে চাঁদার আলোচনা অপছন্দ হওয়া এবং চাঁদা আদায়কারীদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করার যৌক্তিক কারণ এবং তার শরয়ী সমাধান

আমি কখনো ওয়াজ-নসিহতের জলসায় চাঁদার কথা বলি না। অবশ্য এটা আমার একটি সীমাবদ্ধতা। কেননা, খোদ আল্লাহ তাআলাই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় কল্যাণমূলক কাজে অর্থাৎ তাঁর পথে ব্যয় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেখানে আমি বাধা দেয়ার কে?

কিন্তু এ ত্রুটির শিকার আমি একা নই; বরং শ্রোতামণ্ডলিও। কারণ, দানের কথা জনগণের কাছে অপছন্দ মনে হয়। বলতে দ্বিধা নেই, আমি এ কারণেই আলোচনা করি না। মানুষের কাছে যদি দানের কথা অপছন্দনীয় না হত, তাহলে আমার বিরত থাকার কোন কারণ ছিল না। এ জন্য আমি চাঁদার কথা খুবই কম বলে থাকি। কিন্তু চাঁদার ব্যাপারে আলোচনা করলে আবার পরিস্কারভাবে করে থাকি। বক্তাদের মতো এদিক সেদিক ঘুরিয়ে বলি না। অর্থাৎ অন্য কথার সাথে চাঁদার আলোচনাকে যুক্ত করি না; বরং চাঁদার কথা বললে শুরু থেকেই পরিস্কারভাবে বলে থাকি।

এ পর্যায়ে আমি এও বলতে চাই যে, মানুষের কাছে চাঁদার কথা অপছন্দ কেন? এর কারণ এ নয় যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে কৃপণ। এমনকি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, তাদের দরিদ্রতাও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়; বরং হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ অন্যান্য দেশের মুসলমানদের চেয়ে বেশি দান করে থাকে। কৃপণতা ও দরিদ্রতা যেখানে অন্তরায় নয়, তারপরও অপছন্দ হওয়ার কারণ আর কী হতে পারে? অপছন্দ হওয়ার কারণ হল, চাঁদা আদায়কারীদের

www.banglakitab.weebly.com

মধ্যে কারো কারো লেনদেনে অস্বচ্ছতা। অর্থাৎ কোন কোন চাঁদা আদায়কারী মানুষের পকেট থেকে চাঁদা বের করে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। দরিদ্র মুসলমানরা তো নিজেদের কলজে পানি করা পয়সা দান করছে আর অসাধু চাঁদা সংগ্রহকারী তা আত্মসাৎ করে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরছে। ফলে সর্বমহল থেকে চাঁদা সম্পর্কে অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। তাহলে বলুন তো, মানুষ চাঁদাকে কেন অপছন্দ করবে না।

তবে এ অপছন্দতার চিকিৎসাও মানুষের হাতে রয়েছে। তারা নিজেরাই এর চিকিৎসা করতে পারেন। আর তাহল, তারা সকলকে চাঁদা দিবে না; বরং এমন লোকদেরকে দিবে যাদের মাঝে লেনদেনে স্বচ্ছতা রয়েছে।

সারকথা, আমরা সাধ্যমত দান করতে থাকব। কেউ খেয়ানত করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। তবে কারো খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে পারলে তাকে আর চাঁদা না দেয়া; বরং এমন ব্যক্তির কাছে প্রদান করুন যার খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি। (উত্তম হল মাদরাসা ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অবস্থা নিজে যাচাই করে নিবেন। এতে আশ্বস্ত হতে পারলে দান করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করবেন না।) আর যারা আর্থিক সহযোগিতা করতে অপারগ তারা দোয়া করবেন। এটাও অনেক বড় সহযোগিতা। কারো দ্বারা যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে সে যেন আল্লাহর ওয়াস্তে এ কাজে প্রতিবন্ধক না হয়।

শিশু-কিশোরদের থেকে চাঁদা গ্রহণ

বর্তমানে চাঁদা সংগ্রহকারীরা নাবালেগ শিশু-কিশোরদের কাছ থেকেও চাঁদা গ্রহণ করে। এটা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। নাবালেগ বাচ্চারা মনের খুশিতে তাদের সম্পদ থেকে চাঁদা দিতে চাইলেও দিতে পারবে না। এমনকি তাদের অভিভাবকগণও দিতে পারবেন না। অবশ্য পিতা-মাতা যদি নাবালেগকে মালিক না বানিয়ে নিজের পক্ষ থেকে টাকা-পয়সা তার হাতে প্রদান করেন তা থেকে দান করতে সমস্যা নেই। কিন্তু শিশুদের মালিকানায় এসে যাওয়ার পর কাউকে দেয়া জায়েয হবে না। [কামালাতে আশরাফী-১০১]

চাঁদা আদায়ের কতিপয় শর্ত

১. হাদিয়া, সদকা, করজ (ঋণ) এবং দান ইত্যাদি হারাম সম্পদ থেকে না নেয়া। কেউ যদি হারাম সম্পদ থেকে দিতে চায় তাহলে পরিস্কারভাবে না করে দিবে।

www.banglakitab.weebly.com

২. কারো সামর্থ্যের বাইরে চাঁদা গ্রহণ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো সামর্থ্যের বেশি চাঁদা নিতেন না। তবে যাদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ 'ইতমিনান' হত যে, তাদের পূর্ণ মাত্রায় তাওয়াক্কুল রয়েছে তাহলে গ্রহণ করতেন। যেমন হযরত আবুবকর (রা.)-এর সমুদয় সম্পদ গ্রহণ করেছিলেন।

৩. দাতাদের মনে চাপ না থাকা। অর্থাৎ এমন পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকতে হবে যাতে দাতাদের মনে চাপ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِهٖ

[কারো মনতুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ বৈধ নয়]

৪. অপমানজনকভাবে চাঁদা গ্রহণ না করা। কারণ, চাঁদা গ্রহণ করার একটি পদ্ধতি এরূপ যে, দাতার মনে চাপ পড়ে না কিন্তু গ্রহীতা তার দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়। হাদীস শরীফে ভিক্ষার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা এ কারণেই। আর এ কারণেই যেখানে চাপ না হবে এবং হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা না থাকবে সেখানে প্রয়োজনের সময় চাওয়া জায়েয আছে।

হাদীসের সারকথা হল, আল্লাহওয়ালা কিংবা অনেক বেশি বিত্তশালীর কাছে চাও। [তিজারতে আখেরাত-৫৯]

অবৈধতার দু'টি কারণ

ভিক্ষা হারাম হওয়ার দু'টি হেতু রয়েছে। একটি হল অপমান। অরপটি হল মনের অসন্তুষ্টি বা চাপ। যখন এ দু'টির কোন একটিও না থাকবে তখন চাওয়া বৈধ হবে। সুতরাং বাদশার কাছে চাইলে তার জন্য চাপও হবে না এবং গ্রহীতাও হেয় প্রতিপন্ন হবে না। কেননা, যার কাছে কোটি টাকা রয়েছে সে পাঁচ-দশ টাকা দিলে তার ভাণ্ডারে কী ঘাটতি আসবে। আর দৃষ্টি থেকে পড়ার আশঙ্কা নেই এ কারণে যে, গ্রহীতা তার দৃষ্টিতে উঠেছিল কবে যে, পড়ে যাবে।

আর বুযুর্গদের কাছে চাওয়ার অনুমতিও এ কারণেই। কেননা, তাদের কাছে চাওয়ার মাঝে অপমান নেই। কারণ, তারা নিজেদেরকেই অন্যদের তুলনায় হেয় মনে করেন। প্রত্যেকের প্রতি তাদের দয়ার দৃষ্টি থাকে।

আর তাদের মাঝে চাপ এ কারণে থাকে না যে, তারা সব কিছু থেকে মুক্ত। তাঁরা কারো পরোয়া করে চলেন না। কাউকে দিতে না চাইলে স্বাধীনভাবে না করে দেন।

www.banglakitab.weebly.com

চাঁদা হালাল হওয়ার প্রধান শর্ত

যদি দাতার মনে কোন ধরনের চাপ থাকে তাহলে আমি তার চাঁদা গ্রহণ করাকে হালাল মনে করি না। কেননা, হাদীসে শরীফে স্পষ্ট এসেছে :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ (مسند)

[অর্থাৎ কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া হালাল নয়।]

লক্ষ্য করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে لا يحل (হালাল হবে না) বলছেন সেখানে এমন চাঁদা কিভাবে জায়েয হবে। বস্তুত, হালাল হওয়ার শর্ত হল, চাঁদা প্রদান অপছন্দ না হওয়া উচিত। রিয়া ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দিলেও বৈধ হবে কিন্তু চাপ থাকলে বৈধ হবে না। কারণ, রিয়ার সময় মনের সন্তুষ্টি বহাল থাকে। যার কারণে সম্পদ হালাল হয়ে যায়। কিন্তু রিয়ার কারণে আমল কবুল হয় না। [আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ-৯/১৮৩]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চাঁদার বৈধ-অবৈধ নানা পদ্ধতি

দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা জায়েয এবং পীড়াপীড়ি ও চাপ প্রয়োগ করা নাজায়েয

মাদরাসার দান ও চাঁদা সম্পর্কে সর্বদা আমার অভিমত হল, জোরাজুরি ও চাপাচাপি না করা। শুরু থেকেই আমি এ পদ্ধতিটি নাজায়েয বলে আসছি। এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াত থেকে এ সম্পর্কে একটি চমৎকার সমর্থন পেয়ে গেছি। এর পূর্বে কখনো তার প্রতি দৃষ্টি পড়েনি। সেটি হল পীড়াপীড়ি করে চাঁদা আদায় একরকম ভিক্ষা। আর সেটি নাজায়েয। আর তারগীব ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে চাঁদা আদায় জায়েয। কুরআন কারীমের এ আয়াতে তার প্রমাণ মিলে। ভিক্ষা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا

[তারা মানুষের কাছে যাচনা করে না।]

এ থেকে বোঝা যায় পীড়াপীড়ি ও জোরপূর্বক কিছু না চাওয়া উচিত।

www.banglakitab.weebly.com

অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَلتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

[তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে।]

বোঝা গেল, চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে তারগীব ও উৎসাহ প্রদান করার মাঝে কোন সমস্যা নেই। কেননা, দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর শিক্ষা-দীক্ষার ধারা সৃষ্টি করা ছাড়া সেটি সম্ভব নয়। আর বর্তমানে এ ধারা সাহায্য ও দান ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং দান করা একটি ভালো কাজের ভূমিকা। সুতরাং সেটিও ভালো কাজ; বরং আবশ্যকীয় বিষয়ের পূর্বশর্ত হওয়ার কারণে সেটিও আবশ্যকীয়।

যেমনিভাবে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য পীড়াপীড়ি করে চাঁদা আদায় করা উচিত নয়, তেমনিভাবে তারগীব ও উৎসাহ দান করা হলে সম্পদশালীদের জন্যও অস্বীকৃতি প্রকাশ না করা উচিত। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِن يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا الخ

[তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে তারপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে। [সূরা মুহাম্মদ : ৩৮]

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, পীড়াপীড়ি করে চাওয়ার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার মাঝে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কেবল তারগীব ও উৎসাহ প্রদানের পর অস্বীকৃতি জানালে কঠিন আযাবের আশঙ্কা রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, যাচনা করে চাঁদা আদায় করা খারাপ এবং শুধু তারগীব ও আহ্বানের দ্বারা চাঁদা আদায় করা ভালো। [দাওয়াতে আবদিয়্যত, মাকালাতে হেকমত-৫/১২৩]

হারাম চাঁদা

জনৈক চাঁদা আদায়কারী কোন এক জমিদার বাড়িতে এলো। সেখানে আমিও অবস্থান করছিলাম। জমিদার সাহেব তাকে দশ টাকা দিলেন। চাঁদা আদায়কারী বলে উঠল, জনাব, আপনি তো প্রতি বছর বিশ টাকা দিয়ে থাকেন। আজ দশ টাকা কেন দিলেন? এটা ছিল তার চাঁদা উত্তোলনের পদ্ধতি। সকলের সামনে লজ্জা দিয়ে সে চাঁদা সংগ্রহ করত। মনে রাখবেন, চাঁদার এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে

www.banglakitab.weebly.com

শরীয়তবিরোধী ও হারাম। বর্তমানকালে চাঁদা আদায়ের অধিকাংশ পদ্ধতি হারাম। কিন্তু চাঁদা আদায়কারীগণ এটাকে দীন মনে করছে। বস্তুত, এর নাম হল অনুভূতিহীনতা। সম্পদের জন্য দীন ও মান-মর্যাদা কোন কিছুরই পরোয়া করা হচ্ছে না। [আত্ তাবলীগ-৪/১২৫]

জোরপূর্বক চাঁদা আদায়

কেউ কেউ মসজিদ-মাদরাসার জন্য জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে। এটা পূর্বের পদ্ধতির চেয়েও খারাপ। কারণ, যদি সে নিজের জন্য করত তাহলে তো পার্থিব উপকার লাভ হত। আর যখন আল্লাহর জন্য এমনটি করেছে তখন আল্লাহও সন্তুষ্ট হলেন না এবং নিজের কাছেও কিছু থাকল না। সুতরাং خسر الدنيا والاخرة [দুনিয়া আখেরাত উভয়টি হাতছাড়া] অবস্থা হয়ে গেল। নিজেও ভোগ করতে পারল না, অন্যদিকে আল্লাহও সন্তুষ্ট হলেন না।

আর এটা হারাম হওয়ার কারণ হল, হাদীস শরীফে এসেছে :

أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ

[কারো সম্পদ তার মনতুষ্টি ছাড়া বৈধ নয়।]

[দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৪/৩৯]

চাপের মুখে দেয়া চাঁদার হুকুম এবং চাপ দিয়ে চাঁদা আদায় করার বিধান

কেউ জিজ্ঞাসা করল, অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও যদি কেউ কারো চাপের কারণে ভালো কাজ মনে করে কোন ভালো কাজে চাঁদা প্রদান করে তাহলে তার বিধান কী?

হযরত বললেন, দাতা সওয়াব পেয়ে যাবে। কিন্তু গ্রহীতা যদি জানতে পারে যে, এ টাকা আমার চাপের মুখে দিয়েছে তাহলে তা নেয়া জায়েয হবে না।

আরো জিজ্ঞাসা করা হল যে, অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও যদি কেউ সুনাম অর্জনের নিয়তে দিয়ে থাকে তাহলে তার বিধান কী?

হযরত বললেন, এ অবস্থায় 'রিয়া' এবং 'জবর' উভয়টি পাওয়া গেছে। এ জন্য এ টাকাও গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

জিজ্ঞাসা করা হল, দান কিংবা চাঁদা অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও জবরকারীর জন্য গ্রহণ করা যেমন নাজায়েয, দেয়াও কি নাজায়েয? বললেন, জ্বি, নাজায়েয। কেননা, গ্রহীতার জন্য যখন গ্রহণ করা জায়েয নেই তখন প্রদান করাও জায়েয হবে না।

www.banglakitab.weebly.com

কেননা, এটি পাপকর্মে সহযোগিতা, যা স্পষ্টই নাজায়েয। [ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ-৯/১৮৩]

লজ্জায় পড়ে দান করা

চাপ প্রয়োগ কিংবা লজ্জা প্রদানের মাধ্যমে চাঁদা আদায় করা দ্বিগুণ গুনাহ। বায়হাকী ও দারাকুতনী বর্ণিত হাদীস তার দলীল।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا لَا تَظْلِمُوْا اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাবধান, তোমরা জুলুম করো না। সাবধান কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এখানে অনেকের ভুল হয়ে যায়। তারা বলেন, আমাদের কী প্রভাব রয়েছে যে, আমাদের চাপে মানুষ দান করবে। যে দেয়ার সে খুশি মনেই দিবে। অথচ বাস্তবতা তা অস্বীকার করে। এটা দাতাদের কাছ থেকে জানা যেতে পারে।

দাতার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু মারফত তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে, তুমি কি খুশি মনে দান করেছ, নাকি চাপের মুখে কিংবা লজ্জায় পড়ে দান করেছে? তখন অতি সহজেই বিষয়টির সমাধান বেরিয়ে আসবে এবং এ থেকেই তার হুকুম জানা যাবে।

মেয়ে বিবাহের সময় মেয়েপক্ষ, ছেলে বিবাহের সময় ছেলেপক্ষ এবং মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণের সময় কর্তৃপক্ষ যেভাবে দাবি করে অর্থ সংগ্রহ করে সেগুলো লোকজন সামাজিক রীতিনীতি, লজ্জা কিংবা উদ্বুদ্ধকারীর উপর্যুপরি তাগিদে দিয়ে থাকে। কেউ হয়ত উদ্বুদ্ধকরণ ছাড়া স্বপ্রণোদিত হয়েই দেয় কিন্তু সেখানেও প্রদানের ভিত্তি হল রেওয়াজ। কেননা, সে জানে, না দিলে চাওয়া হবে কিংবা বদনাম করা হবে। এ ধরনের টাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল নয়। এভাবে চাওয়া এবং দেয়া ঠিক নয়। এ পদ্ধতিতে আদায়কৃত টাকা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আমরা তো নিজেদের জন্য চাই না; বরং আল্লাহর জন্য চাই। কিন্তু এ ওজরটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, পাপ সর্বাবস্থায় পাপ। দীনের

www.banglakitab.weebly.com

জন্য কোন পাপ কাজ করলে হালাল হয়ে যায় না; বরং শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দিক থেকেই তার জঘন্যতার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। শরীয়তের দিকটি হল, সে পাপকে সওয়াবের মাধ্যম বানাচ্ছে। আর হারামকে দীনের মাধ্যম বানানো এবং সওয়াবের বিশ্বাস রাখা জঘন্যতম পাপ। ফকীহগণ তো হারাম কাজে সওয়াবের আশা করাকে কুফর পর্যন্ত বলেছেন। আর যুক্তির আলোকেও মন্দ হওয়ার কারণ হল, কাজটি শরীয়তপরিপন্থী তরীকায় করার কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়নি। যা خَسِرَ الدنيَا وَالاخِرَةَ -এর মিসদাক। [হুকুকুল ইলম-৬০]

আবেগে প্রদত্ত চাঁদার বিধান

কোন ওয়ায়েজ ও বক্তা যদি দান করার প্রতি এমন আবেগময় ওয়াজ করেন যে, কারো কাছে কেবল দশটা টাকা ছিল আর সে আবেগের বশে দশ টাকাই দিয়ে দিল, তাহলে তার চাঁদা গ্রহণ করা ঠিক হবে না। প্রথমে তার আবেগ প্রশমিত হতে দাও, তারপর তাকে বলো, তোমার তো সারা মাসের আয় হল দশ টাকা। এখনও সামনে গোটা একটি মাস পড়ে আছে। তোমার পরিবার-পরিজন রয়েছে। তাদের জন্য ব্যয় করতে হবে। যদি দান করার আগ্রহ থাকে তাহলে এক টাকা দান কর।

এটা হল জাতীয় সহমর্মিতা। আজকাল মানুষ জাতীয় সহমর্মিতাকে গলা টিপে হত্যা করে দিয়েছে। হতদরিদ্ররাও চাঁদা থেকে রেহাই পায় না। কেউ কেউ মসলা পেষার পুতা বিক্রি করেও চাঁদা দিয়েছে বলে জানা গেছে। এসব অনৈতিক চাঁদার মধ্যে কী বরকত হবে?

আজ তো এমন মানুষের চাঁদা গর্বের সাথে গ্রহণ করা হয়, যারা বলে, আমি আমার কাছে কিছু রাখিনি। অন্যরাও বলে থাকে, অমুকের মাঝে জাতীয় সহমর্মিতা এমন প্রবল যে, ঘরের সবকিছু এনে দিয়ে দিয়েছে। আমি এসব দাতাদেরকে বলে থাকি, হুঁশের সাথে কাজ করো, জোশের সাথে নয়। [আত্ তাবলীগ-১৫/৪৪]

তদবিরের মাধ্যমে প্রভাবিত করে চাঁদা আদায়

কেউ কেউ তাওয়াজ্জুহ ও তদবিরের মাধ্যমে এমন কাজ উদ্ধার করে থাকে যা বাহ্যত ভালো মনে হলেও সেটি বৈধ হওয়ার মাঝে সংশয় রয়েছে। যেমন কারো কাছে মসজিদ কিংবা মাদরাসার সাহায্যের ধ্যান করে। এর ফলে তার মাঝে একটি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং সে দান করার প্রতি বাধ্য হয়ে যায়। অনেক

www.banglakitab.weebly.com

সময় দান করার পর আফসোস করে। তখন সে পরাভূত হয়ে বাস্তবতাকে উপলব্ধি না করে বাধ্য হয়ে যায়। এভাবে চাঁদা আদায় করা আর নেশাগ্রস্ত করে জমি লিখিয়ে নেয়া কিংবা আত্মসাৎ করা একই পর্যায়ভুক্ত।

চাঁদার একটি বিশেষ ধরণ এবং তার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : পানিপথের কম্বল বিক্রেতাগণ তাদের সমাজে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মসজিদের চাঁদার জন্য একটি পদ্ধতি এই আবিষ্কার করেছে যে, প্রতি কম্বলে এক পয়সা মসজিদের জন্য দিতে হবে। তা এভাবে আদায় করা হয় যে, কারো দোকানে কম্বল বিক্রি হলে চাঁদা আদায়কারী উপস্থিত হয়ে যায় এবং হিসাব করে প্রতি কম্বলে এক পয়সা করে আদায় করে আনে। উল্লেখ্য, এতে জোর-জবরদস্তি নেই। এমনকি কেউ একেবারেই না দিলে তাকে কোনরূপ নিন্দাও করা হয় না।

উত্তর : এ পদ্ধতিটিও জোরপূর্বক আদায় করার পর্যায়ভুক্ত। তাই নাজায়েয। এমন করা যেতে পারে যে, কারো কাছে গিয়ে মুখে কিছু বলা হবে না; বরং যারা দিতে ইচ্ছুক তারা নিজেরাই চাঁদা আদায়কারীর হাতে দিয়ে আসবে। কেননা, জবরদস্তি না করলেও চাওয়ার দ্বারা সে লজ্জিতবোধ করে এবং অস্বীকার করতে পারে না। অথচ মনে মনে রাজি থাকে না। আর এটাই হল জবরদস্তি। [হুসনুল আযীয-৩/২৭]

স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীদের দানের বিধান

বিনা অনুমতিতে স্বামীর কোন কিছু দান করা স্ত্রীর জন্য জায়েয না। যেসব জিনিস স্ত্রীর মালিকানায় রয়েছে সেখান থেকে দান করতে হলে অনুমতি লাগবে না। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক্ষেত্রে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে নিবে। [মালফুজাতে কামালাতে আশরাফিয়া-১০৩]

মহিলাদের সমাবেশে বয়ান করে চাঁদা আদায় করা

কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহকারীকে দেখা যায়, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলাদের মাহফিল ও সভায় বয়ান করে। যাতে বেশি চাঁদা পাওয়া যায়। বাস্তবেই তাদের বয়ান মহিলাদের উপর বেশ প্রভাব ফেলে এবং প্রচুর চাঁদা উঠে আসে। এর দু'টি কারণ। একটি হল, চাঁদা দিতে মহিলাদের কোন দ্বিধা-সংশয় লাগে না। কারণ, সম্পদ তো সে নিজে উপার্জন করেনি। স্বামীর উপার্জিত সম্পদ থেকে

www.banglakitab.weebly.com

দিতে সমস্যা কী? দ্বিতীয় কারণ হল, তাদের বুদ্ধি কম হয়ে থাকে। ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপট না বুঝেই জোশের বশে হাতে যা থাকে ব্যয় করে ফেলে। তৃতীয় আরেকটি কারণ হল, তাদের অন্তর কোমল। হৃদয় বিগলিতকারী ক্ষুদ্র ঘটনা শোনালেই তাদের হৃদয় গলে পানি হয়ে যায়। আর সকল বক্তার একটি হাদীসই ভালো মুখস্থ। সেটি হল :

يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْمِنْ حُلِيِّكُنَّ

হে নারী জাতি! তোমরা তোমাদের অলঙ্কার থেকে হলেও দান করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, উদাসীনতা অবহেলার কারণে বেশি সংখ্যক মহিলা দোযখে যাবে। কিন্তু এর মর্ম এই নয় যে, মহিলারা মুক্তি থেকে নিরাশ হয়ে যাবে; বরং হাদীসের মর্ম হল, উদাসীনতা ও অবহেলা বর্জন করে বেশি বেশি নেক আমল করো। নেক আমলের মধ্যে দান-সদকা করাও একটি অন্যতম আমল। হাদীসের মর্ম এই নয় যে, দান করাই মুক্তি পাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা।

বর্ণিত হাদীস শরীফে এ বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম من حليكن (তোমাদের অলঙ্কার থেকে) বলেছেন। من حلى الزوج (তোমাদের স্বামীদের অলঙ্কার থেকে) বলেননি। মর্ম এই দাঁড়াল যে, দান-সদকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে নিজস্ব মালিকানা অলঙ্কারের ক্ষেত্রে, স্বামীর মালিকানাভুক্ত সম্পদে নয়। [আত্ তাবলীগ, কিসাউন্ নিসা-৭/৩৮]

ব্যক্তিগত পর্যায়ে চাঁদা আদায় করার বিধান

বর্তমানে চাঁদা আদায়ের বেলায় খুবই অসাবধানতা ও অসতর্কতা চলছে। প্রায় সব মাদারাসাতেই সাবধানতা ও সতর্কতার সাথে কাজ করা হয় না। আর সবেচেয় বড় অসতর্কতা হল ব্যক্তিবিশেষ চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে। এতে অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া চাঁদা না দিলে কৃপণ সাব্যস্ত হতে হয়। যার সারকথা হল, একজন মুসলমানকে অযথা অভিযুক্ত করা। আর এটা কিছুতেই জায়েয নয়। আমি সাধারণ এবং বিশেষ পদ্ধতির চাঁদা আদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য করি তার উদ্দেশ্য হল, কোন মুসলমানের উপর যেন চাপ সৃষ্টি না হয় এবং তার দুর্নামও না হয়। সাধারণ সম্বোধনে চাঁদা চাওয়া এক জিনিস, আর বিশেষ সম্বোধনে চাঁদা চাওয়া আরেক জিনিস। দু'টির মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশেষভাবে চাঁদা

www.banglakitab.weebly.com

আদায়ের প্রতিক্রিয়া হল, কৃপণতা প্রকাশ, যার ব্যাপারে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا الخ

[তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে তারপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে। [সূরা মুহাম্মদ : ৩৮]

কারণ, পীড়াপীড়ি বিশেষ সম্বোধনের ক্ষেত্রেই হতে পারে। তারপর সাধারণ সম্বোধনের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে :

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

শোনো, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে

এ দাওয়াত ও আহ্বানটি হচ্ছে সাধারণ সম্বোধন। আর উভয়টির মাঝে ব্যবধান থাকার কারণেই পীড়াপীড়ি করে চাঁদা চাওয়ার পর কৃত কৃপণতার সমালোচনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে সাধারণ আহ্বানের দ্বারা চাঁদা চাওয়ার পর কৃত কৃপণতার সমালোচনা করা হয়েছে। তাই তো ইরশাদ হয়েছে :

فمنكم من يبخل............وان تتولوا الخ

তারপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাব মুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না। [সূরা মুহাম্মদ : ৩৮]

জেনে রাখুন, সে ভিক্ষা নিষিদ্ধ যার মধ্যে পীড়াপীড়ি থাকে। মোটকথা, যে পদ্ধতির মধ্যে অন্তরে চাপ ও ব্যথা অনুভব হয় সেটাই পীড়াপীড়ি এবং এখানে কৃপণতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। পীড়াপীড়ি দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল, বাহ্যিক, অপরটি হল, অভ্যন্তরীন। চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে চাঁদা আদায়ই পীড়াপীড়ির অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই হল অভ্যন্তরীণ পীড়াপীড়ির উদাহরণ।

আমি মনে করি, যেসব পদ্ধতি অবৈধ তাই ভিক্ষা। আর যা বৈধ তা 'তারগীব' বা উদ্বুদ্ধকরণ। তারাগীবের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা নিন্দনীয়। [তিজারতে আখেরাত-৬৪]

www.banglakitab.weebly.com

একজন বড় আলেমের সাথে আমার এ মর্মে কথা হয়েছে যে, বিশেষ পদ্ধতিতে চাঁদা আদায় করা জায়েয নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দলীল কি? আমি এই হাদীসটি পড়ে শোনালাম-

أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ

সাবধান, কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা বৈধ নয়।

তখন তিনি বললেন, এটা তো ঠিক আছে কিন্তু এখানে সে পর্যায়ের হারাম নয়। তার কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, আগামীতে তো বলবে মাকে বিবাহ করা যদিও হারাম কিন্তু সে পর্যায়ের নয়। [মালফুজাতে হাকীমুল উম্মত-২/৫৩]

কূটকৌশল এবং ধূর্তামির আশ্রয়ে চাঁদা আদায়

চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা বাণিজ্যিক অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যেমন কোন হতদরিদ্র ব্যক্তি এক টাকা চাঁদা দান করল। এবার সকলকে আশ্চার্যান্বিত করার জন্য এ টাকাটাকে বরকতময় টাকা আখ্যা দেয়া হল। বরকতময় হওয়ার যুক্তি হিসেবে বলা হল যে, দানকারী একজন হতদরিদ্র। সীমাহীন আবেগ ও ইখলাসের পরিচয় দিয়ে তিনি তার সামর্থ্যের বেশি দান করেছেন। তাই তার দানকৃত টাকাটা খুবই বরকতময়। এখন টাকাটা নিলামে তুলে বলা হয়, এটা বেশি মূল্যে খরিদ করার মতো কে আছেন? কেউ দশ টাকা বলে, কেউ একশ' টাকা বলে, কেউ হাজার টাকা বলে।

মোটকথা, লোকজন আবেগতাড়িত হয়ে সে টাকাটার বড় বড় মূল্য বলতে থাকে। প্রথমতঃ তা 'সুদ' হওয়ার কারণে সম্পূর্ণরূপে হারাম। দ্বিতীয়তঃ এটি একটি কুটকৌশল হওয়ার কারণেও হারাম। অনেক সময় চাঁদা সংগ্রহকারীগণ কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে নিজেরাই দাঁড় করিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেশি চাঁদা সংগ্রহ করে থাকে। শরীয়ত কোন পলিসি ও অশুভ কৌশলকে সমর্থন করে না। এ ধরনের আচরণকে শরীয়ত নোংরা মনে করে। চাঁদার ক্ষেত্রে শরীয়তের অভিরুচি হল সততা, নিষ্ঠা ও অনাড়ম্বরতা। আর এসব চাঁদা ইখলাসের ভিত্তিতে দেয়া হয় না; বরং মানুষকে দেখানো ও নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। মনে রাখবেন, এমন আবেগের মুহূর্তে যখন মানুষের বিবেক স্থির থাকে না এবং পরবর্তীতে আফসোস করে তখন চাঁদা গ্রহণ করা জায়েয নেই। আবেগের মুহূর্তে কেউ চাঁদা দিলে গ্রহণ করবে না। আবেগ প্রশমিত হওয়ার পর গ্রহণ কর। [তিজারাতে আখেরাত-৬৪]

www.banglakitab.weebly.com

চাঁদার কতিপয় মন্দ দিক

কোন কোন স্থানে স্থায়ীভাবে চাঁদা দেয়ার অঙ্গিকারকারীদের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ তা চালু রাখেন। তখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখেন না যে, তারা তাদের নিজস্ব মালিকানা থেকে চাঁদা আদায় করছে, নাকি মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া যৌথ সম্পদ থেকে আদায় করছে। যদি যৌথ সম্পদ থেকে দিয়ে থাকে তাহলে তাতে কোন এতীম, অনুপস্থিত কিংবা চাঁদা দিতে অসম্মত ব্যক্তির মালিকানা আছে কিনা। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির পরিধানকৃত কাপড় মাদরাসায় গ্রহণ করার সময়ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের বালেগ-নাবালেগ কিংবা সম্মতি-অসম্মতির কোন খোঁজ খবর নেয়া হয় না।

স্থায়ী চাঁদার মধ্যে বছরের শেষে যা বাকী থেকে যায় সেগুলোকে বার্ষিক রিপোর্টের সাথে ছাপিয়ে প্রকাশ করা একটি গর্হিত কাজ মনে হয়। এর দ্বারা চাঁদা দাতার ওয়াদা খেলাফী প্রচার করা ও গীবত করা হয়। কানপুর মাদরাসায় তার সংশোধন এভাবে করা হয়েছিল যে, রিপোর্ট ও প্রতিবেদনে কেবল উসূলকৃত চাঁদার হিসাব লেখা হয়েছিল। আর অনাদায়কৃত চাঁদার হিসাব মাদরাসার বিশেষ রেজিস্টারিতে লিপিবদ্ধ করে চিঠির মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেয়া হত। এ স্মরণ করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আমার মতে আবশ্যকীয় ও তাকীদপূর্ণ শব্দ ব্যবহার না করা উচিত; বরং সুস্পষ্টভাবে লিখে দেয়া যে, জনাবের অবগতির জন্য পত্র প্রেরণ করা হল। আগ্রহী হলে পাঠিয়ে দিতে পারেন। [আত্ তাবলীগ, আহকামুল মাল-১৫/৪৫]

বর্তমানে বেশিরভাগ চাঁদার ক্ষেত্রে লিখে দেয়া হয় যে, যদি চাপ না হয়, তাহলে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। এমন ভদ্র কে আছেন, যিনি বলবেন, আমার কিছু চাপ আছে। এমন লোকের সংখ্যা বিরল। [হুকুকুল ইলম-৬৮]

চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে সাধারণ এবং বিশেষ সম্বোধনের বিস্তারিত আলোচনা

১. মুসলিম সমাজে মাদরাসার অস্তিত্ব অপরিহার্য। আর তার অস্তিত্ব বহাল থাকার ক্ষেত্রে চাঁদার বিরাট প্রভাব রয়েছে। কিন্তু চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বর্তমানে অসংখ্য খারাবীর সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্য হতে বড় খারাবী হল চাঁদা সংগ্রহকারী আলেমদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়। যা সাধারণ মানুষের জন্য বিষের মতো ক্ষতিকর। অপর দিকে চাঁদা সংগ্রহকারীরাও অনেক ক্ষেত্রে সতর্ক হন না। এমন পন্থা অবলম্বন করেন যার দ্বারা দাতাগণ লজ্জিতবোধ করে কিছু দিয়ে দেন। এমন লজ্জিত অবস্থার চাঁদা গ্রহণ করা জায়েয নেই।

www.banglakitab.weebly.com

এ জন্য উত্তম পদ্ধতি হল, চাঁদা বিশেষভাবে না উঠিয়ে সাধারণভাবে উঠানো। আর বিশেষ সম্বোধন কেবল ঐ অবস্থায় করা জায়েয যেখানে সম্বোধনকারী কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি না হয়, যার প্রভাবে মানুষ চাঁদা দিতে বাধ্য হয়ে যায়। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-১২২]

২. চাঁদা সংগ্রহকারীগণ চাপ বা লজ্জা দেয়ার পন্থা অবলম্বন করবেন না; বরং তারগীব ও উদ্বুদ্ধকরণের চেষ্টা করবেন। তারগীবের দু'টি পন্থা রয়েছে। সাধারণ এবং বিশেষ সম্বোধন। বিশেষ সম্বোধন কেবল এমন অকৃত্রিম বন্ধুদের ক্ষেত্রে হবে যারা নির্দ্বিধায় অস্বীকৃতি জানাতেও সক্ষম। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১৯/৭৭]

৩. সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আর যদি এমন কোন কল্যাণপ্রার্থী বিদ্যমান থাকেন যিনি ভালো খাতে দান করতে আগ্রহী এবং পরিপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, বিশেষভাবে সম্বোধন করলে তার ইচ্ছা ও স্বাধীনতার মধ্যে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটবে না এবং যা কিছু করবেন অন্তরের সন্তুষ্টিতেই করবেন, তাহলে এসকল শর্তে তাকে বিশেষভাবে সম্বোধন করলেও সমস্যা নেই। [হুকুকুল ইলম-৬৩]

৪. সাধারণ সম্বোধনের পন্থায়ই চাঁদা তোলা উত্তম। এ সাধারণ সম্বোধনেও যদি কেউ সম্বোধনকারীর প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তখন তার কাছ থেকে চাঁদা না নেয়া; বরং বলে দেয়া জলসা শেষ হলে কারো কাছে জমা করে দিন।

চাঁদা সংগ্রহের বৈধ পন্থাসমূহ

১. চাঁদার একটি জায়েয পদ্ধতি হল, মুসলিম জনসাধারণের মাঝে ঘোষণা করে দেয়া যে, অমুক মাদরাসার কিংবা অমুক ব্যক্তির জন্য চাঁদা উঠানো হচ্ছে, কারো মনে চাইলে সেখানে দান করতে পারেন। [আত্ তাবলীগ-১৪/১২৫]

২. মাদরাসা এমদাদুল উলূম থানাভবনের একটি ঘটনা। আমি মাদরাসার চাঁদা সংগ্রহের পন্থা এরূপ নির্ধারণ করেছিলাম যে, একটি কাগজে লিখে দেয়া হত যে, মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদার প্রয়োজন। কেউ এতে শরিক হতে চাইলে নিজের নাম এবং টাকার পরিমাণ নিজ হাতে লিখে দিবেন। কোন ছাত্রের হাতে কাগজটি দিয়ে বলা হত অমুকের কাছে নিয়ে দাও। মুখে কিছু বলবে না। তিনি কিছু লিখুক বা না লিখুক কাগজটি নিয়ে চলে আসবে। এ পদ্ধতির চাঁদা সম্পূর্ণ হালাল।

www.banglakitab.weebly.com

যেসব মৌলভী ওয়াজ করে হাদিয়া গ্রহণ করেন কিংবা চাঁদা কালেকশন করেন, তাদের ওয়াজে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। [হুসনুল আযীয-২/৫]

৩. যে কাজের জন্য চাঁদার প্রয়োজন হবে কেবল সে বিষয়টিরই ঘোষণা করে দেয়া যথেষ্ট। এ ঘোষণায় যদি কেউ দান করে তাহলে কবুল করবে। অন্যথায় আলেমগণ ধনীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে চাঁদা চাওয়া খুবই অপছন্দীয় বিষয়। [মালফুজাতে হাকীমুল উম্মত-২/২৩]

এমনটি কখনো চিন্তা করবে না যে, এভাবে কি কেউ চাঁদা দিবে। এটি ভুল চিন্তা। যতটুকু আসার তা আসবেই। এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। তাই কখনোই এ ওয়াসওয়াসার শিকার হবে না। [তাজদীদে তালীম ও তাবলীগ-৬৮]

দাতাগণকে দোয়ার আবেদন না করা উচিত, গ্রহীতাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই দোয়া করা উচিত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তাই আদব। এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত আদব হল, দাতাগণ প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকবেন না কিন্তু গ্রহীতারা নিজেদের পক্ষ থেকেই কৃতজ্ঞতা প্রকশ করবে। আমি বলি, দাতাগণ দোয়ার আবেদনই করবেন না। অবশ্য গ্রহীতারা নিজেরাই দোয়া করবে। তোমাদের পক্ষ থেকে দোয়ার কামনা কেন হবে। আল্লাহ তাআলা তো বলেন :

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিনিময় এবং শোকরকে নাকচ করেছেন। আর দোয়াও এক প্রকারের বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা। কেননা, দোয়াও বিনিময় দেয়ার একটি মাধ্যম। সুতরাং দোয়াও বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর ولاشكورا দ্বারা জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কামনা করাও উচিত নয়। অবশ্য গ্রহণকারীগণের প্রতি দোয়া করার নির্দেশ রয়েছে। তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে দোয়া করবে। তাই তো পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ الخ

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও বরকতময় করবে ও তাদেরকে দোয়া দিবে। [সূরা তাওবা : ১০৩] [হুসনুল আযীয-৩/৩০]

www.banglakitab.weebly.com

আলেমগণ হলেন সমাজের মুকতাদা ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাদের জন্য আবশ্যক হল, তারা যেন মানুষের দৃষ্টি থেকে না পড়েন। আর এটি লাভ করা যায় অমুখাপেক্ষিতার মাধ্যমে। চাঁদার প্রয়োজন হলে সাধারণভাবে কালেকশন করতে অসুবিধা নেই। কেননা, এতে অপমান নেই। আর বিশেষ কালেকশনের ক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আমি অপমানিত হব না এবং সেও আমার কারণে অন্তরে চাপ অনুভব করবে না, তাহলে জায়েয। [তিজারাতে আখেরাত-৮৮]

আলেমদের চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে কতিপয় মনীষীর উক্তি

হযরত মাওলানা মামলুক আলী [রহ.]-এর সূত্রে আমার কাছে একটি বর্ণনা পৌঁছেছে যে, হযরত শাইখুল আরব ওয়াল আজম শাইখুলহিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান [রহ.]-এর কাছে কেউ আপত্তি পেশ করল যে, মাদরাসার চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক খারাবী পরিলক্ষিত হয়। জনগণের মাঝে ইলম ও আলেমদের ব্যাপারে তুচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়। আবার চাঁদা সংগ্রহ না করা হলে মাদরাসার কার্যক্রম কিভাবে চলবে? হযরত শাইখুলহিন্দ [রহ.] বললেন, চাঁদা গ্রহণ করো তবে গরিবদের কাছ থেকে গ্রহণ করো।

হযরত থানভী [রহ.] উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, নিঃসন্দেহে এটি সঠিক চিকিৎসা। কারণ, দরিদ্র লোকেরা চাঁদা সংগ্রহকারী আলেমদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না; বরং সম্মানের সাথে প্রদান করে। আর যা কিছু দান করে তা খুশি মনে প্রদান করে। যার ফলে তাতে বরকতই বরকত পরিলক্ষিত হয়। তবে এখানে একটি প্রশ্ন উদ্রেক হয় যে, দরিদ্রদের কাছ থেকে কতটুকু চাঁদা পাওয়া যাবে? আমি বলি, এ চিন্তাটা প্রথমতঃ এ কারণে সঠিক নয় যে, পৃথিবীতে গরিবদের সংখ্যা সর্বদা ধনীদের চেয়ে বেশি। গরিবরা মিলে যদি এক আনা করে দেয়া শুরু করে তাহলে লাখো টাকা জমা হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ কথা হল, যদি বাস্তবেই চাঁদা কম আদায় হয় তাহলে সে অনুপাতেই কাজ করো। বাজেটের চেয়ে বেশি কাজ করবে না। সামর্থ্যের বেশি বোঝা গ্রহণ করার কী প্রয়োজন? [আনফাসে ঈসা-১/২৮৮]

যেসব গরিবদের থেকে চাঁদা গ্রহণ করা হবে

এক ব্যক্তি বলল, ধনীদের সাথে সম্পর্ক না রেখে মাদরাসার কাজ চলবে না। আমি বললাম, আল্লাহ বলেন, اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ (আমি আমার বান্দার ধারণা

www.banglakitab.weebly.com

অনুযায়ী আমল করি।) যেহেতু তোমাদের ধারণা এরূপ তাই তোমাদের কাজ চলবে না।

যদি আলেমগণ সকলেই অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করেন তাহলে ধনীরা তাদের দ্বারে আসা শুরু করবে। আমি মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে চাঁদা উঠাতে নিষেধ করি না। তবে আমি দু'টি জিনিস অবশ্য পালনীয় মনে করি। একটি হল, চাঁদা আহ্বানের সম্বোধন হবে সাধারণ। বিশেষভাবে কারো নাম ধরে না চাওয়া। আরেকটি হল, চাঁদা কেবল গরিবদের থেকে আদায় করা। আর গরিব বলতে হতদরিদ্র উদ্দেশ্য নয়; বরং ধনী মুখলিসও তাতে শামিল আছে। ধনীদের মাঝেও বিভিন্ন ধরনের লোক রয়েছে। ধনীদের মধ্যেও দুনিয়াদার এবং দীনদার লোক রয়েছে। তাদের কাছে সম্পদের দরিদ্রতা নেই; বরং বিনয় ও ইখলাসের দরিদ্রতা রয়েছে। আরেকটি দরিদ্রতা কুরআনের আয়াত ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّـةُ وَالْـمَسْكَنَةُ -এর মিসদাক। এ দরিদ্রতা হল ভর্ৎসনা ও নিন্দার। অনুরূপভাবে দরিদ্রতা দুই ধরনের রয়েছে।

১. ঐচ্ছিক দরিদ্রতা। যার মূলে রয়েছে সাধনা।

২. চাপিয়ে দেয়া দরিদ্রতা। এটি আযাব স্বরূপ। [ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ-৬/৪১৮]

আলেমদের চাঁদা কালেকশনের ব্যাপারে হযরত থানভী [রহ.]-এর অভিমত

আলেমদের চাঁদা কালেকশনের দ্বারা তো দীনের বড় অসম্মানী হচ্ছে। সাধারণ জনগণ মনে করে, আলেমরা বুঝি নিজেদের জন্যই এত দৌড়ঝাঁপ পারছে। এ জন্য আমার অভিমত হল, আলেমগণ কিছুতেই চাঁদা কালেকশনে যাবেন না; বরং দীনের কোন কাজ করতে হলে সমাজের গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের একত্রিত করে বলে দিবেন, দীনের হেফাজতের জন্য অমুক কাজটি করা দরকার। আপনারাও চিন্তা করে দেখুন এর প্রয়োজন রয়েছে কিনা। যদি আপনাদের দৃষ্টিতেও প্রয়োজনীয় মনে হয় তাহলে সকলে মিলে এ কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

আলেমগণ মূল কাজ করবেন। সম্পদশালীগণ অর্থের যোগান দিবেন। আর যদি সমাজের গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বলে এ কাজের প্রয়োজন নেই; বরং এটি অনর্থক তাহলে আলেমদের পক্ষে চাঁদা কালেকশনের প্রয়োজন নেই। সে কাজ বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকবেন। ব্যবসা, চাষাবাদ কিংবা অন্য কোন

www.banglakitab.weebly.com

পেশায় লিপ্ত হোন এবং অবসর সময় যতটুকু সম্ভব দীনের কাজ করুন। এ অবস্থায় কেয়ামতের দিন আলেমদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। যদি করতে হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দিবেন, আমরা তো মুসলমানদের সামনে দীনি খেদমতের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলাম। তারা এটাকে অনর্থক বলেছে এবং অর্থের ইন্তেজাম করেনি। আর আমাদের চাঁদা কালেকশনের কারণে দীনের অসম্মানী হচ্ছিল বিধায় আমরা তা থেকে বিরত থেকেছি। জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব আমরা দীনের কাজে জড়িয়ে ছিলাম। তখন এর জবাবদিহিতার ভার তাদের কাঁধে গিয়ে পড়বে যারা দীনের খেদমতকে অনর্থক আখ্যা দিত। আলেমগণ এভাবে কিছু কাজ করলে দেখতে পাবেন যে, জনগণ সংশোধিত হয়ে গেছে। তখন তারা নিজেরাই চাঁদা তুলে তুলে নিয়ে আসবে।

আমার মতে আলেমদের দ্বারা চাঁদা কালেকশন করাবেন না। তাদেরকে চাঁদা আদায়ের কাজে নিযুক্ত করবেন না। এতে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা কমে যায়। আমার মত হল, চাঁদা কালেকশনের কাজটি সমাজের ধনাঢ্যশ্রেণী করবেন। তাদের কালেকশনের প্রভাবও বেশি হবে। কেননা, তারা নিজেরাও দিবেন। আলেমদের ব্যাপারে তো এ ধারণা হবে যে, তারা কেবল অন্যদেরকেই দিতে বলে, নিজেরা কিছুই দেন না। ধনীদের বেলায় এ মন্দ ধারণাটি হবে না। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা দান করে সে অন্যের পকেট থেকে পঁচিশ টাকা বের করতে পারে। আর এটা ধনীদের দ্বারা সম্ভব। এ জন্য আলেমদের এ কাজ না করা উচিত। তাছাড়া এ কাজ আলেমদের মূল যিম্মাদারী পালনের পথে প্রতিবন্ধকও বটে।

আলেমদের দ্বারা ঐ কাজ করাও যা তাদের কাজ। অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে দীন শিক্ষা করো। কিন্তু বর্তমানে আলেমদের দ্বারা ঐসব কাজ করানো হয় যা তাদের কাজ নয়। মাহফিলে আলেমদেরকে কেবল এজন্য দাওয়াত দেয়া হয় যে, তাদের মুখে হাদীস কুরআন শুনে মানুষ চাঁদা দিতে উদ্বুদ্ধ হবে, বেশি চাঁদা পাওয়া যাবে। আশ্চর্য লাগে, আলেমগণ তাদের মূল কাজ ছেড়ে কিসের জন্য 'বেগার' খাটছেন। এসব কাজ থেকে আলেমদের বিরত থাকা উচিত। [আত্ তাবলীগ-২/৭০]

দীনের খাদেম এবং চাঁদা সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الخ

www.banglakitab.weebly.com

এ আয়াত দ্বরা আরো কিছু জরুরি বিষয় জানা গেছে।

১. যেসব লোক أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ -এর মিসদাক ও সত্যায়নকারী তথা দীনের খাদেম তারা দুনিয়াদারদের সামনে নিজেদের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করবে না; বরং ধনীদের মতোই অমুখাপেক্ষী থাকবে। যা يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ দ্বারা বোঝা যায়

২. কারো কাছে কোন সম্পদ চাইবে না। لايسئلون الناس الحافا দ্বারা এটি বোঝা যায়। চাঁদার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এ বিধানের আওতায় পড়ে না। কেননা, উদ্বুদ্ধকরণ হল নেক কাজের প্রতি আহ্বান। এর মাঝে এবং ভিক্ষার মাঝে পার্থক্য নিম্নের আয়াত দ্বারা বোঝা গেল-

لَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ............هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

৩. দীনের খাদেমগণ তো কারো কাছে চাইবে না তবে অন্যদের উচিত হল, তাদের খোঁজ-খবর রাখা। দূরদর্শিতা ও নিদর্শন দ্বারা পরিচয় লাভ করে তাদের খেদমত করা। যা تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ দ্বারা বোঝা যায়।

৪. দানকারীগণ তাদের খেদমত করে অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না; বরং তাদের সেবা করতে পারা নিজেদেরই উপকার মনে করবে। যা وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ দ্বারা বোঝা যায়। [হুকুকুল ইলম-১৬]

আলেমগণকে কেন চাঁদা কালেকশন করতে হয় : মুসলিম জনগণের লজ্জা হওয়া উচিত

মুসলমানদের পানিতে ডুবে মরা উচিত যে, দীনের খাদেম উলামায়ে কেরামকে চাঁদা কালেকশন করতে হয়। দুঃখের কথা কী বলব, বর্তমানের মুসলমানগণ চায় আলেমগণই চাঁদা সংগ্রহ করবেন। হে মুসলমান জাতি! তোমাদের কি লজ্জা লাগে না যে, যেসব আলেমকে তোমরা নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে কর তাঁদেরকে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য করছ? তোমরা অর্থ সংগ্রহ করে আলেমদের হাতে সোপর্দ কর কাজ করার জন্য। [আত্ তাবলীগ-১৬/৭৯]

বর্তমানে অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, আলেমদেরকে চাঁদা সংগ্রহের কাজ থেকে বিরত রাখা জটিল হয়ে পড়েছে। আর চাঁদা কালেকশনের এ রেওয়াজ পৃথিবী থেকে বন্ধ হওয়াও কঠিন। কিন্তু মুসলিম জাতিকে বলি, তোমরা কেন

www.banglakitab.weebly.com

দীনের অসম্মান করছো? তোমরা এ খেদমতটি আলেমদের কাঁধে তুলে দিয়ে তাদেরকে কেন অপমানিত করছো? শুধু কি তারা নিজেরাই অপমানিত হচ্ছে; তাদের সাথে সাথে ইল্ম এবং দীনও অপমানিত হচ্ছে। আলেমগণ মানুষের সামনে লজ্জিত হোক জাতির আত্মমর্যাদা এটা কিভাবে সহ্য করে! [আত্ তাবলীগ-১/১৫৪]

মাদরাসা কর্তৃপক্ষের চাঁদা সংগ্রহ জাতির প্রতি অনুগ্রহ

মাদরাসা চালাতে হলে চাঁদার প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু আমরা আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই না। আর যদি ভিক্ষা করা ছাড়া আমরা আপনাদের কাছ থেকে গ্রহণ করি তাহলে আমরা অন্যের কর্মচারী সাব্যস্ত হব, নিজের নয়। অর্থাৎ আমরা নিজেদের জন্য চাই না।

আমাদের কী প্রয়োজন ছিল আপনাদের কাছে চাঁদা চাইতে গিয়ে অযথা তর্কবিতর্ক করা এবং উসূল করার পর তার সংরক্ষণ ও হিসাব নিকাশের ঝামেলা মাথায় নেয়া। তারপর সবচেয়ে কঠিন কাজ তথা প্রাপ্যদের কাছে তা পৌছে দেয়ার ঝামেলাটিও পোহাতে হয়। এসকল কাজ আপনাদের দায়িত্বে ছিল। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তা আঞ্জাম দিয়ে আপনাদের উপর দয়া করছি। যদি আমাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করেন, তাহলে আমাদেরকে একটি পয়সাও দিবেন না। আমাদের আরো অজস্র কাজ রয়েছে। মাদরাসায় সহযোগিতা করাকে যদি পুণ্যের কাজ মনে করেন তাহলে আমরাই কেন করব, আপনারাও করুন। [আল্ কাউলুল জালীল-৪৪]

আমাদের উপর দাতাদের কোন অনুগ্রহ নেই

দীনি কাজে চাঁদা প্রদানকারীদের জন্য আমাদের মুখ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত 'শুকরিয়া' শব্দটি বের হবে না। কেননা, আমাদের উপর চাঁদা প্রদানকারীদের কী অনুগ্রহ রয়েছে? দীনের সাহায্য করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। আপনারা মাহফিলে নিজের কাজের জন্যই আসেন এবং নিজের ফরয কাজ হিসেবেই দান করেন। পরিণামে আপনাদের জন্য রয়েছে সওয়াব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমাদের উপর আপনাদের কী অনুগ্রহ রয়েছে, যার শুকরিয়া আমাদেরক আদায় করতে হবে; বরং ইনসাফের কথা হল আপনারা আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কেননা, জলসার আয়োজন করা হয়েছে গোটা জাতির কল্যাণে। তারপরও আমরা তার দায়ভার গ্রহণ করে আপনাদের উপর দয়া করেছি কিনা।

www.banglakitab.weebly.com

আর এ কাজটি আমরা প্রথমে করেছি, তাই আপনারা আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তারপর আপনারা মাহফিল শ্রবণ করার জন্য এসেছেন এবং কিছু দানও করে অবসর হয়ে গেছেন। আমরা সেই যে মাহফিলের ইন্তেজাম থেকে কাজে নেমেছি, এখনও আমাদের কাজ শেষ হয়নি। আপনাদের কাজ তো এক ঘণ্টার। আর আমাদের কাজ মাসের পর মাসের, বছরের পর বছরের; বরং আজীবনের জন্য। এবার বলুন, জাতির কাজ আমরা বেশি করলাম, নাকি আপনারা। শুকরিয়া পাওয়ার যোগ্য আমরা, নাকি আপনারা? [আত্ তাবলীগ-১/১৬১]

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য

যেসব মাদরাসা কুরআন কারীমের প্রচার-প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর সাহায্য করুন। এসব মাদরাসার মুহতামিম ও পরিচালকদের শুকরিয়া আদায় করা মুসলিম জনসাধারণের উপর আবশ্যক। কেননা, তারা সকলকে ফরযে কেফায়া থেকে দয়ামুক্ত করে রেখেছেন। [আত্ তাবলীগ-২১/২২৭]

জনগণই আলেমদের মুখাপেক্ষী

আপনারা নিজেদেরকে কূয়ো এবং আমাদেরকে পিপাসিত মনে করেন। অথচ বাস্তবতা তার উল্টো। তার প্রমাণ হল, আমাদের কাছে দীন রয়েছে, যা আপনাদেরও প্রয়োজন। আর আপনাদের কাছে দুনিয়া রয়েছে, যা আমাদেরও প্রয়োজন। কিন্তু পার্থক্য হল এই যে, আমাদের কাছেও প্রয়োজন মতো দুনিয়া রয়েছে। যা দ্বারা আমরা জীবনভর অমুখাপেক্ষী থাকতে পারি। আর আপনাদের কাছে প্রয়োজন পরিমাণও দীন নেই। তাই আপনারা কিভাবে আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবেন। আর যদি দীনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করেন তাহলে এটা আপনাদের অনুভূতিহীনতার পরিচয় হবে। [হুসনুল আযীয-১৭১]

জনগণই মাদরাসার মুখাপেক্ষী

আমি এক জলসায় বলেছিলাম, তোমরা যদি আলেমদেরকে তোমাদের মুখাপেক্ষী মনে করো তাহলে তাদেরকে চাঁদা দেয়া বন্ধ করে দাও। সকলে জোটবদ্ধ হয়ে নিজেদের সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দাও। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের কোন পরোয়া নেই। আমরা কেউ চালের দোকান, কেউ আটা-ডালের দোকান এবং কেউ অন্য কিছুর দোকান নিয়ে বসে যাব। কিন্তু এ অবস্থায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করো। পঞ্চাশ বছর পর

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের কী হাশর হবে ; নাউযুবিল্লাহ! কেউ হবে ইহূদী, আর কেউ খ্রিস্টান এবং কেউ হিন্দু। কেননা, একমাত্র দীনি শিক্ষা মানুষকে উপরোক্ত বিপর্যয় থেকে হেফাজত করতে পারে। তোমরা সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার কারণে আলেমগণ দীনি তালীমের জন্য সময় দিবেন না। ফলে যা হওয়ার তা হবে। [কালিমাতুল হক-৩৬]

আলেম এবং জনগণের কর্মবণ্টন

চাঁদা সংগ্রহের কাজ তোমরা নিজেরা করো আর আলেমদের দ্বারা ঐ কাজ করাও যা তাদের মূল কাজ। অর্থাৎ দীনের তালীম ও তাবলীগ। তালীম ও তাবলীগের ক্ষেত্রে তারা যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন তাতে তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না। তোমরা আর্থিক যোগান দানের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করো। এতে আলেমগণ হস্তক্ষেপ করবে না। আর দাতা এবং সংগ্রহকারী সকলকে বলি, তারা যেন এ কাজকে তুচ্ছ মনে না করে। কেননা, চাঁদা চাওয়া আলেমদের পক্ষে অপমান হলেও সমাজের লোকদের জন্য অপমান নয়। কেননা, আলেমগণ চাঁদা আদায় করতে গেলে কেউ সন্দেহ করতে পারে যে, তিনি বুঝি নিজের পেটের দায়ে এসেছেন। পক্ষান্তরে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের চাঁদা আদায়ে এ সংশয়টি সৃষ্টি হয় না। এজন্য আলেমগণ চাঁদা আদায় করতে গেলে মানুষ চাঁদা দিতে দ্বিধা করে, আর সমাজের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ গেলে দ্রুত দিয়ে দেয়। বর্তমানে আলেমদেরকে দেখে মানুষ লুকিয়ে পড়ে। এটা বড়ই আফসোসের ব্যাপার। [আত্ তাবলীগ-১/১৫৫]

আমাদের দায়িত্ব হল, তোমাদের দীনের খেদমত করা, আর তোমাদের দায়িত্ব হল আমাদের খেদমত করা। ইনসাফের কথা তো এটাই। কিন্তু আজ ইনসাফ নেই। আমি আলেমদেরকে বলি, এ বেইনসাফীর অভিযোগ কোন মানুষের কাছে পেশ না করে সরাসরি আল্লাহর তাআলার কাছে পেশ করুন এবং নিজেদের কাজ করতে থাকুন। আল্লাহ তাআলা নিজেই তা শ্রবণ করবেন। আমি তো আমার কর্মপদ্ধতি এটাই নির্ধারণ করেছি। [আত্ তাবলীগ-১/১৫৮]

চাঁদা করা আলেমদের কাজ নয়, সমাজপতিদের কাজ

১. চাঁদা তোলা আলেমদের কাজ নয়। এটা দুনিয়াদারদের কাজ। আলেমগণ এভাবে চাঁদা সংগ্রহ করতে পারেন না। যেসব আলেম এভাবে চাঁদা কালেকশন করেন তারা ভালো কাজ করছেন না। মাদরাসার আর্থিক যোগান দেয়া সকল মুসলমানের দায়িত্ব। এটা হতে পারে না যে, আলেমগণ কাজও করবেন, আবার

www.banglakitab.weebly.com

বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদাও তোলবেন। চাওয়া ছাড়াই যদি মুসলমানগণ আমাদের নিকট টাকা পাঠিয়ে দেন তাহলে তা দ্বারা আমরা কাজ করতে থাকব। আর না পাঠালে আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন জানাব যে, অমুক কাজ করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু মুসলমানগণ অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করেনি। আর আমরা ভিক্ষা করার মধ্যে দীনের অপমান মনে করেছি। অতএব এ জবাবের পর আমরা পরিত্রাণ পেয়ে যাব। তারপর সাধারণ মুসলমানদের জিজ্ঞাসাবাদ হবে যে, তোমরা আর্থিক সাহায্য কেন করনি? [আত্ তাবীলগ-১৬/৯৭]

২. পরিষ্কার কথা হল, যার সাথে দীনের সম্পর্ক তাকে দিয়ে দুনিয়ার কাজ করানো অনুচিত।

৩. চাঁদা সংগ্রহের কাজ আলেমদের দায়িত্বে না থাকা উচিত। কারণ, এতে তাদের মানহানি হয়, ধনীদের মানহানি হয় না। [আল্ কাওলুল জলীল-৯৩]

৪. আলেমদের মুখে চাঁদার কথা শোভা পায় না। কারণ, লোকজন জঘন্যভাবে অপবাদ দিয়ে থাকে। তারা মনে করে পেটের দায়েই আলেমগণ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যারা এসব মনে করে, তাদের কাছে কখনো চাঁদার জন্য যাবে না। [হুসনুল আযীয-১/৫০৯]

চাঁদা আদায় করা আলেমদের জন্য অপরিহার্য নয়

আলেমদের কর্মপদ্ধতি তো তেমন হওয়া উচিত যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তো নির্দেশ ছিল :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দিই। [সূরা ত্বা-হা : ১৩২]

আলেমদের পন্থাও এটাই হওয়া উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলা হয়েছে :

اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ الخ

আপনি কি তাদের কাছে রাজস্ব চান? আপনার প্রভুর রাজস্ব সর্বাধিক উত্তম। তিনিই উত্তম দাতা।

www.banglakitab.weebly.com

অতএব, চাওয়া কিংবা ভিক্ষা করা আলেমদের কাজ নয়। উপরে বর্ণিত আয়াতের ভিত্তিতে তা তাদের শান ও মর্যাদারও পরিপন্থী। এতে তাদের প্রতি মন্দ ধারণাও সৃষ্টি হয়। [আত্ তাবলীগ, খাইরুল মাল-২/৭০]

আলেমদের কাজ কেবল কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করা এবং শরীয়তের বিধানাবলি বর্ণনা করা। আর আলেমগণ এ দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। [আত্ তাবলীগ-১৫/২৫৩]

আলেমদের চাঁদা কালেকশন করার মাঝে সমস্যাবলি

কোন কল্যাণমূলক কাজের জন্য চাঁদা করা হলেও তাতে কিছু না কিছু লাঞ্ছনা অবশ্যই থাকে। মানুষ সেটিকে তো ভালো কাজ মনে করে কিন্তু আমি তা ভালো মনে করি না। এই চাঁদা চাওয়ার মাঝে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। প্রধান সমস্যা তো হল দীনের অপমান। যারা চাঁদা তোলেন তারাও অপমানিত হন। কিছু দিনের মধ্যে তাদের লজ্জা চলে যায়। অভিজ্ঞতা আছে যে, অধিকাংশ চাঁদা কালেকশনকারীদের আখলাক-চরিত্র খারাপ হয়ে যায় এবং ইলমের প্রভাব দূর হয়ে যায়। হাত বাড়ানোর কারণে আলেমগণ লজ্জিত হয়ে গেছেন। এজন্য তাদের কথায় 'আছর' নেই। আর এ কারণেই ধনীরা তাদের সন্তানদেরকে আরবী পড়ান না। কেউ কেউ তো নির্দ্বিধায় বলে ফেলেন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে 'গর্ধব' বানাতে চাই না। যদিও তাদের এ ওজর যথেষ্ট নয় কিন্তু কিছুটা ভিত্তি তো রাখে। এজন্য আলেমগণ এ অভিযোগ থেকে একেবারে রেহাই পাবেন না। এ পদ্ধতিটি সত্তাগতভাবে মন্দ হওয়া ছাড়াও আরেকটি ক্ষতির কারণ। সেটি হল মানুষের দীনি ইলম অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে যায়। মোটকথা, উভয় দিক থেকেই খারাবী রয়েছে। তবে বেশি দোষ জনসাধারণের। [আত্ তাবলীগ-১৫/২৪৩]

আলেমগণ অপমানিত হওয়ার পেছনে কে বেশি দায়ী

আলেমগণ সমাজের মানুষের দৃষ্টিতে অপমানিত হওয়ার পেছনে জনগণ বেশি দায়ী নয়; বরং এমন কিছু মৌলভী দায়ী যারা জনগণের চিন্তাধারা নষ্ট করে দিয়েছে। যদি আলেমগণ সেসব কাজ থেকে বিরত থাকতেন, তাহলে জনগণের এমন দুঃসাহস হত না। মোটকথা, আলেমদের ভুলের কারণেই এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৯/১০১]

www.banglakitab.weebly.com

জনসাধারণের অপরাধ কী? আমরাই নিজেদের অবস্থা এমন করে ফেলেছি। ধনীরা আলেমদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার কারণ হল সেসব ধনীর কাছে এমন আলেমরাই যাতায়াত করে যারা বাস্তবেই লাঞ্ছনার যোগ্য। এজন্য আমি ধনীদেরকে 'মাজুর' (অপারগ) মনে করি। যেহেতু ঐসব মৌলভীদের আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে না তাই তার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে। ফলে সম্পদের ভালোবাসা তাদের অন্তরে প্রবল থাকে। আর সম্পদের ভালোবাসার কারণে এমন লোকেরা দুনিয়াদারদের কাছে গিয়ে নিজেদের সে অবস্থা প্রকাশ করে এবং তাদের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হয়ে যায়। তাদের অপমানের কারণে ইলমে দীনেরও অমর্যাদা হয়। তাদের বোঝা উচিত بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ [হুসনুল আযীয-১/৫০৮]

আল্লাহর কসম করে বলছি, আলেমগণ যদি ধনীদের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে যান যেমন কিনা আলহামদুলিল্লাহ আহলেহক বিমুখ রয়েছেন তাহলে বড় বড় অহংকারীরাও তাদের সামনে মথা নিচু করতে বাধ্য হবে। আলেমদের জন্য তো এটাই উত্তম যে, যদি কোন দুনিয়াদার তাদেরকে কোন কিছু হাদিয়া দেয় তো গ্রহণ করতে অসম্মতি জানাবেন। বস্তুত, আলেমদের অস্তিত্ব তো এমন 'মাহবুব' ও প্রিয় ছিল যে, কারো ঘরে গেলে তার জন্য ঈদের দিন বলে গণ্য হত।

কিন্তু আফসোস! আজ 'ঈদের দিনের' বদলে 'ভীতির দিন' হয়ে গেছে। এ অবস্থা সৃষ্টির নেপথ্যের নায়ক হল কিছু লোভী আলেম। তাদের কারণে এখন আলেমরূপী কাউকে দেখলেই মনে করে কিছু চাইতে এসেছে বুঝি। আলেমদের উচিত সম্পদ এবং মর্যাদার মোহের উপর আগুন জ্বালিয়ে দেয়া। আলেমগণ যদি ধনীদের দরজায় যাওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে তারা নিজেরাই তাদের দরজায় আসতে বাধ্য হবে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/৪৫]

সুযোগ্য এক আলেমের ঘটনা। তিনি একজন বিত্তশালী শরাবীর নিকট কারো জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। লোকটি তখন আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিল। আলেম সাহেবকে দেখে সে বলল, এখন সময় নেই, পরে আসুন। আলেম সাহেব পরবর্তীতে আবার গেলেন। [হুসনুল আযীয-১/৫০৮]

এরাই সে শ্রেণীর আলেম যাদেরকে দেখে দুনিয়াদাররা দীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছে। আমরা নিজেরা ইলমে দীনকে লাঞ্ছিত করেছি। অন্যথায় ইলমেদীন তো এমন বস্তু যার সামনে সকলের মস্তক অবনত হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

দিল্লী সম্রাটের দরবারে যখন উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধি দল গেলেন তখন তাঁদেরকে দেখে সম্রাট মাথা নিচু করে ফেললেন। এবার বলুন তো তাদের কাছে এমন কী জিনিস ছিল? কোন দেশের রাজত্ব ছিল কি? কিছুই ছিল না। কেবল এই ছিল যে, তাঁরা প্রকৃত আলেম এবং দীনের যথার্থ পথপ্রদর্শক ছিলেন। এখন কথা হল আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের অবমূল্যায়ন করি তাহলে কার অপরাধ? [দাওয়াতে আবদিয়্যত-১২/৪৫]

চাঁদা কালেকশন না করা হলে মাদরাসা কিভাবে চলবে

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বলেন যে, যদি এভাবে চাঁদা না তোলা হয় তাহলে মাদরাসার কার্যক্রম কিভাবে চলবে? আমি বলি, সাধারণভাবে যে কালেকশন করা হয় তাতে তো সমস্যা নেই। যদি এখলাসের সাথে কাজ করা হয় তাহলে ততটুকুতেই বিরাট বরকত হবে। আর যদি সাধারণ কালেকশনের প্রভাব না পাওয়া যায় অর্থাৎ তা দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করা না যায় তাহলে সাধ্যের বাইরে কেন যাবে। প্রত্যেকে ততটুকু খেদমতেরই 'মুকাল্লাফ' যতটুকু তার সামর্থ্যের ভিতর থাকে। আপনি আপনার দায়িত্ব আদায় করেছেন। কেউ না দিলে না দিক। এখন কথা হল কাজ তো বন্ধ হয়ে গেল। আমি বলি, অল্প-স্বল্প যদ্দূর সম্ভব হয় কর। আর যেসব কাজ বেশি পয়সা ছাড়া সম্ভব নয় তা রেখে দাও।

যদি মাদরাসা ভেঙ্গে যায় তো ভাঙতে দাও। আমি আলেমদেরকে বলি, এ অবস্থায় নিজের বাড়ি গিয়ে মজদুরী করে উপার্জন করবে। কেউ তোমার বাড়িতে পড়তে এলে পড়াবে। দু'বেলা খাবার না জুটলে ঘরের কোণায়ই মরে যাবে কিন্তু কারো সামনে হাত প্রসারিত করবে না। আর আল্লাহ তাআলার কাছে বলে দিবে যে, আমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব ছিল তা আমরা করেছি। তার চেয়ে বেশির জন্য অনেক পুঁজির প্রয়োজন ছিল। সে পুঁজি আমাদের কাছে ছিল না। যাদের কাছে ছিল তারা দান করেনি। তখন গোটা জাতির মাথা নত হয়ে যাবে। [আত্ তাবলীগ-১/১৫৩]

সাধ্যের সীমানায় যতটুকু কাজ হয় ততটুকুই করো

মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ হল কালেকশন না করা হলে মাদরাসার কার্যক্রম কিভাবে চলবে। আরে আমরা তো বলি, কাজ করে তোমার উদ্দেশ্য কী?

www.banglakitab.weebly.com

নিঃসন্দেহে আল্লাহর সন্তুষ্টি। সেটা তো অল্প কাজেও হতে পারে। যখন একশত ছাত্রের সেবা করার সামর্থ্য ছিল তখন একশত ছাত্র ভর্তি করেছ। এখন পাঁচ জনের সামর্থ্য আছে তো পাঁচ জনই ভর্তি কর। কাজ হালকা হল কিন্তু সওয়াব সমানই পাবে। তারপরও চিন্তা কিসের?

হাদীস শরীফে এসেছে, বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ করেন যে, আমার বান্দা সুস্থাবস্থায় যে আমল করত এখনও তোমরা সে আমলের সওয়াব লিখতে থাক।

লক্ষ্য করুন, সওয়াব আগের মতই লেখা হয় অথচ আমল নেই। অনুরূপভাবে আমরাও যদি পাঁচ জন ছাত্রের খেদমত করার সামর্থ্য রাখি এবং নিয়ত থাকে যে, সামর্থ্য হলে একশ ছাত্রের খেদমত করব তাহলে একশ জনের খেদমত করলে যে সওয়াব পেতাম, এখনও সে পরিমাণ সওয়াবই পাব। এটা তো তার চেয়ে উত্তম। মাথাও ঠাণ্ডা রইল, সওয়াবও পূর্ণ মিলল। [হুসনুল আযীয-১/৫৮৩]

একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেই কাজ করা উচিত

বর্তমান যুগের হাদিয়া এবং চাঁদার মধ্যে কোন না কোন খারাবী অবশ্যই রয়েছে। যদি এর দ্বারা মর্যাদাহানী হয় কিংবা দাতা-গ্রহীতা কারো কষ্ট হয় তাহলে কোনক্রমেই তা অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। আলেমগণ যদি মুখে চাঁদা চাওয়া ছেড়ে দেন তাহলে আল্লাহ তাআলা অকল্পনীয়ভাবে অর্থের ব্যবস্থা করবেন। কেউ ইচ্ছা করলে যাচাই করে দেখতে পারে। আমি তো প্রতিদিন তা অনুভব করি।

আলেমগণ যখন আল্লাহ তাআলার কাজ করবেন তখন কি তিনি তাদেরকে ভুলে থাকবেন? আলেমগণ তো সরকারি কর্মচারী। সরকারি কর্মচারীদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না হওয়া কি কল্পনা করা যায়!

আমাদেরকে 'ইস্তিগনা' ও অমুখাপেক্ষিতার হাকিকত অর্জন করতে হবে। তখন দুনিয়া নিজেই ধন্না দিতে বাধ্য হবে। তবে মনে রাখবেন, এ নিয়তে ইস্তিগনা না দেখানো; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করতে হবে। আর আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো সামনে হাত পাতা অনুচিত। আলেমগণ এ আমলটি ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তাদের কথায় আজ 'আছর' ও প্রতিক্রিয়া হয় না। [আত্ তাবলীগ-১/১৬৮]

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর দিকেই নজর রাখুন। আল্লাহ নিজের কাজ নিজেই করে দিবেন। আল্লাহর উপর 'তাওয়াক্কুল' ও ভরসা করে বলছি, এভাবে চললে কখনোই উপোস থাকার পালা আসবে না ইনশাআল্লাহ। কাজ করতে থাকুন। কাজ নিজেই মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে ফেলে। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করবেন। এ নিয়ত রাখবেন না যে, মানুষ আকৃষ্ট হোক। [প্রাগুক্ত-১/৫৪]

আমাদের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু খেদমত করা সম্ভব ততটুকু করব। যদি চাঁদা না আসে না আসুক। যদি আমাদের অন্তরগুলো পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে সালাফে সালেহীনের তরীকায় দীনের কাজ করা উচিত। তাদের যুগে বড় বড় ভবনের প্রয়োজন হত না। প্রত্যেক আলেম নিজ নিজ বাড়িতে দরস প্রদান করতেন। তবে আমি একথা বলছি না যে, মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হোক। মাদরাসার অস্তিত্ব মহাকল্যাণের বিষয়। এটি বন্ধ না হওয়া চাই। কেননা, বর্তমান সময়টাই এমন। তবে ভারসাম্যতাকে ডিঙ্গিয়ে চলা যাবে না। [হুসনুল আযীয-১/৫০৯]

অমুখাপেক্ষিতার সাথে মাদরাসা পরিচালনা সম্পর্কে হযরত থানভী [রহ.]-এর ঘটনা

আমি কসম করে বলছি, মানুষ যদি খালেস নিয়তে নিজের কাজ করতে থাকে তাহলে লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেই খেদমত করবে। আমি যখন কানপুর মাদরাসায় পড়াতাম তখন মাদরাসার মসজিদে ছাত্রদের জন্য একটি হাউজ নির্মাণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। ফান্ডে টাকা ছিল না। আর কারো কাছে চাঁদা করাও মনে সায় দিচ্ছিল না। তাই আমি মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে বললাম, আপনারা আপনাদের সাধ্য অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিন। সে মতে একটি জায়গায় গর্ত করে রেখে দেয়া হল। মানুষ গর্ত দেখে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে এটা কী? আমরা বলি হাউজ। আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী যতটুকু পেরেছি করেছি। সামনে আল্লাহর উপর ভরসা। দু'এক দিন তো এভাবেই পড়ে রইল। তারপর একদিন মহল্লার এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। তিনি আগেও মাঝেমধ্যে আমাকে ডাকতেন। এবার ডেকে বললেন, শুনতে পেলাম একটি হাউজ বানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে ব্যাপারে কতটুকু কী হল? আমি বললাম, আমাদের সাধ্যে যতটুকু ছিল ততটুকু করেছি। তিনি বললেন, বাকী কাজ শেষ করতে কত টাকা লাগবে? আমি বললাম, পাঁচশত টাকা। তিনি বললেন, পুরোটাই আমি দিয়ে দিব। আমি ছাড়া আর কারো টাকা যেন এখানে ব্যয় না হয়।

www.banglakitab.weebly.com

এবার আরো অনেকে এসে বলতে লাগল, হযরত, আমাদের থেকে পাঁচ টাকা গ্রহণ করুন। কেউ বলতে লাগল, আমাদের দশ টাকা গ্রহণ করুন। আমি বললাম, আল্লাহর এক বান্দী পূর্ণ ব্যয় বহন করার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে এ হাউজের উপর একটি ছাউনীর প্রয়োজন রয়েছে। তারা বলল, তাহলে আমরা ছাউনীর জন্য দান করলাম। এভাবে হাউজও হয়ে গেল, ছাউনীও হয়ে গেল। [আল্ কাউলুল জলীল-৩২]

আমরা আমাদের বাড়িতে একটি মাদরাসা করেছি। কারো কাছ থেকে চাঁদা চাওয়া হয় না। এমনকি কাউকে উদ্বুদ্ধও করা হয় না। ছাত্রদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি তাওয়াক্কুল করে থাকতে পারলে থাক। আমরা তোমাদের থাকা-খাওয়ার যিম্মাদারী গ্রহণ করছি না। আল্লাহ্ তাআলা দিলে আমরা দিব। এ অমুখাপেক্ষিতার কারণে মাদরাসা খুব ভালোভাবে চলছে। [দাওয়াতে আবদিয়্যত-৭/৬১]

হযরত গাঙ্গুহী [রহ.]-এর ঘটনা

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী [রহ.]-এর মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসে সত্তরজন ছাত্র ছিল। মাদরাসা থেকে তাদের খাবার এবং বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু এর জন্য কোন পেরেশানী ছিল না। চাঁদা কালেকশন করা হত না। ছাত্রদের থাকার জন্য কোন ভবনও নির্মাণ করা হয়নি। তারপরও সর্বদা পড়ালেখা চলত। হযরতের ওখানে লোকজন একটি মসজিদ বানাতে চাইল। হযরত বললেন, আমার ভরসায় করবেন না। আমি মসজিদের জন্য কারো কাছে চাইতে পারব না।

যখন গাঙ্গুহ-এ জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে তখন হযরত তার প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কারো কাছে চাঁদা চাননি। নবাব মাহমুদ আলী খান আবেদন জানালেন যে, বাজেট তৈরি করে পাঠিয়ে দিন। হযরত পরিষ্কার জবাব দিয়েছেন যে, আমার তো বাজেট তৈরি করারও সুযোগ নেই। আর আমার কাছে এমন লোকও নেই। আপনার মন চাইলে নিজেই এসে বাজেট তৈরি করে নিন। মানুষ সাধারণতঃ এমন মুহূর্তগুলোকে গনিমত মনে করে। কিন্তু যার কাছে এর চেয়েও বেশি গনিমত (আল্লাহ) রয়েছে তিনি কেন এমন মুহূর্তকে গনিমত মনে করবেন।

আলেমগণের শান এমনই হওয়া উচিত। যদি অন্তরে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে রাজা-বাদশারও পরোয়া থাকবে না। [হুসনুল আযীয-১/৫০৯]

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর সাহায্য

একবার জনৈক ডেপুটি সাহেব খবর পাঠালেন যে, আমরা মাদরাসা পরিদর্শন করতে চাই। হযরত মাওলানা ইয়াকুব [রহ.] মাদরাসার বাইরে একটি ঘরে তার বসার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে তার আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন রামপুর। লোকজনকে বলে গেলেন যে, যদি মেহমান আসেন তাহলে তার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে মাদরাসা পরিদর্শন করিয়ে দিবে। ভদ্রতা পরিপন্থী কোন আচরণ যেন না হয়। এদিকে হযরতের মন চাচ্ছিল ডেপুটি সাহেব না আসুক। এজন্য তিনি দোয়াও করেছেন। আল্লাহর কুদরত। ডেপুটি সহেব থানাভবন এসে মাদরাসায়ও এসেছেন কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করলেন তারপর ফিরে গেলেন। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৩২৮]

এমনিভাবে একবার মোজাফফর নগরের কালেক্টর সাহেব পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই চলে এলেন। হযরত উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললেন। কালেক্টর সাহেব মাদরাসার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, হযরত জবাব দিলেন। হযরত তাকে বললেন, যদি বসতে চান তাহলে চেয়ারের ব্যবস্থা করি। তিনি বললেন, না বসব না, সময় নেই। তারপর দরজা থেকেই বিদায় নিলেন। যাওয়ার পথে নিজের সঙ্গীদেরকে বললেন, বাস্তবেই তিনি বুযুর্গ মানুষ। আমার মাঝে তাঁর বুযুর্গীর বিশেষ প্রভাব অনুভব করছি। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৩২৭]

মসজিদ নির্মাণের ঘটনা

থানাভবন স্টেশনে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। আট টাকার তহবিল দিয়ে কাজ শুরু করা হয়। সেখানে একজন আগের দিনের মৌলভী সাহেব ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মসজিদের জন্য কত টাকা জমা হয়েছে? লোকজন বলল, আট টাকা। বললেন, আট টাকা জমা করেই মসজিদের কাজ শুরু করে দিয়েছ? তিনি খুবই বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, দুই হাজার টাকা জমা হওয়ার আগে কাজে হাত দিবে না। আট টাকায় কি মসজিদ হয়!

আমি এ ঘটনা শোনার পর তাকে বললাম, আপনি তো আল্লাহকে নিজের মতো ধারণা করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তো সকল কিছুর খাযানা ও ভাণ্ডার রয়েছে। তাঁর কাছে টাকা-পয়সার কোন অভাব আছে? وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّموٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহর কাছে তো আসমান-জমিনের সকল ভাণ্ডার রয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

আমি নির্মাণ ব্যবস্থাপককে বললাম, তোমরা ভিত্তির কাজ শুরু করে দাও। কারো কথা শুনবে না। তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে মাটি খনন কর। আল্লাহ্ তাআলাই তাঁর গায়বী খাযানা থেকে থেকে উপকরণের সব ব্যবস্থা করে দিবেন। মৌলভী সাহেব আমাকে বললেন, তোমরা তো ছেলে মানুষ, কিছু বোঝ না। আমি বললাম, যখন ছেলেদের দ্বারা কাজ হয়ে যায় তখন বৃদ্ধদের কথা বলার প্রয়োজন নেই। আর বাস্তবেই তার হিসেবে আমরা ছেলে বয়সেরই ছিলাম।

আট টাকা শেষ হয়ে গেলে আমি নির্মাণ ব্যবস্থাপককে বললাম, কারো কাছে চাঁদা চাইবে না। তিনি বললেন, চাঁদা চাইতে হচ্ছে না, মানুষ নিজ থেকেই দিয়ে যাচ্ছে। আমি কোন কাজে বাজারে যাচ্ছিলাম। লোকজন আমাকে ডেকে বলছেন, মিয়া একটু এদিক আসুন। আমি বললাম, ভাই আমার কাজ আছে। তারা বলল, জনাব একটু দাঁড়ান। তখন তারা নিজেরাই এসে কেউ দুই টাকা, কেউ চার টাকা করে দিয়ে গেল। মোটকথা, লোকজন ডেকে ডেকেই দান করছে।

সেসময় ভূপাল রাণীর ছেলে অসুস্থ ছিল। ছেলের কষ্টে তিনি এমন লবেজান ছিলেন যে, চিঠিপত্র এলেও খুলে দেখতেন না। তখন আমি নির্মাণ ব্যবস্থাপককে বললাম, আপনি বেগম সাহেবের কাছে একটি চিঠি লিখুন যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। একটি ভালো কাজ হচ্ছে। আপনি এ কজে অংশগ্রহণ করতে চাইলে করতে পারেন। আমি আপনার কাছে চাঁদা চাওয়ার জন্য পত্র লিখিনি; বরং আপনাকে অবগত করছি। হয়ত পরবর্তীতে জানারপর আপনি দুঃখবোধ করবেন যে, আমাকে কেন জানানো হল না। এ ভালো কাজে আমাকে কেন শামিল করা হল না।

তিনি সাথে সাথে চিঠির উত্তরে লিখলেন যে, মসজিদ নির্মাণ কাজে কত টাকা ব্যয় হবে বজেট তৈরি করে আমাকে জানান। কেউ কেউ বলল, কিছু বাড়িয়ে লিখে দিন। কেননা, খরচ বেশি হলে তো বেশি টাকার প্রয়োজন হবে। আর নির্মাণ কাজের রীতিই হল খরচ বেড়ে যাওয়া। আমি বললাম, না, এমন করা যাবে না। আল্লাহর কাছে কোন কিছুর অভাব নেই। পরে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি অন্য কাউকে তৈরি করে দিবেন। মোটকথা, বেগম সাহেবকে যথাযথ হিসাব জানানো হল। টাকা এসে গেল।

ঘটনাক্রমে কাজ বেড়ে গেল। আরো টাকার প্রয়োজন দেখা দিল। আমি ব্যবস্থাপককে বললাম, বেগম সাহেবকে আরেকটি চিঠি লিখুন। চিঠির বিষয়বস্তু এমন হবে যে, আপনার প্রেরিত সমুদয় টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। ঘটনাক্রমে কাজ

www.banglakitab.weebly.com

বেড়ে গেছে। এখন আপনার কাছে এ জন্য পত্র লিখছি না যে, আপনাকেই অবশিষ্ট কাজ করতে হবে; বরং এবারও আপনাকে অবগত করানো হচ্ছে। যাতে পরবর্তীতে জানারপর আপনি রাগ না করেন যে, আমাকে কেন জানানো হল না। আমরা আপনার কাছে চাঁদার আবেদন করছি না। আপনি মুক্তমনে দিতে চাইলে দিতে পারেন। চিঠি পৌঁছা মাত্রই টাকা চলে এলো।

এ ঘটনায় লোকজন অবাক হয়ে বলতে লাগল, এমন অমুখাপেক্ষিতার সাথে চিঠি লেখা হল তারপরও খুবদ্রুত টাকা এসে গেল! আমি বললাম, এটা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের সুন্নতের বরকত। তাঁরাও কারো কাছে চাঁদা চাইতেন না। আমরাও তার উপর আমল করেছি। তার বরকতেই আল্লাহ তাআলা কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছেন। [আল্ ইতমাম লিনি'মাতিল ইসলাম-৬৪]

মাদরাসার টাকা সংরক্ষণ করা সত্ত্বেও হারিয়ে গেলে কিংবা চুরি হয়ে গেলে কী বিধান

মাওলানা মুনির সাহেব এক সময় দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। তখনকার ঘটনা। একবার তিনি মাদরাসার বার্ষিক প্রতিবেদন ছাপানোর জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন। পথে দেড়শত টাকা হারিয়ে যায়। মাদরাসার সদস্যবৃন্দ সকলেই বললেন, যেহেতু টাকাটা আমানত ছিল তাই মাদরাসা ক্ষতিপূরণ নিতে পারে না। মাওলানা সাহেব বললেন, আমি ক্ষতিপূরণ দিব। এ নিয়ে মাওলানা সাহেবের সাথে অন্যান্য সদস্যের মতানৈক্য হল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, এ ব্যাপারে হযরত গাঙ্গুহী [রহ.]-কে লিখে জানানো হবে। তিনি যে সমাধান দিবেন সে অনুযায়ী আমল করা হবে। চিঠি লেখা হল। হযরত গাঙ্গুহী [রহ.] জবাব লিখলেন, মাওলানা সাহেবকে জরিমানা দিতে হবে না। মাওলানা মুনির সাহেব জবাব পড়ে খুব আশ্চর্যবোধ করে বললেন, মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব বুঝি আমার জন্যই এত ফেকাহ পড়েছেন। যদি এ টাকা তার কাছ থেকে হারিয়ে যেত তাহলে বুকে হাত রেখে বলুন দেখি তিনি কী করতেন! নিঃসন্দেহে তিনি মাদরাসায় ক্ষতিপূরণ দিতেন। তারপরও তিনি কেন আমাকে বারণ করলেন?

সুবহানাল্লাহ! এঁরা কেমন মুখলিস ও মুত্তাকী ছিলেন! [কালিমাতুল হক-৬৭]

www.banglakitab.weebly.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চাঁদার শরয়ী বিধান

নগদ দান ওয়াক্ফ নয়; বরং দাতার মালিকানাভুক্ত সম্পদ

চাঁদা বা দান করলে তা ওয়াক্ফ হয়ে যায় না; বরং তা দাতার মালিকানাভুক্তই থাকে। [এমদাদুল ফাতাওয়া, কিতাবুল ওয়াক্ফ-২/৫৯৩, ৬১৭]

মাদরাসায় কোন অস্থাবর দান ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ হবে কি-না

নগদ অর্থের ওয়াক্ফ কিংবা ওয়াক্ফকৃত বস্তু থেকে উৎপাদিত বা অর্জিত নগদ অর্থ ওয়াকফের হুকুমে কি-না, এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি সন্দিহান ছিলাম। কেননা, নগদ অর্থের অস্তিত্ব বিলীন হওয়া পর্যন্ত তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। আর ওয়াকফের জন্য শর্ত হল বস্তুর অস্তিত্ব স্থায়ী এবং অবশিষ্ট থাকা। আর নগদ অর্থের উপর যেহেতু ওয়াক্ফের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না, তাই অনিবার্যভাবে নগদ অর্থ ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় থেকে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। কিন্তু আল্লাহর শোকর ফতুয়ায়ে আলমগীরীর একটি ইবারত দ্বারা উক্ত সংশয়টির নিরসন হয়ে গেছে। ফতুয়ায়ে আলমগীরীর একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে :

ان كان يمكن تصحيحه وقفا يجوز تصحيحه ملكًا للمسجد هبة على المسجد

নগদ অর্থের ওয়াক্ফ সহীহ বলা কঠিন হলেও এ হিসেবে সহীহ বলা যায়। (হযরত বলেন,) আমার মতে ওখানে ملك مسجد দ্বারা একটি বিশেষ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যা ওয়াক্ফ এবং হেবার মাঝামাঝি। যাই হোক, উক্ত ইবারত দ্বারা এতটুকু জানা গেল যে, ওয়াকফের নগদ অর্থ ওয়াক্ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। অন্যথায় তা আমানত রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-১৯২]

মুহতামিম এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ দাতাদের পক্ষ থেকে উকিল

মাদরাসার মুহতামিম এবং কমিটি দাতাদের পক্ষ থেকে উকিল। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-১৯২]

www.banglakitab.weebly.com

যাকাতের টাকা সাথে সাথে 'তামলীক' করা আবশ্যক

মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য তৎক্ষণাৎ যাকাতের টাকার 'তামলীক' করা বা কাউকে মালিক বানিয়ে মাদরাসার ফান্ডে দাখেল করা আবশ্যক। অন্যথায় দাতা মারা গেলে তাতে মীরাস জারি হবে এবং বছর অতিক্রান্ত হলে উত্তরাধিকারদের উপর এ সম্পদের যাকাতও ওয়াজিব হবে। যদি তা নেসাব পরিমাণ হয়। [আল্ ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ-২/২৮৮]

'তামলীক' করার প্রচলিত হীলা ও তার শরয়ী দৃষ্টিকোণ

যাকাতের 'মাসরাফ' বা প্রাপ্য হল গরিব মুসলমান। যাকাতের ক্ষেত্রে 'তামলীক' বা মালিক বানানো ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে একটি এমন বিষয় রয়েছে যা বর্ণনা করতে মন সায় দিচ্ছে না কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি। সেটি এই যে, কোন কোন মৌলভী সাহেব যাকাত ও উশরের মাসরাফের ক্ষেত্রে একটি হীলা করে থাকে। মনে করুন, তারা যাকাতের টাকা কিংবা উশরের ফসল মাদরাসার ভবন নির্মাণ কিংবা শিক্ষকদের বেতনে ব্যয় করতে চায়। তখন একজন গরিব ছাত্রকে ডেকে বলে, আমরা তোমাকে যাকাতের টাকা দিব তুমি সেগুলো মাদরাসায় দান করে দিবে। ছাত্র তার শিক্ষকের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। শিক্ষক ছাত্রের হাতে যাকাতের টাকাগুলো তুলে দেয় এবং ছাত্র সেগুলো মাদরাসায় দিয়ে দেয়। এবার মৌলভী সাহেব খুশিতে বাগবাগ যে, যাকাতও আদায় হল এবং টাকাগুলো মাদরাসার ভবন নির্মাণ কিংবা বেতনে ব্যয় করা গেল। কিন্তু মনে রেখো, এমন হীলা অহেতুক। আলেমগণ তো ঐসব গুনাহ্ করে না যা সাধারণ জনগণ করে থাকে। তবে ইলমের ছত্রছায়ায় তারাও কিছু গুনাহ্ করে। আলেমদের গুনাহও আলেমসুলভ হয়ে থাকে।

এ ভূমিকা উপস্থাপনের পর আমি বলি, কিছু কিছু আলেম যাকাত ও উশরের সম্পদে যে হীলা করে তা সম্পূর্ণ অবান্তর ও অহেতুক কর্ম। এতে মালিকানা বদলায় না। আল্লাহর সেসব বান্দাকে কেউ জিজ্ঞাসা করুক যে, এটা তামলীক, নাকি প্রতারণা? অবশেষে আল্লাহ্ তাআলাকেও ধোঁকা দিতে চাও? আল্লাহ তাআলা তো অন্তর্যামী। অন্তরের খবর তার কাছে অনুপরিমাণও গোপন নেই। আচ্ছা, তোমরাই ইনসাফের দৃষ্টিতে বলো দেখি, যখন তোমরা গরিব ছাত্রকে বললে যে, আমরা তোমাকে যাকাতের টাকা দিব, তুমি তা মাদরাসায় দিয়ে দিবে। টাকা হাতে নেয়ার পর কি সে টাকাগুলো নিজের কাছে রাখার কোন এক্তিয়ার আছে বলে মনে করে? কিছুতেই নয়; বরং সে টাকাগুলো ফেরত

www.banglakitab.weebly.com

দেয়াকেই আবশ্যক মনে করে। এই যদি হয় গ্রহীতার মানসিক অবস্থা তাহলে তামলীক হল কিভাবে?

বাস্তবিক কথা হল, গ্রহীতা যতক্ষণ নিজেকে মালিক মনে না করবে ততক্ষণ 'তামলীক' সাব্যস্ত হবে না। যারা তামলীক করার জন্য এমন হীলা করে থাকে তাদের মাথায় তামলীকের মর্ম অনুপস্থিত থাকে। তারা প্রতারণা মনে করেই এমনটি করে। যদি তাদের মাথায় তামলীকের মর্ম বিদ্যমান থাকত তাহলে গ্রহীতা সে অর্থকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার বা খরচ করলে তারা বিরক্ত ও দুঃখিত হত না। কেননা, সে তো মালিক হয়ে গেছে। এখন শরীয়তের দৃষ্টিতে এ টাকা দিয়ে তার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার রয়েছে। চাই মাদরাসায় দান করুক কিংবা মসজিদে ব্যয় করুক কিংবা কোথাও ব্যয় না করে জমা করে রাখুক, এতে কারো বিরক্ত হওয়ার কী আছে? অথচ বাস্তবতা হল, গরিব ছাত্রটি সে টাকা গ্রহণ করার পর যদি নিজের ইচ্ছামত খরচ করে তাহলে প্রদানকারী বিরক্ত ও দুঃখিত হন। গ্রহীতাকে মন্দ বলেন। এতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তার উদ্দেশ্যই ছিল প্রতারণা করা, তামলীক করা নয়। আর যদি গ্রহীতা সে টাকা মাদরাসা কিংবা মসজিদে দিয়ে দেয় তাহলে সেটা লজ্জায় পড়ে দুর্নামের ভয়ে দিয়ে থাকে। যদি সে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হত যে, আমি এ টাকার মালিক হয়ে গেছি এবং নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করলে দুর্নামের শিকার হব না কিংবা মৌলভী সাহেবের মুখ কালো হবে না, তাহলে নিঃসন্দেহে গরিব ছাত্রটি টাকাগুলো ফেরত দিতে সম্মত হবে না। কেননা, গরিব ছাত্রটি সর্বপ্রথম তার নিজের ও পরিবারের কথা চিন্তা করবে। যে বেচারার ঘরে অভাব রয়েছে সে বুঝি সংসারের চিন্তা না করে মাদরাসা-মসজিদে দান করতে যাবে? যদি করেও তাহলে দু'চার টাকা দিবে। গরিব লোক পাঁচ টাকা দান করারও সাহস রাখে না। যখন সে মনে করবে যে, আমি এ টাকার মালিক হয়েছি। আর যদি কেউ সাহস করে বসে তাহলে মনে করতে হবে যে, সে নিজেকে টাকার মালিক মনে করেনি; বরং সে টাকাগুলো ফেরত দেয়াই আবশ্যক মনে করেছে। এজন্যই সে দিয়ে দিয়েছে। এখন বলুন, তামলীক হল কিভাবে? এজন্য এ হীলা অনর্থক এবং হেতুক। এর দ্বারা যাকাত আদায় হওয়ার বিষয়টি আমার বুঝে আসে না। [হুকুক ও ফারাইজ-৫৯৪]

তামলীক সংক্রান্ত হীলা বন্ধ করুন

কিছু কিছু মাদরাসা-মসজিদের কর্তৃপক্ষ যাকাতের টাকা সাধারণ ফান্ডে ব্যয় করার জন্য একটি হীলা করে থাকে। প্রথমে যাকাতের যোগ্য কোন গরিবকে এ কথা বলে পটায় যে, আমরা তোমাকে কিছু টাকা দিব, তুমি সেগুলো মসজিদ

www.banglakitab.weebly.com

কিংবা মাদরাসায় দান করে দিবে। যে কথা সে কাজ। তারপর সেটি মসজিদ-মাদরাসার সাধারণ ফান্ডে জমা হয়ে ব্যয় হয়ে যায়। আর এর নাম রেখেছে তামলীক। অথচ এটা তামলীক নয়। কেননা, নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে প্রদানকারী গরিব লোকটিকে বাস্তবে মালিক বানায় না। কেবল তামলীকের একটি সুরত অবলম্বন করে। এভাবে যাকাত আদায় হওয়া কঠিন ব্যাপার।

এ সুরতে একটি খারাবী হল, লোকটি বাধ্য হয়ে ফেরত দিয়ে দেয়। সুতরাং তার প্রদান করাটা মনের তুষ্টিতে হয় না। যা কারো সম্পদ ব্যবহার হালাল হওয়ার পূর্বশর্ত। মোটকথা, গ্রহণ এবং প্রদান উভয়টিই শরীয়তের নিয়ম পরিপন্থী।

কারো কারো সংশয় হতে পারে যে, শরীয়তের হুকুম তো বাহ্যিক অবস্থার উপর হয়ে থাকে। ভালোভাবে বুঝে রাখ, এ কথার মর্ম হল অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তদন্ত করো না। কিন্তু যদি তদন্ত ছাড়াই ভেতরের অবস্থা জানা যায় যে, এখানে তামলীকের নিয়ত নেই এবং মনের সন্তুষ্টি নেই তখন কি শরীয়ত বলেছে যে, অভ্যন্তরীন বিষয় আমলে নিও না। যদি বিষয়টি এমন না হত তাহলে যেসব হাদীসে কারো সম্পদ ব্যবহারের জন্য মনতুষ্টির শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা অর্থহীন হয়ে যাবে। কেননা, মনতুষ্টি তো অন্তরের বিষয়। [ইসলাহে ইনকিলাব-১/১৫০]

আমার দৃষ্টিতে ফেকহী মূলনীতির আলোকে এভাবে যাকাত আদায় হয় না। কেননা, তামলীক যাকাতের রোকন। আর তামলীকের ক্ষেত্রে যদি দাতা-গ্রহীতা উভয়ে বিদ্রূপকারী হয় তাহলে তামলীক হয় না। আর প্রচলিত সুরতে শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে উভয়েই স্বীকার করে যে, এখানে তামলীক উদ্দেশ্য নয়। [ইমদাদুল ফাতাওয়া-২/১৪]

অবৈধ হীলা

এক জায়গায় মসজিদ নির্মিত হচ্ছিল। নির্মাণ কাজের সহযোগিতার জন্য চাঁদা কালেকশন চলছিল। সেখানকার এক বক্তা দিল্লী থেকে যাকাতের পাঁচশত টাকা কালেকশন করে এনে গরিব মুয়াজ্জিনকে বললেন, মিয়া, তুমি মসজিদে কিছু দান কর না। সে বলল, হযরত আমি গরিব মানুষ। আমার কাছে দান করার কী আছে? বক্তা সাহেব বললেন, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে দশ টাকা দেন তাহলে কি তুমি দান করবে? বলল, জ্বি, দান করব। তারপর বিশ টাকার কথা বললেন। একই জবাব দিল। এভাবে পঞ্চাশ, একশ থেকে পাঁচশত পর্যন্ত বললেন। প্রতিবার একই জবাব এলো । শুধু কথার কারবারই তো ছিল। বলতে

www.banglakitab.weebly.com

অসুবিধা কি? অবশেষে তাকে পাঁচশত টাকা দিয়ে বললেন, নাও, আল্লাহ তোমাকে পাঁচশত টাকা দিয়েছেন। এগুলো মসজিদে দান করে দাও। মুয়াজ্জিন বেচারা নোটগুলো গ্রহণ করেই অগত্যা দান করে দিলেন। কিন্তু বলুন তো, বেচারার অন্তরের অবস্থা কী ছিল? সে কি মুক্ত ও খুশিমনে দান করেছে? [আল্ ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ-৮/১৬৯]

বৈধ এবং অবৈধ হীলার মাপকাঠি

যে হীলার উদ্দেশ্য হয় কোন শরয়ী উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলী দেয়া, সেটি নিন্দনীয়। আর যে হীলার উদ্দেশ্য হয় কোন শরয়ী উদ্দেশ্য অর্জন করা, সেটি প্রশংসিত। যেমন, শরীয়ত সুদকে হারাম করেছে। এখন সুদ খাওয়ার জন্য কোন হীলা গ্রহণ করা গুনাহ। আর যেখানে সুদ উদ্দেশ্য হবে না; বরং এক জাতীয় বস্তু ভালোমন্দ হওয়ার কারণে মূল্য কমবেশি হয় কিন্তু উভয় বস্তু এক জাতীয় হওয়ার কারণে অতিরিক্ত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ الخ এ হাদীস অনুযায়ী হীলা করা বৈধ। [হুকুকুল ইলম-৬৬]

তামলীক করার জায়েয ও সহজ সুরত

যাকাতের ক্ষেত্রে তামলীক করার সুরত হল কোন গরিব লোককে বলা যে, বিনা পরিশ্রমে সওয়াব অর্জন করতে চাইলে তুমি কারো কাছ থেকে টাকা ঋণ করে অমুক নেক কাজে দান কর। আমি তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিব। যখন সে ঋণ নিয়ে মাদরাসা বা মসজিদের ফান্ডে দান করবে তখন তুমি তোমার যাকাত কিংবা কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে দিবে, সে তা দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করবে। [মালফুজাতে আশরাফিয়া-১০১]

বৈধ হীলা সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা

আমি জানি, লোকজন হীলার পদ্ধতি থেকে বিরত থাকবে না। এ জন্য আমি আরেকটি সুরত বলে দিচ্ছি। যা মূলতঃ হীলা নয়; বরং বাস্তবেই তামলীক এবং তা দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যই সাধিত হবে যা পূর্বে বর্ণিত হীলা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়।

এ ব্যবস্থাটি আমরা বলকানের চাঁদার ক্ষেত্রেও গ্রহণ করেছিলাম। সাধারণ জনগণ তো তাকলীদ করে মেনে নিবে যে, এটি হীলা নয়। আর আলেমদের কোন সংশয় থাকলে জিজ্ঞাসা করে জেনে আশ্বস্ত হবেন।

www.banglakitab.weebly.com

এবার শুনুন! যদি কখনো যাকাত কিংবা উশরের টাকা এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার প্রয়োজন দেখা দেয় যে, যেখানে তামলীক সাব্যস্ত হয় না। যেমন মসজিদে ব্যয় করা। অথবা তামলীক তো সাব্যস্ত হয় কিন্তু যেখানে টাকা প্রেরণ করা হবে তাদের প্রতি ভরসা নেই যে, তারা সঠিক মাসরাফে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে কি-না। সেখানে প্রথমে বর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করবে না; বরং সেখানে কোন গরিব লোককে বলা হবে, তুমি যদি সহজে সওয়াব অর্জন করতে চাও তাহলে কারো কাছ থেকে এ পরিমাণ টাকা ঋণ এনে অমুক কাজে দান করো, আমরা তোমার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করব। যখন সে অন্য কারো কাছ থেকে কিংবা তোমাদের কাছ থেকেই টাকা ঋণ করে দান করে দিবে তখন তোমরা তাকে যাকাতের টাকা প্রদান করবে, যাতে সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে বা যেখানে ইচ্ছা খরচ করে।

এ পদ্ধতিতে গরিব লোকটির কাছ থেকে ঐ টাকা ফিরিয়ে নেয়া হয় না যা তাকে যাকাত হিসেবে দেয়া হয়েছিল। কেননা, যাকাতের পয়সা দিয়ে তো সে নিজের ঋণ পরিশোধ করবে। যা ছিল তার ব্যক্তি প্রয়োজন। সুতরাং এ পদ্ধতিতে পরিপূর্ণভাবে তামলীক সাব্যস্ত হল। কেননা, যাকাত গ্রহণ করে গরিব লোকটি নিজের কাজে ব্যয় করেছে। আর যে টাকা সে কারো কাছ থেকে ঋণ করে দান করেছে তা ব্যয় করার পূর্বে গরিবের মালিকানা থেকে বের হবে না। ব্যয় হওয়ার পূর্বে সে তা ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে। এ অধিকার তো সাধারণভাবে প্রচলিত হীলার মাঝেও থাকে। এজন্য এ ত্রুটিটি কেবল এ পদ্ধতির সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। আর এ ত্রুটির সমাধান এভাবে হতে পারে যে, যখন গরিব লোকটি ঋণ করে দান করবে তখন সাথে সাথে তা মাদরাসা কিংবা মসজিদের ফান্ডে ব্যয় করে দেয়া হবে। ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে যাকাতের টাকা প্রদান করা হবে। এখন আর সে তার দান ফেরত নেয়ার অধিকার রাখবে না। আর প্রচলিত হীলার ত্রুটি সমাধান করার কোন ব্যবস্থা নেই। [ওয়াজুল উশর-৫৯৬]

তামলীক সহীহ হওয়ার একটি শর্ত

যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহীতা নিজেকে মালিক মনে না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তামলীক সাব্যস্ত হবে না। [মালফুজাতে আশরাফিয়া-৪৯]

তামলীকের পদ্ধতিতে দাতা-গ্রহীতা উভয়ে সওয়াব পাবে কি-না

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে কিছু কিছু বিদ্বান লোকের এ সংশয় জাগে যে, হীলার উক্ত সুরতে তো দানের সওয়াব পাবে গরিব লোকটি আর দানকারী পাবে ঋণ

www.banglakitab.weebly.com

পরিশোধ করার সওয়াব। তাহলে বুঝে রাখ, দান তো গরিব লোকটি করল কিন্তু যেহেতু তোমরা তার দান করার মাধ্যম হয়েছো এজন্য তার সওয়াবের সমান সওয়াব তোমাদেরও হবে। আল্লাহ তাআলার দয়া অফুরন্ত। হাদীস শরীফে এসেছে, যদি তোমরা তোমাদের কোষাধ্যক্ষ বা ম্যানেজারকে নির্দেশ কর যে, আমার টাকা থেকে অমুককে এত দিয়ে দাও, তাহলে মালিকের সমপরিমাণ সওয়াব কোষাধ্যক্ষও পাবে। [মালফুজাতে আশরাফিয়া-১০২]

বৈধ হীলা

যদি কোথাও যাকাতের টাকা থেকে সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তার জন্য একটি পদ্ধতি রয়েছে, যা সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত। অবশ্য এটি ইখলাসের পরিপন্থী হলেও শরীয়তের নীতি বিরুদ্ধ নয়। সে পদ্ধতিটি হল এই যে, কোন গরিব লোককে পরামর্শ দেয়া হবে, তুমি কারো কাছ থেকে দশ টাকা ঋণ করে অমুককে বা অমুক মাদরাসা কিংবা মসজিদে দান কর। আমরা তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিব। যখন গরিব লোকটি সে টাকা সেখানে দান করবে তখন তোমরা তাকে যাকাতের টাকা থেকে দশ টাকা দিয়ে দিবে, যা দিয়ে সে তার ঋণ পরিশোধ করবে। যদি সে ঋণ পরিশোধ না করে এমতাবস্থায় তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া জায়েয হবে।

এ পদ্ধতির হীলার মধ্যে গরিবকেও বাস্তবেই দেয়া হল এবং তাকে দান করার জন্য জোরও করা হল না। কেননা, সে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা না করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। পক্ষান্তরে তামলীকের প্রচলিত পদ্ধতিতে গরিব বেচারা যদি শেখানো কথামতো দান না করে তাহলে মনে দুঃখ এমনকি ঝগড়াও হয়ে যায়। আর বর্ণিত পদ্ধতিতে টাকার ব্যবস্থা হওয়ার পর ঋণদাতা তার কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করতে পারে। তার কারণ হল ঋণ তো হল ওয়াজিব হক বা আবশ্যকীয় পাওনা। এতে জোর করা জায়েয আছে। আর যেহেতু সে টাকাটা বাস্তবেই গরিব লোকটির মালিকানায় চলে গেছে তাই তার কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করা সহজ। যেমন নাকি এ গরিব লোকটির কাছে তার নিজস্ব উপার্জিত টাকা থাকলে জোরপূর্বক নেয়া জায়েয হত। তেমনি এখানেও জায়েয। [ইসলাহে ইনকিলাব-১/১৫১]

www.banglakitab.weebly.com

অন্যান্য মাদরাসার পক্ষ থেকে তামলীক করানোর ব্যবস্থা এবং হযরত থানভী [রহ.]-এর আমল

যারা যাকাতের টাকা কিংবা কুরবানীর চামড়ার টাকা এমন খাতে (মাদরাসায়) দিতে চায়, তাদের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যারা এটা বুঝবে না তারা আমার কাছে টাকা পাঠিয়ে দিলে আমি সঠিক পদ্ধতিতে তামলীক করিয়ে পাঠিয়ে দিব। এখানে আমি সে পদ্ধতিটি উল্লেখ করছি। যাতে বুদ্ধিমানরা তার উপর আমল করতে পারে। সে পদ্ধতিটি হল এই, প্রথমে কোন দরিদ্র লোককে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবে যে, যদি অনায়াসে সওয়াব অর্জন করতে চাও তাহলে দশ টাকা কারো কাছ থেকে ঋণ করে অমুক জায়গায় দান কর। তারপর আমরা তোমার ঋণ আদায় করে দিব। যখন সে দরিদ্র লোকটি কারো কাছ থেকে ঋণ করে চাঁদা দিয়ে দিল তোমরা তাকে যাকাতের টাকা থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দাও। এতে সব কাজ সঠিকভাবে সম্পাদিত হল। চাঁদাও জমা হল এবং কুরবানীর চামড়ার টাকাও বৈধভাবে আদায় হয়ে গেল। এটি খুবই সহজ পদ্ধতি। যদি কারো এখনও বুঝে না এসে থাকে তাহলে সে আমার কাছে যাকাত কিংবা কুরবানীর চামড়ার টাকা পাঠিয়ে দিলে এ পদ্ধতিতে শুদ্ধ করে দিব। [মাফাসিদে গুনাহ-১৭২]

যাকাতের টাকা এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা দান করার শর্ত হল, যাকে দান করা হবে তাকে তার পূর্ণ মালিক বানিয়ে দিতে হবে। জানা কথা, অনেকেই এভাবে দান করে না। তাই তামলীক করিয়েই পাঠানো উচিত। অন্যথায় দাতাদের পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হবে না।

ভালোভাবে শুনুন এবং বুঝুন! আমি ইশতিহারেও এটি উল্লেখ করে দিয়েছি। আরো উল্লেখ করেছি যে, যদি কারো তামলীকের পদ্ধতি বুঝে না আসে সে যেন টাকা আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখান থেকে শরয়ী পদ্ধতিতে তামলীক করিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে। যদিও আমি আর্থিক কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না তবুও মুসলমানদের সম্পদ যেন নষ্ট না হয়ে যায় এজন্য নিজের অভ্যাসের বিরুদ্ধে হলেও এ কাজটি করতে প্রস্তুত রয়েছি। আর তামলীকের সে পদ্ধতিটি হল এই, কোন দরিদ্র লোককে বলো যে, তুমি কারো কাছ থেকে টাকা ঋণ করে নিজের পক্ষ থেকে অমুক খাতে দান করো, আমরা তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিব। যখন সে টাকা ঋণ নিয়ে দান করবে তখন তোমরা তাকে যাকাতের কিংবা কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে দাও, যাতে সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে কিছু কিছু বিদ্বান লোকের এ সংশয় জাগে যে, হীলার উক্ত সুরতে তো দানের সওয়াব পাবে গরিব লোকটি আর দানকারী পাবে ঋণ পরিশোধ করার সওয়াব। তাহলে বুঝে রাখ, দান তো গরিব লোকটি করল কিন্তু যেহেতু তোমরা তার দান করার মাধ্যম হয়েছো এজন্য তার সওয়াবের সমান সওয়াব তোমাদেরও হবে। আল্লাহ তাআলার দয়া অফুরন্ত। হাদীস শরীফে এসেছে, যদি তোমরা তোমাদের কোষাধ্যক্ষ বা ম্যানেজারকে নির্দেশ কর যে, আমার টাকা থেকে অমুককে এত দিয়ে দাও, তাহলে মালিকের সমপরিমাণ সওয়াব কোষাধ্যক্ষও পাবে। [ওয়াজ : মুয়াসাতুল মুসাবীন-৩৮৪]

মাদরাসার অর্থে অসতর্কতা

অনেকে চাঁদার পয়সা এমন অযথা ব্যয় করে এবং অনুমতি ছাড়া খরচ করে, যেন তা তাদের নিজস্ব সম্পদ। এতে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। [হুকুকুল ইলম-৭৮]

মুহতামিম ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যেসব খাতে চাঁদার টাকা ব্যয় করতে পারবেন

মূলনীতি হল এ ধরনের সম্পদে কোন প্রকার ব্যয় করা জায়েয-নাজায়েযের মাপকাঠি হল দাতাদের অনুমতি। মুহতামিম এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ দাতাদের পক্ষ থেকে উকিল। উকিলকে যেভাবে ব্যয় করার অনুমতি প্রদান করা হবে সেভাবে ব্যয় করাই তার জন্য জায়েয। যদি সুস্পষ্টভাবে কিংবা অবস্থার আলোকে দাতাগণ এ কানুনটি সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং তাদের সম্মতি প্রমাণিত থাকে তাহলে জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়। [এমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৪৭, ৩৪৯]

আর যাকাত সদকা এবং কুরবানীর টাকা দান করার সাথে সাথে তা তামলীক করিয়ে মাদরাসার সাধারণ ফান্ডে জমা করে নেয়া উচিত। [আল্ ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ-২/২৮৮]

মাদরাসার টাকা দিয়ে ছাত্র এবং শিক্ষকদেরকে অতিরিক্ত পুরস্কার দেয়া যাবে কি-না

যদি দাতাগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরস্কার দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হন, তাহলে জায়েয। অন্যথায় জায়েয নয়। কেননা, চাঁদার টাকা ওয়াক্‌ফ নয়; বরং দাতাদের মালিকানা সম্পত্তি। [এমদাদদুল ফাতওয়া, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ-২/৫৯৩]

www.banglakitab.weebly.com

চাঁদার টাকা দিয়ে মাদরাসার সাইনবোর্ড বানানো জায়েয কি-না

যদি সাইনবোর্ড টানানোর দ্বারা মাদরাসার স্পষ্ট কোন উপকার হয় তাহলে তাতে মাদরাসার সম্পদ ব্যবহার জায়েয। আর যদি তাতে মাদরাসার উল্লেখযোগ্য ও স্পষ্ট কোন কল্যাণ না থাকে; বরং সম্ভাবনা পর্যায়ের হয়, তাহলে মাদরাসা ফান্ড থেকে না করে নিজের পক্ষ থেকে তার ব্যয় নির্বাহ করা উচিত। ফকীহগণ একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদের কারুকার্য ওয়াকফের সম্পদ দিয়ে জায়েয নেই। তবে মসজিদ মজবুত ও দৃঢ় হয় এমন কাজ করা জায়েয। এ মাসআলা থেকেই উক্ত বিধান সাব্যস্ত হল। [এমদাদুল ফাতাওয়া, কিতাবুল ওয়াক্ফ-২/৫৯৩]

দানের টাকা ঋণ হিসেবে নিজের কাজে ব্যবহার

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মাদরাসার হিসাব রক্ষক। যদি সে দানের টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করে এবং পরে পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে কি-না?

উত্তর : নিজের কাজে তা ব্যবহার করা জায়েয নেই। কেননা, নিজের কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দাতাদের অনুমতি নেই। আর দাতাদের অনুমতি বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা নাজায়েয। [প্রাগুক্ত-২/৬৪৯]

মাদরাসার টাকা ঋণ নেয়ার বৈধ ও সহজ পদ্ধতি

সাধারণতঃ দীনি মাদরাসার পরিচালক ও ব্যবস্থাপকগণ নিজেদের বিভিন্ন সমস্যার কারণে ঋণ নিতে বাধ্য হন। আর ওয়াকফের ফান্ড থেকে ঋণ দেয়া নাজায়েয। হযরত থানভী [রহ.] দারুল উলূম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষকে এমর্মে পরামর্শ প্রদান করেছিলেন যে, এ জন্য ভিন্ন 'ঋণফান্ড' খোলা হোক এবং এখান থেকে ঋণ দেয়া হোক। এ প্রস্তাব দেয়ার পর হযরত নিজে সর্বপ্রথম সে ফান্ডের জন্য পাঁচশ টাকা দান করেছেন। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-১১৫]

মাদরাসার দানের অর্থ দিয়ে মাদরাসার জন্য ব্যবসা করা জায়েয কি-না

দাতাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অনুমতি সাপেক্ষে মাদরাসার অর্থ দিয়ে মাদরাসার জন্য ব্যবসা করা জায়েয। [এমদাদুল ফাতাওয়া, কিতাবুল ওয়াক্ফ-২/৭৫]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসা এবং মসজিদের ফান্ড ভিন্ন থাকা উচিত

আমি মাদরাসা এবং মসজিদের মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন রাখার চিন্তা করছি। যা খুবই জরুরি। এ জন্য আমি মসজিদের পাখাসমূহে দাগ দিয়ে রেখেছি। যাতে কেউ এখন থেকে তুলে নিয়ে আমার বসার জায়গায় কিংবা নিজের শোয়ার জায়গায় ব্যবহার না করে। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৭৩, ৭৫]

মসজিদের টাকা এবং সম্পদ মাদরাসায় ব্যবহার করা যাবে না

প্রশ্ন : মসজিদের টাকা মসজিদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। আশঙ্কা হচ্ছে, টাকাগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিনা। এ টাকা থেকে এমন কোন দীনি মাদরাসায় সাহায্য করা যাবে, যা মসজিদ থেকে ভিন্ন তবে ছাত্ররা তাতে নামায পড়তে আসে।

উত্তর : মাদরাসা আর মসজিদ এক জিনিস নয়। কোন খাত অর্থ ব্যবহার থেকে অমুখাপেক্ষী হলে তার সমতুল্য খাতে ব্যয় করতে হবে। যেমন কোন মসজিদের ফান্ডে টাকা অতিরিক্ত হলে অন্য মসজিদে এবং মাদরাসার ফান্ডে অতিরিক্ত হলে অন্য মাদরাসায় সাহায্য করা যাবে। এজন্য অতিরিক্ত সম্পদ অন্যান্য মসজিদে ব্যয় করা যাবে। যদি এক শহরের মসজিদসমূহে প্রয়োজন না থাকে, তাহলে অন্য শহরের মসজিদসমূহে খরচ করবে। এক্ষেত্রে যেটি বেশি নিকটবর্তী সেটিই অগ্রাধিকার পাবে। [এমদাদুল ফাতাওয়া-২/৭৫]

فی الدر المختار مع الشامی و کذا الرباط والبئر اذا لم ینتفع بهما فیصرف وقف المسجد والرباط والحوض الی اقرب مسجد او رباط او بئر او حوض الیه-(الشامی جـ٣ صفـ٥٧٤)

একটি ফেকহী সন্দেহের অপণোদন

এখানে একটি সম্ভাব্য সংশয়ের নিরসন করা ভালো মনে করছি। সংশয়টি নিম্নরূপ :

فی الدر المختار مع الشامی و یبدأ من غلة بعمارته ما هو اقرب لعمارته کامام مسجد ومدرس مدرسة یعطون بقدر کفایتهم ثم السراج والبساط کذلك الی اخر المصالح-

www.banglakitab.weebly.com

উপরোক্ত ইবারত দ্বারা বোঝা যায় যে, মাদরাসা হল মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, মসজিদের টাকা এবং সামগ্রী মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা যাবে।

সমাধান : এ সংশয়ের সমাধান এই যে, উক্ত ইবারতের উদ্দেশ্য ও মর্ম হল, মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করার ক্ষেত্রে ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং অন্যরা হল আবশ্যকীয় খাতের অন্তর্ভুক্ত। এ ইবারতের মর্ম এই নয় যে, এসকল খাত মসজিদের ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত; বরং দু'পৃষ্ঠা পর একটি প্রাসঙ্গিক খণ্ডিত মাসআলায় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, মসজিদের ওয়াকফের মধ্যে যদি শিক্ষককে শর্ত করা হয়, তাহলে শিক্ষক জরুরি খাতের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। সে খণ্ডিত মাসআলাটি হল এই-

قلت انما يكون المدرس من الشعائر او مدرس المدرسة كما مَرَّ اما مدرس الجامع فلا لانه لا يتعطل لغيبة بخلاف المدرسة الخ (امداد الفتاوى : جـ٢ صـ٦٢٠)

মাদরাসা এবং মসজিদে অমুসলিমদের দান

জনৈক ভদ্রলোক জানতে চেয়েছেন, যদি কোন হিন্দু লোক মসজিদে দান করে তাহলে গ্রহণ করা জায়েয কি-না এবং সে টাকা মসজিদের নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে কি-না?

উত্তর : হযরত বললেন, জায়েয আছে। তবে নেয়ার সময় দু'টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ দানকারী এমন না হতে হবে যে, দান করে দয়া প্রকাশ করবে বা খোঁটা দিবে। দ্বিতীয়তঃ তার দানে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানগণ যেন তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দান করতে শুরু না করে। এমন যেন না ভাবে যে, তিনি অমুসলিম হয়ে আমাদের ধর্মীয় খাতে দান করেছেন তাই আমাদেরও উচিত তার ধর্মীয় খাতে দান করা। হতে পারে সে মন্দির নির্মাণ শুরু করল। তো মুসলমানদের কাছে এসে বলল, আমরা তোমাদের মসজিদে দান করেছি। তোমরা আমাদের মন্দিরে দান করো। এমন অবস্থায় দান গ্রহণ করা নাজায়েয। আর যদি এমন কিছুর আশঙ্কা না থাকে তাহলে নেয়া যেতে পারে। তাতে সমস্যা নেই। আর এগুলো লক্ষণ ও ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যাবে। বলা হল সে তার ধর্মীয় খাতে দান চাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত বললেন, এ অবস্থায় তার দান গ্রহণ করা জায়েয হবে না। [আল্ ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ-২/৯৮]

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসায় সরকারি অফিসারদের দান

আমার ছাত্র জীবনে এক ইংরেজ কমিশনার দেওবন্দ মাদরাসায় আসার কথা ছিল। আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব [রহ.]-এর কাছে আরজ করলাম, তিনি যদি মাদরাসায় কিছু দান করেন তাহলে গ্রহণ করা হবে কি? হযরত বললেন, হ্যাঁ। আমি আরয করলাম, সেগুলো কোথায় ব্যয় করা হবে? হযরত বললেন, আমাদের কাছে তা ব্যবহারের অনেক খাত রয়েছে। আমরা মেথরদের বেতন হিসেবে তা দিয়ে দিব। আমি আবার আরজ করলাম, তিনি যদি কোন পরামর্শ দেন, তাহলে কি আপনারা গ্রহণ করবেন? বললেন, না। আমরা তাকে বলে দিব, আমাদের যাবতীয় কাজ মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে। আমরা আপনার প্রস্তাব সে মজলিসে উত্থাপন করব। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-১৩৯]

মাদরাসায় সরকারি অনুদান গ্রহণ প্রসঙ্গে

যদি সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমরা মাদরাসায় দান করে মাদরাসার কোন কাজে হস্তপেক্ষ করব না, তাহলে অনুদান গ্রহণ করা জায়েয। অন্যথায় নাজায়েয। [এমদাদুল ফাতওয়া-৪/৭৯]

মাদরাসা থেকে মেহমানদের আপ্যায়ন করা

আমার সব সময়ের মত হল, প্রথমতঃ মেহমানদেরকে মাদরাসার পক্ষ থেকে খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এটা কি কারো ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান! যে আসবে তাকেই খাবার দিতে হবে। এটা তো হল, জাতীয় এবং দীনি কাজের কেন্দ্র। যারা আসবে তারা নিজেদের পয়সা খরচ করে হোটেলে খাওয়া উচিত। যেমন সাধারণ জাতীয় সম্মেলনগুলোতে আগতদের প্রত্যেকেই খানাপিনার ব্যয় নিজে বহন করে থাকে।

আর যদি এমন্ হয় যে, মেহমানদেরকে খাবার খাওয়াতেই হবে তাহলে এর জন্য বিশেষভাবে চাঁদা সংগ্রহ করা হবে। যেখানে শরিক হতে আগ্রহীদের স্পষ্টভাবে জানা থাকতে হবে যে, এ ফান্ডের টাকা মেহমানদের খানাপিনায় ব্যয় হবে। সাধারণ দান থেকে এ খরচ বহন করা উচিত নয়। কেননা, সাধারণ ফান্ডে দানকারীগণ বেশিরভাগ এ মনে করে মাদরাসায় দান করে থাকে যে, আমাদের টাকা তালীম-তরবিয়তের কাজে ব্যয় হবে। এখান থেকে তালেবুল ইলমদেরকে খাবার এবং কাপড় প্রদান করা হবে। আর তারা এ খাতে ব্যয় হওয়াকে বেশি সওয়াবের মনে করে। যদি তারা জানতে পারে যে, এ টাকা দ্বারা মাহফিলে

আগত মেহমানদেরকে খাবার খাওয়ানো হয়, যেখানে অনেক ধনী ও সচ্ছল লোকও রয়েছে, তাহলে হয়তো কেউ কেউ দান করতে অস্বীকৃতি জানাত।

এজন্য আমার মতে সাধারণ ফান্ডের টাকা থেকে মাহফিলের মেহমানদেরকে খাবার খাওয়ানো সন্দেহমুক্ত নয়। আর সন্দেহও প্রবল। সুতরাং হয় তো তাদের জন্য বিশেষ ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ততপক্ষে মাহফিলে যখন অনুদান গ্রহণ করা হবে তখন ঘোষণা দিতে হবে যে, এ মাহফিলের যাবতীয় ব্যয় এ টাকা থেকে বহন করা হবে। তাহলে যিনি এ ব্যপারে একমত না হবেন, তিনি তখনই জানাবেন এবং তার অনুদান আলাদা করে রাখা হবে। এভাবেও সন্দেহ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এত সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করতেও অবহেলা করেন। [আত্ তাবলীগ, আল্ হুদা ওয়াল মাগফিরাহ-১/২২৬]

মাহফিলের অনুদান আপ্যায়নে ব্যয় করা

এক পর্যায়ে আলোচনা হল, তাহলে মাহফিলে আগত মেহমানদের জন্য কোথা থেকে ব্যয় করা হবে? হযরত নিজেই জবাব দিলেন যে, খাদেমগণ খেদমত করতে থাকবেন। মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, মাহফিলের আয় থেকে মেহমানদের জন্য ব্যয় করা জায়েয হবে কি-না? কারণ, জনগণ তো মাদরাসার জন্য দান করেন। হযরত বললেন, অনুমতির উপর নির্ভর করবে। কিন্তু সাধারণ অনুমতি কিভাবে বোঝা যাবে? বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। হ্যাঁ, ভিন্ন ভিন্ন ফান্ড রাখা উচিত। দান গ্রহণ করার সময় টাকা পৃথক ফান্ডে রাখতে হবে। এভাবে সতর্কতা হতে পারে। [হুসনুল আযীয-৪/২৬]

কমিশনের ভিত্তিতে চাঁদা আদায় করার বিধান

প্রশ্ন : মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি চাঁদা কালেকশনের জন্য এশর্তে কালেক্টর নিযুক্ত করে যে, যে পরিমাণ চাঁদা সংগৃহীত হবে তার এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ সংগ্রহকারী পাবেন, তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজনের দৃষ্টিতে এমনটা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি-না?

উত্তর : হানাফী মাযহাবের উসূল ও মূলনীতির আলোকে এটা ইজারায়ে ফাসেদ (অশুদ্ধ চুক্তি) বলে বিবেচিত। অন্য মাযহাবের কথা আমার তাহকীক নেই।

www.banglakitab.weebly.com

চাঁদা আদায়কারীরা কাজ না করলে বেতন-ভাতা পাবে কি-না

প্রশ্ন : জনৈক মুহতামিম সাহেব চাঁদা সংগ্রহ করার জন্য নির্ধারিত বেতনে একজন কালেক্টর নিযুক্ত করলেন। বর্তমানে সে পূর্বের কাজটি করে না; বরং কেরানী ও অন্যদের তদারকির কাজ করে। এ অবস্থায় সে চাঁদা আদায়ের জন্য ধার্যকৃত পূর্বের বেতন পাবে কি-না?

উত্তর : বলাবাহুল্য, সে যখন চুক্তিবদ্ধ কাজটি করে না, তাই পূর্বের বেতনও পাবে না। [এমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৬২]

শিক্ষকের শরয়ী দৃষ্টিকোণ এবং তার বেতন প্রসঙ্গ

শিক্ষক হলেন বিশেষ শ্রমিক। নিজেকে মনিবের হাতে অর্পণ করার দ্বারা পারিশ্রমিকের অধিকারী হয়ে যান। সুতরাং তিনি সময়ের মধ্যে উপস্থিত থাকলে বেতনের যোগ্য হবেন। অন্যথায় হবেন না। [এমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৬১]

মাদরাসার সময়ে ব্যক্তিগত কাজ করলে এবং অন্য সময়ে মাদরাসার কাজ করলে বেতন পাবেন কি-না

প্রশ্ন : কোন শিক্ষক মাদরাসার সময়ে ব্যক্তিগত কাজ করলেন এবং অন্য সময়ে এর পরিবর্তে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করলেন। এমতাবস্থায় তিনি বেতন পাওয়ার যোগ্য হবেন কি-না?

উত্তর : শিক্ষকতা হচ্ছে ইজারা চুক্তি। যদি চুক্তির সময় কোন সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে যে, অমুক সময়ে অমুক কাজ করতে হবে, তাহলে অন্য সময়ে কাজ করার দ্বারা বেতন পাবেন না। আর যদি কেবল কাজের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় এবং সময় নির্দিষ্ট না হয় তাহলে বেতন পাওয়ার যোগ্য হবেন। [এমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৫৬]

মাদরাসা চলাকালীন খালি ঘণ্টায় ব্যক্তিগত কাজ করার বিধান

যদি চাকরির সময় নির্দিষ্ট হয় তাহলে কর্মচারীর জন্য অন্য সময় নিজের ব্যক্তিগত কাজ করা জায়েয হবে। কিন্তু শর্ত হল, নিজের কাজটি মালিকের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না। আর যদি চাকরির সময় নির্দিষ্ট না হয়, তাহলে মালিকের অনুমতি ছাড়া নিজের কাজ বা অন্যের কাজ করা জায়েয হবে না। [এমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৫৬]

www.banglakitab.weebly.com

অসুস্থতা এবং ছুটির দিনগুলোর বেতন দেয়া জায়েয কি-না

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি এ কানুন সম্পর্কে দাতাগণ অবগত থাকেন এবং তাদের সম্মতি প্রমাণিত হয়, তাহলে অসুস্থতা এবং ছুটির দিনগুলোর বেতন অনুদানের টাকা থেকে দেয়া জায়েয। অন্যথায় নাজায়েয। আর যদি সম্মতি প্রমাণিত না থাকে এবং মুহতামিম এবং শিক্ষকদের অসুস্থা এবং ছুটির দিনের বেতন দেয়া শর্ত থাকে তাহলে যিনি এ শর্ত দিয়ে রেখেছেন তিনি নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করবেন। যে মুহতামিম শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন যদি দাতাদের পক্ষ থেকে তাকে কিছু এক্তিয়ার দেয়া থাকে এবং মুহতামিম সাহেব সে এক্তিয়ারের ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের সাথে কিছু শর্ত করেন, তাহলে সে শর্ত অনুযায়ী বেতন নেয়া জায়েয। আর যদি শর্তসমূহ সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকে কিন্তু মাদরাসার নিয়ম-কানুন ও সংবিধান লিখিত ও প্রসিদ্ধ থাকে, তাহলে সেটিও শর্তযুক্তের মতোই হবে। আর যদি সংবিধানে গাওয়া না থাকে এবং রেওয়াজও না থাকে, তাহলে অন্যান্য দীনি মাদরাসাসমূহে যেমন প্রচলিত রয়েছে তদনুযায়ী আমল করা হবে। আর যদি মাদরাসার আয় কোন ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি থেকে এসে থাকে, তাহলে তার ভিন্ন বিধান হবে। [এমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৪৮, ৩৪৯]

ছুটির দিনের বেতনের বিধান

প্রশ্ন : কওমী মাদরাসাসমূহে রমজান মাস ছুটি থাকে। তাই রমজান মাসের বেতন, বিনিময় ছাড়া হওয়া স্পষ্ট ব্যাপার। সেই সাথে শিক্ষকগণ তাদের সময়টুকুও মাদরাসায় ব্যয় করেন না। যদি করতেন, তাহলে নিতে পারতেন। এখন রমজান মাসে দায়িত্ব পালন না করে বেতন নেয়া কিভাবে শুদ্ধ হবে!

যদি মাদরাসার মুহতামিম কোন শিক্ষককে শাবানের ২৯ তারিখে মাদরাসার চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন তাহলে এ শিক্ষক রমজান মাসের বেতন পাবে কি-না। কোন শিক্ষক চাকরিতে বহাল থাকাবস্থায় রমজানের বেতন পেলে কখন থেকে পাবে?

উত্তর : বেতন তো কার্যদিবসগুলোরই হয়ে থাকে। কিন্তু বন্ধ ও ছুটির দিনগুলো কার্যদিবসের অনুগামী হিসেবে সংযুক্ত থাকে। যাতে ছুটির দিনগুলোতে বিশ্রাম নিয়ে কার্যদিবসগুলোতে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন। এ থেকে প্রশ্নোল্লিখিত সকল অংশের জবাব বেরিয়ে এসেছে। প্রথম অংশের জবাব হল, বিধানগতভাবে তা বিনিময়হীন কাজ নয়। দ্বিতীয় অংশের জবাব হল শাবান মাসের শেষে

www.banglakitab.weebly.com

চাকরিচ্যুত হলে রমজনের বেতন পাবেন না। আর চাকরি বহাল থাকাবস্থায় রমজান শেষ হলে বেতন পাবেন। তবে শর্ত হল, শাওয়াল মাসেও কাজ করতে হবে। [এমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৪৮]

কোন শর্ত না থাকাবস্থায় ছুটির দিনের বেতন দয়া ও দান হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য যদি কোন শর্ত হয়ে থাকে অথবা এমন প্রচলিত নিয়ম থাকে, যার উপর সকলে একমত সেটিও শর্তের স্থলাভিষিক্ত হবে। তখন সে শর্তের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। ছাত্র কিংবা মুহতামিমের কাছ থেকে বন্ধের মাসোহারা ও বেতন নেয়া المعروف كالمشروط নিয়মের আলোকে জায়েয। [প্রাগুক্ত]

মাদরাসার সামগ্রী ধার দেয়ার বিধান

হাফেজ সাহেব এসে জিজ্ঞাসা করলেন, মইয়ের প্রয়োজন। মাদরাসার মইটি একটু নিতে পারি? হযরত বললেন, দোকান থেকে ভাড়া নিয়ে যাও। মাদরাসার জিনিসপত্র ওয়াক্‌ফ বিধায় তা ধার দেয়া যাবে না। হাফেজ সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন, মাদরাসার জন্যও তো অন্য জায়গা থেকে জিনিসপত্র ধার আনা হয়।

বললেন, এটা তাদের পক্ষ থেকে দয়া ও দান। তাদের জন্য না দেয়ার এক্তিয়ার রয়েছে। কিন্তু মাদরাসার আসবাবপত্র ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি। এগুলো ধার হিসেবে ব্যবহার করা নাজায়েয মনে করি। [হুসনুল আযীয-১/৯০]

তালেবুল ইলম ও আলেমদের উদ্দেশ্যে কিছু উপকারী কথা, নসিহত ও পরামর্শ

১. দীনের উপর আমল করার ভিত্তি হল সালাফে সালেহীনের 'আযমত' ও শ্রদ্ধা-ভক্তির উপর। এজন্য যথাসম্ভব তাঁদের ব্যাপারে আপত্তি ও সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। [আল্ ইফাজাত-২/২৬৫]

২. মৌলভী হওয়া কোন খুশির ব্যাপার নয়; বরং দীনদার হওয়া খুশির ব্যাপার। [মাযীদুল মাজীদ-৯১]

৩. অধিক ভোজনে শরীর তরতাজা হয় কিন্তু কলব কালিমাযুক্ত ও দুর্বল হয়। আর স্বল্প ভোজনে শরীর দুর্বল হয় কিন্তু কলব শক্তিশালী হয়। [হুসনুল আযীয-৪/২৩৮]

www.banglakitab.weebly.com

৪. ইলমের পাশাপাশি সুহবতের খুব প্রয়োজন রয়েছে। সুহবত দ্বারা জানাশোনাও হয় এবং আমলের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এজন্য শায়খের বড় প্রয়োজন রয়েছে। নিছক কিতাব পড়া যথেষ্ট নয়। [হুসনুল আযীয-৩/৮৯]

৫. মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী [রহ.] বলতেন, পড়ার চেয়ে বেশি বোঝা উচিত। যে ব্যক্তি কেবল পড়ে আর যে বুঝে উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আর অনুভবশক্তি আসে সুহবতের মাধ্যমে। [হুসনুল আযীয--৩/৯০]

৬. আলেমদের সর্বদা দরিদ্র থাকাই শ্রেয়। যে ধর্মের আলেমগণ ধনী ও বিত্তশালী হয়েছে সে ধর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। [হুসনুল আযীয-৩/২২০]

৭. মানুষ যদি অল্পেতুষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে তাহলে অল্প আয় দিয়েই চলতে পারে এবং আবশ্যকীয় দায়িত্বও আদায় করতে পারে। [হুসনুল আযীয-৩/১৫৯]

৮. আলেমদের জন্য দু'টি জিনিস খুবই মন্দ মনে হয়। (১) লোভ এবং (২) অহংকার। এ দু'টি মন্দ স্বভাব তাঁদের মাঝে না থাকা উচিত। [হুসনুল আযীয-৩/৩]

৯. পেন্সিল এবং কাগজ সব সময় পকেটে রাখা উচিত। যখন যে বিষয় মাথায় আসে তা ইঙ্গিতে লিখে রাখতে সুবিধা হবে। অন্য সময় তা বিন্যস্ত করে লিখে নেয়া যাবে। তাই আমার পকেটে পেন্সিল এবং কাগজ থাকে। অন্যথায় অনেক বিষয় মাথায় আসার পর আবার হারিয়ে যায়। [হুসনুল আযীয-৩/১০]

১০. ইমাম মালেক [রহ.]-এর কাছে জনৈক বুযুর্গ চিঠি লিখেছেন যে, আমরা শুনতে পেরেছি, আপনি দামি দামি কাপড় পরিধান করেন। এটা কি বুযুর্গদের শান হওয়া উচিত? ইমাম মালেক [রহ.]-এর সামনে অনেক হাদীস ছিল। ইচ্ছা করলে হাদীসের আলোকে দামি কাপড় পরিধান করার ভাল কাজ প্রমাণিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বললেন, نَعَم نَفعَلُ وَنَستَغفِرُ হ্যাঁ, আমরা দামি কাপড় পরি এবং নিজেদেকে গুনাহগার ভেবে ইস্তিগফার করি। ইমাম মালে [রহ.] এখানে বিনয় দেখালেন। কোন তাবীল করার চেষ্টা করেননি। [হুসনুল আযীয-৩/১৩৬]

১১. অধিক ব্যস্ত মানুষের পক্ষে মুখস্থের উপর ভরসা করা উচিত নয়; বরং আবশ্যকীয় কাজগুলো লিখে নেয়া উচিত। [প্রাগুক্ত-১/৫৯২]

১২. কখনো সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব নিবে না। [প্রাগুক্ত-১/৩৭৯]

১৩. অযথা সময় নষ্ট করা খুবই মন্দ কাজ। কোন কাজ না থাকলে ঘর-সংসারের কাজে লেগে যাও। ঘরের কাজ করার দ্বারা মন প্রফুল্ল থাকে এবং এটি

www.banglakitab.weebly.com

ইবাদতও বটে। জনসমাবেশে বসা ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়, কারো ব্যাপারে অভিযোগ কিংবা গীবত শুরু হয়ে যেতে পারে। এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। [আল্ ইফাজাত-৮/২৬৭]

১৪. লোকজনের সাথে মেলামেশার মাঝে অজস্র ক্ষতি রয়েছে। এ থেকে অসংখ্য খারাবী পয়দা হয়। ব্যস, নিরবে নির্জনে নিজের কাজ করতে থাকা উচিত। [হুসনুল আযীয-১/৩৩০]

১৫. একজন মানুষ সকলকে খুশি রেখে চলা সম্ভব নয়। যখন সর্বাবস্থায় তার উপর মন্দের অভিযোগ আসবেই তাই সে নিজের মঙ্গলকে কেন হাত ছাড়া করবে। যে কাজে নিজের কল্যাণ এবং শান্তি বোধ করবে শরীয়তের অনুমতি থাকলে সেটিই করবে। কে ভালো কিংবা মন্দ বলল, এর চিন্তা করবে না। মানুষ কী বলল তা দেখার বিষয় নয়। আল্লাহ্ তাআলার সাথে মোয়ামালা স্বচ্ছ রাখা উচিত। [হুসনুল আযীয-১/১২৫]

১৬. দু'টি জিনিস আমার খুবই অপছন্দ। একটি হল, বয়ান-বক্তৃতায় সুর করে গজল আবৃত্তি করা। আরেকটি হল, লিখতে গিয়ে অস্পষ্ট লেখা। কেননা, রচনা ও বক্তৃতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্যকে বোঝানো। আর এখানে হয়ে যায় দুর্বোধ্যতা। [হুসনুল আযীয-২/২৫২]

১৭. যাকে ভক্তি করবে তার মন্দ আদেশ পালন করবে না। স্বল্প সময়ের জন্য ধৈর্য ধারণ করবে। সম্ভবত তিনি তোমাকে পরীক্ষা করছেন। যদি তিনি তার পরীক্ষা নেয়ার পূর্বেই ঘোষণা করে দেন তাহলে আর পরীক্ষা কিসের? [হুসনুল আযীয-১/৫৮}

১৮. ব্যস্ততা খুবই নিরাপদ জিনিস। কেননা, কোন কাজে লাগিয়ে রাখা আল্লাহ্ তাআলার রহমত। আল্লাহ তাআলা যার দ্বারা কাজ নিতে চান সেই কাজ করতে পারে। নিজে কিছুই করতে পারে না। [হুসনুল আযীয-১/১৩৫]

১৯. নিজের কোন কিছুর উপর গর্ব করা উচিত নয়। ইলম, যোগ্যতা, বুদ্ধি, সাধনা, তাকওয়া, ইবাদত, আমল, বীরত্ব, শক্তি, সৌন্দর্য ইত্যাদি সবই তো আল্লাহ তাআলার দান। তাহলে গর্ব করবে কোন জিনিসের উপর। গর্ব তো নিজস্ব জিনিসের উপর করা হয়। যখন মানুষের নিজস্ব বলতে কিছু নেই, তখন তো সে করুণার পাত্র। করুণার পাত্র হয়েও যদি গর্ব করে তাহলে আর মঙ্গল নেই। [আল্ ইফাজাত-৮/১৭]

www.banglakitab.weebly.com

২০. যার মাথার উপর কোন মুরব্বীর ছায়া রয়েছে সর্বদা তাকে জিজ্ঞাসা করে কাজ করা উচিত। এ বিষয়টির প্রতি ছোটদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। [মালফুজাতে আশরাফিয়া-২১৩]

২১. বড়দের সাথে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হওয়া ঢালাওভাবে নিন্দনীয় নয়। নিয়ত ভালো থাকলে সমস্যা নেই। তবে নিয়ত ভালো থাকার পরও যদি মুরব্বী সেটি বারণ করে তাহলে চুপ থাকবে। পরবর্তীতে তার অনুমতি পেলে বলতে পারো। [আল ইফাজাত-২/৩০৯]

২২. বড়দের (পীর সাহেবেরও) কোন ভুল হয়ে গেলে মুরীদের আপত্তি না করা উচিত। তবে যখন দেখবে নিজে নিজে সতর্ক হচ্ছেন না তখন পূর্ণ আদব ও সৌজন্য রক্ষা করে সতর্ক করে দিবে। যদি সতর্ক হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়, তাহলে চুপ থাকবে। তখন আপত্তি করা অহেতুক কর্ম হবে। [হুসনুল আযীয-৩/১০৩]

২৩. মানুষ যতক্ষণ দীনের পাবন্দ না হবে তার কোন কথার মূল্য নেই। কেননা, তার কোন কাজ সীমার ভিতরে থাকবে না। বন্ধুত্ব বলো, দুশমনী বলো সবই সীমারেখার বাইরে চলে যাবে। এমন মানুষ খুবই ভয়ঙ্কর হবে। সব কিছু যথাস্থানে রাখাই হল বড় কামাল ও যোগ্যতা। আজকাল অধিকাংশ আলেম ও পীর মাশায়েখের মাঝে এ বিষয়টির ত্রুটি রয়েছে। কোন কিছুই তাদের কাছে যথাস্থানে নেই। [আল্ ইফাজাত-৮/২০৪]

২৪. অভিজ্ঞতা থেকে একটি কথা বলছি, কথাটি খুবই উপকারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। তাহল এই, কোন কিছুর জন্য উঠেপড়ে লাগবে না। এতে কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে। ১. মানুষ সন্দেহ করবে এ কাজে বুঝি তোমার কোন স্বার্থ রয়েছে। মানুষ ভাববে, সে কেন এর জন্য এত উঠেপড়ে লেগেছে। নিশ্চয় তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। ২. এক পর্যায়ে এতে গ্রুপিং ও দলাদলি শুরু হয়ে যায়। তারপর আর কোন কাজ হয় না। ৩. সূচনাতে নিয়তের মধ্যে ইখলাস থাকলেও এক পর্যায়ে কাজ সফল হতে লাগলে নফসায়্যিাত চলে আসে। তারপর আর সওয়াবের আশা করা যায় না। সেই সাথে মানুষের সুদৃষ্টিও উঠে যায়। এটি একটি সূক্ষ্ম কথা। আর শরীয়তের বিধান তাই। ইরশাদ হচ্ছে : أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ [আল্ ইফাজাত-৮/২৭০]

২৫. আমাদের ধারণায় আরেকটি ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেটি হল, পরস্পরে বসে একে অন্যের কাছে বলে, অমুক বড় এবং অমুক ছোট। একে অন্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অন্যের দোষ চর্চা করে থাকে। আমরা আমাদের বড়দেরকে

www.banglakitab.weebly.com

দেখেছি মজমায় অনেক লোক থাকলেও বোঝা যেত না কে পীর আর কে মুরীদ। [হুসনুল আযীয-৩/৩১]

২৬. আমি তো আমার বন্ধুদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকি যে, যদি আল্লাহ্ তাআলা কোন দীনি মাদরাসায় দরস-তাদরীসের সুযোগ করে দেন, তাহলে মুহতামিম কিংবা কোন দায়িত্বশীল হবে না। কেননা, উভয়টির মাঝে বৈপরিত্য রয়েছে। শিক্ষক এবং ইলমী খেদমতে নিয়োজিতদের জন্য শোভনীয় হল, নিজের কাজে নিমগ্ন থাকা এবং স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৮৫]

২৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব [রহ.] ছাত্র, আলেম এবং সুফীদেরকে সবসময় এই নসিহত করতেন যে, তোমরা ইবাদত, নামায, দোয়া, কিতাব মুতালাআ, দরস-তাদরীস, ওয়াজ-নসিহত ইত্যাদি যে কোন কাজ করনা কেন, অন্তরের আগ্রহ ও উদ্দীপনা শেষ না হতেই তা ছেড়ে দাও। ফলে অতি সত্বর নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং কাজ বেশি হবে। আর যদি আগ্রহ-উদ্দীপনা পূর্ণ করে ক্লান্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দাও, তাহলে দ্বিতীয়বার সে কাজের আগ্রহ-উদ্দীপনা আসতে বেশ বিলম্ব হবে। এভাবে কাজ করলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। [মাযীদুল মাজীদ-৭১, মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-৩১৫]

২৮. যার স্বভাবে বিলাসিতা প্রবল হয় তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। [মালফুজাত-২/১৬]

আরো বলেন, ছোট জায়গায় থেকেও বেশি কাজ করা যেতে পারে। কেননা, তখন অবসর সময় বেশি পাওয়া যায়। আর বড় জায়গায় থেকে ছোট কাজও হয় না। কেননা, বেশির ভাগ সময় ব্যয় হয় মানুষের মনোরঞ্জনের কাজে। এ পর্যন্ত যত কাজ হয়েছে তা এ জায়গারই বরকত। কাজ তো হয় গুমনামী ও অন্তরালের মাঝে। [আত্ তাবলীগ-১০/১২৯]

www.banglakitab.weebly.com

হযরত থানভী [রহ.]-এর মাদরাসার নেজাম ও কর্মপদ্ধতি

চাঁদা বা অনুদান

১. কারো কাছ থেকে চাঁদা চাওয়া হয় না এবং প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কালেকশন করা হয় না এমনকি কাউকে দিয়েও করানো হয় না।

২. যদি কেউ খুশি মনে পাঠিয়ে দেয় কিংবা সরাসরি দিয়ে যায়, তাহলে সে যে খাতে ব্যয় করতে বলে সে খাতেই ব্যয় করা হয়। আর কোন খাতের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করলে যেখানে প্রয়োজন হয় খরচ করা হয়।

৩. চাঁদা আদায়ের পর রীতিমত কোন রসিদ প্রদান করা হয় না।

৪. আয়-ব্যয়ের কোন মাসিক বা বার্ষিক প্রতিবেদন ছাপানো হয় না। তবে যে টাকা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যয় না করা হয় তা নিজের এতমিনানের জন্য ডায়রীতে লিখে রাখা হয়।

৫. শরীয়ত পরিপন্থী কোন টাকা, বস্তু বা কাগজপত্র গ্রহণ করা হয় না। বিশেষভাবে নানা উপলক্ষ্যে সামাজিক প্রথা স্বরূপ যে টাকা প্রদান করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে ফেরত দেয়া হয়।

কুতুবখানা

১. আলহামদুলিল্লাহ প্রয়োজন পরিমাণ কিতাবাদী এখানে মজুদ রয়েছে।

২. এখানে যেসব কিতাব মজুদ রয়েছে তা দেশী-বিদেশী অসচ্ছল ছাত্রদেরকে পড়ার প্রদান করা হয়।

৩. যেসব কিতাব মজুদ নেই কিংবা মজুদ রয়েছে কিন্তু কাউকে প্রদান করার মতো নয়, তা প্রদান করা হয় না। তালেবুল ইলমগণ নিজেরা খরিদ করে নেয়।

ছাত্রদের খাবার

১. ছাত্রদের খাবারের দায়িত্ব মাদরাসা গ্রহণ করে না।

২. কোথাও থেকে ব্যবস্থা হলে প্রয়োজন পরিমাণ কোন ভাতা নির্ধারণ না করে দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়।

www.banglakitab.weebly.com

৩. আয় সাপেক্ষে ছাত্রদেরকে যে টাকা প্রদান করা হয় তাতে তাদের পূর্ণ এক্তিয়ার রয়েছে। কয়েকজন মিলে মাদরাসায় রান্না করতে পারে কিংবা কোথাও হতে রান্না করিয়ে আনতে পারে।

৪. কেউ যদি ছাত্রদের জন্য মাসিক খাবারের ব্যবস্থা করে তাহলে খাবার মাদরাসায় পৌঁছে দিতে হয়। ছাত্রগণ খাবার আনার জন্য তার বাড়িতে যায় না।

৫. কেউ যদি ছাত্রদেরকে দাওয়াত করে তাহলে ছাত্ররা তার বাড়িতে খাবার খেতে যায় না; বরং মাদরাসায় খাবার এসে যায়। কেউ এ শর্ত কবুল না করলে তার দাওয়াতই কবুল করা হয় না।

৬. যেসব ছাত্র মজদুরী করতে আগ্রহী তাদের জন্য মজদুরী করার অনুমতি রয়েছে।

৭. কোন মেহমানের কাছ থেকে সরাসরি ছাত্ররা কোন কিছু গ্রহণ করার অনুমতি নেই। পৃষ্ঠপোষকের অনুকরণ করা খুবই জরুরি।

৮. একটি নতুন নিয়ম করা হয়েছে যে, ছাত্ররা মসজিদে অবস্থান করবে না।

ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ

১. ছাত্রদের পোশাকের দায়িত্বও মাদরাসার নয়। যদি কোথাও হতে বানানো সেট কিংবা কাপড় আসে, তাহলে তদন্ত করে শরীয়তের গন্ডির ভিতর আছে বলে মনে হলে গ্রহণ করা হয় এবং দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হয়। আর যদি কোন কারণে শরীয়তের মাপকাঠিতে না টিকে, তাহলে ফেরত দেয়া হয়। বিশেষতঃ মিরাস ও উত্তরাধিকারের অংশের ব্যাপারে খুব তদন্ত করা হয়। যদি কোন একজন ওয়ারিসও মৃত ব্যক্তির কাপড় মাদরাসায় দান করতে সম্মত না হয় কিংবা ওয়ারিসদের মধ্যে নাবালেগ কেউ থাকে তাহলে ফেরত দেয়া হয়।

২. কখনো কারো বেশি প্রয়োজনের সময় সম্ভব হলে কাপড়ের জন্য নগদ অর্থও দেয়া হয়।

৩. লেপ, তোষক, চাদর, আচকান ইত্যাদি কোথাও থেকে এলে অথবা বানানো হলে সেগুলো যথাযথভাবে মাদরাসায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়। শীতকালে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় এবং শীতের মৌসুম শেষ হলে ফেরত নিয়ে রেখে দেয়া হয়।

www.banglakitab.weebly.com

৪. ছাত্রদের মতো যাকেরীনদেরকেও লেপ, তোষক প্রদান করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে নগদ টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে তাদেরকে শামিল করা হয়।

ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা

১. ভর্তিপরীক্ষায় কোন বিশেষ কিতাবের পরীক্ষা দেয়ার শর্ত নেই। এক্ষেত্রে কায়দার ছাত্র এবং মিশকাত শরীফের ছাত্র বরাবর।

২. ভর্তির জন্য ভালো চালচলন ও সুস্থ-শুদ্ধ স্বভাবের অধিকারী হওয়া শর্ত।

৩. এটা আবশ্যক নয় যে, যে কোন াত্র এলেই তাকে ভর্তি করে নিতে হবে। বরং শিক্ষকের হাতে অবসর সময় থাকলে কিংবা বড় কোন ছাত্রের কাছে সবক পড়ার ব্যবস্থা হলেই ভর্তি করা হয়। অন্যথায় পরিষ্কারভাবে না করে দেয়া হয়।

৪. ভর্তির ক্ষেত্রে বহিরাগত এবং স্থানীয় ছাত্ররা বরাবর।

৫. যে ব্যক্তি বাইরের স্বল্পবয়সী ছাত্র ভর্তি করাতে চায় তিনি যদি সেসব ছাত্রের জন্য কোন বেতনভুক্ত তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে দেন, তাহলে ভর্তি করা হয়। অন্যথায় ভর্তি করা হয় না।

পরীক্ষা পদ্ধতি

১. প্রত্যেক মাসের প্রথম তারীখে কুরআন শরীফ ও ফারসী-আরবীর ছাত্রদের বিগত মাস যতটুকু পড়া হেয়েছে তার পরীক্ষা হয়।

২. সর্বনিম্ন পাস নম্বর ১৫ এবং সর্বোচ্চ নম্বর ২০।

৩. যে ছাত্র পরপর তিন মাস পাস নম্বর না পায় তাকে মাদরাসা থেকে বের করে দেয়া হয়।

৪. যে ছাত্র বেশির ভাগ কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকে কিংবা তার কোন মন্দ চালচলন প্রমাণিত হয় তাকেও বহিষ্কার করে দেয়া হয়।

৫. বার্ষিক পরীক্ষা হয় না।

৬. বার্ষিক কিংবা ষান্মাসিক কোন মাহফিল হয় না। তবে যেসব ছাত্র কুরআন শরীফের হিফজ সমাপ্ত করে তাদেরকে জামে মসজিদে জুমার নামাযের পর তাদের মুখ থেকে কিছু তিলাওয়াত শুনে মনতুষ্টির জন্য তাদেরকে পাগড়ি পরিয়ে দেয়া হয়। যেসকল ছাত্র কিতাবখানা থেকে ফারেগ হবে তাদেরকেও পড়া শেষে পাগড়ি পরানো হবে ইনশাআল্লাহ।

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসার বন্ধ, শিক্ষকদের ছুটি ও অন্যান্য বিষয়

১. এখানে শিক্ষকতার জন্য বিশেষভাবে কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না; বরং যেসকল আলেম এখানে যিকির শোগলের উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন, তারাও শিক্ষাদান করেন। কিন্তু যেহেতু এখানে অবস্থানকারী আলেমগণ নিয়মিত থাকেন না এবং এ পদ্ধতি প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য বেশি ক্ষতিকর তাই আরবী ও ফার্সির জন্য একজন এবং কুরআন শিক্ষা জন্য একজন নিয়মিত শিক্ষক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নিযুক্ত করা আছে। তেমনিভাবে তাজবীদের জন্যও একজন কারী সাহেব রাখা আছে।

২. শিক্ষকদের বেতনের দায়িত্ব মাদরাসার উপর নয়। কোথাও থেকে ব্যবস্থা হলে বেতন দেয়া হয়, অন্যথায় দেয়া হয় না। মোটকথা, ছাত্রদের মতো শিক্ষকগণও তাওয়াক্কুলকারী।

৩. দিনে মোট ছয় ঘণ্টা দরস হয়। দরসের শুরু শেষ ঋতুভেদে পরিবর্তন হয়।

৪. প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার, বছরের ২০ রমজান থেকে ১ শাওয়াল এবং ৯ জিলহজ থেকে ১৩ জিলহজ পর্যন্ত মাদরাসা বন্ধ থাকে।

৫. ১ রমজান থেকে ২০ রমজান পর্যন্ত সকালে কুরআনের শিক্ষক কুরআনের ছাত্রদের কাছ থেকে কুরআন মাজীদ শুনেন এবং আরবী শিক্ষকের কাছে প্রাথমিক ছাত্র থাকলে তাদেরকেও সকালে পড়ানো হয়। আর অন্য সময় উভয় গ্রুপের ছুটি থাকে।

৬. শিক্ষকগণ আবেদন করলে গোটা বছরে ভিন্ন ভিন্নভাবে ১৫দিন ছুটি দেয়া হয়। এর বেশি দিনের ছুটি কাটালে (তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে প্রাপ্ত) বেতন থেকে কর্তন করা হয়।

৭. অসুস্থার কারণে ভিন্ন ভিন্ন কিংবা একত্রে ১৫দিন ছুটি দেয়া হয়। এর বেশি হলে বেতন কর্তন করা হয়।

এসব আমলের ক্ষেত্রে সময়, প্রেক্ষাপট ও বিশেষ কল্যাণের ভিত্তিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হতে পারে। কিন্তু সর্বাবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে অনাড়ম্বরতা ও তাওয়াক্কুলের শান যেন হাতছাড়া না হয়।

ছাত্রদের তরবিয়ত ও চরিত্র সংশোধন

১. এ মাদরাসার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধন।

২. মাদরাসার ভিতরে অবস্থানকারী ছাত্ররা একে অন্যের সাথে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়া নিষেধ। এ ব্যাপারে খুব কঠিন নেগরানী করা হয়।

www.banglakitab.weebly.com

৩. একে অন্যের কামরায় যাওয়ার অনুমতি নেই। ঘণ্টার সময় ছাড়া একত্রে বসা ও কথা বলা নিষেধ।

৪. পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশভূষা একেবারে সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর রাখতে হয়। শরীয়ত পরিপন্থী পোশাক এবং সাজসজ্জা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

৫. ছোট নাবালেগ ছাত্রদের চুল বড় হতে পারে না। বেশির ভাগ সময় তাদের মাথা মুণ্ডিয়ে দেয়া হয়।

৬. নিজের উস্তাদ কিংবা তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি ছাড়া বাজারে বা অন্য কোথাও যাওয়া নিষেধ।

৭. শহরের ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখার একেবারেই অনুমতি নেই।

৮. ঘনঘন বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না।

মাদরাসার ফান্ড সম্পর্কিত কিছু জরুরি জ্ঞাতব্য

১. মাদরাসা ও খানকার কোন খাতের টাকা ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী কাউকে ঋণ দেয়া হবে না। অন্যদেরকে তো দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কোন মোতাওয়াল্লী এমন ভুল করলে জরিমানা দিতে হবে। টাকাগুলো এভাবেই থাকবে। মাদরাসার নামেও নয়, খানকার নামেও নয়। টাকা ব্যয় করার অধিকার থাকবে একমাত্র মোতাওয়াল্লীর। তিনি যে কোন কল্যাণকর খাতে ইচ্ছা করলে ব্যয় করতে পারবেন। কারণ, এটাও তো আমানত।

২. তহবিল (ক্যাশ) সর্বদা এমন সিন্দুকে রাখা উচিত যার মধ্যে কমপক্ষে ভিন্ন চাবির দু'টি তালা লাগানো হয়। তার একটি চাবি থাকবে মোতাওয়াল্লীর কাছে আরেকটি থাকবে মোতাওয়াল্লী নিযুক্তকারীর কাছে। মোতাওয়াল্লী নিযুক্তকারী মারা গেলে বা দূরে কোথাও গেলে বা অনুপস্থিত থাকলে খানকায় অবস্থানরত কোন শায়খের কাছে চাবি সংরক্ষিত থাকবে। কোন শায়খ উপস্থিত না থাকলে মোতাওয়াল্লী স্বীয় দীনদারীর ভিত্তিতে এমন কাউকে নির্বাচন করবেন যিনি দীনদারীতে মোতাওয়াল্লী থেকে দুর্বল নন। উভয়ের উপস্থিতিতে ক্যাশ থেকে টাকা নেয়া হবে। আর দ্বিতীয় চাবি সংরক্ষণকারীর পরিবর্তন মোতাওয়াল্লী নিযুক্তকারীর জীবদ্দশায় তার পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। আর তার মৃত্যুর পর স্বতন্ত্রভাবে মোতাওয়াল্লীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

www.banglakitab.weebly.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সিন্দুকে টাকা খুব কম বা একেবারে না থাকাবস্থায়ও এ নিয়মের উপর যত্নসহকারে আমল করতে হবে।

৩. মোতাওয়াল্লী এক মাসের স্বাভাবিক খরচের বেশি টাকা উঠিয়ে নিজের কাছে রাখতে পারবে না।

৪. প্রত্যেক মাসের শেষে আয়-ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত টাকা যোগ করে দ্বিতীয় চাবি সংরক্ষণকারী নিরীক্ষণ করে বকেয়া এবং চলতি হিসাবকে নিজ চোখে দেখে খাতায় স্বাক্ষর করবে।

৫. খুব প্রয়োজন মুহূর্তে এক খাত থেকে অন্য খাতে ঋণ নেয়া যেতে পারে। তবে যে টাকাগুলোর তামলীক জরুরি সেগুলো থেকে ঋণ নেয়া যাবে না।

:: সমাপ্ত ::

---

২৯ জুলাই, বৃহঃবার, বাদ ফজর, ৬.৫৮ মিনিটে সুহৃদ হাফেজ মুহাম্মদ হেদায়াতুল্লাহ পরিচালিত 'মাদরাসাতুল হক বাংলাদেশে' এ বইয়ের অনুবাদ সমাপ্ত হয়।

فلله الحمد و الشكر والصلاة على النبي الامى

www.banglakitab.weebly.com

আশরাফিয়া বুক হাউস
১১ বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার, ঢাকা

Design : An-Noor
01712510726, 01670837659

www.banglakitab.weebly.com